শনিবারের চিঠি

বৈশাখ ১৩৫৪—আশ্বিন ১৩৫৪

ষাণ্মাসিক সূচি

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

অতি-আধুনিক অর্থনীতি—শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টখণ্ডী ৫৩৮
অনাবশ্যক ৫১৩
অরণ্য-মর্মর—শ্রীমতী বাণী রায় ৫০৯
আসল সত্য ৩৪৫
উনত্রিংশে শ্রাবণ, ১৩৫৪—"বনফুল" ৩৮৫
কবিতা—শ্রীপ্রভাত বসু ৪৮৯
কোন্ পথে—শ্রীশীতাংশু মৈত্র ৩০
ক্ষুদিরাম—শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন ৫২০
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১৮৪
খবরের কাগজ—"ভাস্কর" ৫১৩
গড়পড়তা মানুষ—শ্রীদেবব্রত রেজ ১২৫
ঘর-ঠিকানা—শ্রীআরতি রায় ৩৬৬
গান্ধী-বাণী-কণিকা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৫৩০
জাতীয় পতাকা—শ্রীঅতুল্য ঘোষ ২৪৮
জানেন ?—"বনফুল" ২৯
টুক্‌রো কবিতা—শ্রীলীলাময় দে ১১৬, ১৯৩
তারাশঙ্কর ২৬৯
—শ্রীকমলাকান্ত পাঠক
—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
—শ্রীকালিদাস রায় ২৮১
—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ২৮০
—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭৭
—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ২৭৪
—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র ২৮৮
—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ২৭২
—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ২৭৪
—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ২৮৫
—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ২৮২
—"বনফুল" ২৮৪
—শ্রীমতী বাসন্তী রায় ২৮৮

তারাশঙ্কর—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭৩
—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ২৮৫
—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৬
—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ২৮২
—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৩
—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২৮২
তোমরা—"সুবাস" ১১০
ত্রি—"বনফুল" ৫৩৬
দাঙ্গা—শ্রীমনোজ বসু ৫৩৪
দাবি—"বনফুল" ৬০
দি বক্স টানেল—শ্রীজীবনময় রায় ৬১
দুইখানি প্রাচীন সাময়িক-পত্র—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১৪
ধর্মঘট—শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টখণ্ডী ৩৪১, ৪৭০
নতুন দিনের গান ২৫৭
নব-বর্ষ—"বনফুল" ৪৫
নির্বাপিত—শ্রীমতী বাণী রায় ৩৬১
নেলীর বাবার ডায়েরি—শ্রীসুকুমার রায় ১১৭
পতাকা—"বনফুল" ২৫৬
পদচিহ্ন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬, ১৩৫, ২২০, ৩০৭, ৩২৮, ৫০১
পনেরো আগস্টের পর ৩৫৭
পরিণাম ১৩১
পাগল—শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র ৩২১
পেরেক—শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টখণ্ডী ৪৩
প্রেয়সী—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য ৪৩৬
বিজ্ঞাপন-মাহাত্ম্য—শ্রীমুরারি দত্ত ১৯৪
বিবেক ৪৩৫
বিরূপাক্ষের বিষম বিপদ—"বিরূপাক্ষ" ৪৮৭
ভাবী বিরহ—শ্রীনিবিড়ানন্দ নকলনবিস ১৫১
ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ—শ্রীসজনীকান্ত দাস ১

ভিক্ষা—শ্রীঅমলা দেবী ৪৪৭
ভিক্ষা-তত্ত্ব—শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টখণ্ডী ১৮৫
মহাজয়—শ্রীপ্রবোধেন্দু ঠাকুর ৩৫৬
মহাত্মা—শ্রীপ্রভাত বসু ৬৮৬
মহাস্থবির জাতক—"মহাস্থবির" ১২, ৯৭, ১৭১, ২৮৯
মুসাফিরের ডায়েরি—"মুসাফির" ৬, ১২৭, ১৮৮, ৩৫৮, ৪৩৯
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী—সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত ৪৪৪
মুক্তি—শ্রীনীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪২৯
রমেশচন্দ্র দত্ত—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮১
লর্ড-সিংহের বার্ধক্য—শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টখণ্ডী ১১২
লাভ-ক্ষতি—শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন ২১৬
শচীন্দ্রনাথ মিত্র-স্মরণে ৪০৪
শ্রীরাধার অবতার—শ্রীননীমাধব চৌধুরী ১২৮
সংবাদ-সাহিত্য ৭২, ১৫২, ২৩২, ৩৯২, ৫৪১
সভতার অপমৃত্যু—শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন ৩৮৯
সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত—শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় ৪৪২
—শ্রীনির্মলকুমার বসু ৪৪৩
সাহিত্য ও রসতত্ত্ব—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ৩৭৪
সাহিত্যে স্থায়ী ও সঞ্চারী—শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত ১৬১
স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি—শ্রীসুনীলকুমার পাল (ভাস্কর) ৪২০
স্বাধীনতা এবং স্ব-রাজ—শ্রীনির্মলকুমার বসু ২৫০
স্বাধীনতার জন্ম—"বনফুল" ৩৩৮
হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও গান্ধীজী—শ্রীনির্মলকুমার বসু ৪০৫
হে বন্ধু !—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য ৩৮৯
২ অক্টোবর ৪০১
৯ই আগস্ট স্মরণে ২৫১
১৫ আগস্ট ২৪৫
১৫ই আগস্ট—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪১
১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭—"ভাস্কর" ৩৮৬

শনিবারের চিঠি
১৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৪

ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ

বুদ্ধ ও চৈতন্যের সমসাময়িক বা অব্যবহিত পরবর্তী কালে এই দুই মহাপুরুষের প্রভাব দেশের জনগণের ওপর কেমন ছিল, তার কিছু কিছু পরিচয় পালি-সাহিত্যে এবং বাংলা-সাহিত্যে মেলে। দেখতে পাই, একটা ভাবের বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল, আবেশ লেগেছিল ভক্তদের চিত্তে। দেশের ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, কারুশিল্প, ভাস্কর্য, সাজসজ্জা, আচার-ব্যবহার—সবই যে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত হয়েছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, সাধারণ ও অসাধারণ লোক দলে দলে ভিক্ষুশ্রমণ অথবা বৈরাগী-বৈষ্ণব হয়ে সংসারধর্ম পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ সামাজিক জীবনে বহুবিধ বিপর্যয় ঘটিয়েছিলেন এঁরা।

কিন্তু এঁরা উভয়েই ছিলেন ধর্মপ্রবর্তক; জাতির অতিশয় সঙ্কটকালে মুক্তির নূতন পন্থা নিয়ে এঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন, দেশ ও কাল—দুইই অনুকূল ছিল। এক জনের আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালে, অন্য জনের মধ্যযুগে। মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তি তখনও পরিপুষ্টি লাভ করে নি, অলৌকিকের প্রতি মানুষের মোহ কাটে নি।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বিজ্ঞানধর্মী আধুনিককালে, যুক্তির সাহায্যে সর্ববিধ সংস্কার-মুক্তির প্রয়াসের মধ্যে। কোনও সঙ্কটকালের পথনির্দেশক অর্থাৎ ধর্মপ্রবর্তকরূপেও তিনি আসেন নি। তিনি এসেছিলেন কবি হিসেবে, সাহিত্যশিল্পী হিসেবে, সঙ্গীতস্রষ্টা হিসেবে। কিন্তু এই কবি-কর্মের মধ্যেই তিনি মানুষের চিত্তকে এমন ভাবে অধিকার করেছিলেন যে, এই সংশয়শাসিত যুগেই তিনি অনুরূপ বিপর্যয় ঘটিয়ে গেছেন; ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, কারুশিল্প, শিক্ষা, সাজসজ্জা, আচার-ব্যবহার—সমস্ত কিছু প্রভাবান্বিত হয়েছে তাঁর সংস্পর্শে। ধর্মেতর ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবীর বর্তমান ইতিহাসের মধ্যে কোথাও এমনটি আর ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথ পরম বিস্ময়ের মতই র'য়ে গেলেন। তিনি শুধু যুগপ্রবর্তক মাত্র রইলেন না, সমস্ত যুগটাই তাঁতে বিধৃত হয়ে রইল।

তাঁর সাহিত্য কাব্য বা সঙ্গীতের মহিমাকীর্তন স্বল্পপরিসরের মধ্যে সম্ভব নয়। সে আলোচনা গাঢ় মনোযোগ ও দীর্ঘকালের সাধনার অপেক্ষা রাখে। রবীন্দ্র-রচনার গভীর গহনের মধ্যে তার জন্যে বক্তা ও শ্রোতা উভয়কেই প্রবেশ

করতে হবে। শুধু 'সঞ্চয়িতা' 'গীতাঞ্জলি' 'শেষের কবিতা' 'বলাকা' 'মহুয়া' ও 'নবজাতকে'র সঙ্গে স্পর্শ-গভীর পরিচয় থাকলেই চলবে না। অথচ এইটা করাই এরই মধ্যে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে জন্যে দুঃখ ক'রে লাভ নেই, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন না হ'লে আমাদের স্বাভাবিক পল্লবগ্রাহিতা রবীন্দ্রনাথকেও অপমান করতে থাকবে।

আজ এই স্মৃতি-পূজার উৎসবে আমি শুধু ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করব, বাঙালী রবীন্দ্রনাথকে নয়, কবি রবীন্দ্রনাথকে নয়, বিশ্বের রবীন্দ্রনাথকেও নয়—যে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে অন্তরে ধ্যানের মত ধারণ করেছিলেন, তাঁকে। কারণ ভারতবর্ষের আজ বড় বিপদের দিন এসেছে। সে শুধু ভৌগোলিক আয়তনেই খণ্ডিত হতে যাচ্ছে না, তার প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটাবার ঘোর ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছে।

আমাদেরই অব্যবহিত পূর্বকালে দু জন বাঙালী মহাপুরুষ ভারতবর্ষের বিপুল মহিমা উপলব্ধি করেছিলেন, এক জন স্বামী বিবেকানন্দ, অন্য জন কবি রবীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষের যথার্থ গৌরব তাঁরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছিলেন। বিবেকানন্দ জ্ঞানযোগী হয়েও কর্মী ছিলেন, তাঁর সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষকে তিনি সাধ্যমত ঐক্যে প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা আরও বড় ছিল, সে লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের এখনও অনেক তপস্যার প্রয়োজন হবে। তাঁর প্রার্থনা এই—

"হে ভারতবর্ষের চিরারাধ্যতম অন্তর্যামী বিধাতৃপুরুষ, তুমি আমাদের ভারতবর্ষকে সফল কর। ভারতবর্ষের সফলতার পথ একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ। তোমার মধ্যেই তাহার ধর্ম, কর্ম, তাহার চিত্ত পরম ঐক্য লাভ করিয়া জগতের, সমাজের, জীবনের সমস্ত জটিলতার নির্মল সহজ মীমাংসা করিয়াছিল। যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিবিধের আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমাণ করিতে থাকে, তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে। ভারতবর্ষের পথ একের পথ, তাহা বাধাবর্জিত তোমারি পথ—আমাদের বৃদ্ধ-পিতামহদের পদাঙ্কচিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না করি, তবে কোনোমতেই আমরা ব্যর্থ হইব না। জগতের মধ্যে অন্ত দারুণ

দুর্যোগের দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে—চারিদিকে যুদ্ধভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে—বাণিজ্যরথ দুর্বলকে ধূলির সহিত দলন করিয়া ঘর্ঘর শব্দে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছে—স্বার্থের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রলয়-গর্জনে চারিদিকে পাক খাইয়া ফিরিতেছে—হে বিধাতঃ, পৃথিবীর লোক আজ তোমার সিংহাসন শূন্য মনে করিতেছে, ধর্মকে অভ্যাসজনিত সংস্কারমাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে—হে শান্তং শিবমদ্বৈতম্, এই ঝঞ্ঝাবর্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না, শুষ্ক মৃত পত্ররাশির ন্যায় ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধূলিধ্বজা তুলিয়া দিগ্বিদিকে ভ্রাম্যমাণ হইব না—আমরা পৃথিবীব্যাপী প্রলয় তাণ্ডবের মধ্যে একমনে একাগ্র নিষ্ঠায় এই বিপুল বিশ্বাস যেন দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকি যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততোভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাতত মঙ্গল দেখা যায়, আপাতত শত্রুরা পরাজিত হইতে থাকে, কিন্তু সমূলে বিনাশ পাইতে হয়।

"একদিন নানা দুঃখ ও আঘাতে বৃহৎ শ্মশানের মধ্যে এই দুর্যোগের নিবৃত্তি হইবে—তখন যদি মানবসমাজ এই কথা বলে যে, শক্তির পূজা, ক্ষমতার মত্ততা, স্বার্থের দারুণ দুশ্চেষ্টা যখন প্রবলতম, মোহান্ধকার যখন ঘনীভূত এবং দলবদ্ধ ক্ষুধিত আত্মম্ভরিতা যখন উত্তরে-দক্ষিণে পূর্বে-পশ্চিমে গর্জন করিয়া ফিরিতেছিল, তখনো ভারতবর্ষ আপন ধর্ম হারায় নাই, বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই, একমাত্র নিত্য সত্যের প্রতি নিষ্ঠা স্থির রাখিয়াছিল—সকলের উর্ধ্বে নির্বিকার একের পতাকা প্রাণপণ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়াছিল—এবং সমস্ত আলোড়ন-গর্জনের মধ্যে মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিতেছিল—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—একের আনন্দ, ব্রহ্মের আনন্দ, যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয়প্রাপ্ত হন না—ইহাই যদি সম্ভবপর হয়, তবে ভারতবর্ষে ঋষিদের জন্ম, উপনিষদের শিক্ষা, গীতার উপদেশ, বহু শতাব্দী হইতে নানা দুঃখ অবমাননা, সমস্তই সার্থক হইবে—ধৈর্যের দ্বারা সার্থক হইবে, ধর্মের দ্বারা সার্থক হইবে, ব্রহ্মের দ্বারা সার্থক হইবে—দম্ভের দ্বারা নহে, প্রতাপের দ্বারা নহে, স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নহে।"

রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের আদর্শ তাঁর চিঠিপত্রে আরও পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি বলছেন—

"যে অবস্থায়, যে সঙ্গে, যে শিক্ষার মধ্যে পতিত হও না কেন, ভারতবর্ষের আদর্শকে কোন মতেই হৃদয় হইতে ম্লান হইতে দিয়ো না। ইহা নিশ্চয় মনে রাখিয়ো, য়ুরোপীয় বর্বরেরা ভারতবর্ষের যথার্থ মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া উপহাস করে। সে উপহাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিও।...তাহারা বর্বরতাকেই সভ্যতা বলিয়া স্পর্ধা করে। শান্তিতে সন্তোষে মঙ্গলে ক্ষমায় জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা; সহিষ্ণু হইয়া, সংযত হইয়া, পবিত্র হইয়া, আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া, বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া, পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধনমুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে প্রস্তুত হও।...তুমি ক্ষত্রিয় তাহা কদাপি বিস্মৃত হইও না।...অন্যায়, অত্যাচার, অধর্ম, অনাচার হইতে দেশকে সমাজকে রক্ষা করা, ইহাই ক্ষত্রিয়ের কুলব্রত।... ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে—দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি। এই দুই সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিলেই—ভারতবর্ষ পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিতে পারিবে।...ক্ষত্রিয় আদর্শকে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া সেই আদর্শকে সমাজে প্রচার করিবার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়ো।...বলবীর্য তেজ সমাজে কে রক্ষা করিবে? সেই ক্ষাত্রতেজ ক্ষাত্রবীর্য না থাকিলে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা কোথায়? ব্রাহ্মণের শান্তি কাহার অটল বলের উপরে নিজেকে রক্ষা করিবে? সমাজে ধর্মের উচ্চতম আদর্শকে সর্বপ্রকার অত্যাচার ও বিঘ্ন হইতে সুরক্ষিত করিয়া আশ্রয় দিবার জন্যই ক্ষাত্রতেজের মাহাত্ম্য।...নিজেকে ও নিজের সমাজকে বীর্য দাও, অভয় দাও, আশ্বাস দাও, ধর্মরক্ষা ও আত্মত্রাণ ব্রতে দীক্ষিত করো—তোমার জীবন চরিতার্থ হউক—..."

ঠিক পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তরুণকে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন; বাংলা দেশে অন্তত ক্ষাত্রধর্ম জাগ্রতও হয়েছিল, কিন্তু বৈদেশিক রাষ্ট্রীয় চক্রান্তে প'ড়ে তা শেষ পর্যন্ত আত্মকলহে পর্যবসিত হ'ল। এ দুর্গতিও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দেখেছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের জন্মোৎসবদিনে সভ্যতার সঙ্কটে ভীত হয়ে তাঁকে বলতে হয়েছিল—"সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে, সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়,

সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারতশাসন-যন্ত্রের ঊর্ধ্ব স্তরে কোনো এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হ'ত, তা হ'লে কখনই ভারত-ইতিহাসের এত বড় অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না, যে দুর্গতির তুলনা অন্যত্র কোথাও নাই।...

"একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম, য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা ক'রে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা ক'রে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

এই হচ্ছে কবির শেষ বাণী, শেষ আশা। ভারতবর্ষের প্রতি তিনি কখনও বিশ্বাস হারান নি। ভারতবর্ষের একাংশ আজ খণ্ডিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের সকল গৌরবকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে, অস্বীকার করছে

ভারতীয় ঐতিহ্যকে, অস্বীকার করছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে। আপাতত মাতৃভূমির মাঝখানে বিভেদের দেওয়াল তুলে দিয়ে এই অপমান ও দুর্গতি থেকে আমরা আত্মরক্ষা করবার কল্পনা করছি। কিন্তু তা রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের আদর্শ নয়। আমরা নিরুপায়। অহেতুক আত্মঘাত নিবারণের জন্যে রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থে, এই মহামানবের সাগরতীরে সম্মিলিত হবার আগেই আমরা ঠাঁই ঠাঁই হয়ে পড়ছি। আমাদের মধ্যে আশাবাদী যাঁরা, তাঁরা এখনও এই দুর্যোগাবসানের স্বপ্ন দেখছেন, কল্পনা করছেন, পূর্ণ মঙ্গলঘট নিয়ে মায়ের অভিষেকে আমরা অচিরাৎ আবার মিলিত হব, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ জয়যুক্ত হবে। ভগবান করুন, তাই যেন হয়।*

শ্রীসজনীকান্ত দাস

মুসাফিরের ডায়েরি

অনামিকা

আর পাঁচজনের মত আমিও 'খাদ্যাখাদ্য না করি বিচার' ঐশ্বর্যশালীদের গাল দিয়ে থাকি। তাদের পুঁজিবাদবৃত্তিই জগতে সব নৈতিক ও অর্থনৈতিক জটিলতার সূত্র যুগিয়ে এসেছে ব'লে থাকি। বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগতের মতই অদ্ভুত কুৎসিত তাদের সৃষ্টি—এই মৃতপ্রায় গ্রাম, বস্তি-বিরাজিত নগর, দুর্ভিক্ষ, আরও কত কি! তাজমহলের শোভা, আকাশচুম্বী সৌধসৃষ্টির ছটা তাদের এ কালিমা ঘোচাতে পারল না। অভিজাতের উন্নাসিকতাকে আমরা অপাংক্তেয় প্রমাণ করেছি। কিন্তু তাদের আরও একটা দিক আছে, যা আমাকে প্রায়ই আকৃষ্ট করেছে।

কোনও একটি মহিলার দৃষ্টান্ত নিই। সাধারণত লক্ষ্মীর বরলাভের পর, ঝলমল হীরকদ্যুতি সংগ্রহের পর, ধনীকুলের আকাঙ্ক্ষা হয়, রূপে কার্তিকের বংশ ব'লে খ্যাত হবার। সেই হীরের মালিকের তখন চম্পকপ্রভ নবনীনিন্দিত ইত্যাদি হওয়ার তাগিদ আসে, শুরু হয় রূপমহলের নেশা। তাই দেখি, প্রায়শই রাজবধূ রাজবালারা শুভ্রা রূপসী। এমনই এক সুন্দরীকে দেখলুম। বিগতযৌবনা বটে, কিন্তু যৌবন যে এককালে ছিল, তার স্তিমিত ঢেউ দেহতটে লেগে আছে।

* গত ২৭ বৈশাখ নিখিল-ভারত-রবীন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতির ভাষণ।

ছিপছিপে তন্বী ছিলেন না, কিন্তু গজগামিনী নিঃসন্দেহ। একটা নেচে চলার সহজাত ছন্দ আজও অঙ্গভঙ্গীতে প্রকাশমান সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। আধুনিকা কলেজের সুন্দরীদের মধ্যে নৃত্যছন্দ দেখা যায়, কিন্তু সে যেন সুনিপুণ সচেতন চেষ্টার ফল, যেন হঠাৎ বাঁধন ছেঁড়া স্প্রিঙের মত নাচন। ইনি মাটিকে ডিঙিয়ে চলেন না। যথেষ্ট সুখবিলাসমগ্ন জীবন ছেড়ে সবার সঙ্গে এক হওয়ার চেষ্টায় দুঃখব্রতের পথ বেছে নিয়েছেন। আজও অম্লান রঙের আভা শরীরে, দেহের বাঁধনে ভাঙন লাগে নি। একদা যে এঁর সুললিত বাহুভঙ্গী মুগ্ধদৃষ্টির পূজা পেয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। কেশের আধিক্য নেই, আভিজাত্য আছে।

এঁরা কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে জীবনের নীতির মাপে দাগানো ভালমন্দের সাদা-কালো ছক-কাটা পথ বেয়ে অব্যর্থলক্ষ্য নৌবলের মত চ'লে এসেছেন, খামখেয়ালের তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় নাচতে হয় নি। এঁরা জানতেন, সেই আদর্শ ভাল মেয়ে, যে পরীক্ষায় বৃত্তি পায়, রেশমের কারুকার্য জানে, গুরুজন সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ সুরে কথা কয়, নির্বিচারে গুরুআজ্ঞা পালন করে, ঈশ্বর-বিষয়ক গান জানে (এমন গান যার সুর কিছুতে অন্তর্নিহিত নীতিশিক্ষাকে ছাপিয়ে যেতে পারে না), ভাল ভাল বাছাই করা দেশী বিলাতী কবিতা মুখস্থ রাখে, কিছু কিছু আঙ্গিক কারুশিল্পে হাত আছে, সর্বোপরি যার রন্ধনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অসীম। এঁদের জীবনের ছক আঁকা ছিল, শুধু রঙ ফলালেই চলত, আগাগোড়া ঢেলে সাজার বালাই ছিল না; ভ্যালুস অফ লাইফ ধ্রুব ছিল, ফটকার বাজারের মত ওঠানামা করত না। এঁরা সিঁদুর-শাঁখা-আলতা-পরা, লক্ষ্মীশ্রী-মণ্ডিতা; অথচ কার্যকালে ইংরেজী খানা রেঁধে স্বামীর ইংরেজ বন্ধুকে খাওয়াতে সিদ্ধহস্ত। এঁদের বহুমুখী প্রতিভাকে শ্রদ্ধা জানাই। এঁরা ঘরে রোগীর সেবা করেন, বাইরে নাচের জলসায় মুখপাত্র হন। এঁরা ইংরেজীতে কবিতা আবৃত্তি করেন, আবার সুন্দর আলপনা দেন, প্রয়োজনবোধে মান্য অতিথিকে অকুণ্ঠ নতি জানিয়ে পদধূলি নেন। আমার অনামিকা যে জন, তিনি একাধারে নৃত্য, গীত, চিত্র, সূচীকর্ম, আবৃত্তি, কবিতারচনা, বিবিধ কবরীছাঁদ, বিভিন্ন প্রান্তীয় পোশাকসজ্জা, কি যে না জানেন, জানি না। আমি বিস্মিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু ভালবাসতে পারি নি। এমন আত্মসম্পূর্ণ ভাব, এমন তেজ-দৃপ্ত ভঙ্গী, সবই অনন্যসাধারণ, বিশেষ এ যুগে। তবু কোথায় যেন ফাঁক থেকে যায়, মহা আপন মনে হয় না। মনে হয় না, এঁদের বোধ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সুর শুদ্ধ হয়। একাগ্রমী

বৃত্তির রেশ থেকে যায় সর্বকালে। এ যেন সোনার জলের লেখাওলা মরক্কো-বাঁধানো মিল্টনের কাব্যগ্রন্থ, কোথাও শিথিলতা নেই, নেই অলস প্রশ্রয়। মালিন্যের অবকাশ কোথা? সহজাত প্রয়োজনের তাগিদে নয়, অন্তরের মরমী টানে নয়, ঐ দ্বিতীয় কোনও অচলায়তন আদর্শবোধের সংস্কৃত মার্জিত যুক্তি এঁদের এনেছে সবার মাঝে, যেখানে এঁদের প্রাণের যোগ নেই। এঁদের সৌজন্য বাধা জন্মায়, এঁদের অমায়িকতা বিমুখ করে, এঁদের স্নেহস্পর্শ সন্দেহ জাগায়। এখানে এঁরা কৃত্রিম, এঁদের স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মম্ভরিতার পার্থক্য প্রকট থাকে। যেন সবাইকে পিঠথাবড়ানি দিচ্ছে, অকারণ অবহেলার অবজ্ঞা প্রকাশমান। এঁরা যখন শাসন করেন মানায়, কিন্তু যখন বিনয় করেন সয় না। আপনার ঐশ্বর্য-রথচক্রতলে বহুকে পেষণ করাই এঁদের ধর্ম, দলিতের প্রতি করুণা যেন অশোভন। এঁদের সম্মান করা যায়, বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যায়, কিন্তু ব্যথার ব্যথী ভেবে হাত বাড়িয়ে সাহায্য চাওয়া যায় না।

চৈতালী বর্ষণ

এ বছর আর বাদল নামে না। কৃষকেরা যতই অদৃষ্টকে দোষ দেয় আর ঠাকুরের কাছে কান্না জানায়, পাথরের ঠাকুর নিষ্পলক নিরস্থ হিম প্রাণহীন দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে, তার মুখও ভাবলেশহীন, রাগবিরাগের কোনও অভিব্যক্তিরই প্রকাশ নেই।

এ অঞ্চলটা মানুষের কাছে আচম্বিতে মার খেয়ে সশঙ্কিত অর্ধমৃত হয়ে আছে, যেন মৃত্যুমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে। ঘর নেই, সঞ্চয় নেই, শক্তি নেই, আছে কেবল ভিক্ষা আর ক্রন্দন। কাপড় দাও, কম্বল দাও, দাও অন্ন। সেই পঞ্চাশ সনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। যে ধান মাঠ থেকে লুঠতরাজ হয়ে গেছে, সে তো গেছেই, কিন্তু আগামী ফসলটা যাতে ওঠে, তার জন্য নিত্য আকুল কাকুতি উঠছে উর্ধ্বলোকে। সবার মুখে এক কথা—এত দুঃখ দিয়েও দেবতার কোপশান্তি হ'ল না, এখনও আমাদের দুর্গ্রহ খণ্ডন হ'ল না, একটু জল পড়ে না। রোজ কুয়া হচ্ছে—আর এই খরা, আমের বোলগুলো সব ঝ'রে যাবে—না ভুঁইয়ের, না গাছের ফল আমরা ভোগ করতে পারব।

ফাগুনের শেষ। মাঝে মাঝে আকাশে মেঘেরা দল বাঁধে—আশার সঞ্চার করে, এমন ঘন কালো জমাট মেঘের জটলা—মনে হয়, জল ঝ'রে পড়ল বুঝি,

কিন্তু হায় রে, পোড়া দেশের লোকেদের পোড়া কপাল! সন্‌সন্‌ হাওয়া চলে, কোন্‌ সুভাগাদের দেশে ভেসে যায় সে মেঘ তার সঞ্জীবনী সুধা ঢালতে! এমনই চলছে কদিন।

সেদিন গ্রামে বৈঠক আছে। হাতে চরকা ঝুলিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদ্বয় চলেছে। পশ্চিম কোণে কালো পাহাড়ের ঢেউ দেখা যাচ্ছে, ঘনঘটা দেখে বোঝা যায় না আজ কি হবে, আজও কি ধরিত্রীর নির্জলা উপবাস? চষা মাঠের চাকা চাকা মাটির ঢেলাগুলো পাথরের টুকরোর মত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে, প্রতি পদক্ষেপে আঘাত হানছে। তৃষার্ত জমি শুকিয়ে ফেটে গিয়েছে, গোপাটে ঘাসের চিহ্নও নেই। দুটো গ্রামের মাঝে লম্বা মাঠ। আধাপথ চলার পর ভিজে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল, বোঝা গেল, খুব জোর কদমে চললেও আগে পিছে কোনও গ্রামেরই আশ্রয় মিলবে না, মেঘের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসাধ্য। খুব দার্শনিক মন নিয়ে তারা এগিয়েই চলল। মেয়েটি সাথীকে বললে যে, বৃষ্টিতে ভিজতে ভালই লাগবে। আরও এক প্রস্তাব করলে। বৃথা মাঠে ছুটোছুটি না ক'রে ওই সামনের দীঘিটার পাশে বসা যাক, তবু যে লোকে বলে—দাঁড়িয়ে ভেজা, তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

দীঘিটার উত্তর পাড়ে এক জীর্ণ মন্দির, যথেষ্ট পুরোনো, কিন্তু কত পুরোনো তার নিশানা মেলে না, বিগ্রহ কার যেন নিগ্রহে স্থানচ্যুত। পাতলা বাংলা ইটের গাঁথুনি তিন খিলানের ঢঙে তৈরি, চূড়ায় চিরাচরিত পিতলের কলস ও ত্রিশূল। আশে পাশে ধুতরো-বন। দীঘির পাড়ে পাড়ে তাল, নারকেল, খেজুর ও সুপারির ঝোপ। একই জাতীয় গাছ। অনেক মানুষ যেমন বহুকাল নির্বাধভাবে কাটিয়ে শেষ-বয়সে সংসার বাঁধে, তেমনই এ গাছগুলো যেন সৃষ্টির সকল আকর্ষণ অগ্রাহ্য ক'রে ঋজু নিষ্পত্র নির্বর্ণ কাণ্ড নিয়ে স্পর্ধার সহিত ঊর্ধ্বে মাথা তুলছিল, সহসা কেমন গোল বেধে গেল, প্রৌঢ়সীমায় তাদের কামনা ছড়িয়ে পড়ল সবুজ পাতায়। তাদের ফল ফলানোর তাগিদে মাটি থেকে সংগ্রহ করতে হ'ল রস, সূর্য থেকে রঙ। নমনীয় সুপারি গাছগুলো বাতাসে হেলে পড়ে, মাথা নেড়ে ঝড়ের কাছে পরাভবের নতি জানায়। মাঝে মাঝে দু-একটা ঘনসবুজ রূপসী আমগাছ, তাদের গায়ে বসন্তের রঙ লেগেছে—তামাটে রঙের রেশমী নরম ঝকঝকে নতুন পাতা—মুকুলের ঈষদম্ল সৌরভ। কিছু দূরে একটা মাদারগাছ; কোথাও তারুণ্যের

সবুজ চিহ্নমাত্র নেই। কাঁটাওলা পল্লবহীন রিক্ত ডাল, কিন্তু ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। টকটকে লাল ফুল, অমন লাল কমই দেখা যায়। সাথীটি ব'লে উঠল, এ দেখতে আমার বড় বিশ্রী লাগে, নেড়া গাছে কতকগুলো ঝলমলে ফুল। মেয়েটি বললে, কেন যেন আমার সুন্দর লাগে, ও নিয়মমাফিক সবুজ পাতার কোলে ফুল, যেন সাজানো বাটন-হোল; এ বেশ নতুনতর।

ঘূর্ণি হাওয়ার পাকে পাকে শুকনো পাতাগুলো ঘুরে ঘুরে কোথায় কোন্ অজানায় উড়ে চলেছে। মাথার ওপর তালগাছে পাখির বাসাটা দুলছে, শব্দ হচ্ছে খস্—খস্—খস্স্। কুটি-কাটি উড়ে এসে মাথায় মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। বৃষ্টি শুরু হ'ল। দীঘিটা একাধারে ঝড় ও জলের প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দিচ্ছে। ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, সেগুলো ধারে ধারে কচুরিপানা আর শেওলায় এসে ঠেকে মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার বৃষ্টির ফোঁটার চাপে জলটা টোল খেয়ে যাচ্ছে, অসংখ্য বুটিতোলা শাড়ির মত। একটা দলভ্রষ্ট বক। বেচারা পাখার ঝাপট হেনে যতবার ভারসাম্য বজায় রেখে দক্ষিণে যেতে চায়, ততবারই দমকা হাওয়ার ঠেলায় উল্টো পাক খেয়ে ঘুরে যায়। অনেকবার ব্যর্থ প্রয়াসের পর স্থিতধী বিজ্ঞের মত মাদার-ডালে লাল ফুলের পাশে সাদা পাখা ঝাপটে বসল।

কিছুক্ষণ অবিরাম বর্ষণের পর ভিজে মাটির গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে গেল—সদ্যস্নাত গাছ, চীনা ও কয়নার ক্ষেতগুলো শ্যামলতর লাগছিল। আতপ্ত দাহময় আবহাওয়ায় স্নিগ্ধতার স্পর্শ লাগল। উভয়েরই চুল পোশাক ভিজে, জল গড়িয়ে পড়ছে, ঠাণ্ডা বাতাসে শিরশির করছে শরীর। কিছুই যেন ঘটে নি, এমনই ভাব নিয়ে মেয়েটি চেয়ে আছে গন্তব্য গ্রামের দিকে।

সে ভাবছিল, বহুবার আভাস ও আশ্বাস দানের পর আজ এল প্লাবন। ধরিত্রী যেন বাঁচল, কৃষকও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কাল সকাল থেকে জমিতে বেগে কাজ চালু হবে, ব্যস্ততার সাড়া প'ড়ে যাবে। কর্ম্মমুখর দিন এল, এল ফসল ফলাবার আহ্বান। প্রতিবার বর্ষায় তার পৃথিবীকে নতুন লাগে, বড় ভাল লাগে। মনে হয়, এমন আশ্চর্য মধুর দীপ্ত সজল দিন কখন কেমন ক'রে এল? এমন ঘনঘটার পরই ঝরঝর বারিধারা, তারপর হঠাৎ আলোর ঝলকানি। কালো মেঘ জল ঢেলে দেবার পর এক অপূর্ব আভায় দিঙ্মণ্ডল ছেয়ে যায়। আকাশের এক পাশ থেকে মেঘ-চাপা সূর্যের সন্ধানী রেখান্বিত আলোর ধারা ছড়িয়ে প'ড়ে সব কিছু অদ্ভুত উজ্জ্বল দেখায়, নতুন দেখায় নবস্নাত

গাছপালা, তৃষিত মাটির তৃপ্ত শ্বাস, ধোয়া আকাশ, ধূলিবিহীন আবহাওয়া। স্বভাবতই পাহাড়ের কথা মনে হয়, যেন চিরপরিচিত আবাসও বিদেশ।

সে ভাবছিল, এ কেমন ক'রে সম্ভব হয়? কোনও একদিন অকস্মাৎ জল নেমে আসে ঝরঝরিয়ে কিসের টানে? কতদিন তো খরতপ্ত পৃথিবীর এ আকুতি নিষ্ফল হয়। হয়তো দুদিক থেকে যখন ডাকাডাকির—ডাকের ও সাড়ার সামঞ্জস্য ঘটে, তখনই এই আদান-প্রদান সহজ সফল হয়, অবশ্যম্ভাবী হয়। এই যে শুকিয়ে-ওঠা ফাটা বন্ধুর হননধর্মী মাটি তৃষিত তাপিত হয়ে একান্ত নিষ্ঠায় জল চেয়েছিল, তার কামনা ও দাহ অদৃশ্য উষ্ণবাষ্প হয়ে আকর্ষণ পাঠিয়েছিল, তাই তো ওপর থেকে সঞ্চিত স্নিগ্ধতা ঝ'রে পড়ল। ওপরের মেঘ প্রাচুর্যের রস সঞ্চার ক'রে বিলিয়ে দিল, কিছুটা তার নিজের তাগিদেও বটে। কি করবে এত নিয়ে, যদি প্রার্থীকে না দেয় তো এ কৃপণের ধন কোন্ কাজে লাগবে লগ্ন ব'য়ে গেলে? এ ক্ষেত্রে অর্থীর দাক্ষিণ্যে আর প্রার্থীর আকিঞ্চনে সংঘর্ষ বাধে নি। একজন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে দিয়েছে, অপরজন তৃপ্ত হয়ে প্রসন্নচিত্তে নিয়েছে। গ্রাহক এ রিক্ততায়, এ দৈন্যে লজ্জা পায় নি, কিছু দৃষ্টিকটুও হয় নি। এই সহজ গ্রহণের পর সে আবার কত গুণ ফিরিয়ে দেয়, কত সৃষ্টি করে, ধারণ করে, পালন করে। তার নিজস্ব ধনকে সে বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়।

বর্ষণের আগে প্রবল গর্জন ও অগ্নি উদ্গীরণ হয়েছিল। মেঘে মেঘে বেধেছিল সংঘাত। তারা উভয়েই সঞ্চয়ী, কেউ কারও কাছে আত্মনিবেদন করবে না—অথচ এই বিরোধ, এই অসহিষ্ণুতা, এই অগ্নি, এই শতঘ্নীর জন্ম। এমন সহজ লেনদেন কবে হবে? যবে হবে, তবেই দেশের ও দশের কাজে সুসঙ্গতি ঘটবে, নচেৎ সংঘর্ষ অনিবার্য।

তার কতবার মনে হ'ল, অহংবোধ নিয়ে দান করা কত সহজ, কিন্তু নম্রভাবে অক্ষতচিত্তে নেওয়া কি দুষ্কর!

অকুণ্ঠমনে দান গ্রহণ করা কি মহিমার, কি ঋদ্ধিশীলতার পরিচায়ক! যারা অনেক দিতে পারে, তারাই কি নির্বিকারচিত্তে নেয়? তাদের বোধ হয় দেনা-পাওনার আঁক কষতে হয় না। ডাকের মত ডাক পাঠিয়ে নেওয়ার মত নিতে পারলেই পরম পাওয়া হয়। কবে এমন মন হবে?

তার কানে বাজছিল "গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়"।

"মুসাফির"

আমাকে ডেকে তার লাটাইটা এগিয়ে দিলে, ইয়া বোম-লাটাই, আর সে কি ভারী রে বাবা! একটু নাড়াচাড়া ক'রেই আবার যার গদা তার হাতে ফিরিয়ে দিলুম।

যা হোক, সকালবেলার মতন না হ'লেও এ বেলাতেও আশ্চর্য কিছু কম হই নি। ঘুড়ি ওড়ানোর মধ্যেও এত কারিগরি আছে, এর আগে তা দেখা তো দূরের কথা, শুনিই নি। সেখানে একজন লোক ছিল, যাকে একসঙ্গে দশজন মিলে আক্রমণ করলেও, অবিশ্যি ঘুড়ি-সুতো দিয়ে, সে অন্য কারুর ঘুড়ির সুতোয় নিজের ঘুড়ির সুতো না ঠেকিয়ে নিরাপদে বার ক'রে নিয়ে আসতে পারত। আর আক্রমণ করবারই সে কত রকমের কায়দা—কখনও বা একসঙ্গে, কখনও বা এখানে একটা ওখানে একটা সেখানে একটা, প্রত্যেকেই নিরপেক্ষ ও উদাসীন ভাবে যেন উড়তে-হয়-তাই-উড়ছি গোছের, এমন সময় হঠাৎ একটা ঘুড়ি ছুটে তাকে আক্রমণ করতে গেল, তাকে কাটিয়ে বেরুনো মাত্র ঠিক আর দুটোর সামনে, কিন্তু আক্রমণের সমস্ত কায়দা ব্যর্থ ক'রে প্রতিবারই সে ব্যক্তি নিজের ঘুড়িকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে লাগল।

আর একটা লোক ওইখানেই আর এক রকমের ঘুড়ির খেলা দেখিয়েছিল, সে ছবিটা মনে পড়লে আজও হাসি পায়। পূর্বোক্ত ব্যক্তি যেমন পলায়নের ওস্তাদ ছিল, এ ছিল তেমনই প্যাঁচ ভণ্ডুল ক'রে দেবার ওস্তাদ। এর সঙ্গে প্যাঁচ খেলতে গেলেই সে অপর ব্যক্তির সুতোয় নিজের সুতো দিয়ে এমন একটা ফাঁস লাগিয়ে দিত যে, কারু ঘুড়িই কাটত না, অবশেষে টানামানি হওয়া ছিল অনিবার্য, টানামানির দৃশ্যটা ছিল ভারি কৌতুকপ্রদ, এবং প্রতিবারই সে অন্য পক্ষের ঘুড়ি ছিঁড়ে আনতে পারত।

সাধারণের কাছে এই পায়রা ঘুড়ি প্রভৃতি ওড়ার প্রসঙ্গ তেমন ভাল লাগবে না জানি; কিন্তু এটুকু হচ্ছে তাঁদেরই জন্যে যাঁরা একদা উড়েছেন, যাঁরা এখনও উড়েছেন এবং একদা যাঁরা উড়বেন।

এইখানে এই ছাতে আমাদের মাস্টারী জীবনের প্রথম দিনের আর একটি মজার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। ঘুড়ি ওড়ার সঙ্গে ছাত্রের তালিমও চলেছে। হঠাৎ পিয়ারা সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, পতংগ্‌কে ইংরিজী বাংলায় কি বলে?

প্রশ্ন শুনে বেশ বিব্রত হয়ে পড়লুম—পতঙ্গের ইংরিজী কি? মনে হচ্ছে

লাগল, Insect মানে তো কীট। কিন্তু কীট ও পতঙ্গে যে অনেক তফাত। কি বলব ভাবছি, বেশ একটু দেরি হচ্ছে এমন সময় ছাত্রই বাঁচিয়ে দিলে। সে বললে, আচ্ছা, নীল পতংগ্‌কে ইংরিজীতে কি বলবে?

আর ভাবতে হ'ল না, বুঝতে পারা গেল, পতংগ্‌ মানে ঘুড়ি।

আমাদের আবার নতুন ক'রে জীবনযাত্রা শুরু হ'ল। দিদিমণির ওখানে আমরা একেবারে ঘরের লোক হয়ে গিয়েছিলুম। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি হাজার কাজের ভার আমাদের ওপরে চাপানো ছিল। সমস্ত কাজ শেষ ক'রে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিশুদার ঘরে আমি, পরিতোষ, দিদিমণি, বিশুদা ও আহিয়া মিলে ভারি মিষ্টি একটা আড্ডা জমাতুম। এখানে প্রতি সন্ধ্যায় সেই স্মৃতির পীড়ন চলতে লাগল আমার মনের ওপর দিয়ে মর্মান্তিক ভাবে। এখানে খাওয়া-দাওয়া, থাকা-শোওয়া ওখানকার চেয়ে অনেক ভাল, কিন্তু সেই পাতা-ঝরা গাছের শ্রেণী, সেই সারাদিন ধ'রে সো-সো হাওয়ার হুঙ্কার, মৃত্যুপথযাত্রী বিশুদার হাসিভরা মুখ ও রসিকতা, সবার ওপরে কল্যাণময়ী দিদিমণি, কোথায় পাব এখানে!

সে জগতে ছিল নারীমূর্তি দুর্লভ। ব্রহ্মচারীদের আশ্রম হ'লেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু নবাব সাহেবের ঘর ছাড়া বাড়ির এখানে সেখানে, বিশেষ ক'রে পিয়ারা সাহেবের বৈঠকখানায় বড় বড় নগ্ন ও অর্ধনগ্ন নারীর তৈলচিত্র টাঙানো। পিয়ারা সাহেবের সান্ধ্য আসরে বিস্তর লোক যাওয়া-আসা করে। তার মধ্যে জনকয়েক খুবই বকে, কেউ কেউ বেশি কথা বলে না, কেউ কেউ একেবারে চুপ ক'রে ব'সে থাকে, আসা-যাওয়ার সম্ভাষণটুকু বাদে তাদের মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, নারীর প্রসঙ্গ উঠলে আর রক্ষে নেই, সবাই একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

অথচ নারীর মূর্তি সেখানে দেখাই যায় না। মেয়েদের থাকবার মহল, সে যে কোথায় তা জানি না। সেখানে পিয়ারা সাহেব, নবাব সাহেব ও হকিম ছাড়া অন্য কোন পুরুষের প্রবেশের অধিকার নেই। সে মহলে নবাব-বাড়ির অনেক মহিলা ও নিরাশ্রয়া আত্মীয়া বাস করেন। একপাল দাসী আছে সেখানে, কিন্তু সকলের হারেম ছেড়ে বাইরে যাবার হুকুম নেই।

দিনকতক যেতে না যেতেই এই নারীহীন রাজ্যে নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ

ব'লে মনে হতে লাগল। পরিতোষকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি রে, কেমন লাগছে এখানে?

সে বেশ খুশি মনেই বললে, বেড়ে লাগছে!

রাণুমার সঙ্গে পরিচয় হবার পরদিন সকালে ইষ্টিশান থেকে বেরুবার সময় সেই যে স্নান করেছিলুম, তারপরে মাথায় আর জল ঠেকানো হয় নি। অবিশ্যি এখানে আসার পরের দিন সকালেই খাবার আগে চাকর এসে বলেছিল, চলুন স্নান করবেন।

স্নান করব না—শুনে সে জানিয়েছিল যে, গরম জলের যদি প্রয়োজন হয় তাও আছে। আমরা 'আজকে নয়' ব'লে চাকরকে বিদায় দিলেও প্রতিদিনই আজকে নয় চলতে লাগল। শীতকাতর হ'লেও আমাদের প্রতিদিন স্নান করার অভ্যেস ছিল। শীতকালেও একদিনের জন্য স্নান বাদ দিলে শরীর রুক্ষ হয়ে উঠত। তথাপি স্নানের প্রতি এমত বিরাগের কারণ হচ্ছে—আমাদের বস্ত্রহীনতা। ধুতি ও জামা অত্যন্ত মলিন ও এমনভাবে ছিন্ন হয়েছিল যে, সদাসর্বদাই সর্বাঙ্গে র‍্যাপার জড়িয়ে থাকতে হ'ত। উত্তরার্ধের সৌজন্য রক্ষা করতে গিয়ে অপরার্ধের শ্লীলতা বাঁচাবার জন্য তখুনি থেবড়ে ব'সে পড়তে হ'ত। কিছুদিন এই রকম চললে উভয়কে অচিরেই যে নগ্নানন্দ ও দিগম্বরানন্দ মহারাজ হয়ে বদরিনারায়ণাভিমুখে প্রয়াণ করতে হবে, সে বিষয়ে ক্রমেই নিঃসন্দেহ হয়ে উঠছিলুম। এমন সময় দেবতা একটু নেক-নজর করলেন।

চাকরেরা রোজই আসে স্নানের কথা বলতে, আর আমরা বলি 'আজ নয়', চাকরেরা চ'লে যায়। সেদিন দ্বিপ্রহরে কবুতরখানা থেকে ফিরে নবাব সাহেবের সঙ্গে আমরা গল্প করছি. এমন সময় চাকর এসে জিজ্ঞাসা করলে, হুজুর, স্নান করবেন?

না।—বলতেই নবাব সাহেব বললেন, কেন, স্নান করবে না কেন?

তারপরে চাকরকে হুকুম দিলেন, এদের নিয়ে গিয়ে ভাল ক'রে তেল মালিশ ক'রে গরম জলে স্নান করিয়ে দাও।

আর আপত্তি করা চলে না, উঠতেই হ'ল। গোসলখানার সামনে দুজন লোক তেল মাখাবার উপক্রম করতেই আমরা দুজনে একসঙ্গে স্নানের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম, যদিও বেশ ভাল ক'রেই জানা ছিল যে, দুজন ভদ্রব্যক্তি একসঙ্গে এক ঘরে স্নান করতে ঢোকাটা এখানকার চাকরদের চোখেও

বিসদৃশ ঠেকবে। কিন্তু সদৃশ-বিজ্ঞানের সব ফরমুলা মেনে চলবার মতন অবস্থা আমাদের ছিল না।

যা হোক, সেই ছেঁড়া ধুতি প'রে স্নান সেরে র‍্যাপারকে লুঙ্গি ক'রে পরা গেল। আমার র‍্যাপারখানার রঙ ছিল গ্যাডগ্যাডে সবুজ জমির ওপরে লাল সরু চেক, আর পরিতোষের র‍্যাপারখানার ছিল ছাই-রঙের জমি ও তার ওপরে চওড়া কালো চেক।

ঘরের মধ্যে একটা বড় আয়না ছিল, যাতে আপাদমস্তক প্রতিফলিত হয়। লুঙ্গি প'রে, গায়ে সেই ছেঁড়া টুইল শার্ট চড়িয়ে আস্তিন গুটিয়ে, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল, বহু কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে এতদিনে সত্যিই আমার আমিত্ব লোপ পেয়েছে, সেই মোহনমূর্তি দেখে হাস্যসম্বরণ করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াল। পরিতোষ বললে, তোকে ঠিক গাঁটকাটার মতন দেখাচ্ছে!

আমি বললুম, তোকে দেখাচ্ছে ঠিক গরুচোরের মতন।

ঘরের মধ্যেকার সেই ঝাপসা আলোয় পরিতোষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিজেকে দেখতে লাগল সেই আয়নায়। তারপরে হঠাৎ ফিরে আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, ঠিক বলেছিস তুই। আমাদের দুজনের চোখেই কি রকম একটা চোর-চোর ভাব এসেছে, দেখেছিস?

হবে না! সেদিন যা চোরের মার খাওয়া গেছে!

নিজেরাই শুকোতে দেব মনে ক'রে ছেঁড়া কাপড় দুখানা নিংড়ে হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। ঘরের বাইরেই এক পাল চাকর দাঁড়িয়ে ছিল, তারা আমাদের সেই মনোহর সজ্জা দেখে প্রথমটা গেল অবাক হয়ে, তারপরে হাসি চাপবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

আমরা সেদিকে গ্রাহ্য না ক'রে কয়েক কদম এগিয়ে যেতেই একজন চাকর ছুটে এসে আমাদের হাত থেকে ধুতি দুখানা একরকম কেড়ে নিয়ে একদিকে চ'লে গেল।

সত্যি কথা বলতে কি, ধুতি বেহাত হওয়াতে দস্তুরমতন শঙ্কিতই হয়ে পড়লুম। কারণ ব্যবহারের অযোগ্য মনে ক'রে সেগুলো যদি তারা আর ফিরিয়ে না দেয়, তা হ'লে তো গেছি আর কি!

যুগলমূর্তি সেই চমকপ্রদ বেশে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই নবাব সাহেব অবাক হয়ে খোলা চোখে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপরে আড়চোখে

দেখতে লাগলেন। লজ্জায়, মনে হতে লাগল, স্নানের ঘর থেকেই হিমালয়ের দিকে রওনা হ'লেই হ'ত ভাল। এমন সময় খাবার এসে পড়ায় সামলে গেলুম।

ইদানীং দুপুরবেলার ভোজনপর্বের পর আমরা পিল্লারা সাহেবের ঘরে গিয়ে আড্ডা জমাতুম। সেখানে বিড়ি-সিগারেটও বেশ উড়ত, আর আমরাও খুব বকতুম,—সহনশীল শ্রোতার অভাব ছিল না। সেদিন আড্ডায় ব'সে বেশ জমাট ক'রে কলকাতার গল্প শুরু করেছি, এমন সময় ঘরের দুটি লোক এসে দাঁড়াল, একজনের কাঁধে গোটা কয়েক রঙিন ও সাদা কাপড়ের থান আর একজনের গলায় ঝোলানো গজ-ফিতে।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

তোমরা

তোমায় পত্র লিখেছি কদিন আগে,
হয়তো সে চিঠি হয়েছে হস্তগত,
সযতনে তারে রেখেছ তো অনুরাগে,
অথবা ধূলায় ফিরিছে ইতস্তত ?
ওই দেখ ভাই, কি যে সাধ জাগে মনে,
চিঠি লিখিতেই হেন আশা উথলায়,
বুঝি বা তাহারে রাখিলে সঙ্গোপনে
হাতীর দাঁতের সুরভিত কৌটায় !
কবির মনের ব্যাধি ওটা, জানো না কি,
কল্পনা তার উদ্দাম বেগে ছোটে,
ভরে সে সোনায় আসলে যেথায় ফাঁকি,
স্বপনের ধনে শূন্যতা ভ'রে ওঠে।
বাসনা তোমার ছড়ায় দিগন্তরে
হয়তো বা কোন্ যুবজন-সন্ধানী,
আমি ভেবে মরি, আমারই লিখন তরে
হৃদয়ে তোমার নিশিদিন হানাহানি !
যেথায় যা নাই, তা নিয়ে বানাই যত
মন ভোলাবার রঙিন খেলনারাশি,
নহিলে, বল তো, জুড়াতে মনের ক্ষত
কোথা হতে পাব ঘুম-পাড়ানিয়া মাসি ?

সেদিন তোমার সাবান-ফাঁপানো চুলে
সোনার বন্যা নামিল গোধূলি বেয়ে,
রাশি রাশি চুল ঢাকিল হলুদ ফুলে,
আকাশের আলো রচিল সোনার মেয়ে।
আসলে কি জান ? মনের মাধুরীখানি
রূপ খুঁজে ফেরে তোমার তরুণ মুখে।
তুমি মনে ভাব, প্রেমে যে পড়েছ জানি,
এবে কিছুদিন থাকা যাবে কৌতুকে।

থাক্ বাজে কথা, কবিত্ব জাগে মেলা,
নির্ঝর-মুখে পড়ুক পাথর চাপা,
হয়তো ভাবিছ, বকিবে সারাটা বেলা,
লোকটা নেহাৎ মানসিক দিকে ফাঁপা।
জানো তো, আমার 'গুরুগম্ভীর' নামে
ছাত্রমহলে খ্যাতির রটনা আছে,
বিত্তের ঝুরি নেমেছে ডাহিনে বামে
বহু-নীড়-ঘেরা বুড়ো এই বটগাছে।
সুতরাং কোনো লঘুতার অপযশে
চিত্ত আমার হবে না তো বিচলিত,
কেবল কি জানো, তোমার সঙ্গরসে

লঘু উচ্ছ্বাসে মন হয় উছলিত।
তুমি সাবিত্রী, সবিতার স্তবগানে
দশ দিকে জ্বালো আলোকের রামধনু,
খণ্ডিত হয় সে-আলোর খরশানে
পণ্ডিতী-ঠাসা নীরস শুষ্ক তনু।

ওই দেখো ভাই, আবার কাব্যি শুরু,
ফিরে আসে এ যে রেমিটেন্ট জ্বর হেন,
বাজে কথা ছেড়ে ক'ষে চোখ নাক ভুরু
সীরিয়াস কিছু আলাপ হোক না কেন।
তবে বলি শোন, ওই যে শুনছি নাকি
কোন্ যুবজন পড়েছে তোমার প্রেমে,
সভায় সভায় ক'রে মহা হাঁকাহাঁকি
অবসরক্ষণে ইতিহাসে পড়ে এম. এ.
শুনে লাগে ভাল, এমন অভাগা যুগে
এখনো যে প্রেম হয় নি অপাংক্তেয়,
মড়কে মারীতে মহা সন্তাপে ভুগে
এখনো মনের কিছুটা যে রহে দেয়।
কিন্তু বল তো, হালের নতুন কালে
তেমনি কি ভীরু প্রেমের প্রথম ভাষা?
তেমনি জড়ায় লাজুক দিঠির জালে
অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত ভীতু আশা?
শরম-সুরভি নিশ্বাসে নিশ্বাসে
মন-বন ঘেরি জাগায় উন্মাদনা?
কাহিনী ঘনায় দিনে-দিনে মাসে-মাসে
হদিস যাহার না পায় অন্যজনা?
তোমাদের বুঝি সভাতেই দেখা হয়,
ডায়লেকৃটিক আলোচনা চলে মেলা,
সকালে শেফালি বিকালে বকুল নয়,
বিত্তে-বোঝাই বিতর্ক দুই বেলা।
যে কথা না ব'লে বলা যায় বারে বারে
এ কালেতে সে কি অতি পরিহসনীয়,
তোমাদের বুঝি কিছু নয় আঁখিঠারে,
তোমাদের সবই সোজাসুজি কহনীয়।
ফুলশর বটে সোজাসুজি বেঁধে বুকে,
তা ব'লে তাহার ভাষা নয় কিছু সোজা,
কিছুটা তাহার ঝলকায় চোখে মুখে,
কিছুটা তাহার কিছুতে যায় না বোঝা।
তোমাদের প্রেম নিকষিত হেম সম
সবটুকু তার ঝিকিমিকি ক'রে সারা,
তোমাদের নভে চকিতে মিলায় তম,
এক লহমায় জ্ব'লে ওঠে সব তারা।
তারা নয় তারা, প্রেমের জোনাকি-
আলো,
রঙিন মশাল ইন্টেলেক্‌চুয়াল,
দোঁহে দোঁহাকারে তাহে দেখা যায়
ভালো,
ভীরু চাহনির নয় মিছে জঞ্জাল।
তোমাকে সেদিন দিয়ে গেল বইখানা
সমাজ-নাশন নতুন শাসন-টীকা,
বিরস বিষয় বিষম ভ্রূকুটি-হানা,
পাতায় পাতায় উগ্র অগ্নিশিখা।
কাল সন্ধ্যায় দেখা হ'লে দুজনাতে
রসনা ফুঁসিবে 'বিপ্লব' 'বিদ্রোহ',
প্রাচ্য-প্রাচীর বহুতর সংঘাতে
কত সমাজের আরোহণ-অবরোহ।
এ কালে প্রণয় চলে এই ভাষা দিয়ে?
সোজাসুজি চালে চলে একই চতুরালি,
স্বপ্নের জাল একেবারে ছিঁড়ে নিয়ে
তারপর বুঝি চলে এই জোড়াতালি?

তোমাদের ভাই, এ কালের ঢঙ দেখে

মনে মনে ভাবি, কেন মিছে হেন ঠকো,
যে কথা না ব'লে বলা যায় রেখে ঢেকে
সে কথা বোঝাতে এতখানি কেন
বকো ?
একটুকু ছোঁয়া, একটুকু আনাগোনা,
চকিতে কচিৎ চোখের আভাসখানি,
বেতারে খবর বুঝিছে অন্তজনা,
প্রেমের পাথারে এই তো অথৈ পানি।
ক্ষণে ক্ষণে কত ডুবে-যাওয়া ভেসে-ওঠা
কূলে ফিরে এসে আবার অকূলে ভাসা,
এই ফুল ঝরা, এই পুন ফুল ফোটা,
দুজনে দুজনে ভাঙিছে গড়িছে বাসা।
তোমরা মাথায় বহিছ ডিক্‌শনারি,
সতর্ক আঁখি তর্কে দিতেছ ফাঁকি,
দেখা হ'লে দোঁহে কথা কও ভারী ভারী
আসল কথাটি শেষে র'য়ে যায় বাকি।
প্রেম-বিজ্ঞান ধরেছে উলটো গতি,
বেতার ঘুচিয়ে কথা চলে মুখোমুখি,
বোঝো না তো ভাই, বৃথা সময়ের ক্ষতি,
বোঝো তো, কি কথা মনে দেয়
উঁকিঝুঁকি ?

"সুবাস"

লর্ড-সিংহের বার্ধক্য

লর্ড-সিংহ হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে, সে নাকি বুড়ো হয়েছে। লেডী-সিংহী তাড়াতাড়ি আয়নাখানা এনে তার সামনে ধরলে; দেখা গেল, গোঁফ-দাড়ি-কেশর সব পেকে একেবারে ধুতরোফুল হয়েছে; চোখের কোল বসেছে, চিবুকের হাড়গুলো বেশ খানিকটা ঠেলে উঠেছে। সিংহের মুখখানি ম্লান হয়ে গেল, বেশ বড় রকম একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আয়নার সামনে হাই তুলতে দেখা গেল, দাঁতও অনেকগুলো পড়েছে। লর্ড-সিংহ বললে, তাই তো গিন্নী, দিন আমার শেষ হয়ে আসছে; আমি আর এ অরণ্যে থাকতে পারব না; বাণপ্রস্থ নিয়ে এবার আমি তীর্থযাত্রা করব।

লেডী-সিংহী গালে থাবা দিয়ে ব'সে পড়ল; কর্তার কথায় তারও পড়ল দীর্ঘশ্বাস। সুখের অরণ্য ছেড়ে যেতে মন তার চায় না, তার বয়েস এখনও আছে। বহুদিনের ঘর-করা শক্তিহীন স্বামীকে ছাড়তে মন সরে না, আবার তীর্থযাত্রার কষ্টটাও চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

সাহস দিয়ে সিংহ-গিন্নী বললে, বয়েস সকলেরই হয় আর সকলেই চেষ্টা করে সেটাকে ঠেকিয়ে রাখতে। তা তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? জান তো এটা বিজ্ঞানের যুগ; হৃত-যৌবনকে ফিরিয়ে আনা মোটেই অসম্ভব নয়। আর আমার মনে হয়, তোমার বার্ধক্যটা শরীরের নয়, মনের। দুঃসময় না পড়লে তো আর তুমি আমার কথা শুনবে না; তাই যা বলি, শোন। একটা

ভাল ডাক্তার ডেকে শরীরটাকে 'রিজুভিনেট' করিয়ে নাও আর ডেন্টিস্ট ডেকে দুপাটি দাঁতই বাঁধিয়ে নাও। তারপর চল, দিনকতক চেঞ্জে ঘুরে আসা যাক; নতুন জায়গায় গিয়ে নিশ্চিন্তমনে খেয়ে-ঘুমিয়ে বেড়ালে শরীর আপনিই সেরে যাবে আর মতিভ্রমও কেটে যাবে।

চির-অবাধ্য লর্ড-সিংহের মনে কথাটা যেন লাগল। সত্যিই তো, এক জায়গায় বহুদিন থাকলে দেহ-মন দুটোরই বার্ধক্য এসে যায়। এই একই অরণ্যে সে বহুদিন বাস করছে; জীব-জন্তু সে প্রায় শেষ ক'রেই এনেছে; নধর যেগুলো ছিল, সেগুলো তো কবেই শেষ হয়ে গেছে। যে কটা অখাদ্য প'ড়ে আছে, সেগুলো খালি হাড়, মাংসের লেশ নেই। অভ্যাসমত চোখ বুজে সে খেয়ে যায়, ক্ষিদের সময় হাড়-মাসের বিচার করে না; শক্ত হাড় চিবিয়ে চিবিয়েই তো তার দাঁতগুলো পড়ল আর ধরল ডিস্‌পেপ্‌সিয়া।

লেডী-সিংহীর পেছনের থাবা ছুঁয়ে লর্ড বললে, দেহি পদপল্লবমুদারম্। মাপ কর গিন্নী, আর তোমার অবাধ্য হব না। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো তোমার পূজোতেই কাটাব। তুমি যদি সেবা-যত্ন ক'রে আমায় বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পার, তা হ'লে তোমারই সুখ বাড়বে। আজ থেকে আমি তোমার ছায়া-সঙ্গী হলুম।

লেডী-সিংহী কৃত্রিম কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে লর্ডকে কাবু করলে; লর্ডের প্রাণে যে কাব্য বা ফাজলামি জাগছিল, সেটা আর বাড়তে পেলে না। লেডী বললে, তোমার চেঞ্জের ব্যবস্থা আমিই করছি; কিন্তু তোমার এই বিরাট অরণ্য-রাজত্বের কি ব্যবস্থা করবে বল তো?

লর্ড বললে, সেইটেই তো আসল ভাববার কথা; বহুবার মনে করেছি, চেঞ্জে যাব; কিন্তু রাজত্বটা এত মুশকিল বাধায় যে, চেঞ্জ মাথায় উঠে যায়। এই দেখ না, আমি আছি, তাই না বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাচ্ছে, বাঁদরে হাতীর পাকা চুল তুলছে, বেড়ালে বাঘের ল্যাজে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত রাজত্বটা কেমন সুশৃঙ্খলে চ'লে যাচ্ছে! আমি গেলে এই শৃঙ্খলা বজায় রাখবে কে বল তো? কার ওপর ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্তমনে চেঞ্জে যেতে পারি?

লেডী-সিংহী বললে, বাঘই তোমার যোগ্য ডেপুটি, তার ওপর ভার দেওয়া উচিত। তুমি তো আর অমর নও, কাজেই বাঘের ওপর ভার দিয়ে ওকে কাজটা শিখে নেবার সুবিধে ক'রে দাও।

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

চলেছি পথ বেয়ে। দীর্ঘ পথ সর্পিল গতিতে এঁকে-বেঁকে চ'লে গিয়েছে মাঠের মধ্যে দিয়ে। চোখের ওপর দিয়ে সেই পুরাতন ছবি একটার পর একটা ভেসে যাচ্ছে, মনের মধ্যে কিন্তু তোলপাড় চলেছে। অদৃষ্টের হালচাল দেখে মনে হচ্ছে, অতি ধীরে হ'লেও নিশ্চিতরূপে সে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে সেই পুরাতন আবর্তের পানে। সে সম্বন্ধে মাঝে মাঝে পরিতোষের সঙ্গে আলোচনাও হচ্ছে। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, কলকাতায় যদি ফিরে যেতে হয়, আবার ইস্কুলে ঢুকবি তো?

অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে সে বললে, নাঃ, আবার ইস্কুল!

বললুম, তোর বাবা কিছু বলবেন না?

সে বললে, না।

মনে হতে লাগল, ইস্কুল-যাওয়া সম্বন্ধে যদি তারই মতন বলতে পারতুম—নাঃ!

সঙ্গে সঙ্গে একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল, একদিন সকাল-বেলা কি একটা কথা নিয়ে তর্কাতর্কি হতে হতে দাদা বাবাকে ব'লে ফেললে, লেখাপড়া আমার আর হবে না। ওসব ছেড়ে দিয়ে চাকরি-বাকরি ক'রে সংসারে সাহায্য করবার দিকে মন দেব।

এই কথা শুনে বাবার মাথায় সেদিন কি রকম খুন চেপে গেল। তিনি সারাদিন ধ'রে অমানুষিকভাবে দাদাকে পিটতে আরম্ভ করলেন। একতলা দোতলা রক্তে রক্তারক্তি হয়ে গেল। পাড়ার মুরুব্বীরা এসে বাবাকে থামাতে না পেরে চ'লে গেলেন। আশপাশের বাড়ির গিন্নীরা চেঁচিয়ে মাকে ডেকে বাবার উদ্দেশে বলতে লাগলেন, ছেলেটাকে মেরে ফেললে যে!

মা নির্বিকার হয়ে দু-হাতে বারান্দার রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে সেই বীভৎস কাণ্ড দেখতে লাগলেন।

প্রহারের যন্ত্রণায় দাদা চীৎকার করতে লাগল, কে আছ আমায় বাঁচাও—আজ আমাকে যে বাঁচাবে, আমি চিরকাল তার কেনা হয়ে থাকব।

কিন্তু কেউ এল না। বাবার মুখে এক কথা, আজ তোমাকে মেরেই ফেলব।

লর্ড বললে, আমার অবর্তমানে রাজত্ব চালাবার যোগ্যতা একমাত্র বাঘেরই আছে। কিন্তু মুশকিল কি জান? আমার মনে হয়, বাঘ একটু বেশি স্বার্থপর; দুর্বলের ওপর যদি কোনদিন অত্যাচার হয়, বাঘ কখনও তাকে রক্ষে করতে যাবে না, উলটে সে নিজেই হয়তো দুর্বলের ঘাড় মটকাবে। আর জান তো, আমার রাজত্বে বাঘ-ভাল্লুকের চেয়ে ভেড়া-ছাগলের সংখ্যাই বেশি, তারা জানে শুধু নীরব ভাষায় মুখপানে চেয়ে থাকতে, আত্মরক্ষা করবার জন্যে কোমর বাঁধতে জানে না। যারা শক্ত-সমর্থ হয়েছে, তাদের জন্যে ভাবি না, ভাবি শুধু দুর্বলদের জন্যে।

লেডী বললে, দুর্বলদের কাল্পনিক দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে তুমি যদি অক্কা পেয়ে যাও, তা হ'লে পালে যখন সত্যিই বাঘ পড়বে, তখন রক্ষে করবে কে?

লর্ড বললে, তুমিও এটাকে বল কাল্পনিক দুঃখ? তুমি কি আজকাল খবরের কাগজ পড়ছ নাকি? পড় তাতে দুঃখ নেই, তবে সমস্ত জিনিসটা এত সোজা ভেবো না। আমি চর্মচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি, দুর্বলের মহা দুর্দিন সমাগত। আমি আছি, তাই কেউ এখনও বুঝতে পারছে না; শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে বদমাইশদের একটু-আধটু শাস্তি দিলে ওরা আমার বদনাম রটাচ্ছে—আমি ভীষণ অত্যাচারী। অত্যাচারের এখন হয়েছে কি? বাছাধনরা পরে বুঝবে, কত ধানে কত চাল!

লেডী বললে, আমায় মুখ্যু পেয়ে তুমি তো খুব একচোট বক্তৃতা আরম্ভ করলে; মতলবটা কি বল তো? চেঞ্জে যাবে কি না সোজাসুজি ব'লে দাও। এখন থেকে উঠে প'ড়ে লাগলে মোট-ঘাট বেঁধে তৈরি হতে অন্তত বারোটি মাস সময় লাগবে; তার কমে কিছুতেই হবে না। এখনও যদি তুমি মতিস্থির না করতে পার, তা হ'লে আর চেঞ্জে যাওয়া হয়েছে! কোন্‌দিন তুমি আমার খাবার নোয়া মাথার সিঁদুর ঘুচিয়ে জন্মের মত চেঞ্জে চ'লে যাবে। না বাপু, সে আমি পারব না; এই বয়েসে নিরিমিষ খাওয়া আমার সহ্য হবে না। চেঞ্জে তোমায় যেতেই হবে।

লর্ড বললে, তা হ'লে রাজত্বটার কি করি? একটা সুব্যবস্থা না ক'রে তো আর যেতে পারি না।

লেডী বললে, একটা কাজ কর; একটি মিটিং ডাক; সেখানে বাঘ, ভাল্লুক,

হাতী, গরু, ছাগল, ভেড়া এদের সব লীডাররা আসুক, তোমার সামনে ব'সে সকলে মিলে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করুক, আর সেই বন্দোবস্ত-মাফিক কাজ হোক।

লর্ড বললে, কথাটা তুমি মন্দ বল নি গিন্নী; আমার সামনে সকলে হয়তো মিলে-মিশে বাস করতে রাজি হয়ে যাবে। কিন্তু আমি চ'লে গেলে ওরা যদি আবার নিজ মূর্তি ধরে, আর পরস্পর মারামারি কামড়াকামড়ি করে, তা হ'লে কি হবে? সকলেই তো আর ভদ্র পশু নয় যে, কথা রাখবে।

লেডী বললে, তা হ'লে এক কাজ কর; তুমি না হয় নিজেই সকলকে আলাদা আলাদা বন্দোবস্ত ক'রে দাও। রাজত্বটাকে কতকগুলো পাড়ায় ভাগ ক'রে ফেল; প্রত্যেক পাড়ার চারদিকে বেশ উঁচু পাঁচিল তুলে দাও। তারপর এক-একটা পাড়ায় বাঘ, ভাল্লুক, গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল এদের সব পুরে দাও। কারুর সঙ্গে কারুর মুখ-দেখাদেখি থাকবে না, যে যার নিজের পাড়ায় বাস করুক।

লর্ড বললে, ব্যাপার যে রকম দেখছি, হয়তো শেষ পর্যন্ত এই রকম একটা ভাগাভাগিই করতে হবে। কিন্তু তাতে সবচেয়ে মুশকিল কি জান? সকলকেই থাকতে হবে ঘাস-জল খেয়ে। বাঘের মুখে যদি ঘাস-জল না রোচে, তা হ'লে তাকে উপোস ক'রেই মরতে হবে; কেন না বাঘ তো আর বাঘের মাংস খেতে পারে না, আর পাঁচিল দেওয়া থাকলে সে ভেড়া-পাড়াতেও যেতে পারবে না। ছাগল-পাড়ার ঘাসগুলো ফুরিয়ে গেলে তাকেও উপোস করতে হবে; বাঘ-পাড়ায় প্রচুর ঘাস থাকলেও তার যাবার উপায় নেই। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যাবে, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে বা উপোস ক'রে সকলেই রীতিমত কাহিল হয়ে পড়েছে। কাজেই তুমি দেখতে পাচ্ছ, পাঁচিল বড় মারাত্মক জিনিস।

লেডী বললে, দেখ, আমি মুখ্যু মেয়ে-সিংহী; ওসব যুক্তির জাল ফেলে আমায় আর ড্যাঙায় তুলতে চেও না। আমার মাথা খাও, অন্তত দিন কতকের জন্যে তুমি চেঞ্জে চল; যদি দেখা যায় যে, রাজত্বটা কোনও রকমে চ'লে যাচ্ছে, তা হ'লে না হয় বেশি দিন বাইরে কাটানো যাবে; আর যদি গোলমাল লাগে, তা হ'লে ফিরে আসতে কতক্ষণ? সোজা কথায় যদি তুমি রাজি না হও, তা হ'লে আমি কাল থেকেই সত্যাগ্রহ করব। এই বয়েসে খাবার নোয়া আমি কিছুতেই খুলতে পারব না।

লর্ড-সিংহের নান্তঃ পন্থা। রাজ্যময় র'টে গেল লর্ড-লেডী-সিংহ চলে যাচ্ছে। কেউ বললে, আপদ গেল, এইবার আমাদের রাম-রাজত্ব আসবে কেউ বললে, সর্বনাশ! আমাদের দশা কি হবে? কে আমাদের বাঁচাবে কেউ বললে, ছিঃ ছিঃ! আমরা এত ক'রে লর্ড-লেডীর সেবা করলুম, শেষকালে এই রকম ক'রে ফেলে পালানো? কেউ বললে, আমরা কিছুতেই যেতে দেব না; উপোস ক'রে আমরা পথ আগলে প'ড়ে থাকব; দেখি, ওরা কি ক'রে যায়! কেউ বা আসন্ন-বিরহ-ব্যথায় হাপুস-নয়নে কাঁদতে লাগল।

চেলে যাবার নির্দিষ্ট দিন যখন এল, তখনকার অবস্থাটা নিছক কান্নাময়। বাঘ থেকে বাঁদর পর্যন্ত সকলেই কেঁদে ভাসিয়ে দিলে; লর্ড-লেডী যত বলে, কেঁদো না, কান্না ততই গমক দিয়ে আসতে থাকে; শেষে তাদেরও রুমালে মুছতে হ'ল দুচার-ফোঁটা সমবেদনার অশ্রু। যাবার সময় সমবেত পশু-সমাজকে সম্বোধন ক'রে লর্ড-সিংহ দিয়ে গেল 'বিদায়-বাণী'—

সমবেত স্ত্রী-পুং পশুগণ! লেডী-সিংহী আর আমি তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। চোখের জল ফেলে তোমরা যে ভালবাসা আমাদের ওপর দেখালে, তা আমরা কোনদিন ভুলব না। তোমরা সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার কর আর দিন দিন উন্নত হও।

আপাতত কিছুদিনের জন্যে আমরা চেলে যাচ্ছি। যদি তোমরা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ফিরিয়ে আনতে চাও, তা হ'লে দৈনিক ভগবানের কাছে সমবেত প্রার্থনা কর, যাতে আমার শরীরটা শীঘ্রই সেরে যায়।

বিশ্বাস কর, তোমাদের আমরা এত ভালবাসি যে, তোমাদের ছেড়ে স্বর্গে যেতেও আমাদের প্রাণ চায় না। হে আমার অনুরক্ত অনুগত পশুগণ! তোমরা নিশ্চিন্ত হও, আবার আমরা আসব।

অগণিত পশুকণ্ঠে একসঙ্গে ধ্বনিত হ'ল—

"পশু-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে
অরণ্য-ভাগ্য-বিধাতা!"

শ্রীপ্রবোধকুমার

টুক্‌রো কবিতা

বিশ্বজুড়ে যখন দেখি—সব কিছুতে ফাঁকি,
তখন তোমায়, হে ভগবান, পরাণ ভ'রে ডাকি।

শ্রীনীলাম্বর

নেলীর বাবার ডায়েরি

চিকিৎসা

আপিসের দরোয়ান-চাপরাসীরা সকলেই আজকাল আমার কাছ থেকে ওষুধ নিচ্ছে। হোমিওপ্যাথির বাক্সটা ঝেড়েঝুড়ে আবার টেবিলে রেখেছি।

আজ ভোরবেলা আপিসের দরোয়ান এসে বললে, বাবু, দাওয়াই চাই।

বললুম, কি হ'ল রে তোর?

বেশ হাত পা নেড়ে বললে, পেট গড়বড় হয়েছে, মাথায় দরদ, গা ব্যথা হয়েছে।

ওর সঙ্গে এসে দাঁড়িয়ে ছিল আমার বাড়ির উলটো দিকেরই টিনের চালা-ঘরের ভাড়াটে হরেন্দ্র। তাকে দরোয়ানের সঙ্গে মাঝে মাঝেই দেখা যায় আজকাল। সে দরোয়ানের অসুখের সাক্ষ্য দিলে, হ্যাঁ সত্যি, এখানে এসে আমার বাড়ির সামনে ব'সে পড়েছিল বেদনায়।

দরোয়ান বললে, সে ব'সে পড়বার আদমী নয়, তবে কষ্ট হচ্ছে খুব।

বই খুলে হোমিওপ্যাথির বাক্সটা নিয়ে বসলুম। লক্ষণগুলো বিবেচনা করতে করতে বাজারে যাবার সময় ব'য়ে যাচ্ছে, নেলীর মায়ের নিতান্ত বিরক্তিকর তাগাদা আসছে। তিন ফোঁটা ওষুধ চিনিতে ফেলে তিনবার খাবার জন্যে দিলুম। লম্বা সেলাম ক'রে কাতরস্বরে আপিসে ছুটি করিয়ে দিতে অনুরোধ ক'রে চ'লে গেল।

এর পর নেলীর মায়ের সঙ্গে একদফা বেশ হয়ে গেল, বললে, পরের উপকার তো ছাই—এ শুধু তোমার বাতিক। লোকটার কোনও অসুখ নেই।

রেগে বললুম, তোমার বিশ্বাস না হ'লেই আমার বাতিকের কথা আসে। আমার ওষুধে বিশ্বাস তোমাদের নেই ব'লেই প্রতি মাসে ডাক্তারের কাছে দৌড়ে জুতোর তলা আদ্ধেক ক্ষয় হয়ে যায়। আর বর্বরস্ত ধনক্ষয় তো লেগেই আছে।

নেলীর মায়ের কথাগুলো মনের তারগুলোকে বিগড়ে বেসুরো ক'রে দিয়েছে। দরোয়ানটার প্রতি আমার সহানুভূতি অত্যন্ত বেড়ে গেল। আপিসে এসেই দরোয়ানকে ছুটি করিয়ে দিলুম।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে খাবার খাচ্ছি। নেলীর মা বললে, কেমন, এখন হ'ল ব্যাপারটা? হরেন্দ্রের স্ত্রীটির জন্যে ওষুধ দাও এবার। হরেন্দ্র ওকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। ও হাসপাতালে যাবে না।

একেবারে ছোটলোক, বুঝলে! অসুখ হ'লে ওষুধ চাই, সাহায্য চাই, খাবার দাও। এমন কি চিকিৎসার জন্যে আজও ছেলেপুলে পাঠিয়ে টাকা নিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে এসেছি। ও-বাড়িতে তুমুল চীৎকার, কান্না শুনে নেলীকে জিজ্ঞেস করলুম, কি হয়েছে ওদের আবার?

নেলী বললে, তাও জান না? রাণীর বাবা ওর মাকে মারধোর করছে।

বললুম, নাঃ, লোকটাকে এক্ষুনি আমি শায়েস্তা করব। ভদ্রপল্লীর অনুপযুক্ত।

নেলীর মা ছুটে এসে বললে, কি দরকার তোমার? তোমাকে গালাগালি করছে যে!

অবাক হয়ে বললুম, আমাকে? কেন?

ওষুধ দাও, টাকা দাও, পদসেবা করুক,—বুঝতে পারছ না কেন?

এবার উত্তর দিলে নেলী, মা, যদি কিছু হয়েই থাকে, তোমারই জন্যে? কে তোমাকে বলেছে আমাদের কথা দাসী-চাকরানীর সঙ্গে আলাপ করতে? আর বাবা ওষুধ দিচ্ছেন, টাকা দিচ্ছেন, তাতে তোমার কি, শুনি? কেন ঝিকে বলেছ এসব?

তারপর মা ও মেয়েতে মিলে হরেন্দ্রের গৃহের মত ব্যাপারের মৃদু-মন্দ পুনরাবৃত্তি হ'ল। চুপ ক'রে দরজার সামনে ব'সে ছিলুম। সহসা রাণী উপস্থিত হ'ল, বললে, টাকাটা ফিরিয়ে দিতে এসেছি, এই নিন।

জিজ্ঞেস করলুম, কেন?

রাণী বললে, বাবা বলেন—আমরা গরিব, তা ব'লে ভিক্ষে করব কেন?

বিস্মিত হয়ে হরেন্দ্রের কথা ভাবছিলুম, লোকটা কি সত্যি মাতাল?

নেলীর মা এসে বললেন, ভাল ক'রে যারা খেতে পরতে পায় না, তাদের এ অহঙ্কার কেন?

নেলী বললে, বাবা ভিক্ষে দেন নি, কিন্তু তুমি সে অহঙ্কার করেছ, এ হচ্ছে তারই ফল।

নেলীর মা লেখাপড়া-শেখা মেয়ের অহঙ্কারে চটেছে। আমি ভাবছি, সত্যকার অহঙ্কারটা কোথায়?

বিদ্যাদায়িনী

সরস্বতী-পূজো। ছেলেপুলেরা ধ'রে পড়ল, বাবা, ঠাকুর আনতেই হবে।

বললুম, টাকা নেই একেবারেই, কি দরকার ওসব ক'রে?

নেলীর কলেজ-হস্টেলে পুজো, অতএব আমাকে সমর্থন করলে। নেলীর মা বললে, কাজের সময় তোমার টাকায় কুলোয় না কোনও কালে। ছেলে-মেয়েগুলোকে একটু লেখাপড়া শেখাতে হবে তো? মেয়ে তো দিগ্‌গজ হয়েছেন।

ভাবলুম, সরস্বতীর অনুরাগ আমার প্রতি আছে ব'লেই তো লক্ষ্মীও বিরূপ, তুমিও বিরূপ। কিন্তু কি করব?

বারো আনা পয়সা পকেটে ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম। খোকা সঙ্গে এল, সে কাঁধে ক'রে মূর্তি নিয়ে বাড়ি ফিরবে।

অনেক কষ্টে ভিড়ের মধ্যে কুমোরের দোকানে ঢুকে পড়লুম। কত প্রকারের মূর্তি, জয়হিন্দ-মার্কা সরস্বতী, অর্ধ-অনাবৃত ভারতীয় শিল্পের চরম রূপে রূপায়িত বীণাপাণি,—ছোট একটার দাম বারো আনা।

মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল, খোকাকে বললুম, থাক্ বাবা। চল, ঠাকুর ছাড়াও আমাদের চলবে। দেবী হচ্ছেন নিরাকার, বুঝলে?

খোকা বুঝল না কিছুতেই। জেদ ক'রে মূল্য দিতে ব'লে একটা মূর্তি উঠিয়ে নিয়ে চ'লে গেল বাসার দিকে। আমি কুমোরের দোকানে ভিড়ের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলুম।

কতক্ষণে মনে হ'ল, আমি যে ক্রেতা, এ তো কেউ জানে না। ভাবছিলুম ভিড় ক'মে গেলে কুমোরকে ব'লে ক'য়ে দু-পয়সা কমিয়ে নেব। কিন্তু কম তো কিছুতেই হবে না। শুধু বারো আনা পয়সা আমার সম্বল। আমি তো মূর্তি হাতে ক'রে নিই নি, আমার ছেলে নিয়েছে। মূল্য যে কেউ চায় নি, না চাইলেই কি দিতে হবে? দেওয়া উচিত সত্যি, কিন্তু সংসারে উচিত ব্যাপারটা কি সব সময়েই ঘটে? আমার তো আরও পয়সা থাকা উচিত ছিল, যেন সংসার চালাতে পারি নিশ্চিন্তে, কিন্তু কেন নেই? আমি তো কোন ত্রুটি করি নি কক্ষনও। অথচ আমার সংসারের অভিযোগ এত তীব্রই বা হবে কেন? মানুষ কি চিরকালই উচিত কর্ম করে? সহসা মনে প'ড়ে যায়, বিনা টিকিটেও ট্রেনে চলেছি, বাসওয়ালাকে ফাঁকি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি, ট্রামে ফাঁকি দিয়েছি এমনও কাহিনী বলতে পারি। ফাঁকি কে না দিচ্ছে? কে না দিতে বাধ্য হচ্ছে? জীবনের পথে নিশ্চিন্তে চলবার উপায় বের করাই মানুষের

উচিত কর্ম। দোকান থেকে যেন অনিচ্ছা সত্বেও বেরিয়ে চ'লে এলুম। কেউ জানতে পারে নি। আশ্চর্য!

বারো আনা পয়সা দৃঢ় মুষ্টিতে ধ'রে পথ অতিবাহন ক'রে চলেছি। আমি কি জোচ্চুরি করলুম? পয়সাগুলোকে বুক-পকেটে রেখে দিলুম। কিন্তু ওগুলো বক্ষ-স্পর্শ ক'রে রক্তস্রোতকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলিয়ে দিতে লাগল।

ভাবছিলুম, আহত পশুর মত বাড়ি চলেছি কেন? কি করেছি? বারো আনা পয়সায় পুজোর ফল-মূল কিনলুম। যাক, সরস্বতীই পথ বাতলে দিলেন।

ঈজি-চেয়ারটাতে ব'সে অন্যমনস্ক হয়ে ছেলেদের বলতে লাগলুম কত কথা— আমাদের ছেলেবেলাকার কথাগুলো সব। সরস্বতী-পুজোর রাত্রিতে ফুল চুরি করতুম। কি চঞ্চলতাই ছিল আমাদের মনে! আমাদের ছেলেবেলাকার চুরিবিদ্যের ইতিহাস শুনে ছেলেমেয়েগুলো নির্মল আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

চুরি

গত রাত্রির কাহিনী আজকের বাতাসে রেশ রেখে গিয়েছে। আজ বিগত দিনের স্মৃতিতে আমি জড়িয়ে আছি।

মনে পড়ে, গভীর রাত্রিতে ঘুম আসছিল না। কলম নিয়ে ব'সে ভাবছিলুম, এমন কিছু লিখব, যা আমার সব কথা ভুলিয়ে দেবে। ছেলেপুলেরা ঘুমুচ্ছে, নেলীর মায়ের নাসিকা-গর্জন আরম্ভ হয়েছে। টেবিলের ওপরের আলোক বিচিত্র জগৎটাকে একটা চঞ্চল আলোকের ছায়ায় ও মায়ায় ঘিরে রেখেছে। জানলার বাইরের দিকে চেয়ে আছি, ঘুম আসছে না। চোখের স্তিমিত দৃষ্টি, ভাবছি, ব'সে ব'সে এলোমেলো অনেক কথাই ভাবছি।

শরীর রোমাঞ্চিত হ'ল, একটা ছায়া এসে দাঁড়াল খোলা জানলাটার ওদিকে। অবশেষে বুঝতে পারলুম, হরেন্দ্রের মেয়ে—রাণী। আমাকে দেখতে পায় নি। জানলার সামনে পুজোর ফলগুলো রাখা হয়েছিল, যেন রাত্রির শিশিরে ভিজে টাটকা থাকে। সেখানে শীর্ণ কঙ্কালের মত দুটো হাত ফল কয়েকটি উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

চীৎকার করব অথবা ডাকব কি না ভাবছিলুম। সহসা চোখ পড়ল সরস্বতী-মূর্তিটার দিকে। হাসছে যেন বাণীর মুখখানি আমার দিকে চেয়ে। আমাকে বিস্মিত করেছে, চীৎকার করবারও অবসর দিলে না।

আজ ভোরে নেলীর মা ঘুম থেকে জেগেই চীৎকার আরম্ভ করলেন, ওগো, সর্বনাশ হয়েছে, সব চুরি হয়ে গেছে, সব ফল-মূল।

রহস্যময়ী সরস্বতীর দিকে তন্দ্রাবিজড়িত চক্ষু ফিরিয়ে নিয়ে বললুম, চুরি! সে কি? কে করেছে?

নেলীর মা বললে, কে করেছে সে কি আমি জানি? আমাকে কি ব'লে ক'য়ে করেছে? চোর! পূজোর ফল চুরি! হাত-পা খ'সে প'ড়ে যাবে, মরবে, গ'লে প'চে মরবে।

বললুম, ধরা না পড়লে অভিশাপে চোরের কিছুই হয় না আজকাল।

নেলীর মা বললেন, তা হ'লে তুমি কি বল, যে চুরি করে, তার ওপর দেবতার অভিশাপ আসে না? তার ওপর দেবরোষ পড়ে, তার পাপের ফল ভোগ করতেও হয়, ঠিক জানবে।

ঘুরে ঘুরেই নেলীর মা যখন মনের দুঃখটাকে আমার কাছে ব্যক্ত করতে লাগল, আমার অন্তরের গুহাবাসী একটা বিষাক্ত সাপ যেন অজ্ঞাতে ফোঁস-ফোঁস করছিল। নেলীর মাকে ঠাট্টা করতে চেষ্টা করছিলুম, চোর বাড়িতে গিয়ে ভস্ম হয়ে যাবে।

বেলা বেড়ে চলল। নেলীর মা লক্ষ্মীর কৌটো থেকে সিঁদুর-মাখানো টাকা এনে বললেন, এই নাও। ছেলেমেয়েদের মুখ্যু হতে দেব না। লক্ষ্মীঠাকরুণের কাছে নয় মাথা কুটে কাঁদব। নেলীর মায়ের চোখে জল, আমার মনে কতকটা স্বস্তি।

শ্রীসুকুমার

গড়পড়তা মানুষ

এ স্ট্রেট লাইন ইজ দি শর্টেস্ট ডিস্‌ট্যান্স বিটুইন টু পয়েন্টস,—এখানে পয়েন্ট একটা কন্‌সেপ্ট, দূরত্ব একটা কন্‌সেপ্ট, রেখা একটা কন্‌সেপ্ট, এই রকমের সাদা নিরীহ কন্‌সেপ্টগুলোকে ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে উঠল ইউক্লিডের হিংস্র জ্যামিতি; এই জ্যামিতিকে সৌরজগতে বিস্তৃত ক'রে মানুষ গ্রহ-উপগ্রহকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেললে। কি দুরন্ত রাহু! তারপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের কাছাকাছি মিন্‌কাউস্কি (Minkowski) ও রীম্যান (Riemann) তৈরি করলেন নূতন স্বতঃসিদ্ধের উপর নূতনতর জ্যামিতির

ফাঁদ। আইন্‌স্টাইন বিশ্বকে সেই ফাঁদে ফেলে শেষে উপনীত হলেন বাদশাহী মোহরের মত চ্যাপ্টা এক ব্রহ্মাণ্ডের সীমারেখায়। সেই সীমারেখাও আইন্‌স্টাইনের জন্য থমকে রইল না—বেড়ে চলল হু-হু ক'রে দিগ্বিদিকে, মানুষের সেরা জ্যামিতিকে হতবুদ্ধি ক'রে। তারপর সেদিন পণ্ডিতেরা সকল লজ্জাশরম খুইয়ে ঘোষণা করলেন, ব্যতিক্রমটাই জগতের ক্রম (প্রিন্সিপ্‌ল অফ ইন্‌ডিটারমিন্যান্‌সি)। বিশ্ব তাঁদের সংখ্যার খাঁচায় বন্ধ রইল না। বিশ্বের দুয়ার খোলাই রইল; সেই খোলা দরজা দিয়ে ব্যতিক্রমের হাওয়া এসে জগতের সব বৈজ্ঞানিক নিয়মের বন্ধন শিথিল ক'রে দিল। মোট কথা, বৈজ্ঞানিকেরা হেরে গেলেন। এই সনাতন বিশ্ব-দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে তাঁরা সফল হলেন না। তার মানে, সর্বরকমের জ্যামিতি হেরে গেল, সংখ্যা হেরে গেল, সংখ্যাতীত সাংখ্য (স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স) হেরে গেল। কিন্তু মানুষ কি হেরে গেল?

গেল, অসংখ্য মানুষ একটা নূতন সাংখ্যে হেরে গেছে। এই সাংখ্য মনুষ্য-সমাজের মর্ক্সীয় সাংখ্য (মার্ক্সিস্ট ফিলোজফি)। যে উদ্দাম সংখ্যা-লালসা, যে উদ্দাম সংজ্ঞা-লালসা সৃষ্টিকে কুৎসিত ক'রে দিয়েছে, তারই একটা ঢেউ এসে ঠেকল কয়েকজন সমাজসংস্কারকের বুদ্ধিকোষে। তাঁরা মানুষকেও সংখ্যা বানিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সাংখ্য তৈরি হয়ে গেল। যখন তাঁরা দেখলেন, পৃথক পৃথক মানুষ সেই সাংখ্যের নিয়মে চলছে না, তখন আগুন আর ইস্পাত দিয়ে মানুষের গড্ডলিকাকে চলতে বাধ্য করলেন নূতন সাংখ্যে। সাংখ্য হ'ল বহুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, সূত্রাকারে তৈরি। বিশ্ব অনন্তরূপী ব'লেই বহু জ্যামিতির প্রয়োগ চলে তার ওপর। বিশ্ব যদি মুরগির ডিম হ'ত, তা হ'লে তার জ্যামিতি হ'ত একটা।

সাংখ্যের প্রয়োগ যেখানে সংখ্যা বহু। এককের কোন সাংখ্য নাই। একক "আমি," একক অশোককিশলয়, একক কোবিদারকুসুম—এরা সাংখ্যের অতীত, এরা প্রত্যেকে বিশিষ্ট, অবর্ণনীয়।

নূতন মর্ক্সীয় সাংখ্যের যুক্তি মূলত এইরূপ—যন্ত্র একটা সংখ্যা, মানুষ একটা সংখ্যা, এই যন্ত্রসংখ্যার সঙ্গে মানবসংখ্যার সাংখ্যসম্বন্ধ পুঁজি। এই যন্ত্রে মানুষে রচিত সাংখ্য পুঁজিবাদের ভিত্তি। কোন ব্যক্তিবিশেষ সজ্ঞানে এই সাংখ্য-সূত্র ধ'রে চলে না, কিন্তু বহু মানুষের আচরণকে সাংখ্যপদ্ধতি দিয়ে বিচার করলে এই সূত্র ধরা পড়ে।

একক একটা পিপীলিকার গতি উদ্দেশ্যহীন ইতস্তত ছোটাছুটি মনে হ'লেও পিপীলিকারা যখন দলে দলে চলে, তখন প্রত্যেকটি দলের যাত্রাপথের একটা আধা-জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। (খাঁটি গাণিতিক পথ নয়!) মর্কীয়রা বলেন, সামাজিক মানুষের আচরণও ওইপ্রকার। একক কোন রাধাশ্যাম রায় বা রব্বানি মণ্ডলের আচরণ আপাতদৃষ্টিতে শৃঙ্খলাহীন, কিন্তু লক্ষ লক্ষ রাধাশ্যাম আর রব্বানিকে একত্রে কর্মরত অবস্থায় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তারাও এক এক বিষয়ে আপাতদৃষ্ট এক এক গাণিতিক ধারাকে অনুসরণ ক'রে চলেছে। এই ধারা আপাতদৃষ্টিতে সাংখ্যের ধারা। অপর পক্ষে, একক কোন যন্ত্র নিতান্ত নিরীহ। কিন্তু কয়েক শত যন্ত্র একটা চালার নীচে কোন পদ্ধতি অনুসারে একত্রিত হ'লে তারা সামগ্রিকভাবে একটা নূতন অর্থে অর্থবান হয়ে ওঠে। এইরকম হাজার হাজার যন্ত্রাগারকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখলে যেন অভিনব কোন দুর্জয় শক্তির আবির্ভাব ব'লে মনে হয়।

এই বহুযন্ত্রের সঙ্গে বহুমানুষের আচরণের সাংখ্যসম্বন্ধের সূত্র নির্ধারণকে যাঁরা বিপুল বৈজ্ঞানিক প্রয়াস ব'লে মনে করেন, তাঁরা গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড ভুল ক'রে ব'সে আছেন। দোষটা সংখ্যাবিজ্ঞানের নয়। সংখ্যাবিজ্ঞানের পদ্ধতি অজস্র সাংখ্য (স্ট্যাটিস্টিক্স) নির্ণয় করতে সমর্থ। সমাজে যন্ত্র-সমাবেশের বহু সাংখ্য (স্ট্যাটিস্টিক্স) নির্ণয় করা যেতে পারে, বহু মানুষের সংঘবদ্ধ আচরণেরও তেমনই বহুধা বিশ্লেষণ সম্ভব। যন্ত্রবিশ্বের কয়েকটি সাংখ্য বেছে নিয়ে সমাজবিশ্বের কতকগুলি তথ্যের সঙ্গে আধা-গাণিতিক যোগাযোগ স্থাপন করা দুরূহ নয়।

এবং এটা স্বাভাবিক—যুগে যুগে মানুষ বিশ্বকে একটা শৃঙ্খলায় বাঁধতে চেয়েছে; মানুষী বুদ্ধির প্রকৃতিই এই, দূরতমের সঙ্গে নিকটতমের যোগসূত্র আবিষ্কার করার দুরূহ তপস্যা করেছে সে; উদ্দেশ্য—আধ্যাত্মিক প্রবোধ। মানুষ নক্ষত্রসঞ্চরণের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাগ্যবিপর্যয়ের, এমন কি তার প্রতি পদক্ষেপের তালটি পর্যন্ত বেঁধে দেবার প্রয়াসও পেয়েছে। ভৃগুসংহিতাও এমনই একটা সাংখ্যসূত্র। কিন্তু এখন উপহাসের বস্তু। কারণ?

কারণ, যুগ বদলেছে, মানুষের বিশ্বদৃষ্টি (Welt-Anschauung) যুগে যুগে বদলেছে। মানুষের এই বিশ্বদৃষ্টি নির্ভর করেছে যুগমগ্ন মানুষের প্রকৃতির

এই রকম চলেছে। নির্জিত ও নির্যাতনকারী উভয়েই ক্লান্ত, তবুও মার চলেছে। শেষকালে কেউ যখন বাঁচাতে এল না, তখন দাদা নিজেকে সাহায্য করবার গুরুভার নিজের কাঁধেই তুলে নিলে।

এক হেঁচকায় বাবার হাত থেকে ছিটকে প'ড়ে প্রায় গড়াতে গড়াতে ছুটে দাদা একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বাবাও তার পেছনে পেছনে ছুটলেন। কিন্তু তাঁকে ঘরের মধ্যে আর ঢুকতে হ'ল না। দরজার কাছে পৌছবার আগেই দাদা দরজার খিলটা এক হেঁচকায় উপড়ে ফেলে বাবার সম্মুখীন হয়ে বললে, আর একটি আঘাত যদি আমায় কর তো একটি ঘায়ে তোমায় শেষ ক'রে দেব।

দাদার সেই মূর্তি দেখে বাবা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দেখলুম, তাঁর প্রহারোদ্যত হাতখানা শিথিল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে নীচে প'ড়ে গেল। দাদা চীৎকার করতে লাগল, আপনার অনেক অত্যাচার আমি শৈশব থেকে সহ্য ক'রে আসছি, আজ তার শেষ হয়ে যাক।

বাবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাদার সামনেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি আর অস্থির এতক্ষণ কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের কাছে কাছেই ওপর-নীচ করছিলুম। দাদার আর্তনাদের তালে তালে আমাদের কান্নার আওয়াজও উঠছিল পড়ছিল। হঠাৎ তাকে বৈষ্ণবভাব থেকে শাক্তভাবে পরিণত হতে দেখে আমরাও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম।

বোধ হয় ব্যাপারটা বিশেষ গোলমেলে হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেখে মা এসে পড়লেন তাঁদের দুজনের মাঝখানে, তাঁর মুখখানা ঘিরে একটা অস্বাভাবিক কাঠিন্য, কিন্তু দুই চোখে অশ্রু টলটল করছে।

মা বাবাকে সেখান থেকে চ'লে যেতে বলামাত্র তিনি চ'লে গেলেন। দাদাকে দেখলুম, তার চোখ দুটো লাল, মুখখানা একেবারে থেঁতো হয়ে গেছে, ধুতি শতছিন্ন, সেইভাবে হুড়কোখানা তখনও তুলে থরথর ক'রে কাঁপছে।

দাদার সেই অবস্থা দেখে মা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। সেও মাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

দাদা ম'রে গেল মনে ক'রে আমি আর অস্থির চীৎকার ক'রে উঠলুম। মা বললেন, জল নিয়ে আয়।

তখুনি বালতি ক'রে জল নিয়ে এসে দাদার মাথায় দিতে লাগলুম। মার

উপর। মনুষ্যপ্রকৃতির পরিবর্তন ঘটছে দণ্ডে দণ্ডে আর সঙ্গে সঙ্গে তার বিশ্বদৃষ্টি বদলাচ্ছে।

মর্ক্ষীয় বিজ্ঞান অতিরিক্ত যন্ত্রসজ্ঞান উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বদৃষ্টি, এটাই বিশ্বদৃষ্টির চরম রূপ নয়। এই বিশ্বদৃষ্টির মূলে ছিল সংখ্যার প্রতি মুগ্ধ অনুরাগ। এই মোহে মানুষের আচরণকে সংখ্যার আচরণের সঙ্গে তুলনা করতে বুদ্ধিজীবীদের বাধে নি।

মূলে কিন্তু মানুষ 'নাম্বার' হতে পারে না। কারণ সংখ্যার উৎপত্তি সংজ্ঞায়। সংজ্ঞাহীন সংখ্যা থাকতে পারে না। অপরিমেয়কে নিয়ে কোন সাংখ্য রচনা করা যায় না। মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল প্রাণ মানুষকে সংজ্ঞাহীন ক'রে রেখেছে। কোনও স্বতঃসিদ্ধ শৃঙ্খলার উপর প্রাণের গণিত রচনা সম্ভব নয়।

গড়পড়তা মানুষ বা টিপিক্যাল ম্যান একটা ভুল কন্‌সেপ্ট, একটা জালিয়াতি, একটা ধাপ্পা। তোমার আমার প্রাণশক্তিকে যোগ দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করলে কি দাঁড়ায়? তোমার আমার প্রাণশক্তির গড়টা কি? গড়মানুষ নিছকবুদ্ধির ল্যাবরেটরিতে তৈরি একটা অদ্ভুত জানোয়ার। এই গড়মানুষের বুদ্ধিগড়, আকাঙ্ক্ষাগড়, চিন্তাগড়, অভাবগড়, প্রবৃত্তির তীক্ষ্নতা-গড়। গড় অর্থাৎ অ্যাভারেজ। এই কল্পনা বুদ্ধির 'অ্যাবর্শন', গড়পড়তা মানুষ এই নিয়ে মর্ক্ষীয় সমাজসাংখ্যের কারবার। নচিকেতা নহুষের সঙ্গে আমার অ্যাভারেজ আর কি!

উনবিংশ শতাব্দীর বিকৃত বুদ্ধি এই পক্ষীরাজের ডিম্বকে আবিষ্কার করেছে।

মানুষ যন্ত্র তৈরি ক'রে যখন নিজের কৃতিত্বে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, তখন ভাবলে, এই যন্ত্র "আইডিয়া" আকারে তারই অস্তিত্বের বনিয়াদে এতদিন সুপ্ত ছিল। অস্তিত্বের বনিয়াদে মন-আত্মা-আখ্য যে বনিয়াদ—সেই বনিয়াদে শুধু লক্ষ যন্ত্রের 'আইডিয়া'। মানুষ যন্ত্র নয় তো?—ঠিক পরবর্তী প্রশ্নই এই। মানুষ যন্ত্র কি না, এই প্রশ্নের সমাধানের পূর্বেই মানুষের উপর সাংখ্যের প্রয়োগ শুরু হয়ে গেল।

পণ্ডিত প্রমাণ করলেন, দু-একটা ব্যতিক্রমকে বাদ দিয়ে গোটা মানুষগোষ্ঠী সাংখ্যের সূত্র ধ'রে বিবর্তিত হচ্ছে।

কিন্তু সত্য এই যে, এই ব্যতিক্রম ব্যতীত বাকি মানুষ প্রকৃতির বিবর্তনে বরবাদ হয়ে গেছে, বাতিল হয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ অনঙ্কুরিত বীজের মত

ব্যর্থ এরা। এরা শব এবং সংখ্যা। তাই মর্ক্সীয় সাংখ্যে এদের গতি-নির্দেশ সম্ভব হ'ল। জীবন্ত মানুষের সাংখ্য নাই।

বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি নূতন অন্ধকার যুগের শুরু হয়েছে সভ্যতায়; আজ প্রকৃতির বিবর্তনের কুম্ভকারচক্রের পাশে বাতিল মানুষের জঞ্জাল পাহাড় হয়ে জ'মে উঠেছে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতির বিবর্তন মন থেকে আত্মায়, আত্মা থেকে ঈশ্বরে। এই আত্মার স্তর পর্যন্ত বিবর্তিত হ'ল কজন? অতি অল্প-সংখ্যক মানুষ। তাঁরা এই চলন্ত শবদের রাজ্য থেকে দূরে স'রে আছেন।

সহসা মনে হ'ল, আজ পৃথিবীর বিশাল ভূভাগে শবেরা বহন ক'রে নিয়ে চলেছে জীবন্তদের। মনে হ'ল, পৃথিবীতে অন্ধকার; শবেরা ঘুরছে ফিরছে, অযুত যান্ত্রিকযানে শবেরা চলেছে; কোটি কোটি যান্ত্রিক-কোটরে শবেরা প্রবিষ্ট নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে। শবেরা দিচ্ছে শিক্ষা শবেদের—শবসভ্যতা। তাই মর্ক্সীয় সাংখ্য সত্য ব'লে প্রতীয়মান হ'ল। এই শবেরা সংখ্যা, তাই এদের সাংখ্য-রচনা সম্ভব হয়েছে।

আজ গভীর অধিক্যতায় কোটি কোটি শবের কলরবমুখর প্রেতোৎসব (walpurgisnacht)। এ রাত্রির অবসান হোক। যে যেখানে জীবন্ত আছ, ওঠ। অভীঃ!

শ্রীদেবব্রত

মুসাফিরের ডায়েরি

লাঠিখেলা

একটা পাকা ঘরে ব'সে আমি যে পাকা আধুনিক তাই প্রমাণ ক'রে একখানা সমাজতন্ত্রের বই পড়ছি বিকেলবেলা। ইমান এসে সেলাম ক'রে দাঁড়াল। আমি নেহাৎ কূপমণ্ডূকীয়ভাবে শহুরে ও কলকাতিয়া গ্রামে কদাচিৎ গেছি, আত্মীয় জমিদারবাড়িতে সফরে—মান্য অতিথি হয়ে। এই প্রথম পাঁচজনের একজন হয়ে থাকার চেষ্টা চলছে, খুব সচেতনভাবে এদের সঙ্গে আত্মীয়তার সুরে কথা বলি, ভয় হয় পাছে মিশনারির নামান্তর ব'লে অবিশ্বাস করে। এটা নদীয়ার এক গণ্ডগ্রাম, আশেপাশে ক্ষুদ্রতর গ্রাম আছে, কোন কোনটি মুসলমানপ্রধান। ইমানরা ঘরামীর কাজ করে, সব মুসলমান। হাসিমুখে বললুম, কি ইমান, মেটে ঘরে বাস করার শখ মিটে গেলে কি

তোমার কাজ শেষ হবে? একটু হাত চালিয়ে নাও। এই আজ তো এলেই সব এগারোটার পর আর সাড়ে চারটে নাগাদ চ'লেও যাবে, মাঝে কবার যে তামাক খাবে! এ ঠিক রোজের হিসেবে কাজ হচ্ছে না, কলকাতা হ'লে—। খেয়ে গেলুম, যত সাবধান হই, ঘুরেফিরে কলকাতার ভূত ঘাড়ে চাপবেই, কি বিপদ!

আজ্ঞে দিদিঠাকরুণ, জাড়ের দিন, অবেলায় সকাল সন্ধ্যে, এ সময়টা এটু অমন হবে। আর হুঁকো বন্ধ তো কাজও বন্ধ, বুঝলেন না। তা আমার একটা আরজি ছিল, বড় আশা আছে, আপনারা যখন এখানে এয়েছেন—। এটুকু শুনেই আমার মনটা হিম হয়ে এল, এই আবার শুরু করতে হবে কৈফিয়তের পালা, এসেছি তো হপ্তাখানেক, এর মধ্যে যে গুড়ওলা, ধানকোটানী, মুড়ি-ভাজুনী, বাগানের ও ক্ষেতের মুনিষ, জলতোলা ভারী, পড়শী—কত লোককে জবাবদিহি করতে হ'ল। সবার ওই এক কথা—বড় আশা ছিল, আমরা সামান্য মানুষ, কপালের ভাগ্য এমন হবে যে গান্ধীকে দেখব। আপনারা যখন এয়েছেন, তখন সেভা হবে। তা কি ঠিক হ'ল দিদি? দিদি তো জানে, গান্ধীজী আসবেন না। অত আশা ক'রে মিনতি ক'রে বলে, মুখের ওপর 'না' বলতে এমন দুঃখ হয়, মনে হয়, যেন কত অপরাধ করছি। আমতা আমতা ক'রে বলি, এ ন মাইল গরুর গাড়ির পথ কি কষ্টকর জান তো, বুড়ো মানুষ, দামী প্রাণ, আমাদের সাহস হয় না।

হ্যাঁ, সে তো সত্যি কথা, তা তিনি যে রকম মানুষ, মন করলে মোটরে বা এরোপ্লেনে আসতে পারেন তো।

না, সে সুবিধে নেই। মনে মনে ভাবি, এ কি কংগ্রেস ইলেকশান যে, জওহরলাল আকাশপথে ছুটোছুটি করবেন, কি হবে এখানে এসে? এতগুলো লোক খুশি হবে, সার্থক-জীবন বোধ করবে, এটা এমন কিছু নয়। সমস্যা সমাধান হয় না; যে অক্ষম তার ওপর রাগটা প্রবল হয়। উষ্মার স্বরে প্রশ্ন করি, তোমাদের দেখার যাঁর সময় নেই, তাঁকে দেখে কি হবে? ভাল লোকেদের দেখে কি হয়? যা ভাল বলেন, তাই জেনে নিয়ে বুঝে করতে চেষ্টা কর। বুঝি, বঞ্চনা করছি, কি হবে দেখে, তবু তো সুযোগ পেলেই ছুটি নিজে। আরও মনে পড়ে, এই সেদিন কাগজে দেখলুম গান্ধীজী বলেছেন, আমি একজন চাষীমাত্র। সত্যি চাষী হওয়া যে কি ব্যাপার! শারীর

কৃচ্ছ্র ও দুঃসাধ্য, কিন্তু শারীর ও মানস সুখবঞ্চনা অসাধ্য। কত গণ্ডিবাঁধা এদের শখ বা আকাঙ্ক্ষা তাও মেটে না, কত কম চাওয়া তবু না পাওয়ার দলে র'য়ে গেল! এ তো চার্চিল-বর্ণিত উলঙ্গ-ফকির নয়, যাকে বিশ্ব নিঃস্ব হয়ে সম্মান দিচ্ছে, যার জয়ন্তীতে বৈজয়ন্তী ওড়ে বা যে জওহরলালের জন্মদিনে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ফোনে শুভাশিস্ পাঠায়। এ চাষীর স্ত্রীর স্মরণে জাতীয় ভাণ্ডার হয় না। যাক্ এ সীমাহীন উদাহরণধারা।

কি বলছিলে ইমান?

আজ্ঞে, সামনে মহরম, সেদিন তো কাজে অবসর থাকবে, আপনাদের কাছে লাঠিখেলা দেখাতুম আমাদের দল এনে—

এর পরও কিছু বলা বাকি র'য়ে গেল অনুভব করলুম। বেশ তো, সে তো ভালই হবে তা তোমাদের কিছু খরচ হবে না? কি রকম পড়বে বল তো?

সে যা হোক আপনারা দয়া করবেন।

এল মহরম, ওদের দল এল, এল কাঁসর আর ঢাকের বাদ্যি। সাধারণত যারা ঢাক বা তবলা বাজায়, তারা কেমন যেন শীর্ণ ক্ষুধাজীর্ণ দেখতে হয়, ওই তালে তালে মুখভঙ্গী ক'রে ক'রে চোয়াড়ে রুক্ষ দেখতে হয়। বসলুম আমরা দল বেঁধে।

বিশেষ নাম-করা লাঠিয়াল দলের খেলা জন্মে দেখি নি, তবু মনে হতে লাগল, এ ঠিক হচ্ছে না, বড্ড যেন বেমানান লাগছে। এতটুকু বাঁশের টুকরো হাতে (যেন পাকাটির মত) নানা আধিব্যাধিতে ক্লিষ্ট বেঁটে রোগা খেলোয়াড়দল। তারা চক্র সাজিয়ে ঘুরছে লাফাচ্ছে চেঁচাচ্ছে, তবু যেন প্রাণ নেই। আমার চোখে সবচেয়ে বিসদৃশ লাগছিল বস্ত্রাভাবে অনেকে হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি প'রে ছিল, আর, কেন জানি না, দু-তিনজন একেবারে মুণ্ডিতমস্তক বাকি কয়জন নিয়মমাফিক ছাঁটা-চুল। লক্ষ্য ক'রলুম, প্রায়ই বাঁ হাতটা মাথায় বুলোচ্ছে, অনুমান করলুম, একদা বাবরিচুল সামলানোর জন্য ও ভঙ্গীটার প্রয়োজন ছিল, এখন প্রথার অঙ্গে দাঁড়িয়েছে। আর ওই হাফপ্যান্ট! লাঠিয়াল ভাবলেই একটা রঙিন ছোট মালকোচা-মারা কাপড়, কোমরে বন্ধনী, বলিষ্ঠ কালো পেশীবহুল কঠিন চেহারা, ঝাঁকড়া চুল গোঁফ, নিষ্ঠুর দীপ্ত দৃষ্টি চোখে

৪

ভাসে, এ যেন তার প্রহসন। খেলোয়াড়দের যে জাতীয় শক্তির পরিচায়ক অথচ পাকানো ছিপছিপে চেহারা হয় তা এদের নয়। এরা সব রুগ্ন, অপুষ্ট পায়ের গোছ, সরু গলা, খসখসে রুক্ষ চামড়া, ছাঁটা চুলে হাত বুলোচ্ছে আর ওই পোশাক। প্রমথ চৌধুরীর বর্ণিত ঈশ্বর আমার বার বার মনে পড়ছিল।

যা হোক খেলা মন্দ হ'ল না, শেষের দিকে একটু জ'মে এল। কয়েকটা বিশেষ আক্রমণভঙ্গী ও কল্পিত শত্রুবেষ্টনীর বিরুদ্ধে একক তৎপর রক্ষাকৌশল প্রশংসনীয়। তারপর শুরু হ'ল কসরৎ-কৌশল। যথেষ্ট পেশীসঞ্চালনশক্তি না থাকলে এ জাতীয় খেলা দেখানো সম্ভব নয় বুঝলুম। কলকাতায় সার্কাসে সুদৃশ্য পরিচ্ছদ ও পটভূমি সহায়ে এই খেলা দেখানো হয়। রোদে আর শ্রমে এরা লাল হয়ে উঠল, খুব চেষ্টা ক'রে কষ্ট ক'রে আমাদের খুশি ও অবাক করতে চায় বুঝলুম। আমার শঙ্কা হয়, এসব খেলা দেখানো অত্যন্ত ভয়জনক, দম রাখার সামান্য ত্রুটিতে প্রাণহানি বা শিরার বিকার ঘটে। আমরা (মেয়ের দল) যত বারণ করি—আর দেখাতে হবে না, ওদের ততই ঝোঁক বাড়ছে। প্রথমত ওরা মেতে উঠেছে, দ্বিতীয়ত ভাবছে, আমাদের যথেষ্ট তাজ্জব বানাতে পারে নি, তাই আমরা বিরক্ত হয়ে থামতে বলছি। আমরা নাচার হয়ে অসোয়াস্তি ভোগ করতে লাগলুম। রবীন্দ্রনাথের কাদম্বিনীর তবু একটা উপায় ছিল, "সে মরিয়া প্রমাণ করিল যে, মরে নাই", আমাদের তো সে রকম কিছু করার নেই। বকশিসের কমতি হবে না, বরং বেশি দেব, দোহাই, তোমরা থাম।—ব'লে জবরদস্তি করা হ'ল বটে, কিন্তু আমরা খুশি হবার চেষ্টায় যা-খুশি বলছি আর সত্যি যে উপভোগ করছি না, এটা ওদের কাছে ধরা প'ড়ে গেল। ওদের যে ব্যক্তিগত বা দলগত কিছু ত্রুটি হয় নি, এ কথা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করল না, বললে, আর একদিন ভাল দল এনে আরও ভাল খেলা দেখাব। মানে—আরও শারীর শ্রমজনক কষ্টসাপেক্ষ ও মারাত্মক কিছু দেখাবে।

এই শরীরের নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে আত্মকে ও পরকে তৃপ্ত করার একটা নেশা যুগে যুগেই দেখা গেছে সাধক ও খেলোয়াড়দের মধ্যে। যে জাত যত সভ্য বা শিক্ষিত বা দার্শনিক তথ্যজ্ঞানে সমৃদ্ধ হোক না কেন, মল্লক্রীড়া, দ্বৈরথদ্বন্দ্ব, সামূহিক দলবিভাগ প্রভৃতির চর্চা, রাজা বা ধনীর অর্থসাহায্য, ও বিস্মিত জনসাধারণের সহানুভূতির স্পর্শে সজীব থেকেছে ও পল্লবিত হয়েছে। সেই মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তার গতি অব্যাহত আছে। স্পেনীয়

ষাঁড়ের লড়াই দেখা অভিজাত রুচির পরিচায়ক ছিল, রোমীয়দের গ্ল্যাডিয়েটর-গণের নৃশংস হত্যা ক্রীড়ামোদীদের উচ্ছ্বসিত করেছে। হিংস্র পশু অসহায় মানুষকে আক্রমণ ক'রে ক্ষতবিক্ষত করছে, টুকরো টুকরো ক'রে ছাড়িয়ে ফেলছে, এ দেখেও তৃপ্তি পেত মানুষ এককালে। আজও মল্লযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ নামে এই ভদ্রবেশী বর্বরতার প্রকারান্তর দেখি আমরা। রাগবী খেলাটাও উল্লেখ-যোগ্য। ঊর্ধ্ববাহু, একাহারী, বায়ুভুক, আকাশবৃত্তিধারী প্রভৃতি এবং চড়কপূজায় ও গাজনের উৎসবে নানা আত্মপীড়নের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে, যেগুলোকে আমরা মনে মনে সমীহ করি, কঠিন সংযমের প্রকাশ ব'লে শ্রদ্ধা করি। দেবপূজার এক প্রধান অঙ্গ শারীর কৃচ্ছ্রসাধনা যে নিজের বৃত্তিগুলোর গলা টিপে মারল না, সে কিসের তাপস বা সাধক? জীবনের রসাস্বাদন যার আছে সেই তো পাপী ভোগী। তাই বোধ হয় ভারতে রাষ্ট্রজগতেও এ সাধনার সংযোগ দেখি। রাষ্ট্রগুরুকেও কৃচ্ছ্রানলদাহনশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হতে হবে, লোকচক্ষে সীতার মত। গান্ধীজী অর্থনৈতিক জগতের ভিতে কেমন রদবদল ঘটালেন, জীবনের মূল্যবোধের মাপকাঠি দিলেন বদলিয়ে বা নবসুরে বিদ্রোহবাণী শোনালেন সবাইকে, এগুলোর জন্য তিনি পূজ্য নন। গরিব নিরক্ষর চাষী থেকে বিলাসমগ্ন ব্যবসায়ী ও তথাকথিত শিক্ষিতজনগণ সবাই পূজা নিবেদন করে তাঁকে, যিনি লণ্ডনের শীতে চাদর গায়ে গোলটেবিল বৈঠকে যান এবং যিনি এককালে বহুদিন অনশনব্রত চালাতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ তেমন ভাল লোক নন, কারণ তিনি নিরুদ্ধ ইন্দ্রিয়যোগী নন।

এই লাঠিখেলার যুগ্ম আবর্তচক্রে আরও কতকাল কতরূপে বেঁচে থাকবে, কে জানে!

"মুসাফির"

পরিণাম

সাগরের জল তো শুকায়
বালু করে ধুধু চিরদিন,
নয়নের প্রেম তো লুকায়
থেমে যায় দেওয়া-নেওয়া ঋণ।
শুক্তিগর্ভে মুক্তা শুধু বাড়ে
ভাগ্যবানে পায় সে সন্ধান,
মরুভূমি পূর্ণ হাহাকারে—
গুণী শোনে তরঙ্গের গান।

রমেশচন্দ্র দত্ত

(৯৬ পৃষ্ঠার পর)

রমেশচন্দ্রের বেশীর ভাগ গ্রন্থই ইংরেজীতে লিখিত। এই সকল গ্রন্থের একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি ; পাঠ্য পুস্তক, বা কোন কোন পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের নাম ইহাতে বর্জিত হইয়াছে।—

1. *Three Years in Europe* being extracts from letters sent from Europe. By a Hindu. Cal. 1872 (27 June), pp. 116.

   ইহার ৩য় (ইং ১৮৯০) ও ৪র্থ সংস্করণ (ইং ১৮৯৬) পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত। ১ম সংস্করণের ইংরেজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ 'ইয়োরোপে তিন বৎসর' (পৃ. ১০৮) নামে রমেশচন্দ্রের জনৈক কর্মচারী—ভগবানচন্দ্র দাস কর্তৃক ১৮৭৩ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রচারিত হয়।*

2. *The Peasantry of Bengal.* Cal. 1874, pp. 237.
3. *The Literature of Bengal.* By Ar Cy Dae. Cal. 1877, pp. 210

   ইহার "Revised Edition : with Portraits" ১৮৯৫ সনে গ্রন্থকারের নামাঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

4. *A History of Civilisation in Ancient India* based on Sanskrit Literature. Vols. 1-3. Cal. 1889-90.

   ইহার সংশোধিত সংস্করণ ১৮৯৩ সনে বিলাতে প্রকাশিত হয়।

5. *Lays of Ancient India* selections from Indian Poetry rendered into English verse. London 1894, pp. 224.
6. *Rambles in India* during twenty-four years, 1871 to 1895. With maps and Illust. Cal. 1895, pp. 160.
7. *Reminiscences of a Workman's Life* (Poems) "For Private Circulation only." Cal. 1896, pp. 57.
8. *England and India* a record of progress during a hundred years 1785-1885. London 1897, pp. 166.

---

* রমেশচন্দ্রের শ্যালীপতিভ্রাতা—বনগ্রাম ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশুতোষ ঘোষ লিখিয়াছেন :—"১৮৭৫ সালে এই পুস্তক ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করা হয়, ইহার দুই একটী কবিতা আমি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলাম।"—'রমেশচন্দ্র দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী' (১৩০২), পৃ. ৭ দ্রষ্টব্য।

9. *Maha-Bharata* the Epic of Ancient India condensed into English verse. With an introduction by the Rt. Hon. F. Max Muller. Illust. London 1899, pp. 188.
10. *Ramayana*. The Epic of Rama, Prince of India condensed into Eng. verse. Illust. London 1900, pp. 194.
11. *Open Letters to Lord Curzon on Famines and Land Assessments in India*. London 1900, pp. 323.
12. *The Lake of Palms* a story of Indian domestic life. London 1902.

    'সংসার'-এর ইংরেজী অনুবাদ।
13. *The Economic History of India* (1757-1837). London 1902, pp. 454.
14. *Speeches and Papers on Indian Questions* :

    1897-1900. Cal. 1902, pp. 334.
    1901-1902. Cal. 1902, pp. 203.
15. *India in the Victorian Age* an Economic Hist. of the People (1837-1900). London 1904, pp. 628.
16. *Baroda Administration Report* :

1902-03 and 1903-04.	1905. pp. 255.
1904 05.	1906, pp. 323.
1905-06.	1907; pp. 217.

17. *Indian Poetry* selections rendered into Eng. verse. London 1905, pp. 163.
18. *The Slave Girl of Agra* an Indian Historical Romance. London 1909.

    'মাধবীকঙ্কণে'র ইংরেজী অনুবাদ।

রমেশচন্দ্র তাঁহার বিশিষ্ট ইংরেজী গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে ১৯০৩ সনে অগ্রজকে লিখিয়াছিলেন :—"My fame as an English writer may live or perish early ; but so long it lasts it will be connected with three works—my 'Civilisation,' my 'Epics,' and my 'Economic History.' শেষোক্ত গ্রন্থখানি সম্বন্ধে এন. এন. ঘোষ তৎসম্পাদিত *Indian Nation* পত্রে লিখিয়াছিলেন :—"A book like this does more work than cart-loads of Congress Speeches."

উপসংহার

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, এই দুই প্রদীপ্ত প্রতিভার মাঝখানে পড়িয়া রমেশচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক দীপ্তিতে বঙ্গ-সাহিত্য-গগনে প্রতিভাত হইতে পারেন নাই। কিন্তু এ যুগের যে সৌভাগ্যবান্ পাঠক রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস কয়খানি পাঠ করিবার ক্লেশ স্বীকার করিবেন, তাঁহারই মনে ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র স্থায়ী আসন লাভ করিবেন। যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত কথোপকথনে যে বাংলাভাষা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র স্বয়ং সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই ভাষাই যে শিল্পী রমেশচন্দ্রের হাতে বিবিধ মনোহারিণী রূপ লইয়াছিল, তাঁহার 'মাধবীকঙ্কণ' ও 'সংসার-সমাজে' তাহার পরিচয় মিলিবে। তাঁহার রচনা সংযত ও মধুর ছিল। ইহা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুণেই সম্ভব হইয়াছিল। রমেশচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক গৌরহরি সেনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিতেছি :—

বোলপুর।

প্রিয়বরেষু,—স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি বলিয়া ত গর্ব করিতে পারি না। অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল এবং তিনি আমাকে কিছু স্নেহও করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে বরোদায় সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন উপলক্ষ্যে তিনি আমাকে দুই তিন খানি পত্রে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাইতে পারি নাই বলিয়া অদ্য আমার হৃদয় অত্যন্ত অনুতপ্ত আছে। তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্য্যে, কি দেশহিতে সর্ব্বত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছে—বস্তুত ইহাই বলশালিতার লক্ষণ। এই কারণে সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে প্রসন্নতা দেখিয়াছি—এই প্রসন্নতা তাঁহার জীবনের গভীরতা হইতে বিকীর্ণ। স্বাস্থ্য তাঁহার দেহে ও মনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল—তাঁহার কর্ম্মে ও মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে এই তাঁহার নিরাময় স্বাস্থ্য একটী প্রবল প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহার জীবনের সেই সদাপ্রসন্ন অক্লান্ত নির্ম্মলতা আমার স্মৃতিকে অধিকার করিয়া আছে। আমাদের দেশে তাঁহার আসনটি গ্রহণ করিবার আর দ্বিতীয় কেহ নাই। ইতি ১৬ই পৌষ ১৩১৬।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ

পদচিহ্ন

তেইশ

পরের দিন বিকালবেলা স্বর্ণভূষণ একটা সংবাদ পেলেন, তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। স্বর্ণভূষণের ছেলে—একমাত্র পুত্র ভোলানাথ ইস্কুল থেকে এসে সংবাদটা দিলে। গৌরীকান্তকে ইস্কুলে হেডমাস্টার তিরস্কার করেছেন, লাঞ্ছনা করেছেন।

ভোলানাথ গৌরীকান্তেরই বয়সী, কিন্তু গৌরীকান্তের থেকে অনেক নীচের ক্লাসে পড়ে। প্রকৃতিতেও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সে বললে, তোমাকে, ও-বাড়ির কীর্তিদাদাকে কাল 'হেণ্টাকেণ্টা' করেছিল, নমস্কার করে নি, না? তাই জন্মে হেডমাস্টার মীটিং ডেকে সব ছেলেদের সামনে খুব বকলে।

বকলে?

হ্যাঁ। খুব বকলে। বললে, খুব মুচ্ছুদ্দি হয়ে গেছ, না? তারপর ঠাট্টা করলে কবিতা লেখে ব'লে, আলাদা ফুটবল-টীম করেছে ব'লে। তারপর বললে, তোমার বাপ মারা গেছেন, তুমি নিশ্চয় মনে কর—তুমিই এখন একজন বাবু হয়েছ। বাবুর বেটাদের নিয়েই অস্থির, তুমি হয়েছ খোদবাবু! তারপরে ইস্কুলে নোটিস হয়ে গেল যে, ইস্কুলের সেক্রেটারি, মেম্বার, ফাউণ্ডার, মাস্টার, পণ্ডিত বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের দেখলেই প্রত্যেক ছেলেকে নমস্কার ক'রে সম্মান দেখাতে হবে।

স্বর্ণবাবু ঘন ঘন গোঁফে তা দিতে আরম্ভ করলেন। স্থূলবুদ্ধি পুত্রের প্রতি বিরক্তিতে তাঁর মন ভ'রে উঠল। গৌরীকান্তের অপমানে এত খুশি হয়েছে হতভাগা যে, ভাবতেও পারছে না তার নিজের অবস্থার কথা! কীর্তিচন্দ্রের কূটবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে, তার স্পর্ধার কথা ভেবে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। নবগ্রামের যে সম্প্রদায় তাদের কাছে মাথা নত করে নি কোনদিন, তাদের সন্তানদের শীলতা শিক্ষাদানের অজুহাতে প্রণাম করতে বাধ্য করছে, গোপীচন্দ্রের বংশের পদপ্রান্তে এখন থেকে প্রণত হওয়া অভ্যাস করাচ্ছে। রাধাকান্ত বিগত হয়েছেন, স্বর্ণবাবুরও বিলম্ব নাই, স্বর্ণবাবুর সমসাময়িক যাঁরা তাঁরাও সকলে কিছু দিনের মধ্যেই স্বাভাবিক নিয়মেই বিগত হবেন, তখন নবগ্রামের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিনা ক্ষোভে সহজ অভ্যাস-বশে বিনা দ্বন্দ্বে গোপীচন্দ্রের বংশাবলীর কাছে সবিনয় নমস্কার জানিয়ে নতি স্বীকার করবে।

চীৎকার শুনে প্রতিবেশিনীরা, যাঁরা অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা ছুটে এলেন। চেঁচামেচি শুনে বাবা সেখানে এসে ব্যাপার দেখে ছুটলেন ডাক্তারের সন্ধানে। মিনিট দশেকের মধ্যেই বাবা পাড়ার একজন ডাক্তারকে নিয়ে এলেন। ডাক্তার নানা রকম পরীক্ষা ক'রে দাদার মাথা থেকে পা পর্যন্ত নানা স্থানে ব্যাণ্ডেজ ও তাপ্পি মেরে, দুটো তিনটে ওষুধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন ও বাবাকে মৃদু তিরস্কার ক'রে তাঁর জন্যও একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখলেন। বাবা ছুটলেন ওষুধ আনতে, দাদা তখনও অজ্ঞান।

বোধ হয় ঘণ্টাখানেক বাদে দাদার জ্ঞান হ'ল। সে আচ্ছন্নের মতন আমাদের দেখতে দেখতে সেই অবস্থায় শুয়ে শুয়েই মাকে জড়িয়ে ধরল, মা পাশেই ব'সে ছিলেন।

আমরা তিন ভাইয়ে একটা বড় বিছানায় শুতুম। দাদার জন্যে তখন আলাদা বিছানা ক'রে দেওয়া হ'ল। মা তাকে নিয়ে রইলেন।

সেদিন আর আমাদের খাওয়া-দাওয়া নেই। বাবা একটা ঘরে শুয়ে আছেন, আমাদের ঘরে মা দাদাকে নিয়ে আছেন। তিনি কখনও তার পাশে শুয়ে পড়ছেন, কখনও বা উঠে বসছেন। ঘরের সামনেই একটা চওড়া ঢাকা বারান্দায় টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চি পাতা, সেখানে ব'সে আমরা পড়াশোনা করতুম—আমি আর অস্থির সেখানে ব'সে। বাড়িতে আরও দু-তিনটি মেয়ে থাকতেন, তাঁরাই ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনা করতে লাগলেন।

সন্ধ্যের সময় মা দাদাকে ছেড়ে উঠে সারাদিন বাদে আমাদের খাইয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিলেন। দাদার বিছানার অনতিদূরে বিছানা পেতে সেই সন্ধ্যে-রাত্তেই আমরা শুয়ে পড়লুম। মা-বাবা খেলেন কি না জানি না। আমরা শুয়ে পড়বার বোধ হয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মা এসে দাদার মাথার কাছে বসলেন, দাদা তখন, ঘুমে কি না জানি না, একেবারে অচেতন।

অনেক রাত্রে দাদার কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে গেল। শুনলুম, দাদা বলছে—তুমি আমায় মাসে পনেরোটা ক'রে টাকা দিও, তা হ'লেই আমার হবে।

সকালবেলা উঠে দাদা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আর ফিরল রাত্রি প্রায় সাড়ে নটায়। জিজ্ঞাসা করলুম, সারাদিন কোথায় ছিলে দাদা?

দাদা কম্পিতকণ্ঠে বললে, এক বন্ধুর বাড়িতে।

একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, এবার এখান থেকে সম্পর্ক উঠল রে!

বাপের মুখ দেখে ভোলানাথ একটু দ'মে গিয়েছিল। বাবা যে অসন্তুষ্ট হলেন কেন, সে তা বুঝতে পারলে না। সে চুপ ক'রে গেল। স্বর্ণবাবু ভ্রূকুটি ক'রে তাকিয়েছিলেন মাটির দিকে। দৃষ্টি তার উপর নেই বুঝতে পেরে ভোলা স'রে পড়ল ধীরে ধীরে। স্বর্ণবাবুর মনে পড়ল গত সন্ধ্যার কথা। তিনি এতে সাহায্য করেছেন কীর্তিচন্দ্রকে। গৌরীকান্ত কোন অপরাধ করে নি, অপরাধ তাঁর—একমাত্র তাঁর। কাল তিনি এ ব্যাপারে কীর্তিচন্দ্রকে সাহায্য করেছেন, তাঁর আর প্রতিবাদ করারও মুখ নাই, পথ নাই।

স্বর্ণভূষণো—স্বর্ণ-ভূ-ষ-ণো রয়েছ নাকি ?

বংশলোচনের কণ্ঠস্বর শুনে বিরক্ত হয়ে উঠলেন স্বর্ণবাবু। কীর্তিচন্দ্রদের এস্টেটের ম্যানেজারী পদ তাঁর গিয়েছে, কিন্তু তাঁর বড় ছেলে কীর্তিচন্দ্রের কলকাতা আপিসের সর্বময় কর্তা। কীর্তিচন্দ্রের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু। নিজেও নাকি কিছু কিছু কয়লা কেনা-বেচা করে। বর্তমানে কীর্তিচন্দ্রের ইন্‌সল্‌ভেন্সির মকদ্দমা উপলক্ষ্যে বিশেষ হিতৈষী হয়ে উঠেছেন। সবটাই অবশ্য তাঁর কূটবুদ্ধি নয়, বেশির ভাগটাই তাঁর আবেগময় নির্বুদ্ধিতার প্রেরণা; মনে করছেন, কীর্তিচন্দ্র তাঁকে যে সম্মান দেখাচ্ছেন, সেটা অকৃত্রিম এবং অতঃপর চিরস্থায়ী।

স্বর্ণভূষণ! নেই নাকি ?—বংশলোচন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন বোধ হয়।

এবার স্বর্ণবাবু আত্মস্থ হয়ে সাড়া দিলেন, এস, লচুকাকা এস।

এলাম। কিন্তু তুমি ধ্যান করছিলে নাকি ?

স্বর্ণবাবু হেসে বললেন, হ্যাঁ, ধ্যানই করছিলাম।

বংশলোচন হেসে ইঙ্গিত ক'রে বললেন, কার ?

স্বর্ণবাবু প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে ডাকলেন, চৈতন্য, তামাক দাও।

বংশলোচন ছাড়লেন না, আবার হেসে ইঙ্গিত ক'রে বললেন, কার ধ্যান করছিলে হে ?

ম্লান হেসে স্বর্ণবাবু বললেন, ধ্যান করছিলাম কৃত কর্মের, বর্তমান অবস্থার, ভবিষ্যৎ গতির। আর তো যাবার সময় হ'ল !

বংশলোচন অপ্রস্তুত হন না কখনও, তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই সূক্ষ্ম আঘাত দেওয়া বিষণ্ণ প্রসঙ্গান্তরকে প্রসন্নভাবেই গ্রহণ ক'রে সস্নেহে স্বর্ণবাবুর পিঠে হাত

বুলিয়ে বললেন, গোবিন্দ, গোবিন্দ! বল কি বাবা? আগে আমরা যাই, তবে তো তোমাদের যাবার সময় আসবে। আমরা থাকতে ও ভয় কেন?

স্বর্ণবাবু বললেন, যেতে আর ভয় কি? ভাবছিলাম, যাদের রেখে যাব তাদের কথা। তা সে কথা থাক্। এখন তোমার কথা বল। মহালে আদায়-পত্র কি রকম?

ভাল নয়। কালে কালে চাষা ব্যাটারা মাতব্বর হয়ে উঠছে। তার উপরে লেখাপড়া শিখছে দু-কলম, শিখে কামিজ গায়ে দিয়ে ফরফর ক'রে বোলচাল ঝাড়ছে। গোয়ালপাড়ায় নবনে চাষা, তুমি যাকে চাবুক মেরেছিলে হে, সে ব্যাটা তো একটা ঘোঁট পাকাবার তালে আছে। ব্যাটার ভাইটা বি. এ. পাস ক'রে ল পড়ছে। নবীন এখন চাদর গায়ে দিয়ে আসে হে। মাটিতে বসে না। বসতে মাদুর কিংবা কম্বল দিতে হয়। ব'লো না, ব'লো না স্বর্ণ। অর্ধেক খাজনা বাকি। নানা আবদার। বলে, নদীর পুল ভেঙেছে বাঁধিয়ে না দিলে দোব না। আমিও বলেছি—দিও না, আদালতে দেবে সুদসুদ্ধ। কালেক্টারির সময় ছেলেকে লিখলাম—টাকা পাঠাও, ছেলে টেলিগেরাম ক'রে টাকা পাঠালে, দিয়ে এলাম দাখিল ক'রে। কীর্তি শুনে বলে, আমাকে বললেন না কেন? আমি এখানে দিতাম টাকা, কলকাতায় ত্রিলোচনের কাছে নিতাম। ত্রিলোচন যে আমার কাছে অনেক টাকা পাবে। অনেক কয়লা বেচেছে আমার, দালালি পাওনা অনেক। ত্রিলোচনের মত দালালিতে ওস্তাদ নাকি কীর্তি দেখে নাই বলছিল। তেমনই নাকি আপিস-মাস্টার। ত্রিলোচন গাড়ি কিনেছে, মস্ত ওয়েলার ঘোড়া। কলকাতার রাস্তাতেও লোকে তাকিয়ে দেখে।

লচুকাকা ব'লেই চলেছিলেন, মধ্যপথে বাধা দিয়ে স্বর্ণবাবু নলটি হাতে তুলে দিয়ে বললেন, খাও। চৈতন্ত চাকর তামাক দিয়ে গিয়েছে, অভ্যাস ও কানুন অনুযায়ী নিঃশব্দে এসে নিঃশব্দেই বেরিয়ে গিয়েছে। বংশলোচন নলে টান দেবার অবসরে বোধ করি নিজের ছেলের সম্বন্ধে গল্প করার ত্রুটিটা বুঝতে পারলেন। বললেন, কীর্তি বলছিল তোমার ছেলের কথা। বলছিল, স্বর্ণকাকার ছেলেকে যদি আমার হাতে দেন, আমি পাকা লোক ক'রে দেব।

আবার একটু থেমে বললেন, এতদিন পরে দেখলাম, কীর্তি তোমাকে বুঝেছে। প্রাণ খুলে আমাকে বললে, হ্যাঁ, একটা মানুষের মত মানুষ স্বর্ণকাকা। আমি বললাম, জ্ঞান-চক্ষু খুলেছে তা হ'লে? বললে, হ্যাঁ, ভুলই বুঝেছিলাম

এতদিন। গোটা গ্রামের লোককেই দেখলাম, তারা সত্যিই আমাদের ভালবাসে। তারপর বললে, একটি লোক, বুঝলেন ঠাকুরদাদা, তিনি বেঁচে নেই, থাকলে আজ বিপদে পড়তে হ'ত। যুধিষ্ঠিরও মিথ্যে বলেছিলেন অর্জুনকে বাঁচাতে। কিন্তু তিনি বেঁচে থাকলে তাও মানতেন না। আমি বললাম, দেখ, বুঝে দেখ। অথচ সেকালে তোমরা তাকে বলতে মানুষের মত মানুষ! ভগবান বিচার করেন, বুঝলে স্বর্ণ, ভগবান বিচার করেন। রাধাকান্তের দম্ভ ভগবান সইবেন কেন?

অন্য সময় হ'লে রাধাকান্তের নিন্দায়, ভগবানের বিচারের তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় স্বর্ণবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠতেন, জীবনের ক্ষুদ্রতার গলিপথের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসত রাধাকান্তের দ্বারা আহত স্বার্থের ক্ষোভগুলি; এই আসরে তারা ভিড় জমিয়ে বসত নেশার আসরে নেশাখোরের মত। কিন্তু আজ তাঁর জীবনের গলিপথ থেকে তারা বের হতে অবকাশ পেলে না। জীবনের রাজপথে এক উদাসী যেন প্রাণখোলা সুরে গাইছে, সব মিছে রে, সব মিছে। সেই সুরে, সেই গানে সমস্ত জীবন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, ক্ষোভগুলি পর্যন্ত উদাস হয়ে পড়েছে।

বংশলোচনবাবু নলটি স্বর্ণবাবুর হাতে দিলেন, কিন্তু স্বর্ণবাবু খেলেন না, রেখে দিলেন এক পাশে। বংশলোচন বিস্মিত হয়ে বললেন, রেখে দিলে যে? খাও।

না, থাক্। তুমি খাবে তো খাও।

কি সর্বনাশ! তোমার হ'ল কি হে?

স্বর্ণবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, রাধাকান্তদার ছেলেটির কথা ভাবছি লচুকাকা।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বংশলোচন বললেন, শুনেছি, কালকের কথা শুনেছি সব আমি। কীর্তির ওখানে আজ সকালবেলাতেই ওই কথা উঠেছিল। যেমন বীজ, তেমনই চারা। অতি ডেঁপো ছোকরা। ধ্বজাপতাকা নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমায় একদিন কি বলেছিল জান? একটা দাঁত নড়ছিল, কষ্ট পাচ্ছিলাম, গাল ফুলেছিল। দেখে ভাল ছেলের মত মিষ্টি ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার অসুখ করেছে? বললাম, হ্যাঁ, দাঁত নড়ছে, বড়ই যন্ত্রণা পাচ্ছি। বললে, তুলিয়ে ফেলুন, নইলে যতদিন না উঠবে কষ্ট দেবে। এ

পর্যন্ত বেশ। বুঝেছ কি না! আমি বললাম, নড়ছে তো অনেকগুলি, কত তোলাব? আর দাঁত তুলিয়ে মেঠাই খাব কি ক'রে? আমাকে বলে কি না, সবগুলো তুলে ফেলে পুরো তু-পাটি দাঁত বাঁধিয়ে ফেলুন। বোঝ! বোঝ একবার আস্পর্ধা, ডেঁপামি! আমাকে বলে দাঁত বাঁধাতে! গোবিন্দ! গোবিন্দ! রাধে রাধে!

স্বর্ণবাবু চুপ ক'রে রইলেন, তাঁকে মানতে হ'ল, এটা গৌরীকান্তের অন্যায় হয়েছে। অস্পৃশ্য বস্তু কৃত্রিম দাঁত প'রে ছোকরা সাজতে বলাটা অবশ্যই শোভন হয় নি তার।

বংশলোচন ব'লেই গেলেন, এ সমস্তের প্রতিকার হবে এইবার। পবিত্র ইস্কুলের সেক্রেটারি তো! সে শুনে বললে, একা ওর দোষ কেন? গ্রামের ছেলেদের সবারই এসব দোষ আছে। তবে ওই ছেলেটি পাণ্ডা বটে। ইস্কুল থেকে এসবের প্রতিকার করতে হবে। সে আজ নিজে ইস্কুলে গিয়ে মাস্টারদের ব'লে এসেছে। আজ হেডমাস্টার বেশ কড়কে দিয়েছে বোধ হয়। শুনি নাই এখনও সব বৃত্তান্ত। চল না, যাবে একবার ওদিক দিয়ে?

না লচুকাকা, মাথা ধরেছে। তাই এমন ক'রে শুয়ে আছি।—হেসে উঠলেন স্বর্ণবাবু।

বংশলোচন বিস্মিত হলেন। বললেন, কি ব্যাপার বল তো?

কিছু না লচুকাকা।

বংশলোচন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে গেলেন। কীর্তিচন্দ্রের কাছে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে; স্বর্ণবাবুকে নিয়ে তিনি আসবেনই। কীর্তিচন্দ্র সত্যই স্বর্ণবাবুর উদারতায় মুগ্ধ হয়েছেন। স্বর্ণবাবুর সঙ্গে সমস্ত মিটমাট ক'রে একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক তিনি স্থাপন করতে চান। কিন্তু কোনক্রমেই তিনি নিজে স্বর্ণবাবুর কাছে যেতে সম্মত হতে পারছেন না।

* * *

সত্য কথা বলতে কি, পবিত্র কিন্তু ঠিক এই মনোভাব নিয়ে ইস্কুলে এ নিয়ম প্রচলন করে নাই। বরং একটা আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই এ নিয়ম প্রচলন করতে চেয়েছে। মানসিকতার দিক দিয়ে কীর্তিচন্দ্র থেকে অনেক পৃথক সে। কীর্তিচন্দ্র পেয়েছেন পিতার ব্যবসায়বুদ্ধি এবং মায়ের ক্রোধ; তার উপর সম্পদশালী পিতার সন্তান হিসাবে তিনি স্বাভাবিকভাবে

নিজে অর্জন করেছেন মাত্রাতিরিক্ত অসহিষ্ণুতা। কিন্তু পবিত্র পেয়েছে পিতার বিনয় এবং মিষ্ট প্রকৃতি, মিষ্ট ভাষা; তার সঙ্গে সম্পদশালীর পুত্র হিসাবে স্বাভাবিকভাবে নিজে অর্জন করেছে আরামপ্রিয়তা এবং বিলাস। তার সঙ্গে যুগের প্রভাবের ধারা থেকে আরও কিছু সে অর্জন করেছে, যে দিক দিয়ে কীর্তিচন্দ্র চিরদিন বিমুখ হয়ে ব'সে আছেন; অতি অল্পবয়সে লেখাপড়া ছেড়ে ব্যবসায়ের আবহাওয়ার মধ্যে থেকে কোনদিনই কীর্তিচন্দ্র দেশের আবেগমূলক কোন জীবনস্পন্দনের স্পর্শ গ্রহণ করেন নাই। পবিত্র কিন্তু এ স্পর্শ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। সাহিত্য, নাট্যশিল্প, সঙ্গীতচর্চার যে স্রোত বাংলা দেশে ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল, তার প্রতি পবিত্রের রুচি প্রগাঢ়। গ্রামে লাইব্রেরি করেছে, শৌখিন থিয়েটার-সম্প্রদায় স্থাপন করেছে, সঙ্গীত-চর্চার আসর তো অবিরাম চলছেই। এর সঙ্গে করেছে একটি সাহিত্য-সভা। মাসে তার একবার ক'রে অধিবেশন হয়। নবগ্রামের জীবনের এই দিকটার অধিনায়ক সে। এই অধিনায়কত্বের আকাঙ্ক্ষা তার বাল্যাবধিই প্রবল। প্রথম দিকে এতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কিশোর। কিন্তু কিশোর নবগ্রামের রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রায় অপসৃত হয়েছে। রাধাকান্তের শ্যালক রবির সঙ্গে সে-ও বিপ্লববাদী দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু পরে তাকে তারা ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর অমরচন্দ্রের তদ্বিরে সে সরকারী চাকরি পেয়ে এখানকার জীবনমঞ্চ থেকে অকালে প্রস্থান করেছে। কিশোর ছিল সুমধুরকণ্ঠ গায়ক, কবিতা রচনায় তার ছিল প্রতিভা, তার আদর্শবাদে বিপ্লবের উত্তাপ। সে চ'লে যাওয়ার পর থেকে পবিত্র বিপুল উৎসাহে তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সে নিয়ে আসবে নবগ্রামে দেশের শ্রেষ্ঠ রুচি, বেশে-ভূষায় সাহিত্যে-সঙ্গীতে নাট্যশিল্পে, মানুষের সমাজ-জীবনের আচারে ব্যবহারে। অবশ্য তার নিজের সাধ্যমত।

শৌখিন নাট্যশালা স্থাপন ক'রে সে তার নাম দিয়েছিল—'বন্দেমাতরম্ থিয়েটার'। তখনও থিয়েটার নাট্যশালা নাট্যমন্দির অথবা নিকেতন নাম গ্রহণ করে নাই। স্বদেশপ্রেম প্রচারই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু কিছুদিন পরেই ইস্কুলের পুরস্কার-বিতরণী উৎসব উপলক্ষ্যে তদানীন্তন বাঙালী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে নাট্যাভিনয় দেখাবার উদ্দেশ্যে নাট্যশালার নাম পরিবর্তন ক'রে দিলে। ড্রপসিনের উপরে লেখা 'বন্দেমাতরম্' শব্দটা মুছে সেখানে লিখে দেওয়া হ'ল

'সরস্বতী'। সাহেব অভিনয় দেখে খুশি হলেন। কিছুদিন পরেই পবিত্র হ'ল এখানকার প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েত; আরও কিছুদিন পর হ'ল অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। কিশোরের প্রতিষ্ঠিত দরিদ্র-ভাণ্ডারের সঙ্গে তার যোগাযোগ চিরদিনই ক্ষীণ, এর পর সে এটিকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। সেটি এখন চালায় গৌরীকান্ত। তার উপর সাহিত্য-সভায় গৌরীকান্ত কবিতা লিখে পাঠ করে, তার একটি ত্রুটির মধ্যে সে বেসুরের সন্ধান পেয়েছে। মধ্যে একদিন তার এক পার্শ্বচরের কাছে শুনেছে, তাদের সঙ্গীতের পরিত্যক্ত আসরে গৌরীকান্ত এসে টেবিল-হার্‌মোনিয়মটি বাজাতে চেষ্টা করে মধ্যে মধ্যে। এই সব কারণেই পবিত্র কিছু দিন ধ'রেই এই ছেলেটি সম্পর্কে আশঙ্কা পোষণ করছিল। গৌরীকান্ত কবিতা লেখে ব'লে তাকে সত্যই সে স্নেহ করে। তার উপর গৌরীকান্তের এই ঔদ্ধত্যের কাহিনী শুনে ক্ষুব্ধ হয়েই ইস্কুলে কথাটি হেডমাস্টারকে জানাতে গিয়েছিল, জানাবার সময় আলোচনা করতে গিয়ে মনে হ'ল, আদর্শবাদের দিক দিয়ে সমাজে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, যাঁরা জ্যেষ্ঠ, তাঁদের সম্মান করতে শেখানো শিক্ষায়তনের অবশ্যকর্তব্য, শিক্ষার মধ্যে ওটি একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। সেই কারণেই এই নিয়ম প্রচারিত হয়েছে ইস্কুলে। ইস্কুলের সেক্রেটারি, ইস্কুলের কমিটির মেম্বাররা, ফাউণ্ডারের প্রতিনিধি অবশ্যই শ্রেষ্ঠজন হিসাবে মাননীয় জন। এবং গ্রামস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁরা, তাঁরাও শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ হিসাবে মাননীয়।

বাস্তবক্ষেত্রে কার্যে কিন্তু এর প্রতিফলন হয়েছে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে। যে রূপটি প্রমাণ ক'রে দিয়েছে, স্বর্ণবাবু যা দেখেছেন এর মধ্যে, তা মিথ্যা নয়; এবং পবিত্র যা চেয়েছে, তার মধ্যে মঙ্গল আছে।

হেডমাস্টার প্রথমে গৌরীকান্তকে লাইব্রেরিতে ডাকলেন। প্রথমেই উপস্থিত করলেন তার বিরুদ্ধে গত সন্ধ্যার ঔদ্ধত্যের অভিযোগ।

গৌরীকান্ত অন্তরে অন্তরে একটা জিনিস অনুভব করত। এই ইস্কুলের শিক্ষকদের অধিকাংশের ব্যবহারের মধ্যে কোথায় যেন আছে অতি সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ কাঁটা। গ্রামের ছেলেদের, যারা সম্পন্ন ঘরের ছেলে তাদের, অনেকেই পড়াশুনায় অমনোযোগী, এমন কি স্থূলবুদ্ধি বললেও অত্যুক্তি হয় না, তাদের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের বিরাগ স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে যেন বিদ্বেষ আছে। মধ্যে মধ্যে তাদের স্পষ্ট মনে হয় যে, তাদের অভিভাবকেরা এই ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের

বিরোধী ব'লেই তাদের উপর শিক্ষকদের এই বিদ্বেষ। অনুমানটা তাদের অমূলক নয়। শিক্ষকেরা সকলেই প্রতিষ্ঠাতা-বংশের কাছে চাকরির জন্য কৃতজ্ঞ এবং তাঁদেরই তাঁরা মনিব ব'লে মনে করেন। এই শিক্ষিত-সম্প্রদায়টি আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায় হীন গ্রাম্য জমিদার ও অবস্থাবান সম্প্রদায়কে যে দৃষ্টিতে দেখেন, তার মধ্যে উপরে একটা সম্ভ্রমের আবরণ থাকলেও তার অন্তরালে আছে ঘৃণা।

হেডমাস্টার এঁদের ছেলের কাছে জমিদার-সম্প্রদায় সম্পর্কে কথা উঠলেই ব'লে থাকেন, 'ড্রোন্‌স'। জমিদারেরা হ'ল 'ড্রোন্‌স অব দি কান্ট্রি' (Drones of the country)। তারপর 'ড্রোন্‌স' কাকে বলে বুঝিয়ে দেন এবং ঘন ঘন এই সব ছেলেদের দিকে তাকান।

হেডপণ্ডিত মশায় সোজা কথায় বলেন, বাবুর ব্যাটা বাবু। প্রত্যেক শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে এক-একটি কিল মেরে থাকেন, শব্দরূপের অনুস্বার বিসর্গ ভুলের অপরাধে। অন্য জাতের ছেলেরাও অবশ্য সমান মার খায় ওই অপরাধে, সেখানে পক্ষপাত করেন না, কিন্তু ওই কথাটি উচ্চারণ করেন না।

দু-একজন ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু তারা সকলের সমবেত মনোভাবের বিরুদ্ধে কোন মতবাদ প্রকাশ করতে পারে না। শুধু একজন আছেন, যাঁকে গৌরীকান্তের ভাল লাগে, যিনি সকলের থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক এবং বাক্যে কর্মে অকুণ্ঠ নির্ভয়ে তাঁর পৃথক মত যিনি প্রকাশ ক'রে থাকেন। তিনি রতন-বাবু, এই ইস্কুলের থার্ড মাস্টার, অঙ্কের শিক্ষক।

গৌরীকান্তকে হেডমাস্টার প্রথমটা লাইব্রেরিতেই ডেকেছিলেন। সে সময়টা রতনবাবু এবং হেডপণ্ডিতের অবসরের ঘণ্টা। রতনবাবু লাইব্রেরির বই ঝাড়ছিলেন, হেডপণ্ডিত একটি শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণের শ্লোক রচনা করছিলেন।

গৌরীকান্তের বিরুদ্ধে হেডমাস্টার মশায়ের মনেও কয়েকটা অভিযোগ জমা হয়ে ছিল। তার মধ্যে প্রধান অভিযোগ—গৌরীকান্ত ইস্কুলের ফুটবল-টীমের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি ফুটবল-টীম স্থাপন করেছে গ্রামের ছাত্র এবং আরও কতকগুলি অকালে-ইস্কুলত্যাগী গ্রাম্য ছেলেদের নিয়ে। এই টীম স্থাপনের মধ্যেও আছে ওই গ্রাম্য বিরোধের প্রভাব। গোপীচন্দ্রের দৌহিত্র ইস্কুল-টীমের ক্যাপ্টেন হিসাবে গ্রামের এই স্কুলত্যাগী ফুটবলপ্রিয় কয়েকটি ছেলেকে স্কুলের টীম থেকে বার ক'রে দিয়েছিল। তাদের অপমানে ক্ষুব্ধ হয়েই গৌরীকান্ত এবং

আর কয়েকজনে মিলে গ্রামের ফুটবল-টীম স্থাপন করেছে। এ নিয়ে ইস্কুলের দলের সঙ্গে তাদের বিরোধ এবং মনোমালিন্য লেগেই আছে। গৌরীকান্তদেরই একটি সমতল বিস্তীর্ণ প'ড়ো মাঠে তাদের ফুটবল-গ্রাউণ্ড। গৌরীকান্তই তাদের ক্যাপ্টেন। হেডমাস্টার মনে করেন, স্কুল-প্রতিষ্ঠাতাদের বিরোধী-পক্ষের অন্যতম প্রধানের পুত্র গৌরীকান্তের এটা একটা বিদ্রোহ। দ্বিতীয় অভিযোগ—গৌরীকান্ত যে দরিদ্র-ভাণ্ডার পরিচালনা করে, তার আদর্শ ও মন্ত্র হিসাবে বিবেকানন্দের যে সকল বাণী কাগজে লিখে ধ্বজাপতাকার মত ঘাড়ে ক'রে নিয়ে ফেরে, সেগুলি রাজদ্রোহিতার পথে প্রবেশের প্রথম তোরণ। তৃতীয় অভিযোগ—ছেলেটার বাজে বই অর্থাৎ বাংলা কাব্য-উপন্যাস পড়ার ঝোঁক এবং কবিতা লেখার ঝোঁক এত বেশি যে, পড়াশুনায় তার অবনতি ঘটেছে। স্কুলে ভর্তি হওয়া অবধি গৌরীকান্ত বরাবর ফার্স্ট হয়ে এসেছে, কিন্তু গতবার হয়েছে তৃতীয়। এই সমস্ত নিয়ে একটি জটিল এবং তিক্ত মন নিয়েই তিনি তাকে রূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলেন, তুমি কাল স্বর্ণবাবুকে এবং কীর্তিবাবুকে অপমান করেছ কেন?

গৌরীকান্ত ভাবে নাই যে, ব্যাপারটা স্কুল পর্যন্ত আসবে। সে চমকে উঠল। ব্যাপারটায় সে যে আঘাত পেয়েছিল, সে আঘাতের স্মৃতিও তার মনে নূতন ক'রে জেগে উঠল।

হেডমাস্টার আবার প্রশ্ন করলেন, কেন? কেন? কেন? You speak out। বল। তারপরই তিনি ব'লে বসলেন, তুমি নিজে বাবু হয়েছ, নবগ্রামের একজন বাবু! বাবা ম'রে গিয়ে তুমি নিজেই বাবু হয়েছ ভেবেছ?

গৌরীকান্ত আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলে না, মর্মান্তিক ক্ষোভে বেদনায় সে কেঁদে ফেললে, মুখ দিয়ে কোন শব্দ সে করলে না, কিন্তু দুই চোখ থেকে জলের ধারা গড়িয়ে এল।

হেডপণ্ডিত বললেন, রাজপুত্রেরা প্রণাম জানে না; কাঁদছ বাবা, তা মাথা নীচু ক'রেই কাঁদ।

রতনবাবু এগিয়ে এসে হেডমাস্টারের পাশে দাঁড়ালেন, ব্যাপারটা ওর কাছে শুনলে হ'ত না?

হেডমাস্টার মুখে তুলে বিরক্তিভরেই তাঁর দিকে সপ্রশ্ন ভঙ্গীতে তাকালেন। রতনবাবু বললেন, ওকে বলবার ফুরসৎ দিন।

হেডমাস্টার বললেন, কি বলেছ কাল তুমি স্বর্ণবাবুকে আর কীর্তিবাবুকে ?

রতনবাবু বললেন, বল, তুমি বল। সত্য কথা বলবে।

গৌরীকান্ত চোখের জল মুছলে, তারপর ধীরে ধীরে বললে, কাল সন্ধ্যেবেলা ফুটবল খেলে ফেরার পথে মহাপীঠে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। সেখানে—। সে ব'লে গেল আনুপূর্বিক ঘটনা। তারপর বললে, কীর্তিবাবুর রাগ দেখে সকলে ভয়ে স'রে গেল, আমি যাই নি। কেন যাব ? হঠাৎ তিনি বললেন, এতটুকু ছেলে তুমি, এসব কি দাঁড়িয়ে শুনছ ? সকলেই শুনছিল, আমিও শুনছিলাম। তাঁরা খুব চেঁচিয়েই কথা বলছিলেন। দূরে দাঁড়ালেও শোনা যায়। তারপর বললেন—। স্তব্ধ হয়ে গেল গৌরীকান্ত। নিজেকে আবার সামলে নিয়ে বললে, আমার বাবার নাম ক'রে স্বর্ণকাকা বললেন, তার ছেলে ও। ও শুনবে না ? কীর্তিচন্দ্রবাবু বললেন, হ্যাঁ, এখানে মাতব্বরের পুত্র মাতব্বরই হয়ে থাকে।

হেডপণ্ডিত বললেন, তিনি সত্যিই বলেছেন বাবা। মুষলং কুলনাশনং— কথাটা মনেই করে না এখানকার মানুষ। ওরে বাবা, আগুন নিবে গেলে কুলকাষ্ঠ অঙ্গারে পরিণত হয়, তখন সে যদি বলে—আমিই অগ্নি, তা হ'লে সে সমাজের মুখ কালিমাখা হয়ে যায়।

রতনবাবু মৃদুস্বরে বললেন, ওকে কথা বলতে দিন পণ্ডিতমশায়।

বল বাবা, বল।—ব'লে হেসে পণ্ডিতমশায় আবার শ্লোক রচনায় মন দিলেন।

গৌরীকান্ত আবার বললে, কীর্তিবাবু আমাকে এর পর বললেন, ভদ্রতা জান না তুমি ? নমস্কার করতে জান না ? আমি স্বর্ণকাকাকে প্রণাম করলাম, কিন্তু কীর্তিচন্দ্রবাবু সম্পর্কে ভাইপো হন ব'লে প্রণাম করতে পারলাম না। সেই কথা স্বর্ণকাকাকে বলবামাত্র তিনি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। আমি চ'লে এলাম।

হেডমাস্টার চুপ ক'রে রইলেন। রতনবাবু বললেন, হেডমাস্টার মশায় কায়স্থ, আমি সদ্‌গোপ; কিন্তু আমাদের তো তোমরা নমস্কার ক'রে থাক। কীর্তিবাবু ব্রাহ্মণ, বয়সে তোমার চেয়ে অনেক বড়, মাননীয় ব্যক্তি।

হেডপণ্ডিত বললেন, ওরে বাবা, সূর্য-চন্দ্র বৃহস্পতির শিষ্য, কিন্তু সূর্য-চন্দ্রের রাজসম্মান বৃহস্পতিকে মেনে চলতে হয়। গাঁ সম্পর্কে মুচী মিন্‌সে মামা হয়,

তা ব'লে মুচীকে প্রণাম করবি? না তুই ভাগ্নে ব'লে মুচী তোকে প্রণাম করবে না?

হেডমাস্টার বললেন, পণ্ডিত মশায়, আপনি দেখুন তো, আমাদের কেরানী-বাবু কোথায় গেলেন!

পণ্ডিত মশায় বুঝলেন, কথাটা মাস্টার মশায়ের মনোমত হয় নাই। তিনি উঠলেন, উঠতে উঠতে বললেন, ওরে বাবা, তোদের ভালর জন্যেই বলি। বুঝলি, ওদের কাছে মাথা নোয়ালে ওরাই হবেন তোদের মাথার আড়াল। হিমালয়ের কাছে মাথা নোয়ালে হিমালয়ের মান বাড়ে না, কিন্তু যে মাথা নোয়ায় সে ঝড়-ঝাপটা থেকে বাঁচে।

পণ্ডিত চ'লে যেতেই হেডমাস্টার বললেন, তুমি ক্ষমা চেয়ে আসবে। বলবে, নমস্কার না করা তোমার অন্যায় হয়েছে।

গৌরীকান্ত বললে, এখানে নমস্কার করে প্রজারা জমিদারকে, গরিব বড়লোককে আমরা সম্বন্ধ ধ'রে প্রণাম করি। ক্ষমা চাইতে আমি পারব না।

হেডমাস্টার বললেন, প্রত্যেক ছেলেকে নমস্কার করতে হবে।

গৌরীকান্ত বললে, সবাই যখন করবে, তখন করব। তখন না করলে ক্ষমা চাইব।

হেডমাস্টারের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল, তিনি বললেন, I know, I know, তুমি গোল্লায় যেতে বসেছ। তোমার, তোমার—তুমি গানের আড্ডায় গিয়ে হার্মোনিয়ম বাজাও? উত্তর দাও।

দু দিন বাজিয়েছিলাম।

কেন? Why?

বাজিয়ে দেখছিলাম কেমন ক'রে বাজে।

I see, I see, কেমন ক'রে বাজে! এর পরে দেখবে, নেশা ক'রে কেমন লাগে! I see।

গৌরীকান্ত চুপ ক'রে রইল। তার চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে, চোখ মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে, কানের পাশ থেকে আগুনের হল্কা ছুটছে। উত্তর না করলেও হেডমাস্টার তার মুখ দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি অভিযোগের পর অভিযোগগুলি রুষ্ট কণ্ঠে উপস্থাপিত করলেন। গ্রামের ছেলেদের নিয়ে দল পাকাও তুমি! ফুটবল-টীম করেছ! ঝগড়া করবার জন্যে! Undisciplined

আমি চ'লে যাচ্ছি বেলগেছের ভেটারিনারি কলেজে পড়তে। সেখান থেকে পাস ক'রে বেরিয়ে চাকরি নিয়ে চ'লে যাব বিদেশে, এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল।

অভিমানে তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। দাদার কথা শুনে আমি ও অস্থির কাঁদতে লাগলুম। অনেকক্ষণ পরে সেইরকম ধরা-ধরা গলায় দাদা বললে, মা রইল, দেখিস।

এর পরের অংশটুকুর সঙ্গে যদিও বর্তমান কাহিনীর সম্পর্ক কম, তবুও সেটুকু এইখানেই শেষ ক'রে রাখি।

দাদা প্রতিদিনই বাবা ঘুম থেকে ওঠবার আগেই বেরিয়ে যায় আর ফেরে রাত্রে। বাবাও তার কোন খোঁজ করেন না, শুধু মা আসেন তার সঙ্গে কথা বলতে। মায়ে-ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দায় ব'সে কি সব কথাবার্তা হয় তা বুঝতে পারি না, দাদা ঘরে ফেরবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ি। এই কয়েকদিনের মধ্যে সে যেন আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে চ'লে গেল। মনের মধ্যে নিয়তই একটা খোঁচা বাজতে লাগল, দাদা চ'লে যাবে, দাদা পর হয়ে যাবে, সে আমাদের ভুলে যাবে।

এই রকম দিনকয়েক চলবার পর একদিন বাবা আপিসে বেরিয়ে যাবার কিছু পরেই দাদা বাড়িতে এসে স্নান ক'রে খেয়ে একটা বাক্সতে নিজের জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে মাকে প্রণাম ক'রে ভাড়াটে গাড়ি চ'ড়ে চ'লে গেল।

তারপরে তিন বছরের মধ্যে তিন মাস সে বাড়ি থাকে-নি। ওখান থেকে পাস ক'রে সে চ'লে গেল বিদেশে চাকরি নিয়ে। সেখানে না খেয়ে একটি একটি ক'রে পয়সা জমিয়ে সে বিলেতে চ'লে গেল। অবিশ্যি বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে বাবাই ছিলেন তার প্রধান সহায়। যা হোক, ইংলণ্ডে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে আমেরিকায় গিয়ে অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে পড়াশোনা ক'রে মানুষের ডাক্তার হয়ে আজ সমারোহে সেখানে সে বাস করছে। সেই থেকে বাড়ির সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, আজও সে বাড়ি ফেরে-নি।

বাবা মনে করেছিলেন, ছেলেকে নিজের মনের মতন ক'রে তৈরি করবেন, অবিশ্যি বাবার পক্ষে সে কথা ভাবা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বাবার পেছনে আর একজন বড়বাবা অদৃশ্যে ব'সে সকল বাবারই যে জীবন নিয়ন্ত্রণ করছেন, শাসন করবার সময় অনেক বাবারই সে কথা স্মরণ থাকে না। তার ফলে বাবা হারালেন সন্তান, আর আমরা যা হারালুম, তা প্রকাশের নয়।

unruly প্রকৃতি হয়েছে তোমার! That দরিদ্র-ভাণ্ডার! Those slogans! আঁ্যা, বোমা-পিস্তলের দল করবে এর পর! I know, I remember your maternal uncle—that রবিমামা! কবিতা লেখ, নাটক নভেল পড়! Class-এ তুমি এবার থার্ড হয়েছ। I know, আসছে বছর তুমি promotion পাবে না। I know। পিতামহ জমি ক'রে গিয়েছে, সামান্য জমিদারি ক'রে গিয়েছে, বাপ ব'সে খেয়েছে; like a drone তুমিও তাই খাবে। I know।

গৌরীকান্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রতনবাবু বলিলেন, গৌরী, তুমি কীর্তিবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে এস।

না সার্। আমি অন্যায় করি নি, আমি পারব না।

হেডমাস্টার বললেন, মাস্টার মশাই, প্রত্যেক ক্লাসে ব'লে দিন, তিনটের পর last period-এ হলে মীটিং আছে। তারপর গৌরীকান্তের দিকে চেয়ে বললেন, You can go।

গৌরীকান্ত চ'লে গেল।

শেষ ঘণ্টায় মীটিং হল। প্রথমেই ঘোষণা করা হ'ল, নূতন নীতিশিক্ষার কথা। বিধি প্রচলিত হ'ল—প্রত্যেক ছেলেকে বিনয়ী হতে হবে, জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠকে সম্মান করতে শিখতে হবে, নমস্কার জানাতে হবে। তারপর ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ডাকলেন গৌরীকান্তকে। বললেন, লুক অ্যাট দিস্ বয় গৌরীকান্ত। স্কুলে ফার্স্ট হ'ত, এবার হয়েছে থার্ড। গোয়িং ডাউন এভ্রি ইয়ার। পড়াশুনায় বিসর্জন দিয়ে কবিতা লেখে, নাটক পড়ে, নভেল পড়ে, হার্মোনিয়ম বাজানো শিখতে যায়। এর কিছুদিন পর হয়তো থিয়েটারে ঢুকবে।

কোনক্রমেই তিনি দরিদ্র-ভাণ্ডারের কথাটা বলতে পারলেন না। বার বার ইচ্ছা হ'লেও, কি জানি কেন, নিজের অন্তর থেকে বাধা পেলেন। ভয়ও হ'ল, ছেলেদের কাছে বোমা পিস্তল, দরিদ্র-ভাণ্ডার, দেশ, স্বাধীনতা শব্দগুলি উচ্চারণ করলে ফল হবে বিপরীত। তিনি যেন মনে মনে অনুভব করেন, সমস্ত দেশে এই সুর, এই ধারা, এই আদর্শ মাটির তলার অঙ্কুরের মত উদ্গত হচ্ছে, সে মাটির তলদেশ হ'ল ভবিষ্যতের মানুষ—এই ছেলেদের অন্তর্লোক; চাষীর মত মাটিতে হাত দিয়ে অঙ্কুরের ঠেলা তিনি বুঝতে পারছেন। একে ঠেকানো হয়তো

অসম্ভব। দেশের সঙ্গে সঙ্গে নবগ্রামেও তার সাড়া আসছে; আসছে কি, এসেছে। এখানকার সব রীতিনীতি নিয়মকানুন ভেঙে দিয়ে ওই সুর জাগবে।

হঠাৎ তিনি গৌরীকান্তের দিকে তাকিয়ে চকিত হয়ে উঠলেন অকারণে। এই আনবে নাকি?

তিনি আবার একবার নূতন নিয়ম ঘোষণা ক'রে স্কুলের ছুটি দিয়ে দিলেন। স্কুলের সামনেই কমিশনারের নামে প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুন্দর সুদৃশ্য বাড়িটি। এক পাশে ডিস্পেন্সারি, অন্য পাশের ঘরগুলি মাননীয় অতিথিদের জন্য সাজানো আছে, পবিত্রবাবু এখানে প্রায়ই আরাম করে, সাহিত্য-চর্চা করে। সে ছুটির ঘণ্টা পড়তেই গেস্ট-হাউসের ফটকে এসে দাঁড়াল—আজকে শীলতা শিক্ষার ফল বোঝবার জন্যে। ছেলের দল নমস্কার করতে লাগল। শতাধিক ছেলে নমস্কার করছে। স্বর্ণবাবুর ছেলে ভোলাও নমস্কার করলে। সর্বশেষে চার-পাঁচটি ছেলের সঙ্গে যাচ্ছিল গৌরীকান্ত। সেও নমস্কার করলে।

পবিত্র অন্যমনস্কভাবে সিগারেটসুদ্ধ হাতটি তুলে রেখে প্রতিনমস্কার জানালে।

ভাল হয়েছে। চমৎকার লাগল। শীলতাই যদি না শিখলে ছেলেরা, তবে শিখলে কি! চোখ জুড়িয়ে গেল, মন খুশিতে ভ'রে উঠল।

* * *

স্বর্ণবাবু অভিভূতের মত ব'সে ছিলেন।

চাকর চৈতন্য এসে ফরাশের এক প্রান্তে ধুতি জামা ছড়ি নামিয়ে রেখে বললে, মায়ের স্থানে যাবেন না? নোটন এসে ব'সে আছে।

চকিত হয়ে স্বর্ণবাবু পিছন দিকের খোলা দরজার দিকে তাকালেন। চৈতন্য বললে, বেলা আর নাই বললেই হয়। কথাটা বিচিত্র অর্থে স্বর্ণবাবুর মনে আঘাত করলে। একটু হেসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি উঠলেন। চৈতন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তিনি কাপড় বদলাতে বদলাতে হাসিমুখে চৈতন্যের কথাটাই আপনার মনে আউড়ে গেলেন।

জামা গায়ে দিচ্ছেন, এমন সময় এসে দাঁড়াল একখানা গাড়ি। কীর্তিচন্দ্র বাইরে থেকে ডাকলেন, স্বর্ণকাকা রয়েছেন নাকি?

স্বর্ণবাবু বেরিয়ে এলেন। কীর্তিবাবু বললেন, মায়ের ওখানে যাবেন না? আসুন, একসঙ্গেই যাওয়া যাক।

গাড়ির ভিতর থেকে বংশলোচন ডাকলেন, এস এস। গাড়িতে গ্রামটা পাক দিয়ে মায়ের ওখানে যাব। তোমার মাথা ধরেছে, সেরে যাবে।

স্বর্ণবাবু জামাকাপড় প'রে বাইরে যাবার জন্তে তৈরি হয়েছিলেন, প্রত্যাখান করবার কোন অজুহাত পেলেন না।

কীর্তিবাবু হঠাৎ ডাকলেন, ভোলানাথ, এস এস, শোন।

ভোলানাথ পাশ কাটিয়ে আড়াল দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল, কীর্তিচন্দ্র তাকে দেখতে পেয়েছেন। ভোলানাথ এসে কোনক্রমে একটি নমস্কার ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়াল।

বংশলোচন বললে, বাঃ বাঃ, মানিক ছেলে, এই তো—এই তো চাই।

স্বর্ণবাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন, ভোলা নমস্কার জানাল কাকে?

কীর্তিবাবু সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, তোমাকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাব। বাবাকে ব'লো। দাদার কাছে ব্যবসা শিখবে। চল, তুমিও চল, মহাপীঠে যাবে।

স্বর্ণবাবু বললেন, না। ও থাক্। যা, তুই বাড়ির ভেতরে যা। শোন্, একবার গৌরীকান্তকে ডাকবি। সন্ধ্যের পর আসতে বলবি।

বংশলোচন বললেন, কেন? তাকে কি কাজ? ছেলেকে ওর সঙ্গে মিশতে দিও না। আমার মত বৃদ্ধকে বলে, দাঁত বাঁধিয়ে ফেলুন! রাধে রাধে!

স্বর্ণবাবু বললেন, কাল সে আমাকে মহাপীঠে প্রণাম করেছিল। কিন্তু আমি তাকে আশীর্বাদ করি নি।

কীর্তিচন্দ্র গম্ভীর হয়ে গেলেন।

হঠাৎ স্বর্ণবাবু বললেন, তোমরা যাও কীর্তি। অম্বল হয়েছে, মাথাধরাটা বোধ হয় সেইজন্তে। হেঁটে গেলে একটু হজমে সাহায্য হবে।

কীর্তিচন্দ্র গাড়িতে উঠলেন, বললেন, তা হ'লে আমরা যাই।

বংশলোচন বললেন, গাড়িতেই এস হে, গাড়িতেই এস। ফিরে না হয় খানিকটা ডন-বৈঠকি করবে, না হয় মায়ের নামে কারণ দু পাত্র বেশিই খাবে। সুধা সুধা! সুধা খেলে মানুষ অমর হয়, তোমার আর অম্বলের চোঁয়া ঢেকুর যাবে না!

কীর্তিচন্দ্র বললেন কোচোয়ানকে, হাঁকাও।

গাড়ি চ'লে গেল।

নোটন এসে দাঁড়াল। স্বর্ণবাবু বললেন, দরকার নাই। বাড়ি যা তুই।

একাই বেরিয়ে গেলেন তিনি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মহাপীঠে প্রণাম ক'রে ফিরবার পথে তিনি মাঠের পথ ছেড়ে গ্রামের পথ ধরলেন। ফিরবার পথে নিজেই তিনি গৌরীকান্তের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন। কতদিন তিনি রাধাকান্তের বৈঠকখানায় যান নি! অনেক দিন। কত কথা মনে পড়ছে! কালও তাঁর মনে রাধাকান্তের প্রতি বিদ্বেষ ছিল। আজ আর নাই। আজ মনে হচ্ছে, রাধাকান্ত বেঁচে থাকলে আজ তিনি সমব্যথার ব্যথী পেতেন। কেউ বুঝলে না। কি হ'ল আজ, সে কথা কেউ বুঝলে না।

হঠাৎ অনেকগুলি আলোর ছটা চোখে লাগতেই তাঁর চমক ভাঙল। বাজারের পথে ঢুকে পড়েছেন তিনি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলেন। আজকাল বাজারের পথে হাঁটতে কেমন যেন সঙ্কোচ অনুভব করেন তিনি। সে সম্মান আর তাঁর নাই। লোকে নমস্কার এখনও জানায়, সকলেই জানায়, তবু তার ভিতরটায় যেন আসল বস্তুটা নাই ব'লেই মনে হয়। কিন্তু আর উপায় নাই। কোন গলি-পথে ঢোকা উচিত হবে না। সাপের ভয় আছে, আর একা তাঁকে গলি-পথে দেখলে লোকে নানা সন্দেহ করবে।

বাজারে দোকানে দোকানে গালগল্প চলছে। হাসি খুশি, গান বাজনা তর্ক। মাথা হেঁট ক'রে হনহন ক'রে চলেছিলেন তিনি, যথাসম্ভব লোকজনের চোখ এড়িয়ে। হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়াতে হ'ল তাঁকে। কয়েকখানা গরুর গাড়ি রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। যাবার পথ সঙ্কীর্ণ। তিনি বিরক্তিভরে সামনের দোকানের দিকে তাকালেন, দোকানদারকে ডেকে গাড়োয়ানদের গাড়ি সরিয়ে নেবার জন্যে বলবেন। দোকানটি মণি দত্তের। দোকানে জটলা চলছে, কাঁধে চাদর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে গোয়ালপাড়ার নবীন; চন্দ্র গড়াঞীকে খুব উল্লসিত বোধ হচ্ছে। কথা বলছে মণি দত্ত, রাধাকান্তবাবু মোটামুটি লোক ভাল ছিল। তার ছেলের এ অপমানটা ঠিক হয় নি। ভগবানের বিচারে একটু ভুল হয়েছে। ওটা স্বর্ণবাবুর ছেলের, সরকারবাবুদের কারও ছেলের হ'লেই ঠিক হ'ত।

চন্দ্র গড়াঞী বললে, দত্তদাদা, দু পুরুষ আগে তোমাদের দত্তকর্তা বাবুদের

মাথা ঠেকিয়ে পেনাম করে নাই ব'লে বাবুরা জোর করে চাপরাসী দিয়ে মাটিতে মাথা ঠুকে দিয়েছিল, দত্তকত্তার কপালে কাচ ফুটে গিয়েছিল। বাবুদের মধ্যে রাধাকান্তর বাবাও ছিল শুনেছি। তবে আর ভগবানের বিচারে ভুল বলছ কেনে? ও ঠিক বিচার দাদা, ও ঠিক বিচার হয়েছে। তা 'পরে, এখন তো সব বাবুর বেটাকেই পেনাম করতে হবে গো—স্বর্ণবাবু সরকারবাবু—সব সব!

নবীন বললে, বুঝলে, রাধাকান্তবাবুর 'বোঠকখানাতেই' একদিন লচুবাবু আর স্বর্ণবাবুর যা রাগ আমার ওপর! ওঃ! সে চরম। দোষ কি? না, হাত জোড় ক'রে পেনাম করেছিলাম, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে পেনাম করি নাই; পায়ের ধূলো নিই নাই। 'যখন তখন করে পাপ, সময় পেলেই ফলে পাপ। পাপ ছাড়েন না, আপন বাপ।' হুঁ-হুঁ বাবা! বুঝলে, আমার ভাইটাকে বলছি, মাস্টারি কর্, নয় তো ল পাস ক'রে কীর্তিবাবুর বাড়ির ম্যানেজারি নে। তখন বুঝলে কিনা, সব বাবুর বেটাকে সেলাম বাজাতে হবে।

স্বর্ণবাবুর চোখের সামনে সব যেন দুলতে লাগল। তিনি কোন রকমে চোরের মত ওই সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্য দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে একটা অন্ধকার গলি-পথ ধ'রে বাড়ির দিকে প্রায় ছুটতে লাগলেন। মনে হচ্ছে, তিনি যেন একটা উঁচু জায়গা থেকে নীচের দিকে প'ড়ে যাচ্ছেন। সর্বাঙ্গ শিরশির করছে তাঁর। বাড়ি এসে তিনি হনহন ক'রে উঠে গেলেন একেবারে ছাদের উপর। অভয়া পিছন পিছন এসে সবিস্ময়ে বললেন, সন্ধ্যেবেলা ছাদে এলে কেন? কোথাও আগুন লেগেছে নাকি?

না। কিছু হয় নি। চৈতনকে ডেকে দাও। এখানেই একটা মাদুর আর বালিশ দিয়ে যাবে আমাকে। একটু গড়াব। আর তর্পণের কারণ কোশাকুশী সব এখানে এনে দাও। জায়গা এখানেই কর।

পরদিন সকালেই নবগ্রাম উত্তেজনায় ভ'রে গেল।

স্বর্ণবাবু রাত্রে কখন ছাদ থেকে উল্টে নীচে প'ড়ে গিয়েছেন। একা শুয়েছিলেন ছাদে। কখন কি ভাবে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে, কেউ জানতে পারে নাই। সকালে দেখা গিয়েছে, রক্তাক্ত দেহে তিনি প'ড়ে আছেন সান বাঁধানো উঠানের উপর। ক্রমশ

তারাশঙ্কর

ভাবী বিরহ

চন্দ্র-তারা-চিহ্নহারা বদ্ধ গৃহ অন্ধকার।
নাহি বুঝি রে আজি উজিরে-আজম মছলন্দ আর ॥
চেরাগে আর তৈল নাহি
ঘুচিয়া গেল শাহানশাহী,
থামিয়া গেল শেখানো বুলি চাচাতুয়া ও চন্দনার ॥
গেল যে থামি কাউন্সিলে
সকল লীগ-কলীগ মিলে
মত্ত যত নৃত্য-রত, নাচানো চারু চন্দ্রহার ॥
কলুটোলা যে উঠিল টলি
হায় কি হ'ল, কি হ'ল বলি,
কলাবাগানে ধ্বনিল ধুয়া—ক্যা হুয়া ক্যা ক্যা ক্রন্দনার ॥
সে ধ্বনি শুনি সকলে কাঁদে
ওয়াজিরা ও নাজিমাবাদে,
কেমনে খানা হইবে আনা কারখানা যে বন্ধ-দ্বার ॥
পড়িল চাল, নিভিল চুলা,
থানায় কাঁদে শৃঙ্গীগুলা,
স্কন্ধোপরি লোহার টুপি ছুটিছে দোহা-খন্দকার ॥
মাথায় হাত একেকটি যে,
মধুপ বসি সাপ্লাইজে,
ফুলের 'পরে বসিয়া ফুলে লুটেছে মকরন্দ তার ॥
আপন জনে হতেছে পর,
কি হবে ভাবি অতঃপর,
কি ছাই হ'ল মিছাই শুধু দ্বন্দ্ব 'পরে দ্বন্দ্ব সার ॥
কত না ফুলে ভরিল মিছা
আসমানেরি গুল-বাগিচা,
শেষটা কিনা ওষ্ঠাধরে কোষ্টা-পচা-গন্ধ-ভার !
একে ও একে ছাড়িছে ডেরা,
ভাগিছে ভাই-বেরাদারেরা,
সালারে-আলা সালারে-সুবা পালা রে গোয়ালন্দ-পার ॥

শ্রীনিবিড়ানন্দ

সংবাদ-সাহিত্য

"আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু এখন ওগো কর্ণধার।
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক ফিরব না গো আর॥
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গনি
ওগো কর্ণধার—
এখন মাভৈঃ বলি' ভাসাই তরী দাও গো করি পার॥"

আমাদের যাত্রা শুরু হইয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, তুফান উঠিয়াছে; কিন্তু কর্ণধার কোথায়? আমরা কাহার জয়ধ্বনি দিয়া বিপদ-বাধা গণনা না করিয়া মাভৈঃ বলিয়া তরণী ভাসাইব? দীর্ঘকালের সাধনায় অবস্থা অনুকূল হইয়াছে। মৃত্যুভয়, কারাবন্ধন, শাসন-নিপীড়ন অতিক্রম করিয়া আমরা ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত চরণে স্বাধীনতা-বৈতরণীর তীরে উপস্থিত হইয়াছি। তরীও প্রস্তুত, কিন্তু কর্ণধার কই?

* * *

বাংলা দেশের কথা বলিতেছি। সারা ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমরা যখন প্রথম অভিযান করিয়াছিলাম, তখন অন্য কাহারও মোহনিদ্রা ভাঙে নাই। বাঙালী রামমোহন নব-জাগরণের প্রথম শঙ্খধ্বনি করিয়া ভারতবর্ষকে আহ্বান করিলেন, তন্দ্রাজড়িমা ভাঙিয়া যাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করিলেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমাপ্তিকাল পর্যন্ত এই মুক্তি-মিছিলের জের টানিয়া চলিলেন, তাঁহারাও প্রায় সকলেই এই বাংলা দেশের সন্তান। তখন যাত্রীরও অভাব ছিল না, কর্ণধারেরাও বিভিন্ন বাঁধা ঘাটে প্রস্তুত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাহা ছিল প্রস্তুতির কাল—গঠনের যুগ।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালীর মুক্তি-মন্ত্রে ভারতবর্ষের জাগরণ ঘটিল। কংগ্রেসের বাঁধা খাতে ভারতবর্ষের জাগ্রত চেতনা প্রবাহিত হইল; কিন্তু ভগীরথ-বাঙালী সেই বাঁধা পথে খুশি রহিল না। গঠনের নিয়মতান্ত্রিকতা তখন একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে, তাহার রক্তে বিপ্লবের বান ডাকিয়াছে। বাঙালী বিদ্রোহ করিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহা রূপপরিগ্রহ করিল স্বদেশী আন্দোলনে, এবং সেই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হইল হিংসাত্মক মারণ-যজ্ঞে। তখনও কর্ণধারের অভাব হয় নাই।

কিন্তু ভাঙার কাজে, বিপ্লব ও বিদ্রোহের সাধনায় অত্যধিক মন দিতে গিয়া চিত্তবিকার ঘটিল বাঙালীর, সে যেন আর একবার সহজের সাধনায় মাতিয়া উঠিল। আর ব্যাপক দেশব্যাপী সংগ্রাম বা অভিযান নয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতালচারী দলে বিভক্ত হইয়া, একা একা অথবা সমধর্মী দুই-পাঁচ জনে মিলিয়া আত্মকেন্দ্রিক চক্রে বসিয়া মূল স্বাধীনতার লক্ষ্যটাকেই বাঙালী ভুলিয়া গেল। ঈর্ষা ও দলগত স্বার্থবুদ্ধি প্রশ্রয় ও প্রবলতা পাইল, দেশের শত্রুর কথা ভুলিয়া দলের শত্রু নিজের শত্রু-নিপাতের জন্য চক্র ও চক্রান্তের সীমা-পরিসীমা রহিল না। দেবতার পূজা শেষ পর্যন্ত আত্মোদরপরায়ণতায় বিকৃতি লাভ করিল।

বাঙালীর মুক্তি-সাধনার বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসরের ইহাই ইতিহাস। এই সর্বনাশা কালে দেবীর ছিন্নমস্তা রূপ—আপনার রুধির আপনি পান করিতেছেন। লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই, কোনও শালীনতাবোধ নাই। এই আত্মকেন্দ্রিক মুক্তিসাধনার পরিণতি আমরা দেখিলাম দুর্ভিক্ষে এবং মন্বন্তরে, কলিকাতা করপোরেশনে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায়, সিভিল-সাপ্লাইজে ও কালো-বাজারে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং টেক্সটবুক কমিটীতে। বাংলা দেশের রাষ্ট্রে ও সমাজে ধর্মাচরণে ও শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বত্র ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের নির্লজ্জ বিলাস ও হানাহানি চলিতে লাগিল।

* * *

এই কালে সমগ্র ভারতবর্ষ শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়াছে গঠনের পথে। মনস্বী গোখ্‌লের উক্তি—বাংলা দেশ আজ যাহা ভাবে ভারতবর্ষ কাল তাহাই ভাবিবে—তাহার চূড়ান্ত জবাব দিল ভারতবর্ষ, বাঙালী আজ যাহা ভাবিল কাল তাহাকে কার্যে পরিণত করিয়া। গান্ধীজী আসিলেন দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে ধর্মসম্মত বিপ্লবের অস্ত্র হাতে লইয়া। ভারতবর্ষের আত্মার বাণীমূর্তি-রূপে তিনি ভারতবর্ষের নূতন চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। ইহার ঢেউ বাংলা দেশেও আসিয়া লাগিয়াছিল। বীভৎস আত্মতান্ত্রিকতার মোহপাশ ছিন্ন করিয়া বাঙালী সমগ্র ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনায় তাহার বিপুল ভাবোচ্ছ্বাস লইয়া ঝাঁপাইয়াও পড়িয়াছিল, কিন্তু এই ভাবোন্মাদ দীর্ঘস্থায়ী ও দূরপ্রসারী হয় নাই। দলগত স্বার্থবুদ্ধি ভারতবুদ্ধিকে বারংবার পরাভূত করিয়াছে, স্বাধীনতা-যজ্ঞ ধূলোট ও দধিকর্দমে পরিণত হইয়াছে।

এই হানাহানি ও আত্মকলহের ফলে বাঙালী জাতিহিসাবে কর্ণধারহীন হইয়া পড়িয়াছে। নেতৃস্থানীয় অনেকেই পাতালভূমির ঊর্ধ্বে জাগিয়া

উঠিয়াছেন, কিন্তু নীচের আকর্ষণে কেহই জাতির নেতা হইতে পারেন নাই। পঙ্কে পতিত ঐরাবতের মত তাঁহারা একই স্থানে মাতামাতি করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন। সুযোগ বুঝিয়া দুষ্টবুদ্ধি শৃগালেরা নীলবর্ণ ধারণ করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে নায়ক-মর্যাদা লাভ করিয়া বসিয়া আছেন।

* * *

আজ সমগ্র ভারতবর্ষের সাধনার কল্যাণে বাংলা দেশেও যখন আমরা স্বাধীনতার সিংহদ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছি, তখন স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগিতেছে —কে আমাদিগকে তোরণদ্বার উত্তীর্ণ করিয়া দিবে, কর্ণধার কোথায়? নীলীবর্ণ-সঞ্জাতদের দেখিয়া মনে এতটুকুও সান্ত্বনা পাইতেছি না। ভারতমুখী হইয়া নেহরু-প্যাটেল-রাজেন্দ্রপ্রসাদ-আজাদ-রাজাগোপালাচারীদের বিপুল মহিমাদৃষ্টেও ভরসা জাগিতেছে না। কারণ, ইহা সেল্‌ফ্‌ ডিটারমিনেশনের যুগ। ভারত-ইউনিয়নে থাকিবার অধিকার লাভ করিলেও খণ্ডিত বাংলার বোঝা বাঙালীকেই বহন করিতে হইবে। তেমন টীম-ওয়ার্ক থাকিলে বড় বড় মহারথীদের অভাবেও ভয় হইত না, পাঁচজনের সমবেত চেষ্টায় কর্ণধারের অভাব পূর্ণ করিয়া হয়তো অনুকূল অথবা প্রতিকূল বাতাসে তরণী ভাসাইতে পারিতাম। কিন্তু সে একতা কোথায়? যাহারা সহস্রের মধ্যে এক হইবারও উপযুক্ত নয়, তাহারাই প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান হইয়া বসিয়া আছে, তাহাদের কূটকৌশলী বক্তৃতাবাজ সাঙ্গোপাঙ্গেরা অথবা ধর্ম ও শ্রেয়বুদ্ধি হীন সংবাদপত্রগুলি তাহাদের মহিমা যতই কীর্তন করিতেছে, নদীতরঙ্গের কথা চিন্তা করিয়া আমাদের হৃদয় ততই আতঙ্কগ্রস্ত হইতেছে।

কোথায় কর্ণধার? যাঁহারা আছেন, অঘটনঘটনপটীয়ান কালের মাহাত্ম্যে থাকিবার সুযোগ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, একে একে তাঁহাদের কথাই মনে জাগিতেছে। সর্বপ্রথমে মনে হইতেছে তাঁহার কথা, যিনি অনুচরদের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া নিজের মর্যাদায় দেশবাসীর মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলে তাহারা কৃতার্থ হইত। তাঁহাকে পুরোভাগে রাখিয়া মাভৈঃ বলিয়া যাত্রা করিতে তাহারা ইতস্তত করিত না। কিন্তু মহাসভার মোহে তিনি এমনই আবিষ্ট হইয়া আছেন যে, মহাদেশের আহ্বান উপেক্ষা করিতেছেন। যে দশজন অনুচরকে সুখের দিনে ত্যাগ করিতে তাঁহার চক্ষুলজ্জায় বাধিতেছে, তাহাদের দিক হইতে মন সরাইলেই তিনি দেখিতে পাইতেন, লক্ষ লক্ষ দেশবাসী তাঁহার অনুচর হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁহার হৃদয় তাঁহার বুদ্ধিকে এখনও পরাভূত করিতেছে।

আর একজনের কথা মনে হইতেছে, যিনি দেশের দশের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিতে ফেলিতে হঠাৎ এক সুযোগে একটু বেশি আগাইয়া পড়িয়াছেন, যে অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার নিদারুণ আঘাত দেশবাসীর বুকে এখনও দগদগ করিতেছে, তিনি সহসা তাহা তুচ্ছ করিয়া স্বাতন্ত্র্যকামী হইয়া উঠিয়াছেন। কোথায় তিনি আঘাত পাইয়াছেন জানি না, এক এবং অখণ্ড ভারতবর্ষের চিন্তাও তাঁহার অসহ্য হইয়াছে। যে "জয় হিন্দ্" মন্ত্রের উপর তাঁহার আধুনিক প্রতিষ্ঠা, সে "জয় হিন্দ্"ও আজ তাঁহার মন্ত্র নয়, তিনি অখণ্ড সমাজতান্ত্রিক বাংলার উপাসক হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, দেশের লোকের প্রাণে দাগা দিয়া দেশের কোনও বৃহত্তর কল্যাণ অবতারেরাও করিতে পারেন না। সম্ভবত তাঁহার এই নূতন তন্ত্র পলায়নী-মনোবৃত্তিপ্রসূত। তিনি হাঁপাইয়া উঠিয়াছেন এবং একটা অসম্ভব অজুহাত খাড়া করিয়া দেশের কাছে কলঙ্কমুক্ত হইতে চাহিতেছেন। তাঁহার কাছ হইতে আমাদের আর কোনও প্রত্যাশা নাই।

আর একজন জ্ঞানে নিষ্ঠায় ও আত্মত্যাগে সর্বজনমান্য হইলেও অতিশয় দুর্বলপ্রকৃতির। সঙ্কটকালে ধৈর্যধারণ করিতে পারেন, সর্ববিধ কায়িক ও মানসিক ক্লেশ গুরু-গৌরবে বরণ করিতে পারেন, কিন্তু কর্ণধাররূপে বিপন্নকে বিপদোত্তীর্ণ করিবার কৌশল জানেন না। তিনি আদর্শ হইতে পারেন, কিন্তু নেতা হইবার ক্ষমতা রাখেন না। সে জন্য যে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, ভগবান তাঁহাকে তাহা দেন নাই। তাঁহাকে পাইলেও, আমরা স্বস্তি পাইতেছি কোথায়?

অন্য যে সকল এঁড়ণ্ডেরা এই হতভাগ্য দেশে দ্রুম হইয়া আছেন, তাঁহাদের কথা ভাবিতেও ইচ্ছা হইতেছে না। একদা কারা-শুদ্ধ হইলেও ইঁহাদের অধিকাংশেরই পরবর্তী ইতিহাস কলঙ্কিত, অনেকে বুদ্ধিতে বলীয়ান হইলেও চরিত্রে হীন। সম্পদের প্রলেপে অনেকের অতীত চাপা পড়িলেও দেশবাসী এখনও তাহাদিগকে সন্দেহের চোখে দেখে। ইঁহারা কর্ণধার হইবেন? হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে দেশের কল্যাণ নাই।

* * *

বিপ্লবের যুগে বিদ্রোহের কালে অর্থাৎ ভাঙার সময় বাঙালী যে কীর্তি রাখিয়াছে, ভারতবর্ষে এখনও তাহা বিস্ময়ের বস্তু। বাঙালী ভাঙিতে জানে, কারণ বাঙালী আত্মবলিদান করিতে পারে। ইংরেজের শাসনবন্ধন শিথিল

পথ চলতে চলতে বেলা যত প'ড়ে আসতে লাগল, মনের মধ্যে কেন জানি না, সেদিনকার সেই ছবিগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

চলেছি পথ বেয়ে। রাত্রিটুকু ছাড়া এই তিন দিন নিরন্তর পথ বেয়ে চলেছি। সেই সকাল থেকে এতক্ষণে বোধ হয় দশ-বারো মাইল পথ অতিক্রম করেছি। জুতো জোড়ার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, সকালবেলাতেই পথের পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হ'ল। পায়ের তলা জ্ব'লে যাচ্ছে, তবুও চলেছি, কোথায় সেই দীনের পালক, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, তাঁরই উদ্দেশে।

পথে লোক দেখলেই জিজ্ঞাসা করি, কোথায় তাঁর বাড়ি, আর কতদূরে?

সকলেই তাঁকে জানে, বলে, আরও কয়েক মাইল, আশায় নতুন ক'রে বুক বেঁধে আবার চলেছি। মাঝে মাঝে হাঁটু মুড়ে আসে, পথের ধারে ব'সে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার চলেছি। ক্ষুধায় নাড়ীতে পাক দিচ্ছে, জীবদ্দশাতেই বায়ুভোজী হতে হয়েছে। শীতের দিনেও তৃষ্ণায় কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। সূর্য পশ্চিমে ঢ'লে পড়ল ব'লে, তবুও চলেছি।

চলতে চলতে আমরা একটা শহরের মতন জায়গায় এসে পড়লুম। পথের ধার দিয়েই রেল-লাইন চ'লে গিয়েছে। দু-একখানা বাড়ির গাড়িও দেখলুম আমাদের পেরিয়ে চ'লে গেল। এক জায়গায় মাঠে একদল ছেলেকে ক্রিকেট খেলতে দেখলুম। আরও কিছুদূর অগ্রসর হবার পর দু-চারখানা ইটের বড় বাড়িও চোখে পড়ল। লোকজনের চলন-ফেরন ও সাজ-পোশাকের মধ্যে একটু নাগরিক ভাবও লক্ষ্য করতে লাগলুম।

ক্রমেই রাস্তা জনবহুল হয়ে উঠতে লাগল। বেশ বুঝতে পারলুম, আমরা একটা ছোট শহরের মধ্যে অথবা কোন বড় শহরের প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। অজানা অপরিচিত হ'লেও শহরের মুখ দেখে আমাদের নাগরিক মন একটু খুশির দোলায় নেচে উঠল। ভাবলুম, আজ রাতে যদি একান্ত কোথাও আশ্রয় না-ই মেলে, তা হ'লে অন্তত ইষ্টিশানে প'ড়ে থাকতে পারব।

পথের লোকদের জিজ্ঞাসা করতে করতে চলেছি, নবাব সাহেবের বাড়ি কোথায়?

সকলেই প্রথমে অবাক হয়ে মুখের দিকে চায়। তারপরে বলে, এই সোজা চ'লে গিয়ে বাঁ দিকে ফিরতে হবে, তারপরে ডাইনে—

সোজা গিয়ে বাঁয়ে ঘুরে আবার ডাইনে ফিরে চলেছি। বোধ হয় আধ

করার কাজে অর্থাৎ সাম্রাজ্যভাঙার কাজে বাঙালী বরাবরই অগ্রণী হইয়াছে। যাঁহারা এই কার্যে পটু ছিলেন, তাঁহাদিগকে আমরা পূজা করিয়াছি, যথাবিহিত সম্মান দিয়াছি। আজ তাঁহাদের অনেকের কাজ ফুরাইয়াছে। এখন গড়ার কাল আসিয়াছে। গঠনের কাজে যে জ্ঞান যে মনীষা ও ধৈর্যের প্রয়োজন, ইঁহাদের অনেকেরই তাহা নাই। কিন্তু ভাঙার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া গঠনের কাজেও ইঁহারা যদি কর্তৃত্ব করিতে আসেন, তাহা হইলে দেশের কল্যাণ হইবে না।

ভাঙিতে গিয়া আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অনেক পাপ প্রবেশ করিয়াছে; তাহার মধ্যে ভাঙার নেতাদেরও প্রশ্রয় আছে অনেক। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যাঁহাদের হাতে বর্তাইয়াছিল, তাঁহারা ব্যক্তি ও দল গত স্বার্থের মোহে দেশের জনসাধারণকে বলি দিতে লজ্জিত হন নাই। এমন নির্মম ও নৃশংস বলির দৃষ্টান্ত চীন দেশেও পাওয়া দুষ্কর। সিভিল সাপ্লাইয়ের নামে, রেশন-ব্যবস্থার নামে, আইন ও শৃঙ্খলার নামে, পুলিস বিভাগে, সরকারী দপ্তরে, এমন কি করপোরেশনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন বীভৎস অনাচার ঘটিয়া আসিতেছে যে, আমরা নিতান্ত অমর বলিয়া এখনও বিলকুল মরিয়া যাই নাই। এতদিন সুবিধা পাইলেই আমাদের তথাকথিত নেতারা তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ইংরেজের দোহাই পাড়িতেন। তাহাতেই সাতখুন মাপ হইত। গত ৩রা জুনের ব্রিটিশ ডিক্লারেশনের পর কিছু পাই আর না পাই, এই দোহাইয়ের সুযোগ হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। সুতরাং যাঁহারাই কর্ণধার হউন, তাঁহাদের সাবধান হইবার যুগ আসিয়াছে।

* * *

এখন কাজ অনেক, একেবারে গোড়া ধরিয়া পত্তন করিতে হইবে। গত দুই শত বৎসরের কলঙ্কিত ইতিহাস মুছিয়া ফেলিয়া গৌরবের ইতিহাস গঠন করিতে হইলে বহু গুণী জ্ঞানী ও মনীষীর অবাধ আত্মত্যাগ প্রয়োজন, কিন্তু সর্বপ্রথম প্রয়োজন অগ্নিশুদ্ধি। আগুনে পুড়িয়া খাঁটি না হইলে এই বিভীষিকাময় দুর্দিনে কেহ কল্যাণকর নেতৃত্ব করিতে পারিবেন না। দলগত স্বার্থবুদ্ধি এবং দলের প্রাধান্য বর্জন করিতে হইবে। নূতন জাতি-গঠনে কোনও পুরাতন ভেদা-ভেদের বাধা গ্রাহ্য হইবে না। রাজ্যের প্রজাহিসাবে হিন্দু মুসলমান বর্ণহিন্দু ও তপসিলী খ্রীষ্টীয়ান ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাহারও কোনও বিশেষ অধিকার থাকিবে না। এক-ভারতীয়ত্বের গৌরবে সকলেই গৌরব বোধ করিবে। ইহাই হইবে গোড়াকার কথা।

ভাঙার কাজ কঠিন, কিন্তু গড়ার কাজ কঠিনতম। ইহার জন্য বহু বিচক্ষণতার ও সদ্‌বুদ্ধির প্রয়োজন। সমাজের ও রাষ্ট্রের আষ্টেপৃষ্ঠে পাপ প্রবেশ করিয়াছে। পরস্পর কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া অকারণ সময়ক্ষেপ না করিয়া সকলেই একযোগে সংস্কারকার্যে আত্মনিয়োগ করিলে এ দেশে যাহার একান্ত অভাব, সেই একতাবুদ্ধি জাগ্রত হইবে। এতদিন আমরা দুঃখের সহিত সর্বত্র দেখিয়া আসিয়াছি, শুধু সম্প্রদায় বা দল মাহাত্ম্যে অযোগ্যের প্রাধান্য। এই অযোগ্যের শাসন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে বিষাইয়া তুলিয়াছিল। সাধারণ মানুষ শুধু এই কারণেই নেতাদের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছিল। দৈন্যভারে পীড়িত তাহাদের উপর শুধু কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থায় আরও যে সকল ক্লেশ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সারা পৃথিবীতে কোথায়ও তাহার তুলনা মেলে না। একদিন আমরা স্বাধীন হইব, একদিন এই নিদারুণ অব্যবস্থার হাত হইতে আমরা রক্ষা পাইব—শুধু এই আশায় তাহারা ধৈর্য ধরিয়া ছিল, বিদ্রোহ করে নাই। দলে দলে মরিয়াছে, তবু বিশ্বাস হারায় নাই। তাহাদের সেই কাম্য স্বাধীনতা আজ আসিয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা আজ কর্তৃত্ব করিবেন, তাঁহাদের দায়িত্ব তাই অপরিসীম।

* *

বাংলা দেশের পশ্চিম ভাগে যে শাসনব্যবস্থার আজ অবসান হইতে চলিয়াছে, তাহা দেশের জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ হয় নাই। দরিদ্র নিম্নস্তরের মানুষই নানাভাবে শোষিত ও পিষ্ট হইয়া এক নবগঠিত আভিজাত্যের দেহ পুষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা যদি আজ মুক্তির নিশ্বাস ফেলিতে না পায়, তাহাদের হৃতমর্যাদা ধীরে ধীরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে সকলই বৃথা হইবে, নূতনের কোনও জবাবদিহি করিবার থাকিবে না—সেই সহজ সত্য কথাটি কি যাঁহারা আগ্রহলোলুপভাবে নূতন মসনদের দিকে হাত বাড়াইতেছেন, তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন? শুধু সম্প্রদায়ের পরিবর্তনে দেশের পরিবর্তন ঘটে না, যদি না হৃদয়ের পরিবর্তন হয়। ইতিমধ্যেই দেখিতেছি, সেই পুরাতন দলগত স্বার্থবুদ্ধি প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে, পুরাতন অস্ত্র লইয়া কাগজওয়ালারাও তৎপর হইয়াছেন। বাউণ্ডারি কমিশন বসিবার পূর্বে ইঁহাদের পরস্পরের স্বার্থের বাউণ্ডারি যদি না ভাঙিয়া পড়ে, তাহা হইলে নূতন ব্যবস্থাও ধিক্কৃত হইবে।

কারণ, অত্যন্ত দুঃসময়ে এই পরিবর্তন ঘটিতে যাইতেছে। সম্মুখে আসন্ন

দুর্ভিক্ষ। এই মন্বন্তর ঠেকাইবার যেখানে যতটুকু রসদ ছিল, তাহা স্থানান্তরিত হইবার আশঙ্কা আছে। যাঁহারা এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা দলাদলি ভুলিয়া এখন হইতে যদি না একযোগে চিন্তা ও কার্য করেন, তাহা হইলে এই দুর্ভিক্ষ তাঁহারা রোধ করিতে পারিবেন না। ১৩৫০-এর মন্বন্তরে মানুষ কাতারে কাতারে অকাতরে মরিয়া কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব লঘু করিয়াছিল, এবারে তাহারা তাহা করিবে না। কম্যুনিস্টরা উদ্যত হইয়া আছেন, অপসৃত শাসনকর্তারাও প্রতীক্ষা করিতে থাকিবেন, তখন সাম্প্রদায়িক এবং অসাম্প্রদায়িক বিপ্লবকে কে ঠেকাইবে! বহুরক্তমূল্যে ক্রীত এই সোনার বাংলা দেশ তাঁহাদেরও হাতছাড়া হইয়া যাইতে বিলম্ব হইবে না। তাই বলিতেছিলাম, যাঁহারাই কর্ণধার হউন, তাঁহাদের দায়িত্ব অপরিসীম।

*　　　*　　　*

নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের স্কন্ধেও কঠিন দায়িত্বভার আসিয়া পড়িয়াছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যাঁহারা কারাগারের ছবি আঁকিয়া এবং শিকল ভাঙার গান গাহিয়া আত্মবিনোদনের সঙ্গে দেশের কাজ করিতেছিলেন, আজ তাঁহাদিগকে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে হইবে। যাহা জীবন্ত ও জাগ্রত ছিল, তাহা আজ ইতিহাসের বিষয় হইতে চলিয়াছে। আজ নূতন সৌধনির্মাণের ছবি আঁকিতে হইবে, গড়ার গান গাহিতে হইবে। তাহারও জন্য মনের আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। আশা করি বাংলা দেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা সে সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই অবহিত হইতেছেন।

মহারাজ নন্দকুমারের বিচারের নামে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে বাংলা দেশের কণ্ঠে যে ফাঁসি লটকানো হইয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর ঠিক মধ্যভাগে ১০০ হ্যারিসন রোডের মামলার বিচারে সম্ভবত তাহা অপসৃত হইল। সার্ ইলাইজা ইম্পেদের জয় হউক।

এ দেশে জাতিভেদপ্রথা যখন সৃষ্ট হইয়াছিল, তখন নিশ্চয়ই ইহার প্রয়োজন ও সার্থকতা ছিল; কারণ প্রয়োজন ব্যতিরেকে প্রথার উদ্ভব হয় না। কিন্তু এখন প্রতিদিন আমরা অনুভব করিতেছি, ইহার কোনই সার্থকতা নাই; বরঞ্চ নানাভাবে দেশবাসীর একাত্মতার দিক দিয়া জাতিবাচক চিহ্ন অর্থাৎ উপাধি বাধারই সৃষ্টি করিতেছে। বিগত দুই শত বৎসরের মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থায় প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। শিক্ষাদীক্ষাও

বদলাইয়াছে। বিবিধ উপাধি-সম্পন্ন লোকেরা একত্র খাওয়া-দাওয়া শোওয়া-বসা আচার-ব্যবহার করিয়া পরস্পরের কোনই পার্থক্য আর খুঁজিয়া পাইতেছে না। অনেক ক্ষেত্রে তালপুকুরের তালের মত উপাধিগুলাই রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের বিশেষ এবং অবিশেষ কোনও তাৎপর্য নাই। অথচ অনেকের কাছে এগুলি বিভেদের প্রাচীররূপে পরস্পর এক ও ঘনিষ্ঠ হইবার পক্ষে বাধা বলিয়া গণ্য হইতেছে।

এই বিবিধ উপাধি-জালে আমরা এমনই জড়াইয়া পড়িয়াছি যে, অনাবশ্যক জানিয়াও এগুলিকে বর্জন করা কঠিন হইতেছে। সামাজিকভাবে যদিও তাহা করিতে পারি, রাষ্ট্রীয় বাধা দূর করিতে সময় লাগিবে। দলিলে-দস্তাবেজে চুক্তিপত্রে এবং বিবিধ বৈষয়িক ব্যাপারে উপাধি ব্যবহার এখনও অনিবার্য হইয়া আছে। আমরা বুঝিতেছি, ইহা অন্ধ সংস্কার মাত্র, বর্জন করিলেও ক্ষতি নাই। তবু বাধ্য হইয়া সম্পত্তি ও ব্যবসায় রাখার জন্য উপাধি ব্যবহার করিতেছি। গত সংখ্যায় মুজঃফরপুরের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথের যে ফরমুলা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমাদের মনে লাগিয়াছে। দুই-দশ জনে যতদূর সম্ভব এই ফরমুলা অনুযায়ী চলিতে থাকিলে ইহা যদি সত্যই দেশের কল্যাণকর হয়, একদা ব্যাপকভাবে নিশ্চয়ই গ্রাহ্য হইবে। এই বিশ্বাসে বর্তমান সংখ্যা হইতে আমরা উপাধি বর্জন করিলাম। শুধু যেখানে আইনে আটকাইবে, সেখানে আমরা আপাতত নিরুপায়।

*　　　*　　　*

শুধু আমরা নই, ওই ফরমুলা বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি সমর্থন করিতেছেন। ইহার ব্যাপক প্রয়োগে যে একদিন জাতিভেদের গ্লানি আমরা ভুলিতে পারিব, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। আজিকার বলাইচাঁদের বংশধর যদি চার-পাঁচ পুরুষ পরে মুখটি বংশের গৌরব সম্বন্ধে উপাধির দ্বারা সচেতন না থাকেন, তাহা হইলে আজিকার শান্তিপ্রিয়ের কোনও বৃদ্ধ প্রপৌত্রীর পাণিপীড়ন করিতে তাঁহার কোনও দুশ্চিন্তারই কারণ ঘটিবে না। উপাধির ব্যবহার রহিত হইলেই অদূরভবিষ্যতে তপসিলী ও বর্ণহিন্দুর পরস্পর মিলনের বাধা অপসৃত হইবে। আমাদের দেশের সর্বাপেক্ষা গ্লানিকর সমস্যার সহজ সমাধান এই ভাবে হইয়া যাইবে। ইহার ফলে হিন্দু সমাজের কি পরিমাণ শক্তি বৃদ্ধি হইবে, সহজেই অনুমান করা যায়।

শ্রীপূর্ণেন্দু একটা অতি সাধারণ ঘটনা দেখিয়া অবাক হইয়াছেন, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে (পৃ. ১৬৩) 'ভারতবর্ষে' শ্রীবীরেন দাশের "প্রতিদ্বন্দ্বী" নামে একটি গল্প বাহির হইয়াছিল। হুবহু সেই গল্পটিই শিরোনামাসহ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ১১ই বৈশাখের 'সচিত্র ভারতে' শ্রীহীরেন বসু কি করিয়া লিখিতে পারিলেন—শ্রীপূর্ণেন্দুর ইহাই সমস্যা। তবু তো শ্রীহীরেন পুকুরচুরি করেন নাই, নায়ক "গাঙ্গুলী"কে "মিত্তির" করিয়া কতকটা মৌলিকতা বজায় রাখিয়াছেন। শ্রীপূর্ণেন্দু ভুল করিয়া এই সমস্যা আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন, শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব, শ্রীযুক্ত শিবরাম ও শ্রীযুক্ত শশধর, ফুলবেঞ্চে এই পাঁচজন বিচারকের উপর এই মামলার ভার দিলে ন্যায়বিচার হইতে পারিত।

গোপালদা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

একান্নবর্তিতা

থাকে না কখনো মা যদি না হন সকলের বন্দিতা।
হাঁড়ি নিয়ে যদি হয় কাটাকাটি
ভাগ করা ভাল থালা ঘটি বাটি
ভাগ হওয়া ভাল ভায়ে ভায়ে যদি মতি হয়ে থাকে তিতা।

আমি যা বলিব তুমি যদি তার বিপরীত কর মানে,
এক রক্তের ধুয়ো না তুলিয়া ভাগ হও মানে মানে।
না হ'লে রক্ত বহিবে অবাধে
নরঘাতী ইট জ'মে যাবে ছাদে
কবরে চলিবে অকালে মানুষ অকালে জ্বলিবে চিতা।

মন ভেঙে গেছে ভায়ে ভায়ে, হেরি পথেঘাটে রেষারেষি
পৃথক অন্ন হওয়া ছাড়া আর গতি নাই পেষাপেষি।
সালিস মানিয়া হয়ে যাও ভাগ
কর বর্জন না করিয়া রাগ
রবেন স্বস্তিতে তবু, হ'লেও দ্বিখণ্ডিতা।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত [দাস]
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ [দাস] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাহিত্যে স্থায়ী ও সঞ্চারী

৩

'স্থায়ী' ও 'সঞ্চারী' শব্দ সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের অতিপরিচিত প্রসিদ্ধ [illegible] 'সঞ্চারী' শব্দের স্থলে পূর্বকালে কেবলমাত্র 'ব্যভিচারী' শব্দ [illegible] হইত, পরবর্তীকালে উভয় শব্দই প্রচলিত হইয়াছে। [illegible] মীমাংসকগণ কাব্য-জিজ্ঞাসার উত্তরে এই দুইটি শব্দকে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়াছেন। যে ভাব ব্যতীত রস-তত্ত্বের কোন উপলব্ধি বা বিচার সম্ভবপর নয়, তাহাকে স্থায়ী ও সঞ্চারী বা ব্যভিচারী এই দুইটি ভাগে বিশ্লেষণ করিয়া প্রাচীনেরা সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলাতেও [illegible] দুইটি আদৃত হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, 'স্থায়ী' ও 'সঞ্চারী' এই বিশেষণ দুইটি অলঙ্কারশাস্ত্রে কেবলমাত্র ভাব সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাবশব্দের সূক্ষ্ম তাৎপর্য নির্ণয় পরে করা হইবে, এখানে আমরা তাহাকে চিত্তাবস্থা বা চিত্তবৃত্তি, বিশেষতঃ ক্রতিগুণাত্মক হৃদয়বৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছি। এখন এই ভাবের স্থায়ী ও সঞ্চারী ভেদ দ্বারা কি বুঝানো হইতেছে, অর্থাৎ অলঙ্কারশাস্ত্রে ভাব-সম্পর্কে স্থায়ী ও সঞ্চারী শব্দ দুইটির শক্তি ও তাৎপর্য কি, তাহাই বর্তমান প্রবন্ধে বিচার করা হইবে।

'স্থায়ী' ও 'ব্যভিচারী' এই শব্দ দুইটি সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন [illegible] তৎকৃত নাট্যশাস্ত্রে নাট্যরসের আলোচনা প্রসঙ্গে। তাঁহার [illegible] হইতে স্থায়ী ভাবের সর্বপ্রাধান্য বুঝা গেলেও স্থায়িত্বের কারণ স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয় না। তিনি বলেন, যে প্রকার পুরুষগণের লক্ষণ সমান হইলেও, হস্ত পাদ [illegible] শরীর তুল্য হইলেও এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমান হইলেও কুল, শীল, বিদ্যা, [illegible] শিল্পে বিচক্ষণতা হেতু কেহ কেহ রাজত্ব প্রাপ্ত হন, এবং অন্য সকলে [illegible] বলিয়া তাঁহাদেরই অনুচর হইয়া থাকে, সেইরূপ বিভাব, অনুভাব ও [illegible] [illegible] স্থায়ী ভাবসমূহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহার পরেই [illegible]
[illegible] নরেন্দ্রো [illegible]-পরিবারোঽপি সন্ স এব নাম [illegible];
[illegible] স্থায়ী ভাবো রসো নাম [illegible]

করেন, কারণ তিনি সুমহান পুরুষ, সেইরূপ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্থায়ী ভাব রস নাম লাভ করে।

ভরত 'সঞ্চারী' শব্দ প্রয়োগ করেন নাই, 'ব্যভিচারী' শব্দের ব্যাখ্যানে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, "বি অভি ইত্যেতৌ উপসর্গৌ, চর্ ইতিগত্যর্থো ধাতুঃ, বিবিধম্ আভিমুখ্যেন রসেষু চরন্তি ইতি ব্যভিচারিণঃ।"

—বি ও অভি এই দুইটি উপসর্গ, চর্ এই গত্যর্থক ধাতু, রসসমূহের আভিমুখ্যে বিবিধভাবে চলে বলিয়া ব্যভিচারী।

ভরতমুনির অভিমত হইতেছে এই, যে ভাব হইতে সাক্ষাৎরূপে রসোৎপত্তি, তাহাই স্থায়ী ভাব। অতিশয় শক্তি আছে বলিয়া রস-বিচারে তাহাই সর্বপ্রধান। ব্যভিচারী ভাব এবং বিভাব ও অনুভাব সর্বপ্রকারে তাহাকেই আশ্রয় করিয়া তাহাকেই পুষ্ট করিয়া থাকে। ব্যভিচারী ভাব অপ্রধান ভাব, তাহা সর্বদাই স্থায়ী ভাবের অনুগামী হইয়া রসকে পুষ্ট করিয়া থাকে।

পরবর্তী আচার্যগণ 'সঞ্চারী' শব্দ প্রয়োগ করিয়া উহার সংজ্ঞা দিয়াছেন—

"সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপিতে।"

—ভাবের গতিকে সঞ্চারিত করে বলিয়া ব্যভিচারী ভাবকে সঞ্চারী ভাবও বলা হয়।

ভাবের গতিকে সঞ্চারিত করা আর ভাবকে পুষ্ট করা একই কথা। স্থায়ী ভাব যেন স্থির, সঞ্চারী ভাব নানারূপে উদিত হইয়া ও সঞ্চরণ করিয়া স্থায়ী ভাবকেই যেন গতি দান করে এবং তাহাকে পুষ্ট করিয়া সম্পূর্ণ করে। বাংলায় আমরা 'সঞ্চারী' শব্দই বেশি পছন্দ করি এবং সাধারণত তাহাই প্রয়োগ করিব।

ভরতমুনির ব্যাখ্যা করিয়াছেন আচার্য অভিনবগুপ্ত। তিনি স্থায়ী ভাবের স্বরূপকে অনেকখানি স্পষ্ট করিয়াছেন। তিনি উহাকে স্বয়ংসিদ্ধ সহজাত চিত্তবৃত্তি বলিয়া কখনও 'সংবিৎ' এবং কখনও বা 'বাসনা' শব্দ দ্বারা বুঝাইয়াছেন। তাঁহার মতে—"জাত এব হি জন্তু রিয়তীভিঃ সংবিত্তিঃ পরীতো ভবতি। তথাহি দুঃখদ্বেষী সুখাস্বাদনলালসঃ সর্বো রিরংসয়া ব্যাপ্তঃ স্বাত্মনি উৎকর্ষমানিতয়া পরম্ উপহসতি। উৎকর্ষাপায়শঙ্কয়া শোচতি। অপায়ং প্রতি ক্রুধ্যতি। অপায়-হেতুপরিহারে সমুৎসহতে। বিনিপাতাদ্ বিভেতি। কিংচিদ্ অযুক্ততয়া অভিমন্যমানো জুগুপ্সতে। ততশ্চ পরকর্তব্য-বৈচিত্র্য-দর্শনাদ্ বিস্ময়তে। কিংচিজ্জিহাসু স্তত্র বৈরাগ্যাৎ প্রশমং ভজতে। নহি এতচ্চিত্তবৃত্তিবাসনা-শূন্যঃ

প্রাণী ভবতি। কেবলং কস্যচিৎ কাচিদ্ অধিকা ভবতি চিত্তবৃত্তিঃ, কাচিদ্ ঊনা। কস্যচিদ্ উচিতবিষয়-নিয়ন্ত্রিতা, কস্যচিদ্ অন্যথা।"

—জাত হইবামাত্রই প্রাণী এই কয়টি সংবিৎ বা জ্ঞানাত্মক বৃত্তি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। সকলেই দুঃখকে দ্বেষ করে, সুখাস্বাদনের লালসা করে—এইরূপে রিরংসা বা রতি দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। আবার নিজেকে উৎকৃষ্ট মনে করিয়া পরকে উপহাস করে। উৎকৃষ্টতার বিনাশ-আশঙ্কায় শোক করে, এবং বিনাশের কারণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। বিনাশের কারণ পরিহার করিবার নিমিত্ত সম্যক উৎসাহ প্রকাশ করে। পতন হইতে ভয় পায়। কোন কিছু অনুপযুক্ত মনে করিয়া জুগুপ্সা বোধ করে। তারপর অন্যের কৃত বৈচিত্র্যময় ব্যাপারসমূহ দেখিয়া বিস্ময় বোধ করে। কোন বস্তু ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া সেই বিষয়ে বৈরাগ্য হেতু শমগুণ ভজনা করে। এই সকল চিত্তবৃত্তিরূপ বাসনাশূন্য হইয়া কোন প্রাণীই জন্মগ্রহণ করে না। কেবলমাত্রই কাহারও কোনও চিত্তবৃত্তি বা বাসনা অধিক হইয়া থাকে, কোনওটি বা হইয়া থাকে কম। কাহারও বা উচিত বিষয়ে চিত্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়, কাহারও বা হয় অন্যরূপে।

আচার্য অভিনবগুপ্ত ব্যাখ্যানের আরম্ভে ও শেষ ভাগে ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন—জাত প্রাণী মাত্রেরই কতকগুলি বিশিষ্ট চিত্তবৃত্তি বা ভাব থাকিবে। ইহারাই আদি বাসনা বা সংস্কার বা সংবিৎ। ব্যক্তিবিশেষে এই চিত্তবৃত্তি-সমূহের আধিক্য বা অল্পতা দেখা যাইতে পারে, কিন্তু অভাব হইবে না কখনও। এই সহজাত, সর্বপ্রাণি-সাধারণ ও সর্বস্বর চিত্তবৃত্তি বা ভাবকেই বলা হয় স্থায়ী ভাব। এই স্থায়ী ভাবের কিরূপে প্রকাশ হয় এবং তাহাদের পরিচয় ও সংখ্যা কি, তাহাও তিনি ব্যাখ্যানের মধ্যভাগে বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বর্তমান প্রসঙ্গে এখনই আমাদের আলোচ্য নহে। যাঁহারা জন্মান্তর স্বীকার করেন না, মানবচিত্তের দৃঢ়মূল বাসনা-রূপ এই স্থায়ী ভাবের স্বীকৃতি ও উপলব্ধিতে তাঁহাদেরও আপত্তি করিবার কিছু নাই। কারণ, জন্মান্তরবাদ দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, মাতাপিতা হইতে সন্তানের জন্মসূত্র বা heredity দ্বারা তাহাই পাওয়া যায়। এই অনাদি বংশপরম্পরাই তো Evolution বা ক্রমবিবর্তন-বাদের অবলম্বন। পিতা হইতে পুত্রে, রক্তধারার সহিত চিত্তধারার এই প্রবাহ নিত্য বহমান। বীজের মধ্যেই সকল বাসনা বা সংস্কার গূঢ়ভাবে নিহিত। এই অতিগূঢ় অথচ অতি প্রবল, মূল-ভূত অনাদি ভাবরাশিই মানবচিত্তের স্থায়ী

ভাব। ইহারা সর্বমানব-সাধারণ এবং প্রায়শঃ সর্বপ্রাণি-সাধারণ। এই স্থায়ী ভাবসমূহই কাব্য নাটক বা উপন্যাস—সর্বপ্রকার সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন।

ভরতমুনি এবং অভিনবগুপ্তকে অনুসরণ করিয়া পরবর্তী অলঙ্কারাচার্যগণ প্রায় একই রূপে স্থায়ী ভাবের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা ভোজরাজ-প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অবলম্বন করিয়া আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি। ভোজ-রাজ সরস্বতীকণ্ঠাভরণগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"চিরংচিত্তেঽবতিষ্ঠন্তে সংবধ্যন্তেঽনুবন্ধিভিঃ।
রসত্বং প্রতিপদ্যন্তে প্রবুদ্ধাঃ স্থায়িনোঽত্রতে॥"

—সেই স্থায়ী ভাবসমূহ বাসনালোক হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল চিত্তে অবস্থান করে, অনুবন্ধী বা অনুগত সঞ্চারী ভাবসমূহ দ্বারা সম্বদ্ধ হয় এবং রসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

স্থায়ী ভাব সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য অথবা অবশ্য-আলোচ্য চারিটি বিষয়েরই এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে,—(১) স্থায়ী ভাবের উৎপত্তি বা উদ্বোধ কোথা হইতে হয়, (২) স্থায়ী ভাবের স্থায়িত্বের হেতু কি, (৩) স্থায়ী ভাবের পুষ্টি ও প্রকাশ কি করিয়া ঘটে, এবং (৪) স্থায়ী ভাবের সার্থকতা বা শেষ কোথায়। এক এক করিয়া বিষয়গুলি বিচার করা হইতেছে।

(১) স্থায়ী ভাবের ঠিক উৎপত্তি বলিয়া কিছু আলোচিত হইতে পারে না, কারণ, তাহা মানবের সহজাত বৃত্তি বলিয়াই পরিগণিত হয়। তবে কোন বৃত্তিই সকল সময়ে প্রকাশিত থাকে না। বিশেষ কারণ উপলক্ষ করিয়া তাহা কার্যকারী হয়, তখনই আমরা তাহার উদ্বোধ, উদ্দীপন বা প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া মনে করি এবং তাহাকেই বলি উৎপত্তি। অগ্নি কাষ্ঠের ভিতর লুক্কায়িত থাকে, ঘর্ষণে যেমন তাহার উৎপত্তি হয়, অথবা নবনীত দুগ্ধের মধ্যে অদৃশ্য থাকে, মন্থনে যেমন তাহার গোচরতা হয়, ঠিক তেমনই বিভাবাদির প্রবল সংযোগ হেতু স্থায়ী ভাবের প্রকাশ বা উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। স্থায়ী ভাব অপ্রকাশিত বা গূঢ় অবস্থায় যে লোকে নিহিত থাকে, তাহাকেই বলা হয় বাসনালোক। বাসনালোক হইতে তাহা প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। স্থায়ী ভাবের স্বরূপই বাসনা, বা প্রাণীর অতিসূক্ষ্ম চিরন্তন স্বয়ংসিদ্ধ সংস্কার। এই সংস্কারের স্বরূপ ও ভিন্নতা বিচার করিয়াই স্থায়ী ভাবের গণনা ও সংখ্যা নির্ণয় করা হইয়া থাকে। অভিনবগুপ্তের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যে প্রথমেই উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রাণীর

প্রথম সংস্কার হইতেছে—দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ এবং সুখের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। এই দুঃখ-দ্বেষ এবং সুখাকাঙ্ক্ষা একই বস্তু, অভিনবগুপ্ত ইহারই নাম দিয়াছেন 'রিরংসা', অর্থাৎ রমণেচ্ছা বা রতি। অন্তর ও বাহিরের বিচিত্র বিষয়ে আত্মার রমণ বা সুখাস্বাদনই এই রতি। প্রায় সকলেই রতিকে কেবল মাত্র স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া এই আদি ভাবটিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আদর করিয়া শৃঙ্গারভাব, কান্তভাব, মধুরভাব প্রভৃতি শব্দ দ্বারা উহাকে বুঝাইয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষের প্রেম হয়তো সর্বোত্তম রতিভাব এবং শ্রেষ্ঠ স্থায়ী ভাব, কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্রের বিচারেও উহাই একমাত্র রতিভাব, ইহা আমরা মানিতে প্রস্তুত নই। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রীতির ন্যায়, মাতা ও সন্তানের পরস্পরের প্রীতি, ভগবান ও ভক্তের প্রীতি, তুল্যজন অর্থাৎ সুহৃদ্বর্গের প্রীতি এবং জন্মভূমি বা স্বদেশের প্রতি প্রীতিও সাহিত্যে স্থায়ী ভাব স্বরূপে কার্য করিয়া রসোৎপাদনে সমর্থ। পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বিচার করিলেই এই মন্তব্যের সারবত্তা বুঝা যাইবে। যথাস্থানে এই সকল বিষয় আলোচিত হইবে।

(২) স্থায়ী ভাবের স্থায়িত্বের হেতু কি? সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে, এই ভাবসমূহ দীর্ঘকাল চিত্তে অবস্থান করে। পূর্বাংশে আমরা যেখানে স্থায়ী ভাবকে বাসনারূপ সূক্ষ্ম মূল-ভূত চিরন্তন সংস্কার বলিয়াছি, সেখানেই এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার কিছু বিশদ আলোচনা আবশ্যক।

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেন, "অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ ভাবসমূহ যাহাকে তিরোহিত করিতে পারে না, যাহা আস্বাদরূপ অঙ্কুরের কন্দ বা মূল স্বরূপ, তাহা স্থায়ী ভাব বলিয়া জ্ঞাত হয়।" রসগঙ্গাধরগ্রন্থে জগন্নাথ বলেন, "তত্র আপ্রবন্ধং স্থিরত্বাদ্ অমীষাং ভাবানাং স্থায়িত্বম্।"—সমগ্র প্রবন্ধে স্থির থাকে বলিয়া ওই সকল ভাবের স্থায়িত্ব। কোন উক্তিই বিষয়টিকে সকল দিক হইতে স্পষ্ট করে নাই।

স্থায়ী ভাব ও সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবের গণনা প্রাচীন সাহিত্যাচার্যগণের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক সন্দেহ নাই, বস্তুতঃ সাহিত্যে রসবাদের ভিত্তিভূমি ইহাই। কাব্যবিশ্লেষণ অথবা আত্মবিশ্লেষণ করিলেই ইহার যথার্থতা উপলব্ধি হইবে, গ্রীক্-আচার্য আরিস্টটলের কাব্য-সূত্রে ইহার বিশদ কোন আলোচনা

াইল যাবার পর আমরা একটা বাজারের মতন রাস্তায় এসে পৌঁছলুম, তার ়-দিকে সারি সারি দোকান-ঘর। দু-দিকের দুই সার গিয়ে মিলেছে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদের সিংহদ্বারে।

সিংহদ্বারের ওপরেই একটা খোলা ছাদ, দূর থেকে মনে হ'ল, যেন সেই ছাদের ওপরে কারা ব'সে রয়েছে। তাদের পাশেই একটা উঁচু জায়গায় সোনালী রঙের কি একটা ছোট্ট জিনিস ঝকঝক করছে, অস্তরাগরঞ্জিত ন্দিরচূড়ার কনককুম্ভের মতন।

সিংহদুয়ারের কাছে এসে দেখলুম, সেখানে দু-তিনজন জঙ্গী উর্দিপরা ন্দুকধারী সিপাহী খটমট ক'রে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে, সামনেই একটা াঙা কামান সযত্নে সাজানো রয়েছে।

ভাবতে লাগলুম, এই প্রাসাদের মধ্যে কোথায় নবাব সাহেব আছেন, সখানে আমাদের মতন অকিঞ্চন পৌঁছবে কি ক'রে! কাকেই বা তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করি! সেপাইদের সাজ-পোশাক ও ঘোরন-ফেরন দেখলে তো বুকের ক্ত জল হয়ে যায়!

অনেক চিন্তা ও পরামর্শের পর বুক ঠুকে 'জয় বাবা বিশ্বনাথ' ব'লে এগিয়ে গয়ে এক সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করলুম, এটা কি অমুক নবাব সাহেবের দৌলতখানা?

ভেবেছিলুম, সিপাহীসুলভ ধমক ও তাড়া দিয়ে সে আমাদের দূর ক'রে দবে, কিন্তু আমাদের অনুমান ব্যর্থ ক'রে অতি মিষ্টি সুরে সে বললে, মালিকের জে দেখা করতে চাও? কোথায় তোমাদের বাড়ি?

বাংলা দেশ।

সিপাহী বললে, ওই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চ'লে যাও, সেই ছাতে মালিক র সৈয়দ সাহেব ব'সে আছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, সৈয়দ সাহেব কে?

তিনি মালিকের হকিম। কোনও ভয় নেই, নির্ভয়ে উঠে যাও, কেউ কিছু বে না।

নির্ভয়েই সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হওয়া গেল।

ওপরে উঠে দেখি, ভারতীয় চিত্রের আদর্শে একখানা উঁচু-নীচু ছাত, এখান কে সিঁড়ি উঠে গেছে একটা ছাতে, ওখান থেকে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে অন্য

না থাকিলেও বুচারের ব্যাখ্যান হইতে মনে হয়, 'primary emotion' নাম দিয়া যাহা বুঝানো হইয়াছে, তাহাই আমাদের স্থায়ী ভাব, এবং "the more transient emotions, the passing moods of feeling"—ইহারাই হইতেছে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব।

স্থায়ী ভাবসমূহের স্থায়িত্বের কারণ তিনটি। প্রথম কারণ—মানবচিত্তের গূঢ় অন্তর্দেশ দিয়া ইহাদের অবিরাম প্রবাহ; এই ভাবগুলি সাধারণতঃ অন্যভাব-নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য এবং আপেক্ষিক নিত্য সত্তাই এই ভাবসমূহকে স্থায়িত্ব দান করে। মানবের ন্যায় অনেক প্রাণীর চিত্ত-ভূমিতেও এই স্বতন্ত্র ভাবগুলি সহজাত দৃঢ় সংস্কাররূপে প্রবাহিত রহিয়াছে। যেমন বলা চলে, রতি, ক্রোধ, ভয় ও শোক-ভাব প্রায় সর্বজীব-সাধারণ, কিন্তু হাসি ও বিস্ময়-ভাব প্রধানতঃ সর্বমানব-সাধারণ। পূর্বেই বলা হইয়াছে, স্থায়ী ভাবগুলি আমাদের বাসনালোকে সর্বদাই গূঢ়রূপে বর্তমান থাকে; উদ্বোধক বস্তু অর্থাৎ আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাবের সংযোগে চিত্তবৃত্তিরূপে উদ্বুদ্ধ হয়। যখন উদিত হয়, তখন ইহারা যেন সম্রাট; বিভাব, অনুভাব বা অন্যবিধ ভাব ইহাদের আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া ইহাদের অনুবর্তন করে। এই ভাবগুলি ভাবান্তরের অধীন না হইয়া স্বতন্ত্র ও স্বয়ংপ্রধানরূপে কার্য করিতে পারে। ইহারা প্রধান বলিয়া এত প্রবল হইতে পারে যে, বিরুদ্ধভাব উদিত হইয়াও ইহাদিগকে তিরোহিত করিতে পারে না। স্থায়িত্বের উহাই প্রথম ও প্রধান কারণ।

দ্বিতীয় কারণ—বাসনালোক হইতে ইহাদের মুহুর্মুহুঃ অভিব্যক্তি। এই কারণটি প্রকৃতপক্ষে প্রথম কারণেরই অন্তর্গত। যখন ইহারা বাসনালোক হইতে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রবল হয়, তখন উহারা প্রত্যক্ষতঃও স্থায়ী হইয়া থাকে। অন্য ভাবগুলিকে তরঙ্গ বলিলে ইহারা যেন সমুদ্র। ইহারা অতি সহজে উদ্বুদ্ধ হয়, অতি সহজে প্রবল হয়, এবং প্রবল হইলে কাব্যে মহিমাময় হইয়া সর্বদাই দৃশ্যমান থাকে; এবং অন্য ভাবগুলি তরঙ্গের ন্যায় উদিত হইয়া ইহাদের আশ্রয়ে নিজ লীলা সম্পন্ন করিয়া ইহাদের স্বরূপেই যেন পুনরায় বিলীন হইয়া যায়।

তৃতীয় কারণ—কাব্যনিবন্ধে এই ভাবগুলিরই একটি প্রবল হইয়া স্থায়ী হইয়া থাকে। অন্য জাতীয় ভাব জগতে ও কাব্যে মানবচিত্তকে স্থায়ীরূপে দীর্ঘকাল আবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। মানবেতিহাস পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই

উপলব্ধি হয়—সুদূর অতীত যুগে এই সমুদয় ভাবই প্রবল হইয়া মানবচিত্তকে আন্দোলিত করিয়াছে ; বর্ত্তমান যুগেও ইহাদের প্রভাব কিছুমাত্র ন্যূন হয় নাই যুগোপযোগী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ইহারা সংসারে ও সমাজে নব নব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছে ; এবং আধুনিক সভ্য মানবের ধারণা অনুসরণ করিয়াও বলা চলে, দূর—অতিদূর ভবিষ্যৎ কালেও সাধারণ মানবচিত্তে ইহারা সমানভাবেই প্রবল থাকিবে। লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, মানব-জগতে যাহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলিয়া চিরকাল আদৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা এই ভাবসমূহের অবলম্বনে রচিত গাথা, কাব্য বা নাটক। স্থায়ী ভাবের অবলম্বনে রচিত সাহিত্যই সাহিত্য-গুণে উৎকর্ষশালী হইলে জগতে স্থায়ী সাহিত্য হইয়া থাকে। অস্থায়ী ভাবাবলম্বনে রচিত কবিতা যুগবিশেষের যতই আদরণীয় হউক, তাহা যে শতবর্ষ পরেও পাঠকসমাজের চিত্ত বিনোদন করিবে, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। অপর পক্ষে বাল্মীকি, কালিদাস, ইস্‌কাইলাস, হোমর, শেক্‌স্‌পীয়র নিত্যকালের। যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, মার্ক্স-পন্থীদের প্রাদুর্ভাবে শেক্‌স্‌পীয়রের আয়ু নিঃশেষিতপ্রায়, তাঁহাদিগকে হতাশ করিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রখণ্ডে শেক্‌স্‌পীয়রের প্রভাব নবযুগে সর্বাধিক বিস্তার লাভ করিয়াছে। আমরা তাই বলিতে পারি, স্থায়ী ভাব হইতেই সাধারণতঃ স্থায়ী সাহিত্যের উদ্ভব হইয়া থাকে।

(৩) স্থায়ী ভাবের তৃতীয় লক্ষণ বিচারে দেখিতে হইবে, কি করিয়া উহার পুষ্টি ও প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গেই আসে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব-সমূহের কথা।

স্থায়ী ভাবের একটি লক্ষণ এই যে, স্থায়ী নয়—এইরূপ ভাব বা ভাবসমূহ উক্ত স্থায়ী ভাবের প্রসঙ্গবলেই উদ্ভূত হইয়া তাহাকে পুষ্ট করে এবং উহাদের বিচিত্র সম্বন্ধ দ্বারা তাহার প্রবল প্রকাশ ঘটাইয়া আবার যেন তাহাতেই লীন হইয়া যায়। এই ভাব বা ভাবসমূহকেই বলা হইয়াছে—ব্যভিচারী ভাব বা সঞ্চারী ভাব। সঞ্চারীকে না বুঝিলে স্থায়ীর পরিচয় হয় না, আবার স্থায়ীকে না চিনিলে সঞ্চারীর উপলব্ধিও অসম্ভব। উভয়ের সংজ্ঞা বা নির্বচন কেবলমাত্র উভয়কে অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধ হইতে পারে। উভয়ের সম্পর্ক কেহ কেহ বলিয়াছেন—সমুদ্র ও তরঙ্গের ন্যায়, কেহ বা বলিয়াছেন—মাল্য ও মাল্যমধ্যস্থ সূত্রের ন্যায়, অভিনবগুপ্তের ভাষায়—ইহারা সর্বদাই 'পরস্পরোপকারী'। আমরা প্রারম্ভেই

বক্তব্য করিয়াছি,—সঞ্চারীর সম্পদেই স্থায়ীর অতিসম্পন্নতা ও বলভূয়িষ্ঠতা, এ যেন ঈশোপনিষদের বর্ণিত বিদ্যা ও অবিদ্যার লীলা, বিদ্যা ও অবিদ্যার ঊর্ধ্বে পূর্ণ ব্রহ্মের ন্যায় স্থায়ী ও সঞ্চারীর ঊর্ধ্বে রহিয়াছে পরম কাব্যামৃত বা কাব্যরস।

'দুষ্মন্তকে শকুন্তলা প্রথম দর্শনেই ভালবাসিয়াছে'—ইহা একটি বাক্য বটে, কিন্তু রসাত্মক বাক্য নয়, তাই ইহা কাব্য নয়। এই বাক্যে স্থায়ী ভাব—রতি থাকা সত্ত্বেও তাহার বহুলরূপে উপলব্ধি হয় নাই, অর্থাৎ তাহার কোনরূপ সাহিত্যিক প্রকাশ ঘটে নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমেই বলিতে হইবে, বাক্যটিতে স্থায়ী ভাবের সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া তাহার পোষণার্থ একটিও সঞ্চারী ভাবের উল্লেখ বা বর্ণনা করা হয় নাই। হেমাদ্রির নামে প্রচলিত বোপদেব-কৃত মুক্তাফলের কৈবল্য দীপিকা টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে—

"ভাবা এবাতিসম্পন্নাঃ প্রয়ান্তি রসতাম্ অমী।"

—স্থায়ী ভাবসমূহই অতিসম্পন্ন হইলে রসতা প্রাপ্ত হয়।

বাক্যটির অর্থ এই—স্থায়ী ভাবসমূহের সার্থকতা রসতা-প্রাপ্তিতে (ইহাই স্থায়ী ভাবের সংজ্ঞার চতুর্থ লক্ষণ) এবং তাহার জন্য প্রয়োজন, তাহাদের অতি-সম্পন্নতা অথবা অতিশয়তা-প্রাপ্তি। স্থায়ী ভাবের এই অতিসম্পন্নতা সম্ভবপর হয় প্রধানত সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবের সহায়তায়। বিচিত্র সঞ্চারী ভাব-সমূহের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলে তবে স্থায়ী ভাব নানারূপে উল্লসিত হইয়া সহজেই রস-মূর্তি লাভ করে। স্থায়ী ভাবের নব নব রূপে আস্বাদন একমাত্র সঞ্চারীর বিচিত্র সঞ্চরণের উপরই নির্ভর করে। বাস্তবিক পক্ষে সঞ্চারী পরিস্ফুট না হইলে স্থায়ী ভাবের সম্যক উপলব্ধি হয় না। স্থায়ী ভাবের স্থিরত্ব, ব্যাপিত্ব, চমৎকারিত্ব এবং আস্বাদন-যোগ্যত্ব, অতএব রচনার কাব্যত্ব অনেক পরিমাণে নির্ভর করে সঞ্চারী ভাবসমূহের কুশল বিন্যাস এবং সূক্ষ্ম লীলাময় বিলাসের উপরে। এইজন্য ভারবি এবং বাসুকি নামক দুইজন আলঙ্কারিক পণ্ডিত সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবকেই রস বলিয়া বর্ণনা করিয়া উহার সুস্পষ্ট স্তুতিবাদ গাহিয়াছেন।

শকুন্তলা যেখানে দুষ্মন্তের গোপন-দর্শন লালসায় ছলনা করিয়া পদতল হইতে কুশাঙ্কুর এবং তরুশাখা হইতে বল্কল মোচন করিতে লাগিল, সেখানেই সঞ্চারী ভাবের সংযোগে স্থায়ী ভাব—রতি বা পূর্বরাগ উজ্জ্বল হইয়া নিশ্চিত সাহিত্যিক রূপ লাভ করিল।

বৈষ্ণব সাহিত্যের পরম সাধিকা শ্রীমতী রাধিকার কথাই ধরা যাক। সেই অপূর্ব কৃষ্ণরতি, তাহার প্রকাশ কত বিচিত্র তরঙ্গে তরঙ্গে! রাধিকা কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়াছে, তাহার প্রাণ আকুল হইয়াছে। কদম্বতলায় সে রূপ নিরীক্ষণ করিয়া রাধিকা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছে। আমরা সহজ কথায় বলি, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে রাধিকার চিত্তে রতিভাবের উদয় হইয়াছে। রতি একটি স্থায়ী ভাব। রাধিকার চিত্তে এই ভাবের পোষণ ও প্রকাশ কোথায়? রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা ও ধ্যান করিতে করিতে মেঘের প্রতি চাহিয়া থাকে, একদৃষ্টি দিয়া ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ দেখিতে থাকে। কৃষ্ণকে রাধিকা পাইতেছে না,—বিষাদে তাহার চিত্ত ভরিয়া যায়, সে চঞ্চল হইয়া ঘরে আর বাহিরে যাতায়াত করিতে থাকে। একদিন ঘন বর্ষণরত শ্রাবণ-রজনীতে পালঙ্কে শুইয়া শুইয়া রাধিকা স্বপ্নের ঘোরে শ্রীকৃষ্ণের সাদরস্পর্শ পাইয়া হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠে। একদিন সে দুর্যোগের তিমির রজনী অগ্রাহ্য করিয়া চলে অভিসারে, লজ্জায় তাহার পা সরে না, কৃষ্ণ কি ভাবে তাহাকে গ্রহণ করিবেন ভাবিয়া শঙ্কায় তাহার বুক দুরু-দুরু কাঁপিতে থাকে। তারপর যখন সে শোনে, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে, তখন তাহার অন্তরে জ্বলিয়া উঠে ঈর্ষা আর অসূয়া, চন্দ্রাবলীকে গালি দিতে দিতে সে সহসা মোহ-গ্রস্ত হইয়া ভূমিতে অচেতন হইয়া পড়িয়া যায়।

লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, রাধিকার রতিভাব বা অনুরাগের সাগরে কেবলই তরঙ্গ উঠিতেছে আর পড়িতেছে, আবার নূতন তরঙ্গ উঠিতেছে। একবার চিন্তা, আবার বিষাদ, পরক্ষণে স্বপ্নাবস্থা, আবার হর্ষ লজ্জা, শঙ্কা ঈর্ষা, অসূয়া মোহ—আরও কত ভাবের উদয়-বিলয় চলিল। সাগরবক্ষে তরঙ্গের ন্যায় মূল রতিভাব বা ভালবাসাকে তাহারা নব নব রূপে পুষ্ট ও প্রকাশ করিতে লাগিল। এই ভাবগুলিই সঞ্চারী বা ব্যভিচারী। ইহাদের বাদ দিয়া স্থায়ী ভাবের অতিসম্পন্নতা, আস্বাদ্যতা, বা রস-রূপে স্ফূর্তি—কিছুই সম্ভবপর নয়। এইজন্য ভাবপ্রকাশন-গ্রন্থে শারদাতনয় বলেন,—

"উন্মজ্জন্তো নিমজ্জন্তঃ কল্লোলাশ্চ যথার্ণবে।
তদ্বোৎকর্ষং বিতন্বন্তি যান্তি তদ্রূপতামপি ॥
স্থায়িন্যুন্মগ্ন-নিমগ্না স্তথৈব ব্যভিচারিণঃ।
পুষ্ণন্তি স্থায়িনং স্বাংশ্চ তত্র যান্তি রসাত্মতাম্ ॥"

—কল্লোলগুলি যে প্রকার সমুদ্রে একবার উত্থিত হয়, আবার বিলীন হয় এবং এইরূপে তাহারা উৎকর্ষ বিস্তার করিয়া তাহার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়, ব্যভিচারী ভাবগুলিও সেই প্রকার স্থায়ী ভাবে উন্মগ্ন-নিমগ্ন হইয়া নিজ নিজ স্থায়ী ভাবকে পোষণ করে এবং রস-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

"স্থায়িন্যুন্মগ্ন-নিমগ্নাঃ"—স্থায়ীভাবে একবার ডুবিতেছে, আবার উঠিতেছে! কবিরাজ বিশ্বনাথও ব্যভিচারী ভাবগুলি সম্বন্ধে সাহিত্য-দর্পণ গ্রন্থে ওই একই মন্তব্য করিয়াছেন।

আচার্য অভিনবগুপ্ত অভিনবভারতী ভাষ্যে একটি জমকালো উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া স্থায়ী ও ব্যভিচারী ভাবের বিচিত্র সম্পর্ক ও লীলাবিলাস বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন; এবং আচার্যপাদই এই বিষয়ে এক হিসাবে প্রথম ব্যাখ্যাতা এবং প্রধান ব্যাখ্যাতা। তিনি স্থায়ী ভাবসমূহকে রক্ত, পীত, নীল প্রভৃতি নানা বর্ণদ্বারা রঞ্জিত কতকগুলি সূত্র, এবং ব্যভিচারী ভাবসমূহকে ক্ষণিক উদয়শালী বিচিত্র লীলাগর্ভ কতকগুলি স্ফটিক কাচখণ্ডের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সূত্রে যেমন স্ফটিকখণ্ডসমূহ গ্রথিত হইয়া মাল্যরূপ ধারণ করে, স্থায়ী ভাবের দ্বারা সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া তেমনই ব্যভিচারী ভাবসমূহ অপরূপ কাব্য-শ্রী ধারণ করে। অন্তরালবর্তী প্রাণ-স্বরূপ যে সূত্রসমূহ দ্বারা কাচখণ্ড-সমূহ বিধৃত হয়, তাহাদেরই বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উহারা পদ্মরাগ, মরকত, কখনও বা মহানীলমণির আকারে প্রতিভাত হইতে থাকে। কেবল তাহাই নয়। প্রত্যেক দুইটি স্ফটিকখণ্ডের মধ্যবর্তী শূন্য স্থান বিচিত্র রত্নের আকারে দীপ্যমান ওই স্ফটিকখণ্ডদ্বয়ের নানা বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া এক মায়ালোকের প্রতীতি জন্মায়, ঠিক এইরূপেই কাব্যের মায়ালোকে রতি, শোক, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের বৈচিত্র্যে রঞ্জিত হইয়া মনোহর হইয়া উঠে ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবসমূহ। এবং পরক্ষণেই অথবা সঙ্গে সঙ্গেই ব্যভিচারী ভাবসমূহের বিস্ময়কর প্রতিবিম্বনে তাহাদের প্রতিবিম্বিত বৈচিত্র্যসমূহ সূত্র-স্থানীয় স্থায়ী ভাব সকলকে পুনরায় নব সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়া অলৌকিক রমণীয়তার সৃষ্টি করে। আসল কথা হইতেছে এই—অন্তরালবর্তী স্থায়ী ভাবের সূত্রে সঞ্চারী ভাবসমূহ গ্রথিত রহিয়াছে এবং চিত্ত-ভূমির সহিত তাহাদের স্থায়ীভাব-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কোন যোগ নাই; স্থায়ী ভাবেই তাহাদের উদয়, অবস্থান ও বিলয়, স্থায়ী ভাবেই তাহাদের বিচিত্র বিলাস এবং এই বিলাসের সাক্ষাৎকলেই স্থায়ী ভাবের অপরূপ

রমণীয়তা এবং আস্বাদনীয়তা। ইহাকেই আমরা বলি, স্থায়ী ভাবের রসমূর্তি লাভ। স্থায়ী ভাবের এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিয়াই ভরতমুনি বলিয়াছেন,—স্থায়ী ভাব কাব্যে পাত্র-মিত্র-পারিষদ্‌বর্গ পরিবেষ্টিত রাজার ন্যায় বিরাজমান।

(৪) স্থায়ী ভাবের শেষ সার্থকতা সাক্ষাৎ রস-প্রকাশে। ইহা উপরের প্রসঙ্গে দুই-এক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। বিষয়টির সম্যক আলোচনার জন্য পৃথক প্রবন্ধের অবতারণা আবশ্যক।

শ্রীসুধীরকুমার

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

তারা পিয়ারা সাহেবকে সেলাম ক'রে দাঁড়াতেই সে আমাদের বললে, আপনাদের জামার মাপ নিতে এসেছে।

শুনে প্রথমটা আশ্চর্যই লাগল। উঠতে কিন্তু কিন্তু করছি দেখে আসরের এক বৃদ্ধ বললেন, যান যান, মাপটা দিয়ে এসে গল্প করবেন 'খন।

দরজী আমাদের দুজনের মাপ নিয়ে কাপড় পছন্দ করতে বললে। দু-তিন রকমের ছিট পছন্দ ক'রে দিতে দরজী কুনিশ ক'রে চ'লে গেল। পিয়ারা সাহেবের ঘর থেকে ফিরে গিয়ে দেখি, সেখানে আমাদের জন্যে ধোয়া কোরা ধুতি ও শাড়িতে মিলিয়ে বারোখানা কাপড় অপেক্ষা করছে।

সেই দিনই সন্ধ্যার একটু পরে দরজী এসে ছটা জামা দিয়ে গেল আর বললে, বাকি ছটা কাল এমন সময় এসে দিয়ে যাব।

হঠাৎ এতগুলো জামা কাপড় পেয়ে, ভিক্ষার সামগ্রী হ'লেও, খুবই খুশি হওয়া গেল।

রাত্রে আহারাদির পর আমাদের পরমস্ত ব্যাপার ছেড়ে নতুন ধুতি ও সেই রঙিন না-শার্ট না-পাঞ্জাবি না-পিরান জামা চড়িয়ে শুয়ে পড়লুম।

পরের দিন পিয়ারা সাহেব আমাদের আলাদা ডেকে দুজনকে পাঁচটা ক'রে টাকা দিয়ে বললে, খরচ করুন, যখন যে জিনিসের দরকার পড়বে, আমি আপনাদের খাদিম রয়েছি, আমাকে জানাবেন।

এর পরদিনই পিয়ারা সাহেবের কাছ থেকে দোয়াত কলম, চিঠি লেখবার কাগজ ও খাম চেয়ে নিয়ে দুজনে আলাদা আলাদা ক'রে দিদিমণিকে দুখানা

দীর্ঘ পত্র লেখা গেল। তাতে বড়কর্তার কথা, টাকা কেড়ে নেওয়া, প্রহার ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত তন্নতন্ন ক'রে লিখে দিলুম। দুজনেই এ কথা লিখে দিলুম যে, পত্রপাঠ মাত্র টাকা পাঠিয়ে দেবে, টাকা পেলেই আমরা ফিরে যাব।

সময়টা যে কি ভীষণ উৎকণ্ঠায় কাটতে লাগল, তা বোধ হয় আর লিখতে হবে না।

চিঠির জবাব আসবার সময় উত্তরে যাওয়ার দু-তিন দিন পরে একদিন পিয়ারা সাহেবকে জিজ্ঞাসাই ক'রে ফেললুম, আচ্ছা, সেদিন চিঠিটা ঠিক ডাকে দেওয়া হয়েছিল তো?

পিয়ারা সাহেব চমকে উঠে বললে, সে কি! তা কখনও হতে পারে! আচ্ছা, আমি এখুনি তাকে ডাকাচ্ছি।

তখুনি সে ব্যক্তির তলব পড়ল। সে বললে, হুজুরের হুকুম পাওয়া মাত্র আমি নিজে ডাকখানায় গিয়ে দু-পয়সার টিকিট লাগিয়ে বাক্সে ফেলে এসেছি।

কি আর করা যাবে! আবার চিঠি লেখবার সরঞ্জাম চেয়ে নিয়ে দিদিমণিকে দীর্ঘতর এক পত্র লেখা গেল। সেদিনকার চিঠিতে যা গিয়েছিল তা তো লিখলুমই, তা ছাড়া আরও অনেক কথা লেখা হ'ল। পিয়ারা সাহেব চিঠিখানা হাতে নিয়ে বললে, এটা তা হ'লে রেজিস্টারি ক'রে পাঠানো যাক, কি বলেন?

বললুম, তা হ'লে তো ভালই হয়।

তখুনি সেই লোকটাকে ডেকে পিয়ারা সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, চিঠি রেজিস্টারি করতে পার?

লোকটার উজবুগের মতন চাউনি দেখে মনে হ'ল যে, সে পারবে না। পরিতোষ বললে, ডাকঘরটা আমাদের দেখিয়ে দাও, আমরাই রেজিস্টারি ক'রে দেব 'খন।

আমাদের উঠতে দেখে পিয়ারা সাহেব বললে, আচ্ছা, আমার একটা পরামর্শ শোনেন তো বলি। এ চিঠিখানা এমনিই যাক, এর যদি জবাব না আসে, তখন রেজিস্টারি করা যাবে।

সভাস্থ একজন রসিকতা ক'রে বললে, সে চিঠিরও যদি জবাব না আসে?

পিয়ারা সাহেব তখুনি হেসে উত্তর দিলে, তা হ'লে 'পিরিপেট' তার করা হবে, উত্তর না দিয়ে আর উপায় থাকবে না।

কথাটা উচ্চারিত হওয়া মাত্র সভায় প্রশংসার উচ্চরোল উঠল। সভাস্থ

সকলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে সাহেবজাদার বুদ্ধির তারিফ করতে লাগল। সেই তারিফের তুফান উপেক্ষা ক'রেই লোকটা আমাদের চিঠিখানা হাতে নিয়ে ছুটল ডাকঘরের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু হায়! সেখানারও উত্তর পাবার দিন পেরিয়ে গেল, তবু দিদিমণির কোনও খবর পেলুম না। আমরা ঠিক করলুম, আর সেখানে চিঠি লিখব না; কিন্তু পিয়ারী সাহেব একদিন নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা ক'রে জবাব পাই নি শুনে বললে, দ'মে যাবেন না, এখনও দু-দুটো অস্ত্র আমাদের হাতে আছে। আপনারা আবার লিখুন।

এবারে শুধু পরিতোষ লিখলে, দিদিমণিকে একখানা ও বিশুদাকে একখানা। আমি আর লিখলুম না; কি জানি কেন, আমার মনের মধ্যে কয়েকদিন থেকেই কে যেন নিরন্তর ব'লে চলেছিল, রাজকুমারীর মতন দিদিমণির অধ্যায়ও শেষ হয়ে গেল। একটা ব্যথাভরা ঔদাস্যের পীড়নে নিষ্পেষিত হতে লাগলুম।

এবারেও নির্দিষ্ট দিন অতীত হয়ে যাবার পর চিঠি এল না বটে, কিন্তু রেজিস্টারি চিঠির রসিদ ফিরে এল—মনোরমা দেবীর বদলে সই ক'রে নিয়েছেন অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

আর বাক্য-বিনিময়ের অবকাশ রইল না। উভয়েই মর্মে মর্মে বুঝতে পারলুম, দিদিমণির সঙ্গে চিরদিনের জন্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

দিদিমণির সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের কথাটা আজ যত সহজে লিখে ফেলতে পারলুম, সেদিন কিন্তু তত সহজে সে আঘাতকে স্বীকার করতে পারি নি। সৃষ্টিকর্তা আমার হৃদয়যন্ত্রটিকে ঘাতসহ ক'রে তোলবার জন্যে তখন থেকেই যে বনেদ গাঁথতে শুরু করেছিলেন, সে কথা কল্পনাও করতে পারি নি।

এতদিনে আমাদের এই নতুন কর্মক্ষেত্রকে অন্তরের সঙ্গে মেনে নেবার জন্যে মনের মধ্যে নতুন ক'রে লড়াই শুরু হ'ল। এখানে আমাদের কোন কষ্টই নেই। এত খাতির যত্ন আদর, এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চোখের সামনে থাকলেও মানসলোকে জ্বলজ্বল করত দিদিমণি ও তাদের সংসার। কামলোকে নিয়ত গুঞ্জরিত হ'ত একই তান—কবে সেখানে ফিরে যাব, কবে আবার জীবনের সেই সুখের দিনগুলি শুরু হবে, যে জীবনযাত্রায় অল্পদিন হ'লেও আমরা একান্তই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম, নিষ্ঠুর বিধাতা চোরের মার মেরে যে অভ্যেস ছুটিয়ে দিলেন।

রেজিস্টারি চিঠির রসিদে শ্রীমান বড়ে ভাইয়ের দস্তখত দেখে নিমেষে আমাদের আশার প্রাসাদ ভূমিসাৎ হয়ে গেল। এখানে সেখানে ঘুরি, আমোদ আহ্লাদ ও আড্ডায় যোগ দিই ; কিন্তু কোথায় যেন একটা অস্বস্তিকর খোঁচা স্মরণে বাজে, কিছুই ভাল লাগে না।

আমাদের হালচাল দেখে একদিন পিয়ারা সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, কদিন থেকেই লক্ষ্য করছি, আপনারা দুজনেই মনমরা হয়ে আছেন, কোন কারণে আমাদের ওপর নারাজ হয়েছেন কি ?

বললুম, আপনাদের ওপর নারাজ হব—এত বড় অকৃতজ্ঞ আমাদের মনে করবেন না। এখানে আমরা খুবই সুখে আছি।

পিয়ারা সাহেব আবার বললেন, কিন্তু মাপ করবেন, আপনাদের চেহারা দেখে আমার মনে হচ্ছে, নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে। আমি আপনাদের অধম ছাত্র, আমার দ্বারা যদি কিছু হয় তো বলুন।

পিয়ারা সাহেবের কথা শুনে পরিতোষ কি একটা বলতে উদ্যত হয়ে থেমে গেল। ফিরে দেখলুম, তার চোখে মেঘ থমথম করছে। তার হালচাল দেখে থমকে গিয়ে পিয়ারা সাহেব কিছুক্ষণের জন্যে চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, যেখানে তিন-তিনখানা চিঠি লিখলেন, সেখান থেকে কোন উত্তর এসেছে কি ?

পরিতোষের অশ্রু তখন গলায় ঠেকেছে। সে কি একটা বললে, কিন্তু গলা দিয়ে স্পষ্ট কিছু বেরুল না। তার অবস্থা দেখে আমিই বললুম, উত্তর আসে নি বটে, কিন্তু সেখান থেকে আর কখনও যে উত্তর আসবে না, তার সঙ্কেত এসেছে।

আমার কথাটা ভাল বুঝতে না পেরে পিয়ারা সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, কি এসেছে ?

এবার তাকে সমস্ত কথা খুলে বলা গেল। কি রকম ক'রে আমরা দিদিমণিদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলুম, কেমন ক'রে ক্রমে আমাদের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হয়ে উঠেছিল ; বড়কর্তার প্রথম দিনের ব্যবহার, দিদিমণির আশ্বাস ও বড়কর্তাকে বাড়ি থেকে দূর ক'রে দেওয়া ; তারপর কাশীতে সেই অমানুষিক অত্যাচার, সবার ওপরে দিদিমণির চিঠিগুলো গাপ করা। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে দিদিমণিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ইতিহাস তন্নতন্ন ক'রে

তাকে খুলে বললুম। আমাদের কথা শুনতে শুনতে পিয়ারা সাহেবের স্বভাব-রক্ত বর্ণ আরও লাল হয়ে উঠতে আরম্ভ করল।

কাহিনী শেষ ক'রে চুপ করলুম। পিয়ারা সাহেবও কিছুক্ষণ কোনও কথা বললে না। সে সেই রকম লাল মুখ নিয়ে নীচের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে লাগল গভীরভাবে। তার এ মূর্তি এর আগে কখনও দেখি নি। সদাসর্বদাই তার মুখখানা ঘিরে ভারি একটা মিষ্ট হাসি জ্বলজ্বল করত। চাকরবাকরদের ধমক দেবার সময় তার কণ্ঠস্বর কিছু উচ্চগ্রামে চড়লেও মুখে সেই হাসিটুকু কিন্তু লেগেই থাকত, তার এমন পরুষ মূর্তি এই প্রথম চোখে পড়ল।

কিছুক্ষণ সেই ভাবে থেকে আবার সেই পুরোনো হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, সেই লোকগুলো আপনাদের দুখানা কলকাতার টিকিট দিলে মাত্র? পথের দু-দিনের, অর্থাৎ আপনাদের খাওয়াদাওয়ার জন্যে কিছু খরচপত্র দিলে না?

না।

পিয়ারা বললে, ওই যে কি নাম লোকটার, অমরনাথ না কি, লোকটা আদমজাদ্ নয়, একেবারে হায়ওয়ান অর্থাৎ হিংস্র জানোয়ার।

এবার পরিতোষ গ'র্জে উঠল, ঠিক বলেছেন আপনি, লোকটা মানুষরূপী জানোয়ার।

পিয়ারা সাহেব আবার সেই রকম ঘাড় নীচু ক'রে বসল চিন্তা করতে। কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে মুখ তুলে ভারি মিষ্টি ক'রে বললে, দেখুন, বয়সে আমার চেয়ে ছোট হ'লেও আপনারা আমার শিক্ষক, আমি ছাত্র। বলুন, এ বান্দা কি ভাবে আপনাদের খিদ্‌মতে লাগতে পারে? কোনও দ্বিধা করবেন না, সম্ভব-অসম্ভবের কথা বিচার করবেন না। শুধু মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করুন, আপনাদের আশীর্বাদে তা কার্যে পরিণত করবার মতন হিম্মৎ এ বান্দা রাখে।

কথাগুলোর বাচ্যার্থ ঠিক বুঝতে না পারলেও ব্যঙ্গার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে দেরি হ'ল না। অমরনাথ বান্দ্যোপাধ্যায়কে কি করা হবে, কি সাজা দিলে সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ হয়, সেই চিন্তায় মাথার মধ্যে গোলমাল বেধে যেতে লাগল, বাঁশবনে ডোমকানার অবস্থায় প'ড়ে গেলুম।

বোধ হয় আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরে পিয়ারা সাহেব বললে, কয়েক রকমে তাকে জব্দ করা যেতে পারে। ধরুন, আপনারা বলছেন যে, দিদিমণির হাতে যদি আপনাদের চিঠিগুলো পড়ত, তা হ'লে তিনি নিশ্চয় জবাব দিতেন।

ছাতে। ছাতের তিন দিক অর্থাৎ সামনে রাস্তার দিক ছাড়া, মানুষের চেয়ে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। আর সেই দেওয়ালের মাঝে মাঝে চমৎকার সব বাহারে কুলুঙ্গি। খোলা ছাদের দেওয়ালে এমন সব সুদৃশ্য কুলুঙ্গি রাখবার মানে বুঝতে পারলুম না। বোধ হয় সমতল দেওয়াল খারাপ দেখায় ব'লে বাহার করবার জন্যে সেগুলি করা হয়েছে।

সেখান থেকে কয়েক ধাপ ওপরে উঠে আর একটা ছাতে গিয়ে পৌঁছলুম। সামনেই দেখা গেল, একজন সঙ্গিনধারী পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে, ছবির মতন স্থির। অনতিদূরেই, ছাতের প্রায় সীমানায় রাস্তার দিকে মুখ ক'রে পাশাপাশি দুটো গদি-মোড়া চেয়ারে দুজন বৃদ্ধ ব'সে আছেন। অর্থাৎ আমরা মাত্র তাঁদের পিঠের দিকটাই দেখতে পেলুম। এক পাশে ঘড়াঞ্চের মতন উঁচু একটা কাঠের টেবিলের মতন জায়গায় একটা জরির টুপি, বুঝতে পারলুম এই টুপিটাই দূর থেকে মন্দিরচূড়ায় সুবর্ণকলসের মতন দেখাচ্ছিল, সূর্যাস্তের আভায় তখনও সেটা ঝকঝক করছিল।

আমাদের দেখে পাহারাদার জিজ্ঞাসা করলে, কি চাই তোমাদের ?

বললুম, মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ওই তো মালিক সামনেই ব'সে আছেন।

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলুম। দেখলুম, দুই বৃদ্ধ পাশাপাশি চোখ বুজে ব'সে আছেন। দুজনের মাথায়ই ধপধপে সাদা বাবরি-চুল ও মুখে লম্বা সাদা দাড়ি। আন্দাজ করবার মতন বয়স তাঁদের পেরিয়ে গিয়েছে, তাই সেটা ঠিক অনুমান করতে পারলুম না। আমরা দুটো লোক যে তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম, পাশে কেন, প্রায় সামনে বললেও চলে, তা কেউ একবার ফিরেও দেখলেন না।

দুজনে একরকম নিশ্বাস বন্ধ ক'রে সেই ধ্যানী মূর্তিযুগলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তাঁরা পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে ব'সেছিলেন, দেখতে দেখতে তাঁদের মুখের ওপর ছায়া ঘনিয়ে আসতে লাগল, জরির শিরস্ত্রাণ ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। একবার পাহারাদারের দিকে তাকালুম, দেখলুম, সেও নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু তার করধৃত বন্দুকের মাথার কিরিচের ডগাটুকু চকচক করছে।

মনের মধ্যে কে যেন খোঁচা দিয়ে ধমকে উঠল, কদিনের এই দুরন্ত

আমরা দুজনেই ব'লে উঠলুম, নিশ্চয়ই।

পিয়ারা সাহেব বললে, তা হ'লে এ কথা নিশ্চিত যে, এই লোকটাই তাঁর চিঠিগুলো গাপ করে, আর এ কথাও ঠিক যে, চিঠি সে বাড়ি থেকে গাপ করে না, কারণ বাড়িতে ঢোকবার হুকুম তার নেই। আমার মনে হয়, ঐখানকার ডাকঘরের কোন কর্মচারীর সঙ্গে তার যোগ আছে।

আমাদেরও তো তাই মনে হচ্ছে।

তা হ'লে ডাকঘরের সেই কর্মচারীকে খুঁজে বের ক'রে তাকে টাকা দিয়ে হাত ক'রে, চিঠি মেরে দেওয়ার অপরাধের জন্যে আপনাদের অমরনাথের নামে নালিশ করা যেতে পারে। মামলার সময় ডাকঘরের লোকটা সাক্ষী দেবে যে, এই লোকটার হাতে চিঠিগুলো সে দিয়েছিল এই বিশ্বাসে যে, সেগুলো যথাস্থানেই পৌঁছবে।

পিয়ারা সাহেব ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, এ কথা যদি প্রমাণ করতে পারা যায় তো নিশ্চয় তার ভাল রকম সাজা হয়ে যেতে পারে।

ছাত্রের আইনজ্ঞান দেখে পুলকিত হয়ে বললুম, সেই ঠিক হবে, লোকটা যে রকম বদমাইশ, তাতে তার বিশেষ শিক্ষা হওয়া দরকার।

একটু কি ভেবে নিয়ে পিয়ারা সাহেব বললে, আচ্ছা ধরুন, ডাকঘরের কর্মচারীর সাক্ষ্যের পর আপনাদের দিদিমণি যদি তাঁর ভাইকে বাঁচাবার জন্যে বলেন, সব চিঠিই তাঁর হস্তগত হয়েছিল ; কিন্তু তিনি ইচ্ছে ক'রেই কোন জবাব দেন নি। তা হ'লে? তা হ'লে তো ওই লোকটাই উল্টে নালিশ ক'রে আমাদের সাজা দিইয়ে দিতে পারে।

জোর ক'রে বললুম, সে কখনও হতে পারে না, সে হওয়া অসম্ভব। দিদিমণি তাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। সে-ই ওকে বাড়ি থেকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের সামনে।

পিয়ারা সাহেব মৃদু হেসে বললে, আচ্ছা, না হয় ধ'রেই নেওয়া গেল যে, পাতানো ভাইদের জন্যে তিনি নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবেন। কিন্তু তাঁর বাবা এখনও বেঁচে আছেন। আপনারাই বলছেন, বাপ এই ছেলেকে খুবই ভালবাসেন, দিদিমণিও এ কথা আপনাদের অনেকবার বলেছেন, কেমন কিনা?

বললুম, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

পিয়ারা বললে, তা হ'লে বুঝুন। বাপ যদি মেয়েকে অনুরোধ করেন যে, ভাইয়ের বিরুদ্ধে তুমি সাক্ষী দিও না। তা হ'লে আপনাদের দিদিমণি কি করবেন? নিশ্চয় আপনারা এই ক-দিনে তাঁর বাপের চাইতে আপনার লোক হয়ে যান নি!

পিয়ারা সাহেবের কথাগুলো ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে বুঝতে পারলুম, সে ঠিকই বলছে। কি আর বলব, চুপ ক'রে রইলুম।

কিছুক্ষণ বাদে পিয়ারা সাহেব বললে, আর একটা কাজ করা যেতে পারে— আমরা হ'লে তো তাই করতুম, কিন্তু আপনাদের মরজি হবে কি না বলতে পারি না।

দুজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, কি কাজ?

পিয়ারা সাহেব বললে, যদি হুকুম করেন তো আপনাদের আসামীকে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় আপনাদের পায়ের কাছে এনে ফেলে দিতে পারি। তারপর তার নাক কান ছেঁটে দিতে পারেন অথবা চোখ কানা বা হাত পা নষ্ট অথবা যদি প্রাণদণ্ড দেন সে হুকুমও তামিল হয়ে যেতে পারে, ভয় পাবেন না, আপনাদের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগবে না।

কথাটা শুনে আনন্দের চোটে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলুম, মাথা ঘুরতে লাগল লাট্টুর মতন বনবন ক'রে।

পরিতোষটা তড়াক্ ক'রে হাঁটু গেড়ে উঠে যাত্রার ঢঙে বলতে আরম্ভ ক'রে দিলে, অর্জুন! অর্জুন! An Arjun is come to judgement। হে পরন্তপ! আপনি ধন্য এবং আপনার মতন মহানুভবকে ছাত্ররূপে পেয়ে আমরাও ধন্য হলুম।

সে ব'লে চলল, আমাদের তারিখে লেখা আছে, দ্বাপর যুগে আপনারই মতন একজন ছাত্র তাঁর গুরুকে ঠিক এই ভাবেই একদিন গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন, আর আজ কলিযুগে দিলেন আপনি।

সেই যাত্রার ঢঙেই ব'সে প'ড়ে পরিতোষ সাড়ম্বরে দ্রোণাচার্যের কাহিনী শুরু করতে যাচ্ছে, এমন সময় পিয়ারা সাহেব মিষ্টি হেসে বললে, সে কাহিনী আমার জানা আছে। দ্রোণ মহারাজ আর অর্জুনজীর কিস্‌সা তো?

একটু চুপ ক'রে থেকে পিয়ারা সাহেব সেই রকম হেসে আমাকে বললে,

কিন্তু দ্রোণ মহারাজ সেজন্য অর্জুনজীকে ভাল ভাল সব বাণ দিয়েছিলেন। আপনাদের শত্রু দমন করলে আমাকে কি দেবেন?

আমি বললুম, দ্বাপর যুগের সেসব অস্ত্র এ যুগে অচল হয়ে পড়েছে। আমরা আপনাকে এ যুগের প্রধান অস্ত্র বাক্যবাণ ছাড়বার কৌশল শিখিয়ে দেব। তাক বুঝে প্রয়োগ করতে পারলে ইতরবিশেষ সকলেই এতে ঘায়েল হয়, অথচ শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন থাকে না। আপনি বোধ হয় জানেন না, জাতিহিসাবে আমরা এই অস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছি। অতএব মাভৈঃ।

আমার কথা শুনে পিয়ারা উচ্চরবে হেসে উঠল। হাসি থামলে সেই রকম উচ্চকণ্ঠেই বলতে আরম্ভ করলে, বাহ্‌বা, বহোত খুব, খুব, খুব।

আরও বার পাঁচ-সাত 'খুব' কথাটি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে উচ্চারণ ক'রে বললে, ভারি খুশি করেছেন আপনারা, ভারি খুশি হয়েছি। আপনারা একটু বসুন, আমি এখুনি আসছি। যাবেন না যেন, আজ এক জায়গায় কুস্তির দঙ্গল দেখতে যাবার নিমন্ত্রণ আছে, সকলে মিলে যাওয়া যাবে।

কিছুক্ষণ বাদে পিয়ারা সাহেব দুটো চমৎকার, কিনারায় হাতের কাজ করা সিল্কের চাদর এনে আমাদের দিয়ে বললেন, ওড়িয়ে।

এখানকার হালচালই আলাদা।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা কুস্তির দঙ্গল দেখে এসে পিয়ারা সাহেবের খাশ দরবারে বিরাট আড্ডা ব'সে গেছে। চার-পাঁচজন লোক, তারা কুস্তি করে না বটে, কিন্তু কুস্তিবিদ্যা এবং কুস্তিগীরদের জীবনী সম্বন্ধে এক-একটি অথরিটি। তারা এক-একজন ক'রে অতীত ও বর্তমানের বড় বড় সব কুস্তিগীরদের জীবনী ও বড় বড় দঙ্গলের ইতিহাস বেশ জমাটি ক'রে ব'লে যাচ্ছিল। বিচিত্র তাদের জীবন-কাহিনী আর অসম্ভব তাদের শক্তিমত্তা! বাস্তব মানুষের এমন রূপকথার মতন জীবন এর আগে শুনি নি। আর সেই লোকগুলির বর্ণনা করবার কায়দাও চমকপ্রদ। শুনতে যে ভালই লাগছিল, তা অস্বীকার করব না; কিন্তু মাঝে মাঝে এ কথাও মনে হচ্ছিল যে, আমরা পিয়ারা সাহেবের খাশ দরবারে ব'সে আছি, না কোন গুলির আড্ডায় ঢুকে পড়েছি! সাদা চোখে মানুষ যে এমন সব অসম্ভব কাহিনী ব'লে যেতে পারে এবং লোকে তা বিশ্বাস করে, এই তার প্রথম অভিজ্ঞতা হ'ল।

যা হোক, রাত হয়ে যাচ্ছে, হয়তো নবাব সাহেবের আহারের সময় উত্তীর্ণ

হয়ে যাবে, এই মনে ক'রে ওঠবার উপক্রম করতেই পিয়ারা সাহেব বললে, বসুন, কোথায় যাচ্ছেন এরই মধ্যে?

বললুম, যাই, নবাব সাহেব হয়তো আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

পিয়ারা সাহেব রহস্য ক'রে বললে, রোজই তো নবাব সাহেবের সঙ্গে খানা খান, আজ না হয় এই গরিবের সঙ্গে খেলেন।

এর ওপর আর কথা চলে না। বসতেই হ'ল।

ক্রমে আসরের অনেকেই উঠে গেল। আবার দু-একটি ক'রে লোক এসে তাদের স্থান পূরণ করতে লাগল। এমনই চলেছে, এমন সময় একটি লোক ঘরের মধ্যে ঢুকতেই পিয়ারা সাহেব বললে, কি, নবাব সাহেবের আসতে আজ এত দেরি হ'ল যে?

লোকটা সহাস্যে উত্তর দিলে, এখানে এলে আপনি না খাইয়ে তো ছাড়বেন না। জানি, দেরি হবে, তাই কতকগুলো কাজ সেরে এলুম।

পিয়ারা সাহেব বললে, তা বেশ করেছ, তুমি একবার ছুটে হারোয়ার বাড়িতে গিয়ে বল যে, এক্ষুনি এসে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। যদি সে বাড়িতে না থাকে তো ব'লে এস, যত রাত্তিরই হোক আমার সঙ্গে দেখা করবে, সে না আসা পর্যন্ত আমি তার জন্যে এখানে অপেক্ষা করব।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই লোকটা ফিরে এসে বললে, হুজুর, হারোয়া বাড়িতে নেই, খবর দিয়ে এসেছি, ফিরলেই এখানে পাঠিয়ে দেবে।

কিছুক্ষণ পরেই প্রায় আসর-জোড়া দস্তরখান বিছানো হ'ল। তাড়া তাড়া শানকি ও বাটি আসতে লাগল।

পিয়ারা সাহেবের আসরে এই প্রথম খানা খেতে বসলুম। সে এক বিরাট ব্যাপার! সে আবার একলা কিংবা বাড়ির দু-চারজন লোকের সঙ্গে ব'সে খেতে পারে না, বিশেষত রাত্রের আহারের সময়। সে সময় রোজ দশ-পনেরো-জন বাইরের লোক তার সঙ্গে ব'সে খাওয়া চাই, নইলে তার খেয়ে তৃপ্তি হয় না। কোন কোন দিন খাবার সময় লোক কম পড়লে সেই রাত্রে চাকরদের এখানে সেখানে ছুটোছুটি করতে হয় লোক ডাকবার জন্যে। চাকরেরাও সেয়ানা—আড্ডায় লোকসমাগম কম দেখলেই তারা সন্ধ্যে থেকেই ছুটোছুটি করতে থাকে পিয়ারা সাহেবের মোসাহেবদের বাড়িতে বাড়িতে। তার এই সান্ধ্য-বিলাসের জন্য আলাদা বাবুর্চি, বাবুর্চিখানা, আলাদা মসালচি ইত্যাদি নিযুক্ত

আছে, সেই সকাল থেকে এ বেলার রন্ধনের আয়োজন শুরু হয়। এখানকার আহারাদির বাহুল্যও বেশি। কিন্তু বাহুল্য ও আড়ম্বরের তারতম্য যাই হোক না কেন, একটা বিষয়ে এই দু-জায়গাকার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত লক্ষ্য করলুম। নবাব সাহেবের সঙ্গে খানা খেতে খেতে মাঝে মাঝে মনে হ'ত, বুঝি বা ব্রহ্মোপাসনার আসরে বসেছি। এখানে মনে হতে লাগল, যেন কাঙালী-ভোজনের পংক্তিতে বসেছি।

আহারপর্ব শেষ ক'রে ঘরের ছেলেরা সব ঘরে ফিরে গেল। পিয়ারা সাহেব আমাদের ছাড়লে না। উঠি উঠি করছি দেখে সে বললে, যাবেন না। আপনাদের জন্যেই হারোয়াকে ডেকে পাঠিয়েছি, আজ রাতেই পরামর্শ ক'রে একটা যা হয় কিছু স্থির ক'রে ফেলা যাবে।

জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি হন কে?

আপনাদের দুশমনকে ধ'রে নিয়ে আসবার কথা বলেছি না! এই হ'ল সেই লোক, এ কাজ সে অনেকবার করেছে, এখনও করে। মোদ্দা কথা হ'ল, এই হ'ল তার পেশা।

এমন দুর্লভদর্শনকে দেখবার কৌতূহল হতে লাগল।

একটু পরেই ঘরের মধ্যে একজন লোক এসে পিয়ারা সাহেবকে কুনিশ ক'রে দাঁড়াল। এই লোকটির চেহারার কিছু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক বোধ করছি।

লোকটা অত্যন্ত ঢ্যাঙা আর অস্বাভাবিক রকমের রোগা। হাড়ের ওপরে স্রেফ চামড়াটুকু টান ক'রে বসানো মাত্র, মধ্যে মেদ-মাংসের চিহ্নমাত্রও নেই। শিরাগুলো যেন দেহ ত্যাগ ক'রে ঠিকরে বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচে, এমনই ফুলে রয়েছে। সরু, প্রায় আধ হাত লম্বা গলার ওপরে ইয়া বড় একটা শুকনো মাথা, অর্থাৎ মাথায় একগাছিও চুল নেই, খুলির ওপরে চামড়াটা একেবারে সেঁটে ব'সে আছে, শিরাগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। তার চুড়োয় আবার একটা উঁচু গোছের ছোট জরির টুপি চড়ানো—জরি অবশ্য মলিন হয়ে গিয়েছে। মুখের অবস্থাও তাই, দুই গালে অতলস্পর্শী খোঁদল। তার ওপর বেশ ঘন একজোড়া গোঁফ, একটি চোখের অর্ধেকটা সাদা, সেটা ছানি কিংবা কোন আঘাতের চিহ্ন কি না তা বোঝা গেল না। ফরসা, কালো, মিশকালো, শ্যাম ও উজ্জল শ্যামবর্ণকে বেশ ক'রে একত্রে মেশালে যে রঙ হয়, তাই হচ্ছে তার গায়ের রঙ।

ইনি আবার শৌখিন কম নন। গায়ে ফিনফিনে একটা ঢোলা পাঞ্জাবি, এমন ঢোলা যে তার মধ্যে তার মতন পাঁচ-সাতটা লোক অনায়াসে লুকোচুরি খেলতে পারে। পাঞ্জাবির ওপরে একটা গা-সাঁটা গরম ওয়েস্ট্‌কোট। এর ওপর আবার সেই খ্যাংরাকাঠির মতন পায়ে চুড়িদার পাজামা। সে রকম একখানি মাল সচরাচর চোখে পড়ে না।

লোকটি কুনিশ ক'রে দাঁড়াতেই পিয়ারা সাহেব তাকে অভ্যর্থনা করলে, এস এস, চুন্নি মিয়া, কি খবর? আজকাল তো বাবুসাহেবের দর্শন পাওয়াই ভার!

চুন্নি মিয়ার কঙ্কাল মৃদু হেসে বললে, হুজুর, রুটির ফিকিরে দিনরাত ব্যস্ত থাকি, তাই আপনার দরবারে রোজ হাজির হতে পারি নে, নইলে সময় পেলেই তো আসি।

অদ্ভুত কণ্ঠস্বর! সে কেমন একটা শাঁই-শাঁই আওয়াজের উচ্চ নীচ সমষ্টি মাত্র। আমার মনে হ'ল, চুন্নি মিয়া যেন জিভের বদলে আলজিভ দিয়ে কথা কইলে।

পিয়ারা সাহেব বললে, কাল রাত্রে আমার সঙ্গে খানা খাবে, অনেকদিন একসঙ্গে ব'সে খাই নি।

চুন্নি মিয়া নীরবে অভিবাদন ক'রে বললে, হুজুরের যা মর্জি।

চুন্নি মিয়া এবারে জুতো ছেড়ে আমাদের কাছে এসে বসল। তাকে দেখিয়ে পিয়ারা সাহেব আমাদের বললে, এই যে আমাদের চুন্নি মিয়াকে দেখছেন, একে সামান্য লোক মনে করবেন না, ইনি মানুষরূপী শের অর্থাৎ ব্যাঘ্র।

পরিতোষ ব'লে ফেললে, তাতে আর সন্দেহ কি!

দেখলুম, চুন্নি মিয়ার মুখ-কঙ্কাল কিঞ্চিৎ প্রসন্ন ভাব ধারণ করলে।

পিয়ারা সাহেব বলতে লাগল, এর এখন যা চেহারা দেখছেন, তা চুন্নি মিয়ার ভূতের চেহারা, আমার দুটোর মতন চেহারা ছিল এর আগে।

দেখলুম, চুন্নি মিয়ার মুখ-কঙ্কাল ক্রমেই অপ্রসন্ন হয়ে উঠতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলুম, তা হ'লে এমন চেহারা হয়ে গেল কি ক'রে?

পিয়ারা সাহেব মৃদু হেসে বললে, রোগে।

কি রোগ? হকিম সাহেবকে দেখালে হয় না?

পিয়ারা সাহেব ওপর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, একমাত্র ওই হকিম ছাড়া এ রোগ ওর কেউ সারাতে পারবে না, আমাদের চুন্নি মিয়া সাম্খিয়ার শৌখিন।

সে আবার কি জিনিস?

সে একরকম নেশার জিনিস। কেন, সাম্খিয়ার নাম শোনেন নি আপনারা?

পিয়ারা সাহেবের প্রশ্ন শুনে পরিতোষ হাসতে হাসতে বললে, সাহেবজাদা! আমরা নেশা-সমুদ্রের কূলে ব'সে সবেমাত্র এই নুড়িখেলা আরম্ভ করেছি। উপযুক্ত গুরু পেলে ও সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পারব এই আশা মাত্র রাখি। তবে ওই যে কি বললেন, ওর কথা শুধু আমরা কেন, আমাদের দেশেও বোধ হয় কেউ শোনে নি। আমরা গোটা কয়েক মামুলি নেশা, যেমন—মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, ভাঙ, আফিম ইত্যাদির কথা জানি।

পরিতোষের কথা শুনে পিয়ারা সাহেব উচ্চ হেসে বললে, জী হাঁ। সাম্খিয়া নেহাৎ তুচ্ছ নয়। এর জন্যে চুন্নি মিয়াকে দৈনিক দেড় পো ক'রে কাঁচা ঘি খেতে হয়।

কথাটা শুনে চমকে উঠলুম, বলেন কি?

পিয়ারা সাহেব বললে, জী হাঁ। নইলে শরীর বড় শুকিয়ে যায়।

এবারে চুন্নি মিয়া আমাদের বললে, হাঁ বাবুজী, সাম্খিয়া বড্ড ঘি খায়।

কথাটা ব'লেই পিয়ারা সাহেবের দিকে ফিরে বললে, আজকাল আর দেড় পোতে শানাচ্ছে না, প্রায় আধ সের ক'রে টানতে হচ্ছে।

আমি আর থাকতে না পেরে ব'লে ফেললুম, চুন্নি মিয়া, আমার বেয়াদপি মাফ করবেন, রক্ত মাংস মজ্জা প্রভৃতি আসুরিক ভোজ্যের প্রতিও সাম্খিয়া মহারাজের বিশেষ অরুচি আছে ব'লে তো বোধ হচ্ছে না!

চুন্নি মিয়া আবার অপ্রসন্ন হলেন।

যা হোক, কিছুক্ষণ গালগল্প ওড়বার পর পিয়ারা সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করলে, হারোয়ার কি খবর? তাকে ডেকে পাঠিয়েছি, অনেকক্ষণ হ'ল!

চুন্নি মিয়া বললে, হুজুর, সেইজন্যেই তো আমি এসেছি। বাড়িতে শুনলুম, আপনি হারোয়াকে তলব করেছেন। কিন্তু সে তো বিশেষ একটা কাজে বিদেশে গিয়েছে, আমার দ্বারা যদি কিছু হয়, তাই ছুটতে ছুটতে এলুম।

পিয়ারা সাহেব খুব আস্তে, এক রকম ইশারাতে কি জিজ্ঞাসা করলে। তার

জবাবে চুন্নি মিয়া তার সেই শাঁই-শাঁই স্বরকে যতদূর সম্ভব সংযত ক'রে বললে, হ্যাঁ, মোটা রকমের কিছু পাবার উম্মিদ আছে।

পিয়ারা সাহেব চুন্নি মিয়াকে আমাদের কথা বলতে আরম্ভ করলে। দেখলুম, আমরা তাকে যা যা বলেছিলুম, তার একটি বর্ণও সে ভোলে নি। একটার পর একটা ঘটনা এমন অপূর্ব ভঙ্গীতে সে বর্ণনা করতে লাগল, সেগুলো যেন চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল। কাশীতে সেদিন সেই সকালবেলাকার অত্যাচারের সময় আমাদের দৈহিক যন্ত্রণাই প্রবল হয়েছিল। তার মধ্যে যে মর্মান্তিক অপমান নিহিত ছিল, পিয়ারা সাহেবের বর্ণনাকৌশল মনের মধ্যে তার গভীর ছাপ ফেলতে লাগল ও সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটার প্রতি হিংসায় প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্পে মন বিষিয়ে উঠতে লাগল।

পিয়ারা সাহেবের কথাগুলো খুব গম্ভীরতার সঙ্গে শুনে চুন্নি মিয়া বললে, এর আর কথা কি! হুজুরের যখন মরজি হয়েছে, তখন দুশমন অচিরেই আপানার পায়ের তলায় এসে পড়বে। যদি হারোয়াকে এ কাজের ভার দিতে চান তো তাকেই দেবেন, সে তো আমারই ছোট ভাই। আর যদি আমাকে হুকুম করেন, তাও তামিল হবে।

পিয়ারা সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, হারোয়া কবে ফিরবে?

চট ক'রে যদি কাজ মিটে যায় তো কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে।

পিয়ারা সাহেব বললে, দেখ, হারোয়াকে আমি সেখানে পাঠাতে চাই, আর তুমি থাকবে এখানে। এখানেও তো কাজ আছে।

ব'লে চোখ মটকে সে কি ইশারা করলে।

চুন্নি মিয়া বিজ্ঞের মতন বার কয়েক নীরবে ঘাড় নেড়ে বললে, সে তো ঠিক কথা। তা বেশ, সব ঠিক হয়ে যাবে।

এবারে আমরা বললুম, লোকটা কেও-কেটা নয়। সেখানে তার বেশ সহায়-সম্পদ আছে, মোট কথা, তাকে বড়লোক বলা যেতে পারে।

আমাদের সাবধানবাক্য শুনে চুন্নি মিয়া সেই মুখে সুধাময় হাসি হেসে আশ্বাস দিলে, বাবুজী, বেফিকির থাক।

তারপরে মুখের ওপর অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের ভাব এনে বললে, বাবুজী, নিজেদের গুমর করতে নেই, তার ওপরে সামনে মনিব ব'সে রয়েছেন, আমরাও বড়লোক।

পরিতোষ বললে, তাতে আর সন্দেহ কি।

চুন্নি মিয়া পিয়ারা সাহেবকে বলতে লাগল, হারোয়ার ফিরতে তো এখনও দিন কতক দেরি আছে, ইতিমধ্যে আমরা এদিকের কাজগুলো সেরে ফেলি। কাশীতে চিঠি লিখতে হবে, সেখানে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে। চারদিকের আটঘাট না বেঁধে তো কাজে হাত দেওয়া যাবে না, সেবারকার কথা মনে আছে তো? পরে যেন আপসোস না করতে হয়।

পিয়ারা সাহেব চঞ্চল হয়ে ব'লে উঠল, ঠিক বলেছ। তার ওপরে এঁরা বলছেন, লোকটার টাকাকড়িও বেশ আছে, সহায়ও কিছু কম নেই।

চুন্নি মিয়া বললে, ওইজন্যেই তো বলি, হুজুর, কাজের শেষ ক'রে দিতে। তা করেন না ব'লেই তো শেষে নানা রকমের বখেড়া এসে জোটে, এ তো আর হুজুরের অজানা নেই।

পিয়ারা সাহেব গম্ভীরভাবে বললে, যা বলেছ।

এবারে চুন্নি মিয়া আমাদের বললে, দেখুন বাবুজী, যে লোকটা আপনাদের সঙ্গে এতখানি দুশমনি করেছে, চোর বদনাম দিয়ে রাস্তার লোক দিয়ে মার খাইয়েছে, আপনাদের আখের নষ্ট ক'রে দিয়েছে, তাকে হাতে পেয়ে হাত পা ভেঙে কিংবা নাক কান কেটে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া দয়ার কাজ হতে পারে, কিন্তু সুবিবেচনার কাজ হবে না। আমার মতে একেবারে শেষ ক'রে দেওয়াই উচিত, ও শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

শত্রু সম্বন্ধে এই বিধানটি দেখলুম সর্বশাস্ত্রসম্মত।

সেই রাত্রেই অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাণদণ্ড দিয়ে ঘরে এসে দেখি, নবাব সাহেব যথারীতি পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে হাঁটু গেড়ে ব'সে চোখ বুজে দুই হাত সামনে প্রসারিত ক'রে কার কাছে কি ভিক্ষা চাইছেন, কে জানে!

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ

আকাশে বিদ্যুৎচিহ্ন নাহি রহে ক্ষণেকে মিলায়,
নিঃশেষে মরিয়া যায় তড়িৎ-আহত বনস্পতি।
বৃহতের মনোলোকে দুঃখ কভু স্থান নাহি পায়,
সামান্য দুঃখেও দেখি, ক্ষুদ্রের দীর্ঘ আত্মরতি।

ভিক্ষা-তত্ত্ব

বাবু, একটা পয়সা দাও। করুণ আবেদন কানে এল। পা-টা যেন রাস্তার সঙ্গে আটকে গেল, কাজেই ফিরে দাঁড়াতে হ'ল। এক ভিখারিণী ব'সে আছে হাতটি পেতে, আকপাল ঘোমটা, বয়েস এখনও আছে; কোলে একটা ঘুমন্ত শিশু। সে নাকি খেতে পায় নি, তাই একটা পয়সা চাইছে।

খেতে না পেলে লোকে তিনটি কাজ করে,—(১) চুরি, (২) আত্মহত্যা, (৩) ভিক্ষা। গুণ ধ'রে বিচার করলে তিন রকম কাজ হয়, উত্তম, মধ্যম আর অধম। তিনটি কাজের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম, কোন্‌টি মধ্যম আর কোন্‌টি অধম, সেটা নির্ণয় করা খুবই শক্ত। ক্ষিদে পেলে চুরি করাটাকে আমি যদি বলি, উত্তম কাজ; সমাজপতিদাদা বলবেন, ছিঃ, চুরি করা কি উত্তম কাজ? চুরি করা অতি অধম কাজ। আমি যদি নজির দেখাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের, তিনি অমনই ব'লে বসবেন, ওসব লীলা, তোমার আমার বেলায় ওটা পাপ। আবার যদি বলি, ক্ষিদের সময় চুরি বা ভিক্ষে না ক'রে আত্মহত্যা করাই উত্তম কাজ, যেহেতু তাতে রক্ষে হয় নশ্বর দেহের বদলে অবিনশ্বর আত্মসম্মান; শাস্ত্রীমশাই অমনই ব'লে বসবেন, আত্মহত্যা মহাপাপ, অতি জঘন্য নরকেও আত্মহত্যাকারীর স্থান নেই। আর যদি বলি, ক্ষিদে পেলে ভিক্ষে করাটাই উত্তম কাজ, তা হ'লে নিশ্চয়ই আমার মাথায় পড়বে বুড়ো বার্নার্ড-শ'র গাঁট্টা; দাদু ব'লে বসবেন, ছি ছি, ভিক্ষে করার মত মহাপাতক দুনিয়ায় নেই; খেতে না পেলে কেড়ে খাও; কেড়ে খাবার শক্তি যদি শরীরে না থাকে, তা হ'লে না হয় উপোস ক'রে ম'রে সমাজের ভার কমাও; দোহাই তোমার, ভিক্ষে ক'রো না। কাজেই দেখা যায়, দেশ-কাল-পাত্রভেদে উত্তম-মধ্যম-অধমের ধারণা বিভিন্ন হয়।

ভিক্ষে করতে গেলে হাতটা পাততেই হয় এবং মুখেও কিছু বলা দরকার; মুখটি বুজে চুপ ক'রে ব'সে থাকলে পথচারীর কর্ণ বা দৃষ্টি কোনটাই আকর্ষণ করা যায় না। তাই আবেদনটা silent ও talkie দু রকমই থাকা দরকার। বেশভূষাটা ভিখারীর মস্তবড় asset; নবার্ব-পুত্তুরটি সেজে যদি সে ভিক্ষে করে, তা হ'লে লোকে নিশ্চয়ই পয়সা দেবে না; জামা-কাপড়ের পরিমাণ যত কম হবে এবং সেগুলি যত বেশি ছেঁড়া-ময়লা হবে, ভিখারীর earning capacityও তত বাড়বে; মাথার চুলগুলি রুক্ষ থাকা দরকার, দাড়ি-গোঁফ না কামানো হ'লেই ভাল।

লোকে ভিক্ষে করে, হয় নিজের জন্যে, না হয় পরের জন্যে। নিজের জন্যে যে

পরিশ্রমের পর মন্দিরের দরজার কাছে এসে ফিরে যাবি? এখুনি ধরণী আঁধার হয়ে যাবে, তারপরে আবার সেই অন্ধকারে পথের ধারে শোওয়া—

অথচ এঁদের মধ্যে কে যে মালিক তা বুঝতে পারছি না, কাকে সম্বোধন করব! দুজনেই চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন।

আর দেরি নয়। এক কদম এগিয়ে গিয়ে ঘাড় নীচু ক'রে কুর্নিশ ক'রে বেশ চেঁচিয়েই ব'লে ফেলা গেল, আদাব আর্জ্ মালিক!

দুই বৃদ্ধ একেবারে চমকে উঠে চোখ খুললেন। তাঁদের মধ্যে যাঁকে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী মনে হয়েছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে তোমরা? কি চাও?

বললুম, মালিক, আমরা মুসাফির, বহুদূর দেশ থেকে আপনার নাম শুনে হাঁটতে হাঁটতে এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছেছি, আমরা সারাদিন অভুক্ত ও পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত, চারদিন অনবরত হেঁটেছি, আমরা দাঁড়াতে পারছি না এমন অবস্থা।

বৃদ্ধ অতি ক্ষীণস্বরে হাঁক দিলেন, এই—

অদূরই যে শান্ত্রী দাঁড়িয়েছিল, ডাক শুনে একরকম ছুটে এসে সে কুর্নিশ ক'রে সামনে দাঁড়াইতেই তিনি তাকে বিড়বিড় ক'রে কি যে বললেন, ধরতে পারলুম না।

কথাটা শুনেই লোকটা আবার সেই রকম দ্রুত পদক্ষেপে নীচে নেমে গেল। দু-তিন মিনিটের মধ্যে শান্ত্রীর পেছনে একটা লোক দুটো মোড়া নিয়ে উপস্থিত হ'ল। বৃদ্ধ তাকে হুকুম করতেই সে মোড়া দুটো তাঁদের সামনে পাশাপাশি রেখে চ'লে গেল। তিনি আমাদের বললেন, ব'স এখানে।

আমরা দুজনে বসতেই তিনি জিজ্ঞাসা, করলেন তোমাদের বাড়ি কোথায়?

কলকাতায়।

তা এই বয়সে তোমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছ কেন? তোমাদের কি আপনার লোক কেউ নেই?

একবার মনে হ'ল, ব'লে ফেলি, হুজুর, দুনিয়ায় আপনার বলতে আমাদের কেউ নেই। কিন্তু কি জানি কেন, একেবারে নির্জলা মিথ্যা কথাটা বলতে বাধ-বাধ ঠেকতে লাগল। বললুম, মালিক, আমাদের সবই আছে, কিন্তু আল্লা যার ভাগ্যে যা লিখেছেন, তা তো ভোগ করতেই হবে।

ভিক্ষে করে, সে পেশাদার-ভিখারী; আর পরের জন্যে যে ভিক্ষে করে, সে অ্যামেচার-ভিখারী। পেশাদার-ভিখারীকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয় তার make-upটার দিকে; কিন্তু অ্যামেচার-ভিখারীর ওসব বালাই নেই; বেশভূষাটা রীতিমত ভাল হ'লেই বরং সুবিধে। এই দু রকমের ভিখারীই শহরে অনেক দেখতে পাওয়া যায়; পেশাদারদের দেখা যায় রাস্তায় রাস্তায়, না হয় বাড়ির দোর-গোড়ায়; আর অ্যামেচারদের দেখা যায় বাড়ির বৈঠকখানায়, খবরের কাগজে কিংবা মীটিঙে। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী অ্যামেচার-ভিখারীদের মধ্যে আদর্শ-স্থানীয়; একজনের ঝুলি ছিল শান্তিনিকেতনী আর একজনের হচ্ছে হরিজনী। তা ছাড়া আমাদের দেশের ছোট-বড়-মাঝারি সব সাইজের নেতারাও এক-একটি করিৎকর্মা অ্যামেচার-ভিখারী। বন্যা, ঝঞ্ঝা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দাঙ্গা, ধর্মঘট ইত্যাদি বারো মাসে তেরো পার্বণ তো আছেই, তার ওপর আবার কংগ্রেস হিন্দুমহাসভা স্মৃতিরক্ষা প্রভৃতিও আছে। এক নেতাজীর নাম ভাঙিয়ে কত ভিক্ষে তোলা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নাম নিয়ে ভিক্ষের যে বিশ্ব-ঝুলি পাতা হয়েছিল, তাতে আয় বড় কম হয় নি। আমাদের এটা ভিখারীর দেশ; ভিক্ষে করার লোকেরও যেমন অভাব নেই, তেমনই অভাব নেই ভিক্ষে দেবার লোকের। চেষ্টা করলে কয়েক শ ভিক্ষের ঝুলির নাম অনায়াসে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

এক রকমের অ্যামেচার-ভিখারী আছে, ভিক্ষে করাটা যাদের সাধনার বিষয়-বস্তু; নিরহঙ্কার হবার জন্যে লালাবাবুকে যে ভিক্ষে করতে হয়েছিল, তার নাম— মাধুকরী। ছেলের কঠিন অসুখের সময় মা মানত করে, ছেলের অসুখ সারিয়ে দাও ঠাকুর, আমি দাঁতে কুটো দিয়ে ভিক্ষে ক'রে তোমার পূজো দেব। এও একটা অহঙ্কারনাশিনী অ্যামেচারী-ভিক্ষা।

অ্যামেচার-ভিখারীদের মধ্যে আর এক দলকে পাওয়া যায়, যারা ভবিষ্যতে নেতা হবার জন্যে apprentice খাটে; তারা স্কুল-কলেজের ছেলের দল। ঝুলির বদলে কৌটো নিয়ে তারা ঘুরে বেড়ায় ট্রামে, বাসে, আপিসে, লোকের বাড়ি বাড়ি।

ভিখারীর চেয়ে ভিখারিণীর আবেদনী-শক্তি অনেক বেশি; পেশাদার ও অ্যামেচার—দু রকম ভিখারিণীরাই বেশি শক্তিধারিণী। যে রামবাবুর টাকায় ছেতলা ধরার প্রবাদ আছে এবং সকালবেলায় যার নাম করলে হাঁড়ি ফেটে

যাবার সুনাম আছে, তার কাছে কোন অ্যামেচার-ভিখারী গেলে পাবে শুধু টাকার বদলে উপহাস বা উপদেশ; কিন্তু কোন অ্যামেচার-ভিখারিণী গেলে কিছু টাকা অনায়াসে আদায় হতে পারে। ভিখারীর আবেদন যখন রামবাবুর হৃদয়কে আদৌ ছুঁতে পারে না, ভিখারিণীর আবেদন তাঁর হৃদয়কে একেবারে বিদীর্ণ ক'রে দিতে পারে; আর তার বয়েসটা যদি একটু কাঁচা হয়, তা হ'লে রামবাবুর হৃদয় গ'লে একেবারে জল হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। পেশাদার-ভিখারীরা যখন duet ভিক্ষে করতে বেরোয়, তখন ভিখারীটি দাঁড়িয়ে থাকে ভিখারিণীর কাঁধের ওপর হাতটা রেখে, আবেদন-নিবেদন ভিখারিণীই ক'রে থাকে এবং দিনান্তে উপায়ও বেশ হয়। কিন্তু যদি ভিখারীর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকে ভিখারিণী, আর ভিখারী চায় ভিক্ষে, তা হ'লে উপায় রীতিমত কম হয়। এটি হ'ল ভিক্ষের একটি trade secret।

ভিখারীর কথা তুলতে গেলে আপনি এসে প'ড়ে দাতার কথা; দাতা থাকলেই ভিক্ষে করা সম্ভব হয়। ভিখারীর মত দাতাদেরও মোটামুটি দু দলে ভাগ করা যায়, পেশাদার-দাতা আর অ্যামেচার-দাতা। ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিচার না ক'রে যে দান করে, তাকে ব'লে পেশাদার-দাতা; যথা—প্রাতঃস্মরণীয় দয়ার-সাগর-মশাই; লোকে তাঁকে ঠকাচ্ছে জেনেও তিনি হাত গুটোতে পারতেন না, চাইলেই তিনি দিয়ে দিতেন, দেওয়াটাই ছিল বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ধর্ম। এতবড় পেশাদার-দাতা সচরাচর দেখা যায় না। আর যে দাতা অনেক হিসেব ক'রে দান করে, তাকে বলে অ্যামেচার-দাতা; ছেলেটা পয়সাটা নিয়ে মুড়ি খাবে, না বিড়ি খাবে, ভিখারিণীটা পয়সা দিয়ে খাবার কিনে খাবে, না পান-দোক্তা খাবে, সমস্ত খতিয়ে দেখে তবে অ্যামেচার-দাতা পয়সা ছাড়ে। যারা অতি সাবধানী, তারা আবার নিজেরাই মুড়ি কিনে দেয়। আরও দেখা যায় যে, বিশেষ কোন সুখের সময় অ্যামেচার-দাতার দিল্ খুলে যায়, হাতও হয়ে যায় একটু আলগা। মা-কালী চাকরিটি পাইয়ে দিলে কিংবা বড়সাহেব সাড়ে তিন টাকা increment দিলে কেরানী দু-এক পয়সা দান করে; স্কুল-কলেজের ছেলেরা দান করে পরীক্ষায় পাস করলে। পাঁচ-মেয়ের বাপ দান করে পুত্রলাভ হ'লে; ঘোড়ার-ল্যাজ-ধরা বাবু দান করে বাজিমাৎ হ'লে; মেসের বাবু দান করে স্ত্রীর চিঠি পেলে; মামলা-বাজ দান করে মামলায় জিতলে।

এই পর্যন্ত ভিক্ষে-তত্ত্বের বেশ সোজা কথা; তার পরে গোপন কথা।

ভিক্ষে কথাটা বড় কড়া, এর মিঠে নাম 'চাঁদা'। এই 'চাঁদা'-নামক ভিক্ষেতে চলে না, এমন কাজ এ ভারতে নেই। স্কুল, হাসপাতাল, স্মৃতিমন্দির, দেশোদ্ধার, থেকে আরম্ভ ক'রে জীবন নির্বাহ পর্যন্ত যাবতীয় কাজ চাঁদায় চলে। ভিক্ষের সাধনা করতে করতে ভিখারী এমন এক অবস্থায় উন্নীত হয়, যেখানে অ্যামেচার-পেশাদারের দ্বৈতবাদ আর থাকে না। ভিক্ষের তত্ত্বের গূঢ় কথাটা অনেক অর্বাচীন লোকে জানে না, তাই তারা এর নাম দেয় ফাণ্ড্ মারা; আসলে এইটাই হ'ল এই তত্ত্বের রস-মাধুর্য। রস-মাধুর্যের অবস্থায় উঠলে অ্যামেচার-দাতারাও হয়ে যায় পেশাদার। দুর্ভিক্ষের চাঁদায় পতিতা-উদ্ধার হ'ল, কি দেশোদ্ধারের চাঁদায় নেতা-উদ্ধার হ'ল, এইসব কোনও খবরই দাতারা রাখতে চায় না, ভিখারীরাও দিতে চায় না।

ভিক্ষের তত্ত্বের দিকটা এই পর্যন্ত দেখা গেল; তত্ত্বের দিক ছাড়াও এর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক আছে, অনাবশ্যক বোধে সেগুলো নিয়ে আর মাথা ঘামালুম না।

ব্যাপারটা একবার বুঝুন, এক নগণ্যা ভিখারিণী-মা আমার কাছে চাইলে একটি পয়সা, তাইতে আমার মাথা গেল গরম হয়ে আর লিখে ফেললুম এই ভিক্ষা-তত্ত্ব। বোধ হয় এইরকম এক ভিখারিণীর পাল্লায় প'ড়ে অজন্তার শিল্পী এঁকেছিলেন—"মাতা-পুত্র" আর র‍্যাফেল এঁকেছিলেন "ম্যাডোনা"। তিলকে তাল করাই শিল্পীর রোগ কিনা।

শ্রীপ্রবোধকুমার

মুসাফিরের ডায়েরি

আমার কি মনে রইল (১)

সমুদ্রের বড় ঢেউ যখন আসে, তখন হয় নীচে তলিয়ে থাকতে হয়, নয় সেই তরঙ্গভঙ্গের দোলায় নিজেকে ভাসিয়ে দিতে হয়, অন্যথায় সে দূরে ঠেলে ফেলে দেয় আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে। আমাদের যাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা করেন এমন সমাজে দেখলুম, নোয়াখালি সম্পর্কে আগ্রহ সেই সর্বগ্রাসী ঢেউয়ের রূপ নিয়েছে। গতানুগতিক ঔদাসীন্য ত্যাগ ক'রে এঁরা ব্যগ্রভাবেই সাহায্য করতে ইচ্ছুক।

বার্ষিক অবকাশ ভোগ করছিলুম। প্রশ্নের বাণে জর্জরিত হয়ে উঠলুম।

'আপনি এ টাকা নোয়াখালির দুর্গতদের জন্য পাঠাবেন তো? ভেতরের খবর কি বলুন তো, এ দেশে কি হিন্দু থাকবে না? আপনি সেবার কাজে যান নি?"

সবিনয়ে জানালুম, সহকর্মীরা গেছেন, আমি যাই নি। কয়েক ঘণ্টা ঘুরে বুঝলুম, আমার সততা ও সাহস সম্বন্ধে এঁরা সন্দিহান হয়ে উঠছেন। কর্তৃপক্ষকে জানালুম যে, নোয়াখালি বা তার কাছাকাছি কোথাও সাময়িকভাবে আমাকে পাঠানো হোক, নতুবা সমূহ বিপদ, এখানে তিষ্ঠতে দেবে না। সর্বত্র নিরীশ্বরবাদীর ঈশ্বর-অপ্রমাণের মতই হিন্দু-মুসলিমের সম্ভাব্য ঐক্য আর দুর্নিবার অনৈক্যের ছেদহীন আলোচনা।

গেলুম বিশেষ বিধ্বস্ত অঞ্চল দেখতে। নানা মর্মন্তুদ কাহিনী ও দৃশ্য। সব দেখি শুনি, এগিয়ে চলি, কিছু বলি না।

একটি পরিচিত হিন্দু-পরিবারের সঙ্গে দেখা হ'ল, তারাও সর্বস্বান্ত হয়েছে। তাদের নিগ্রহের বর্ণনা করলে।

তারা বর্ধিষ্ণু ঘর, দোল দুর্গোৎসব, পূজাপার্বণ যথারীতি হয়ে গেছে, একান্নবর্তী পরিবার। কোজাগরী পূজা উপলক্ষ্যে প্রতি বছর ধুমধাম হয়। মেয়েরা রন্ধনশিল্পের কারিগরির পরিচয় দিয়ে থাকে, কবে থেকে নিষ্ঠার সহিত নারকেলের ছিরা, চিঁড়া, গঙ্গাজলী তৈরি হয়। এবার নিয়মরক্ষার্থে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আয়োজন হয়েছে, নিরাড়ম্বর সংযত উপচার। পূর্ণিমার রাতে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোককে উপহাস ক'রে, প্রচ্ছন্ন ক'রে দেখা দিল আগুনের লেলিহান দীপ্তি। লালচে সোনার রঙে দূর দিকচক্রবালের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত ছেয়ে গেল। অনাগত বিপদের আশঙ্কায় শিউরে উঠে অসহায় মায়েরা ঘুমন্ত শিশুকে বুকে চেপে আঁচল ঘিরে সঙ্কটমোচনের মানসিক জানিয়ে ছাদ থেকে নেমে এল। সবাই বাড়ির বাস্তু দেবতার দুয়ারে একবার মাথা ঠুকে অভয় চেয়ে নিল। রণোন্মাদিনী চণ্ডী তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

আগুনেরই মত অব্যাহত ও তড়িৎগতিতে এ নৃশংসতার বার্তা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। মেয়েরা ঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল, কিন্তু কি যে দুর্গ্রহ, বাড়ির কর্তা বেঁকে বসলেন। তিনি দেবীর খড়্গ স্পর্শ ক'রে শপথ নিলেন, দেহে প্রাণ থাকতে ভিটা ত্যাগ করবেন না। অনুজেরা প্রমাদ গনলেন, এখন উপায় কি? জ্যেষ্ঠকে ফেলে পলায়ন, না উন্মাদ সঙ্কল্প আঁকড়ে থেকে নিশ্চিত মরণ বরণ? বাড়িতে মাত্র পাঁচজন পুরুষ, বাকি নারী ও শিশুর

হল। দুশ্চিন্তায় সচকিত হয়ে দিনের পর রাত আর রাতের পর দিন কাটে। বেশিদিন আর কাটল না। যথারীতি দস্যুর আক্রমণ ঘটল, অতর্কিত হ'লেও অপ্রত্যাশিত নয়। প্রাণের বিন্দুমাত্র ভরসা না রেখেই তারা প্রতিরোধ করলে। কর্তা ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে মায়ের খাঁড়া নিয়ে রীতিমত যুদ্ধ করলেন, একজন চোট খেয়ে ধরাশায়ী হ'ল। এমন বিপুল সংখ্যাধিক্যের বিপক্ষে মুষ্টিমেয়ের বিরোধ নিতান্ত বাতুলতা, কিন্তু দাঁড়িয়ে মরা ছাড়া উপায় কি?

উন্মত্ত হিংস্র জনতা ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে, চতুর্দিকে নরঘাতকের বেড়াজাল, নিমেষে তাদের টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবে, এমন সময় কার যেন মন্ত্রবলে ধ্বংসলীলা সংহত হ'ল! আগামী কাল বহ্নি-উৎসবে অসমাপ্ত যজ্ঞ শেষ হবে—এই তর্জনগর্জন শুনিয়ে তারা বিদায় নিলে।

সবাই বললে, আজ রাতে পালানো যাক। কর্তা প্রাণপণ ক'রে লড়াই করার অটল সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন।

অন্দরমহলের নেত্রী খিড়কি-দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে প্রতিবেশীর শরণ নিলেন। পাশেই কালু মিয়ার বাড়ি; সেই বাড়ির বৃদ্ধা কর্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন, আজিমা, যেমন ক'রে পার, আমাদের মান-ইজ্জৎ বাঁচাও, তুমিও মেয়ে, তোমারও সন্তান-সংসার আছে। বুড়ী সব শুনল। তার চার-চারটে জোয়ান ছেলে ঘরে। তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এসে বললে, তোমাদের সব গহনা টাকা এনে দাও, পরে কি ব্যবস্থা হয় খবর দেব। গৃহিণী তৎক্ষণাৎ অলঙ্কারাদি এনে সঁপে দিলেন, অনুমান করলেন, মান ও প্রাণের বিনিময়স্বরূপ এই মাশুল দিতে হবে।

কালুর ভাই এ বাড়িতে ঢুকতে যাবে, এমন সময় বাধা পেল। আদেশ এল, যদি বন্ধু হও ফিরে যাও, শত্রু হও তো ঢুকতে পার; কিন্তু দেহে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না। চেয়ে দেখে, কর্তার হাতে খড়্গ, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, চঞ্চল-পদপাতে পাহারা দিচ্ছেন।

বড়বাবু, আমি লালু।

যেই হও, এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না।

জরুরি কথা আছে।

না, তোমাদের সঙ্গে সকল কথা ফুরিয়ে গেছে।

বহু অনুনয় করার পর হতাশ হয়ে লালু বাড়ি ফিরলে। এ বাড়ির গিন্নী

নিরুপায় হয়ে ঠাকুরঘরে আছড়ে প'ড়ে মাথা কুটতে লাগলেন। এক দিকে সমস্ত সংসার, এতগুলো প্রাণ, অন্য দিকে স্বামী।

প্রথম রাতের আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে আবৃতদেহে কয়েকটি মনুষ্যমূর্তি কোথায় চ'লে গেল। ইঙ্গিত মাত্রে তারা জলপথের দিকে এগিয়ে চলল। নদীর কিনারায় কয়েকটি নীরব ছায়ামূর্তি। চাপা ফিসফিস শব্দ। বাঁধন খুলে নৌকা ছেড়ে দিল। নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে দাঁড়ের ছপছপ আওয়াজ। নৌকা কানাৎ দিয়ে ঘিরে ভু-মহল করা হয়েছে। চারজন মাঝিই মুসলমান। তীরে একটি নারী দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে দু-হাত তুলে ভগ্নস্বরে ব'লে উঠলেন, খোদার দোহাই, আমার প্রাণের আশীর্বাদ তোমাদের পিছনে রইল। আমার চার-চারটে মরদ ছেলে সঙ্গে দিলুম। এরা তোমাদের এ জাহান্নম পার ক'রে ভাল জায়গায় রেখে আসবে। আল্লার যদি অন্য ইচ্ছা হয় তো এরা জান থাকতে তোমাদের গায়ে আঁচড় লাগতে দেবে না। এদের শেষ রক্তের ফোঁটা যেন তোমাদের ইজ্জৎ রাখতে খোয়া যায়। যদি তোমাদের প্রাণ যায় তো এরাও যেন না ফেরে। আমি এই নদীর তীরে পুত্রহারা হয়ে "হায় হায়" ক'রে কাঁদব, তবু যেন ওরা বেইমানি না করে। আমার জীবনের সকল সম্বল তোমাদের হাতে তুলে দিলুম।

পথে যতবার নৌকা আটক হয়েছে, ততবার "আমাদের মেয়েরা যায় গো" ব'লে মাঝিরা এগিয়ে গেছে।

প্রায় দিন পনেরো পরে এরা একটু গুছিয়ে বসার পর এক সন্ধ্যায় এসে কালু সেই গহনার বাক্সটা দিয়ে গেল, কিছু অভাব আছে কি না জেনে নিলে। কৃতজ্ঞতায় উছলে-পড়া চোখের জল বাধা মানে না, শান্ত লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিতা একটি বউ এক হাতে চোখে আঁচল চেপে অন্য হাতের মুঠিতে কিছু টাকা নিয়ে বললে, তোমাদের ঋণ কখনও শোধ হবে না, বকশিশও দিচ্ছি না, এটা বড্ড দিতে ইচ্ছে হচ্ছে, নেবে? বাচ্চাদের মিষ্টি কিনে দিও'। ভগবান ওপর থেকে সব দেখছেন, তিনি তোমাদের মঙ্গল করবেন।

কেন নেব না মা, দাও।—ব'লে প্রসন্ন মনে হাত পেতে টাকা নিয়ে চ'লে গেল।

সব শুনে ভাবলুম, এ তো দান গ্রহণ নয়, এ যে দান করা। ওই বউটির মত মানুষের দেওয়া আঘাতের চেয়ে প্রেম বড় হয়ে রইল। সেই নদীতটে বৃদ্ধার

একক মূর্তি ও মর্মস্পর্শী উক্তি আমার অন্তরে চিরদিনের আসন পেয়ে অমর হয়ে রইল।

আমার কি মনে রইল (২)

আজ দুর্গতদের কাপড় বিলি করার দিন। আমার এমন ক'রে কাউকে কিছু দিতে ভাল লাগে না, অথচ এ কাজে অংশ নিতেই হবে কর্মী হিসাবে। আগেই ব'লে রেখেছিলুম, আমি যবনিকার অন্তরালে হিসেব রাখব, হাতে তুলে দেবার ভার সহকর্মীর।

ফর্দমত লিখিত নামের সিঁড়ি বেয়ে প্রায় নীচের ধাপে এসে গেছি, এমন সময় বাইরে গোলমাল শোনা গেল, ভারী গলার চাপা কান্নার শব্দও। বেরিয়ে দেখি, মুখচেনা এক বৃদ্ধ মুসলমান কাঁদছে। সহসা পুরুষকে কাঁদতে দেখে কারোই ভাল লাগে না; তা ছাড়া ভাবছিলুম, চিরাচরিত বিড়ম্বনা ঘটেছে নিশ্চয়, সেই আমাদের বদনাম যে আমরা পক্ষপাতিত্ব করি, যার দরকার তাকে ছাড়া সকলকে দান করি, ইত্যাদি।

অপ্রসন্ন স্বরে বললুম, কি, হ'ল কি? উত্তর এল, সেরাজুল ওর সই-করা চিরকুটখানা ভটচাজ্জি-গিন্নীর পায়ের কাছে রেখে কাঁদছে, ও কাপড় নেবে না বলছে।

এসব কাপড় বিপন্ন হিন্দুদের জন্যই এসেছে। সেরাজুল অধর্ম করায় রাজি হয় নি, গুণ্ডামিতে যোগ দেয় নি, ফলে খুব অত্যাচারিত হয়েছে, তাই ওর নামটাও ঢুকিয়ে দিয়েছিলুম। বেচারা বাবুর বাড়ি চাকরি ক'রে চুল পাকিয়েছে। বাবুরা হাঙ্গামার সূত্রপাতে বিদেশে চ'লে গেছেন। বুড়ী বিধবা পিসী ভিটে আগলে ছিলেন, আর ছিল সেরাজুল। কিছু রক্ষা পায় নি, সব জ'লে পুড়ে লুঠতরাজ হয়ে নিঃশেষ হয়েছে।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, সেরাজুল, কি হ'ল তোমার? কেন কার্ডখানা অমন ক'রে রেখে দিলে?

বুড়ো হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠল। বললে, দিদি, আমি যখন এতটুকু ছোঁড়া, তখন থেকে এ বাড়ির নিমক খেয়েছি। আমরা ক পুরুষ পাশাপাশি একত্র আছি, আমার ছেলেপিলে খোকাবাবুদের সঙ্গে খেয়ে-প'রে খেলে মানুষ হয়েছে। আর এ কি কালের কাল হাওয়া এল যে, সব ছারখার ক'রে দিলে! আমার নিজের ছেলে, আমার রক্তের সন্তান, বাবুর ঘরে আগুন দিলে, আমি

রুখতে পারলুম না। সেই সোনার ঘর-দুয়োর ছাই হয়ে গেল, আম-নারকোলের গাছ ঝলসে গেল, আর কলাগাছ কটা ঠিক রইল। সেই কলাপাত কেটে ওরা ওই পোড়া ভিটেতে চিঁড়ে গুড় খেলে। ওদের মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল না, ওদের গায়ে একটু আঁচ লাগল না! আমার কি মতিচ্ছন্ন হ'ল, ছুটে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলুম না, বুড়ীকে নিয়ে প্রাণ বাঁচাতে গেলুম। আমার মরণ ছিল ভাল। আজ কিনা বুড়ী পিসী আমার সঙ্গে একসাটে দাঁড়িয়ে একখান কাপড় ভিক্ষে করছে, এও আমাকে দেখতে হ'ল! আমার কাপড় চাই না, হাতজোড় করি দিদি, আমাকে মাপ কর —ব'লে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে উত্তরমুখে চ'লে গেল।

বুড়ী কি করছে, আর দেখলুম না। ওদের সামান্য বাকি কাজ সেরে নিয়ে আসতে ব'লে আমি আমাদের শিবিরের দিকে এগিয়ে চললুম।

দু-একজন হিতৈষী বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক অগ্রণী হয়ে আমাকে বোঝাতে লাগলেন, এ ও-ব্যাটার একটা চাল, বুঝলেন না? ওর নিজের ঘরে ছেলে আসামী আর মায়া-কান্না কেঁদে সাধু সাজছেন! বোধ হয় কংগ্রেসী সাহায্য নিলে ওদের দলের কাছে অপমান হবে, তাই এ উদারতা দেখালে, বুঝেছেন? আপনি শহরে নতুন লোক, এসব তো দেখেন নি।

কিছু ভাল লাগছিল না, বললুম, সব বুঝেছি, একটু পথ ছাড়ুন তো, আমি একা চলতে চাই।

মুসলমানদের দেওয়া এত অপরিসীম ক্ষতির মসীমাখা পটভূমিতে এই শুভ্র প্রীতিময় বিন্দুটি আমার চোখে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল, মানুষের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে এনে দিলে, এই কৃতজ্ঞতায় মন আপ্লুত হয়ে গেল। ওকে উদ্দেশ ক'রে মনে মনে বারংবার উচ্চারণ করলুম, সেরাজুল ভাই, তোমায় নমস্কার; তোমার মত চালবাজ স্বার্থপর লোক দুনিয়ায় এত কম কেন?

"মুসাফির"

টুকরো কবিতা

অন্তর যার দীনতায় ভরা,
তার শুধু—নাই নাই।
উদার মনের ভাণ্ডার ভরা
রহে সবাকার ঠাঁই।

শ্রীলীলাময়

বিজ্ঞাপন-মাহাত্ম্য

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমাদিগের দেশে "কর্মাশিয়াল আর্ট" বলিয়া কিছুই ছিল না ; এত অল্পদিনে ইহার প্রসার ও প্রভাব দেখিয়া মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হয়। জনসাধারণের আর্টের প্রীতি ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার দোহাই দিয়া ব্যবসায়ীরা স্ব স্ব পণ্যের গুণকীর্তন সাধারণের গোচর করেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার মধ্যে যে সমস্ত পণ্যের প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে নজরে পড়ে, সেই সমস্ত পণ্যের চাহিদা ক্রমশ বর্ধিত হইতে থাকে। বিজ্ঞাপন এমন হইবে, যাহাতে লোকের দৃষ্টি ও চিত্ত আকর্ষণ করিবে এবং পড়িবার সময় কিছুতেই মনে হইবে না যে, ইহা বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের পাঠ-রচনায় বহুদর্শী মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণই পারদর্শিতা এবং নিপুণতা দেখাইতে পারেন এবং নূতনত্বের প্রয়োজন দ্বারা লোককে বিমুগ্ধ করিয়া থাকেন। অবশ্য এই কার্যটি খুব সহজসাধ্য নহে—বহু চিন্তা ও গবেষণার ফলে ইহা সম্ভবপর হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে শ্রীযুক্ত অন্নদা মুনশী প্রভৃতি কয়েকজন শিল্পী এই ধরনের প্রচাররীতির পরিকল্পনা করিয়া সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞাপনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহা নূতন ভাবে চিত্ত আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়।

কোনও এক বিশেষ সাহিত্যরসিক বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, "Advertising is the pictured vision of unreality better than life itself"। এ কথা বিজ্ঞাপনদাতা বা রচয়িতা শিল্পীগণ মানিয়া লইতে চাহিবেন না। কিন্তু বিজ্ঞাপনের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে তিনি কুণ্ঠা প্রদর্শন করেন নাই।

প্রথমেই আমাদিগের চিন্তা করা উচিত যে, বিজ্ঞাপনপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে কত দিন এবং তাহার পূর্বে পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল! অতি-আধুনিকেরা বলিবেন যে, পৃথিবী তখন তমসাবৃত অবস্থায় ছিল, ক্রমশ আলোকের স্পর্শ পাইয়া সজাগ হইতেছে। ক্রিস্টোফার কলম্বসকে আমেরিকা আবিষ্কারের জন্য অষ্টাদশ বৎসর কাল ইউরোপের রাজন্যবর্গের দ্বারে ও দরবারে শুধু পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। কিন্তু আজিকার দিনে কি তাঁহাকে এতটা বেগ পাইতে হইত। শুধু চিত্তাকর্ষক চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনে কার্য সমাধা করিতে পারিতেন। কাগজে কাগজে ছবি আঁকিয়া গোটা কয়েক গাল-ভরা স্লোগানের দ্বারা—যথা, "Do you want

a continent ?" অথবা তিনি তাঁহার নিজের ছবি পত্রস্থ করিয়া আত্মপ্রচার করিয়া "This man discovers continents" প্রভৃতি বচনবিন্যাসে স্বকার্য সাধন করিতে পারিতেন। তাঁহার দুরদৃষ্ট তিনি তমসাচ্ছন্ন অ-বিজ্ঞাপনের যুগে জন্মিয়াছিলেন এবং দুর্ভোগ ভোগ করিয়াছিলেন। হয়তো আমেরিকা বহু পূর্বেই আবিষ্কৃত হইতে পারিত। কোন এক জগৎবিখ্যাত ব্যবসায়ী তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীতে তাই বলিয়াছেন, "Where would be the world without advertising ?"

পুরাকালে বিজ্ঞাপনপ্রথা বা প্রচারপদ্ধতি প্রচলিত যে ছিল না, এমন নহে। মহাভারতীয় যুগে নারদ মুনি বীণাহস্তে প্রচারকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করিতেন। রাজকীয় আদেশ ঢোল-সহরতে ঢেঁড়া দ্বারা ভেরী বা ঢক্কা নিনাদ ঘোষিত হইত। আমাদিগের গৃহে অবরোধপ্রথার মধ্যে মল বা চুটকীর নিক্কণ নববধূর গতিবিধির সংকেত জানাইয়া দিত। গ্রামে ব্যাঘ্রের আমদানি শৃগাল ও ফেরুপাল ঘোষণা করিত। বাদশাহ সম্রাট ও রাজন্যবর্গ অনেক স্থাপত্য ও শিলালিপি ও স্তম্ভে প্রচারকার্য প্রচলিত করিয়াছিলেন। সাজাহান বাদশাহের পত্নীপ্রেমের নিদর্শন তাজমহল, বোধিসত্ত্বের প্রচারকার্যে বৌদ্ধ-বিহার রচনা করিয়া তাহাতে প্রচারকের বসবাস স্থাপন।

আধুনিক যুগে সংবাদপত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এখন বিজ্ঞাপনের প্রচলন অনুষ্ঠিত হইয়া ক্রমশ কি ভাবে তাহার উৎকর্ষ ও পুষ্টি হইতেছে, সেই প্রসঙ্গে আমরা দুই-চারি কথা বলিব। বিজ্ঞাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে—সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, কিন্তু তাহার স্ফুরণ হইবে স্বল্প কথায় ও ভাবের নবধারায়। আধুনিক মানুষের সময় অল্প, কাজ বেশি ; সেই কারণে বিজ্ঞাপনও ছোট হওয়া উচিত। প্রথম যখন রেলগাড়ির আমদানি হয়, তখন পথিককে সাবধান করিবার জন্য বিপদসঙ্কুল ক্রসিং-এর ধারে লেখা থাকিত—'No person or persons proposing to cross the Railway tracks at this point at a time when a train or trains may be approaching is or are warned that if he or she does it, he or she or they are in danger of coming into collision with it or them"। কিন্তু পরে "Look out" বা "Caution" বা "Beware of Trains" অথবা "Danger" প্রভৃতি স্বল্পায়তন সতর্কবাণী সাময়িক তৎপরতার খাতিরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আপিসের দরজায় লিখিত

বলা বাহুল্য, এই রকম সব বুকনি বিশুদার আড্ডায় হামেশাই লোকের মুখে শুনতুম, কিন্তু এত শিগগিরই যে সেগুলো কাজে লাগবে, তা তখন মনেই করতে পারি নি।

এবারে বৃদ্ধ আমাদের আর কিছু না ব'লে পাশে উপবিষ্ট অতিবৃদ্ধকে কি সব বলতে লাগিলেন। যে ভাষায় তিনি কথা বলতে লাগলেন, তা উর্দু নয়, নিশ্চয় ফারসী হবে। তবে কথার মধ্যে দু-তিনবার বাংগালী শব্দটির উল্লেখ করলেন।

তাঁর কথা শুনে অপর বৃদ্ধ উর্দুতে বললেন, ওদের মুসাফিরখানায় পাঠিয়ে দাও, ওরা খাবার ব্যবস্থা নিজে ক'রে নেবে 'খন।

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, আমরা যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলুম, তিনি আসল মালিক নন। যা হোক, মালিকের কথা শুনে তিনি বললেন, দেখ, আমাদের মালিকের মুসাফিরখানা আছে, সেখানে গিয়ে থাক। থাকবার কোনও অসুবিধা হবে না। তবে তোমরা হিন্দু, আমাদের তৈরি খাবার তো তোমাদের চলবে না। আমাদের হিন্দু বাবুর্চিও নেই, সেইজন্যে আহারের ব্যবস্থা তোমাদের নিজে ক'রে নিতে হবে।

কথাটা শুনে দ'মে গেলেও মনের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে আশাও উঁকি দিতে লাগল, যা হোক, থাকবার একটা জায়গা তো ভগবান ঠিক ক'রে দিয়েছেন, হয়তো আরও কিছু প্যাঁচ না ক'ষে তিনি আহারের ব্যবস্থাটা করবেন না।

পরিতোষের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার মুখখানা ঘিরে একটা অপ্রসন্ন ভাব ফুটে উঠেছে। তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হকিম সাহেবকে, অর্থাৎ যিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তাঁকে, কি একটা বলতে যাচ্ছি, এমন সময় পরিতোষের আওয়াজ কানে এল। পরিতোষ চোস্ত উর্দুতে বললে, মালিক, একটা কথা আপনার চরণে নিবেদন করতে চাই।

আসল মালিক যিনি এতক্ষণ চেয়ারে হেলান দিয়ে নির্জীবের মতন ব'সে ছিলেন, পরিতোষের কথা শুনে ধড়মড় ক'রে যতদূর সম্ভব সিধে হয়ে বললেন, বল বেটা, কি তোমার বক্তব্য শুনি!

পরিতোষ বললে, মালিক, আমরা যে ঘরের ছেলে সে ঘরে আমাদের বয়সী ছেলেকে একলা রাস্তায় বেরুতে দেওয়া হয় না, গাড়ি চাপা পড়বার ভয়ে। কিন্তু আমরা খোদার ভরসা ক'রে গৃহত্যাগ করেছি জীবনে উন্নতি করব ব'লে।

নোটিসের রূপ ছিল—"No person or persons can be permitted to enter these premises unless he or she enters in the course of some definite transaction pertaining to the business of the company"। ক্রমে সেটা "No admission except on business"-এ পরিণতি লাভ করিয়াছে, আবার কেহ মার্কিন ধরনে "Keep out"ও লেখেন। কলিকাতায় গত "Safety first" সপ্তাহে রাস্তার চৌমাথার উপরের বাড়িগুলির দেওয়ালে লেখা হইয়াছিল "Look out then walk—দেখে শুনে পথ চলুন"। আবার সেই বোর্ডের দিকে অনিমেষ নয়নে দেখিতে গিয়া অনেককে বিপন্ন হইতে হইয়াছে।

আমাদিগের দেশে বর্তমানকালে বিজ্ঞাপনধারার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, উত্তরকালের "শ্বাসারি" "জ্বারমলীন জ্বরের যম" "সুরবল্লী কষায়" "বিজয়া বটিকা" "কি ছিলাম কি হইয়াছি" "ভোঙ্গরের বালামৃত" "ডাক্তার পালের ভীম পিল্‌স" "মদন-মদিরা", "মদ খাও নেশা হইবে না" "বিনামূল্যে ধবল ধ্বংস" "সরস্বতী কবচ" "সর্বসিদ্ধি মাদুলী" "গুদাম সাবাড়, এই অপরাহ্নের উদীয়মান সাহিত্য-সম্রাটের গ্রন্থ কোহিনূররাজি সাত টাকা স্থলে মাত্র এক টাকায়" "ও মাই গড্ দাদের মলম" ইত্যাদি পঙ্কিকাপুষ্ট অদ্ভুত অতিরঞ্জিত বিবৃতি ক্রমশ অন্তর্হিত হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। লোকশিক্ষার প্রসারের সহিত তাহার আরও উৎকর্ষ আশা করা যায়।

অনেকে বিজ্ঞাপনে ধান্যভঙ্গে শিবসঙ্গীত অবতারণা করার মত অনেক অবান্তর অবাস্তব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। কেহ কেহ নিজ প্রতিষ্ঠান বা পণ্য-সম্ভারের বিজ্ঞাপন দিতে গিয়া নিজের প্রতিকৃতির সহিত নিজমহিমা-কীর্তনে পরাঙ্মুখ হন না; পূর্বে কিশোরীলাল জৈনের তাম্বূলবিহার ছিল, ইদানীং "অমুকচন্দ্রের enterprise" ছবি-সমেত স্লোগান "life begins at sixty"

বিজ্ঞাপনে শ্লীলতা, শালীনতা ও সৌন্দর্যবোধের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। লিভার বা যকৃতের কর্মক্ষমতাবর্ধক ঔষধের বিজ্ঞাপনে দেহ-উৎপাটিত যকৃতের ছবি নয়নগোচর করিলে রীতিমত বিভীষিকা ও ঘৃণার উদ্রেক হয় নাকি? এই সমস্ত বিকৃতরুচির পরিচায়ক, এই কদর্য দৃশ্য দেখিবার জন্য সাধারণে কখনও প্রস্তুত থাকে না। যৌনব্যাধি স্ত্রীরোগের নিরাময়ব্যঞ্জক বিজ্ঞাপনে অথবা অর্শ আদি রোগের ঔষধ সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তিতে সংযম ও রুচির অভাব অনেকেই লক্ষ্য

করিয়া থাকিবেন। কিন্তু সি. কে. সেনের অশোকার বিজ্ঞাপনগুলি সুস্থ মন ও মার্জিত রুচির পরিচায়ক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত মানুষ মাত্রেরই নারীর সুন্দর মুখের ছবি দেখিবার আগ্রহ আছে, সেই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া বিজ্ঞাপনে নারীদেহ-সুষমার বিকাশ দ্বারা বিষয়বস্তুর অবতারণা করিয়া থাকেন। মার্কিন পত্রিকা হইতে মেম সাহেবের ছবিকে বাঙালী সাজসজ্জায় অঙ্কিত করিয়া কিম্ভূত-কিমাকার বাঙালী মহিলার রূপ দিতে অনেক শিল্পীকে দেখা যায়। তাহাতে অঙ্কনের হয়তো সুবিধা হয়, কিন্তু ছবিখানি নামাবলীর কোট-প্যাণ্টালুন পরিহিত লোকের মত বিসদৃশ হইয়া পড়ে।

সভ্য আমেরিকায় "Sex" সম্বন্ধে এত অধিক আলোচনা বাহির হইয়া থাকে যে, নিম্নলিখিত নমুনা হইতে কতকটা বোঝা যাইবে। এই ধরনের বিজ্ঞাপন "Vogue" বা "Harper's Baazar" পত্রিকায় স্থান পাইয়াছে।—

"Vice is a monster of so frightful mien
As, to be hated, needs but to be seen ;
Yet seen too oft, familiar with her face
We first endure, then pity, then embrace"

"That graceful uplift, that enchanting silhouette" "Lines of uninterrupted beauty" "The ultimate abbreviation." "Smooth slender line of unbroken grace" "High youthful contour" Figure-moulding magic" "Gay bits of wintchery"

সভ্যসমাজে অধুনা বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা যে কত, তাহা যুদ্ধে বা শান্তিতে রাজ্যশাসনে, ব্যবসায়বাণিজ্যে সকল ক্ষেত্রেই তাহা প্রোপাগাণ্ডা-রূপে প্রকট হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে যুদ্ধের সময়ের দুই-একটি বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করা যাউক। "ভারতীয় নৌবাহিনীতে যোগ দিয়া ভারতের গৌরব বাড়ান"—ইহারই আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া অনেক ভারতীয় যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু গৌরব কাহার বাড়িল, সে কথা বলা অবান্তর মনে করি। আমেরিকায় W.A.C.-এর প্রচারপত্রে "Be one of fifty thonsouds" দৃষ্টে কত নারী প্রলুব্ধ হইয়াছিল, তাহাদের দুর্গতির কথা ভাবিলে শিহরণ জাগে। বিজ্ঞাপনে সাধারণে প্রলুব্ধ হয় কিরূপে, তাহার একটি নির্বাক নিদর্শন হইতেছে—বিড়ির দোকানে অগ্নিসংযুক্ত নারিকেল-দড়ি দোদুল্যমান থাকিয়া পথিককে আকৃষ্ট করিয়া আনে। বেচারী নির্বাপিত বিড়িতে অগ্নিসংযোগ করিতে আসিয়া

কৃতার্থ হইয়া চারি পয়সার "মিঠেকড়া লাল সুতা" খরিদ করিয়া কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনে কার্পণ্য করে না।

বিজ্ঞাপনের পাঠ কি রকম হয়, তাহার কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল—"Listen ! This is you" "You poor simp" অথবা "Do you ever take a bath" কিংবা "What would you do if your wife ran away"। এই প্রকার ব্যক্তিগত আহ্বানে লোকচিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

অনেক সময় পাঠ রচনায় নাম-করা কবিতা বা প্রবাদগুলি বেশ কার্যকরী হইয়া থাকে, Longfellow কবির "Tell me not in mournful numbers"-এর ছায়া অবলম্বনে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া দেখুন—

"Young man, this is you ! Do you want to remain all your life on a low salary ? If not, why not be up and doing ? Still achieving ! Still pursuing ! We can show you how—why not take a corresponding course ? Our curriculum includes—Engineering, mind-reading, oratory, religion, accounting etc. Don't wait. Start achieving now"

"ভীষণ জাল হইতেছে" বা "ভেজাল প্রমাণে ১০০ টাকা পুরস্কার" অথবা ট্রেডমার্ক অপব্যবহার জনিত মোকদ্দমা আনয়ন প্রভৃতি দ্বারা অনেক সময় প্রচারের কার্য হইয়া থাকে। নব ভাবধারায় আধুনিক বিজ্ঞাপন কি ভাবে উৎকর্ষ লাভ করিতেছে, সে বিষয়ে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমুরারী

শ্রীরাধার অবতার

নিকট-প্রাচ্য ও মধ্য-প্রাচ্য দেশের নানা জায়গায় ঘুরিয়া অবশেষে রুশ-ইরান সীমান্তের এক স্টেশন হইতে বিমানে উড়িয়া ক্যাপ্টেন সুমন্ত দত্ত দেশে ফিরিয়াছে চার সপ্তাহের ছুটি পাইয়া। তাহার ফরসা রঙ তামাটে হইয়াছে, চোখে মুখে কেমন একটা অভারতীয় রুক্ষতা আসিয়াছে। পূর্বের পরিচিত মন্থর আয়েশী ভাবভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলে ও প্রচ্ছন্ন বক্র হাসির সঙ্গে উচ্চারিত কথা শুনিলে হঠাৎ মনে হয়, যেন আগেকার সুমন্ত গিজের কোন পিরামিডের মধ্যে কুড়াইয়া পাওয়া একটা মুখোশ আঁটিয়া বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে।

তাহার এই বক্র হাসির মাত্রা কয়েক দিন হইল বাড়িয়াছে। করাচী হইতে ট্রেনে হাওড়া পৌঁছিয়া স্টেশনে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের ভিড়ে চিত্রাদের বাড়ির কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সে একটু বিস্মিত হইল। করাচী হইতে তারে পৌঁছিবার সময় জানাইতে সে তো ত্রুটি করে নাই!

বাড়ি আসিয়া পুরা দুইটি দিন সে শুইয়া, ঘুমাইয়া, গল্প করিয়া কাটাইল। ইতিমধ্যে চিত্রাদের বাড়ির কিছু কিছু খবর সে জানিতে পারিল। তৃতীয় দিন চিত্রাদের নূতন বাড়ির অবস্থান জানিয়া লইয়া সে বিকালের দিকে বাহির হইল। বৎসর খানেক হইল, চিত্রারা নূতন বাড়ি তৈয়ারি করিয়া সেখানে বাস করিতেছে।

সুন্দর পরিচ্ছন্ন পল্লী, চওড়া রাস্তার দুই পাশের বাড়িগুলি মালিকগণের সচ্ছলতা ও রুচির পরিচায়ক। 'সেন ভিলা'র ফটকের মধ্যে গাড়ি প্রবেশ করিবার সময় সুমন্তের নজরে পড়িল, দোতলা বাড়ির কার্নিশের নীচে মাঝামাঝি জায়গায় বড় বড় সিমেণ্ট-বালির হরফে ফাঁক ফাঁক করিয়া লেখা:—ওঁ শ্রীগুরু কৃপাহি কেবলম্। লাল জমির উপর সাদা অক্ষরগুলি বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। গাড়ি পাথরের নুড়ি বিছানো রাস্তা ধরিয়া গাড়ি-বারান্দায় প্রবেশ করিল। সুমন্ত গাড়ি হইতে নামিল।

গাড়ি-বারান্দা হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ির দুই পাশে পিতলের দাঁড়ের উপর বসিয়া দুইটি বৃহৎ আকারের কাকাতুয়া দাঁড়-সংলগ্ন পিতলের বাটি হইতে একটি একটি করিয়া ছোলা উঠাইয়া খোসা ছাড়াইয়া খাইতে ব্যস্ত ছিল। শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া ক্ষুদ্র গোল চারিটি চোখের দৃষ্টি প্রখর করিয়া তাহারা উভয়ে একসঙ্গে কর্কশ চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার আর থামে না।

কাকাতুয়ার চীৎকারের মধ্য দিয়া খোলের বাজনা ও কীর্তনগানের আওয়াজ সুমন্তর কানে আসিল। সে সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিল। পাশের ঘর হইতে উর্দি-পরা একজন বেয়ারা এই সময়ে বাহিরে আসিল। খাকী পোশাকে সুমন্তকে দেখিয়া সেলাম করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, সাহেব কাহাকে চান?

মিঃ সেন বাড়িতে আছেন?

আছেন, এদিকে আসুন।

সে পথ দেখাইয়া সুমন্তকে ভিতরের একটি ঘরের দিকে লইয়া চলিল।

গানের শব্দ সেই দিক হইতে আসিতেছিল। দরজার ভারী পরদা তুলিয়া ধরিয়া সে বলিল, সেন সাহেব এখানে আছেন। আপনি ভিতরে যান।

বেশ বড় হল-ঘর। মেঝেতে মোটা কার্পেট বিছানো। গানের আসর বসিয়াছে মনে হইল। খোল করতাল বাজিতেছে। একজন ফরসা লম্বা সুশ্রী চেহারার লোক গলায় মোটা ফুলের গ'ড়ে, গায়ে সাদা সিল্কের পাঞ্জাবি, বাঁ হাতে কোঁচা ধরিয়া ডান হাত উপরে তুলিয়া গান করিতেছে ও নাচিতেছে বা নাচিবার ভঙ্গী করিতেছে। চেহারা যেমন চমৎকার, গলাটি তেমনই মধুর।

গায়কের কাছে এক পাশে মিঃ সেন দরজার দিকে পিঠ করিয়া করজোড়ে বসিয়া আছেন, তাঁহার মাথার টাকের খানিকটা দেখা যাইতেছে। মিঃ সেনের কাছে জন পাঁচেক ভদ্রলোক করজোড়ে বসিয়া। সম্মুখে দুইজন বাদক। অন্ত দিকে কয়েকজন মহিলা চিত্রাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন।

বেয়ারা পরদা উঠাইলে প্রথমে চিত্রার দৃষ্টি সুমন্তের উপর পড়িয়াছিল। গায়কের দিকে ফিরিয়া মাথা নামাইয়া করজোড়ে নমস্কার করিয়া সে উঠিয়া আসিল। গায়ক তখন নাচিয়া নাচিয়া কীর্তনের কি একটা পদ গাহিতেছে।

সুমন্তকে লইয়া চিত্রা দোতলার ড্রয়িং-রুমের সামনের বারান্দায় আনিয়া বসাইল। নীচের লন এবং মরশুমী ফুলের ও গোলাপের বেডগুলি চমৎকার দেখাইতেছে। চিত্রার বাগানের শখ আছে। দুইজনে বসিলে চিত্রা বলিল, সুমন্তদা, আপনাকে চেনা যায় না, তিন বছরে এত বদলে গেছেন! কেমন আছেন বলুন? তিন দিন না চার দিন হ'ল এসেছেন, কেমন নয়? আপনার পৌঁছবার খবর আমরা ঠিকমত পাই নি ঠিকানার গোলমালে। তা ছাড়া, আপনার পৌঁছবার কথা যে দিন, সে দিন আমরা এখানে ছিলাম না, প্রসাদপুর আশ্রমে গিয়েছিলাম গুরু-পঞ্চমী উপলক্ষ্যে। কাল ফিরেছি।

সে একটু হাসিল, যেন ত্রুটি স্খালনের জন্য।

সুমন্ত চিত্রার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। তাহার মনে হইল, তিন বৎসর আগেকার চিত্রার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্তন কোথায় হইয়াছে সে ভাল করিয়া ধরিতে পারিতেছে না। চিত্রা সামান্য একটু মোটা হইয়াছে, রঙটা একটু মসৃণ হইয়াছে, কিন্তু চিত্রার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র তাহার মনে হইয়াছে, তিন বৎসর আগে যে চিত্রাকে সে দেখিয়া গিয়াছিল, এই মেয়েটি যেন সে নয়। তাহার মনে পড়িল, পরিবর্তন চারিদিকেই হইয়াছে। কলেজের

প্রফেসর বাবু বাসুদেব সেন আজ সেন মুখার্জি কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টার। নানা রকম ব্যবসা—বাংলায় বিহারে আসামে। অজস্র উপার্জন। এই সৌভাগ্যোদয়ের সামান্য সূচনা মাত্র সে দেখিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের কয়েকটি বৎসর মাসে আড়াই শত টাকা বেতনের অধ্যাপককে আজ নাকি মাসে দশ-পনেরো হাজার টাকা আয়ের উপায় করিয়া দিয়াছে। তাহার বাড়ির লোক এই রকম বলে। আরও বলে যে, যুদ্ধের ফলে যে নূতন একটা বাজারের উৎপত্তি হইয়াছে, মিঃ সেন নাকি সে বাজারের একজন গণ্যমান্য লোক। অর্থ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কেমিস্ট্রিতে পণ্ডিত মিঃ সেনের ধর্মপিপাসাও নাকি অত্যন্ত বাড়িয়াছে। মেজদা হাসিয়া বলেন, টাকা ও গুরুভক্তি প্যারিটি রক্ষা করিয়া বাড়িতেছে। আর চিত্রা?

সুমন্তদা, চোখ বুজে কি ভাবছেন?

কি ভাবছি শুনবে? তোমার কপালে ওটা কিসের চিহ্ন—চন্দনের ছাপ দেওয়া?

গুরুদেবের শ্রীচরণপদ্মারবিন্দ চিহ্ন।—চিত্রা স্মিত মুখে বলিল।

সুমন্ত সোজা হইয়া বসিয়া একটু বিস্মিতভাবে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। তাহার মুখে অতি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া মিলাইয়া গেল।

সে বলিল, কি ভাবছি শোন, যদিও আমি চোখ বুজি নি, তোমার দিকে চেয়েই ভাবছিলাম। বছর আড়াই আগে ইরাকে মোসালের কাছে একটা জায়গায় হাসপাতালে কাজ করছি। একদিন বিকেলের দিকে মন বড় খারাপ লাগল। ভাবলাম, হাসপাতালের কাজ সেরে একটু বেড়াতে যাব। কয়েকজন লোক ট্রাক থেকে একটা বডি নামিয়ে স্টেচারে নিয়ে ঢুকল। ডাক পড়তে গিয়ে শুনলাম, আমাদের একটা ট্রাক গাঁ-পথে যেতে একটি মেয়েকে রান ওভার করেছে। ক্ষতিপূরণের ব্যাপার আছে, দেখে শুনে বিস্তারিত রেকর্ড করতে হবে। শুনলাম, মেয়েটি কুর্দি জাতির। একজন ইরাকী নার্সকে ভাল ক'রে দেখে রিপোর্ট দিতে বললাম। কিছুক্ষণ পরে সে এসে জানালে, মেয়েটা মরে নি, চোট লেগে জখম ও অজ্ঞান হয়েছে—মাথার পিছনে ও পাঁজরায় চোট লেগেছে। দেখতে গেলাম। টেবিলে মেয়েটাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, মুখের ওপর গোছা গোছা রক্ত ও ধুলো মাখা চুল এসে পড়েছে। আলো কম মনে হ'ল। আস্তে তার মুখের ওপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিলাম, বিজলী

আলোটাও জ্ব'লে উঠল। এত বেশি চমকে উঠেছিলাম যে, নার্স ও আরও কয়েকজন লোক ছুটে এল। ততক্ষণে সামলে নিয়েছি। কুর্দিস্থানের পাহাড়-অঞ্চলের গরিব গ্রাম্য মেয়ে, বোধ করি আশপাশে কোথাও মজুরি বা ওই রকম কিছু করে। মাস খানেক হাসপাতালে থেকে সে চ'লে গেল—সম্পূর্ণ নয়, খানিকটা ভাল হয়ে।

আমি চমকে উঠেছিলাম কেন জান? আলতা-গোলা দুধের মত রঙ, ছোট মুখ, টিকলো নাক, পাতলা ঠোঁটের রেখা আর গালে নাকের পাশে কালো একটা জড়ুল দেখে। হঠাৎ মনে হ'ল, ছ মাস আগে হাওড়া স্টেশনে একটি মেয়েকে ফেলে এসেছিলাম, সে-ই বুঝি কোন উপায়ে এই বালির দেশে এসে পড়েছে।

সুমন্ত চিত্রার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। চিত্রা একটু ভাবিয়া বলিল, তাকে আরাম ক'রে দিলেন, সে কৃতজ্ঞতা জানালে না যাবার সময়ে?

না। এক মাসের মধ্যে একটা কথা বলে নি, যাবার সময়ও বলে নি? সে কথা যাক। এ রকম ক'রে চমকে ওঠবার মত ঘটনা আরও কয়েকবার ঘটেছে। একবার সিরাজ থেকে পারসিপোলিসের ধ্বংসাবশেষ তখ্ত জামসিদ দেখতে গেলে সেখানে, একবার পুষ্ট-ই-কোহ্‌র পার্বত্য অঞ্চলে বখতিয়ারীদের একটা গ্রামে। বোধ হয় আরও কয়েক বার, ঠিক মনে নেই।

সুমন্ত কিছুক্ষণ নীচে বাগানের দিকে চাহিয়া রহিল। নীচের খোলের শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে। চিত্রা বোধ হয় কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া একটু নড়িয়া বসিল।

সুমন্ত মুখ তুলিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে চিত্রার দিকে চাহিল। বলিল, কেন এ গল্প তোমাকে শোনালাম, বুঝলে?

চিত্রার মুখে অতি সামান্য লালের আভা দেখা গেল। সে বলিল, গল্প আর কই শোনালেন?

তাহার কথা কানে না তুলিয়া সুমন্ত বলিল, দেখ চিত্রা, যে মেয়েটি তিন বছর ধ'রে এ ভাবে আমার মনের মধ্যে বাস করছিল আর যার সঙ্গে কোন মেয়ের সামান্য সাদৃশ্য দেখলেই আমি চমকে উঠতাম, এখন দেখছি, সে আমার মনের কল্পনা, বাইরে তার অস্তিত্ব কোন সময়ে থেকে থাকলেও এখন—

সুমন্তদা, একটু বসুন। আপনার আসবার খবর মাকে দিয়ে আসি। আপনার কথা এর আগে প্রায়ই বলতেন।

সুমন্ত হাসিল, বলিল, আচ্ছা, বসছি, কাকীমাকে খবর দাও।

সুমন্ত চিত্রার মাকে 'কাকীমা' বলে বাল্যকাল হইতে। তাহাদের বাড়ি একটা বাড়ি পরে প্রফেসর সেন একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে থাকিতেন। দুই পরিবারে যাতায়াত হৃদ্যতা অনেকদিন হইতে। চিত্রা তাহার চোখের সম্মুখে বড় হইয়াছে। চিরকাল ধীর শান্ত মেয়ে, ভয়ানক সীরিয়াস ছেলেবেলা হইতে সব বিষয়ে সে সীরিয়াস—চুল বাঁধা হইতে পুতুল খেলা পর্যন্ত। কিন্তু একটি আদর্শ জিনিস সে লক্ষ্য করিয়াছে চিত্রার মধ্যে। মাঝে মাঝে তাহার স্বভাবে সাধারণ গতির বিপরীত একটা গতি সক্রিয় হইয়া উঠে তাহার স্বভাবে অল্পবাক্ শান্ত মেয়েটি হঠাৎ বাচাল ও চঞ্চল হইয়া উঠে। শান্ত সমুদ্রের বুকে যেন মাতাল তরঙ্গ দেখা দেয়। কিছুদিন পরে তরঙ্গ আবার সমুদ্রের বিশাল বুকে বিলীন হইয়া যায়।

চিত্রা বরাবর সুমন্তের অনুগত। এই আনুগত্য কোথায় পৌছিয়াছে, তাহারা দুইজনে জানিতে পারিল, যখন সুমন্ত এমার্জেন্ট কমিশন লইয়া মধ্য-প্রাচ্যে যাইবার আদেশ পাইল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করিবার অবকাশ তাহারা পায় নাই। সুমন্ত হাওড়া স্টেশনের বিদায়-দৃশ্যকে, গাড়ির জানালায় মাথা রাখিয়া চিত্রা কান্না চাপিবার চেষ্টা করিতেছে, এই ছবি মনের মধ্যে একটা ফোটোর মত বাঁধাইয়া রাখিয়াছিল। গত তিন বৎসরের ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে আবর্তিত হইয়াও এই ফোটোকে সে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে।

তিনটি দ্রুতপরিবর্তনশীল, ভয়ঙ্কর, দেশ ও জাতি বিধ্বংসী বৎসর চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে সব কিছু ভাঙিয়া চুরিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আগুনের হলকায় বারুদের ধূমে আকাশ বাতাস উত্তপ্ত ও অন্ধকার হইয়াছে। সুমন্ত তাহার মনের মধ্যের ফোটোটিকে অমলিন স্থির রাখিয়াছে।

চিত্রার মায়ের সঙ্গে দেখা হইল। ভদ্রমহিলার তিন বৎসরে যেন অনেকখানি বয়স বাড়িয়াছে। চারিদিকের নূতন ঐশ্বর্যের জাঁকজমকের মধ্যে তাঁহার ভাব যেন অনেকখানি নির্লিপ্ত উদাসীন। ইহার কারণ কি হইতে পারে, ভাবিতে ভাবিতে সুমন্ত নীচে নামিল।

সে ভাবিল, মিঃ সেনের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবে। চিত্রা সুমন্তের কাছে

তাহার মাকে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সুমন্ত নীচে নামিয়া হল-ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কীর্তন থামিয়াছে, কি একটা স্তোত্র আবৃত্তি হইতেছে, মাঝে মাঝে সমবেত কণ্ঠে 'জয় গুরু জয় গুরু' ধ্বনি উঠিতেছে। শীঘ্র আসর ভাঙিবে মনে করিয়া সুমন্ত বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। পরদা উঠাইলে আবার সেই কোঁচার খুঁট ধরিয়া হাত ঘুরাইয়া নাচ দেখিতে হয়, এই ভয়ে ভিতরে যাইতে সে ভরসা করিল না।

সুমন্ত লক্ষ্য করিল, বাড়িতে কিসের কর্মব্যস্ততা দেখা দিয়াছে, লোকজন আসিতেছে, যাইতেছে, জিনিসপত্র মাথায় করিয়া বার বার কুলিরা যাওয়া-আসা করিতেছে। ইউনিফর্ম-পরা সুমন্তের দিকে সকলেই একবার চাহিয়া দেখিয়া পাশ কটাইয়া যাইতেছে, কেহ একটা কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে না। আয়োজন কিসের জানিবার কৌতূহল হইলেও জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা নিবৃত্ত করিবে এমন লোক সে দেখিতে পাইল না। সে নিজের মনে এদিক ওদিক পায়চারি করিতে লাগিল।

আসর ভঙ্গ হইল। মিঃ সেন বাহিরে আসিলেন, সঙ্গে চিত্রা। সুমন্ত আগাইয়া আসিয়া মিঃ সেনকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইল। তিনি চমকিয়া দুই পা পিছনে হটিয়া গেলেন। দুই হাত তুলিয়া বলিলেন, শ্রীগুরু শ্রীগুরু! দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া করজোড়ে বলিলেন, আমাকে পাপের ভাগী করবেন না। আমি তৃণ অপেক্ষাও নীচ, আমাকে প্রণাম করা কেন?

চিত্রা বলিল, বাবা, সুমন্তদা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

প্রসন্ন হাস্যে মিঃ সেনের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। তিনি বলিলেন, কে, সুমন্ত? তা বাবা, এসেছ বেশ করেছ। বড় আনন্দ পেলাম। বেশ, বেশ!

তিনি আর কোন কথা না বলিয়া অগ্রসর হইলেন। চিত্রা তাঁহার কাঁধে হাত দিল, বাধা পাইয়া তিনি দাঁড়াইলেন। চিত্রা বলিল, পরশু শ্রীগুরুদেব আসবেন, উৎসব হবে। সুমন্তদাকে নিমন্ত্রণ করবে না?

মিঃ সেন মেয়ের মাথায় হাত রাখিয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন, শ্রীগুরুদেবের দর্শনলাভ পুণ্যের কথা মা, তিনি অমৃতের উৎস। তেষ্টা যার পাবে, সে নিজেই ছুটে আসবে মা, আমার নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করবে না।

সুমন্তের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তা বাবা, শ্রীগুরুদেব যদি কৃপা ক'রে

টানেন, তুমি অবিশ্যি আসবে। বাসুদেব সেনের এমন কি যোগ্যতা আছে যে, তোমাকে নিমন্ত্রণ করবে?

একজন চাকর আসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, বিরিজ্‌মল্‌জী আসিয়াছেন, আপিস-ঘরে বসিয়া আছেন। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া মিঃ সেন জিজ্ঞাসা করিলেন, শরবত পান দেওয়া হইয়াছে কি না! ভৃত্যটি মাথা নাড়িয়া জানাইল, হইয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি আপিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সুমন্ত চিত্রাকে জিজ্ঞাসা করিল, বিরিজ্‌মল্‌জী কে? চিত্রা জানাইল, তিনি সরকারী প্রকিওর্‌মেণ্ট এজেণ্ট, বড় মাড়ওয়ারী মার্চেণ্ট। সাপ্লাই বিভাগের কণ্ট্রাক্টরের কাজও করেন। মিঃ সেনের একজন হিতৈষী বন্ধু, সদাশয় ও ধর্ম্মপ্রাণ লোক।

বিরিজ্‌মল্‌জীকে শরবত ও পান দিবার ব্যগ্রতার হেতু সুমন্ত বুঝিল। বিদেশ হইতে ফিরিয়া তিন বৎসর পরে এ বাড়িতে দেখা করিতে আসিয়াছে সুমন্ত—যে সুমন্তের আগে এখানে বাড়ির ছেলের মত আধিপত্য ও আদর ছিল, কিন্তু তাহাকে এক গ্লাস জল পর্যন্ত দিবার কথা কেহ মুখে আনে নাই। তিন বৎসরে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে বটে!

চিত্রা সুমন্তের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, বোধ হয় তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। সে বলিল, একবার এদিকে আসুন সুমন্তদা।

সুমন্ত চিত্রার কপালের শ্রীগুরুপদারবিন্দচিহ্নের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, এবার সরিয়া পড়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে কি না! চিত্রা তাহার বাহুতে একটি অঙ্গুলি রাখিয়া আবার তাহাকে ডাকিল।

সুমন্তকে সঙ্গে লইয়া চিত্রা ডাইনিং-রুমে আসিল। ডাইনিং-রুমের ঝকঝকে বিলাতী কায়দার সাজসজ্জা দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। এই ঘর হইতে তাহারা ছোট একটি ঘরে আসিল। দুই দিকে বড় বড় জানালা দিয়া ভিতরের বাগান দেখা যাইতেছে। গোল টেবিলের উপর ও কোণে পিতলের স্ট্যাণ্ডের উপর জয়পুরী ভাসে মরশুমী ফুলের বাহারী তোড়া। ঘরটি সুমন্তের বেশ লাগিল। গুরুভক্তির বন্যায় চিত্রার ঘরদোর সাজাইবার রুচি আজও ভাসিয়া যায় নাই, ইহাতে সে একটু আশ্বস্ত বোধ করিল।

পরিপাটী করিয়া খাবার সাজাইয়া চিত্রা তাহাকে খাইতে দিলে সে মহা খুশি হইয়া উঠিল। এ বাড়ির আবহাওয়া ভুলিয়া গিয়া সে বলিল, তোমাদের

খোদার কৃপায় অনেক স্থানে আশ্রয়ও পেয়েছি, কিন্তু সব জায়গা থেকেই বিনা দোষে অপমানিত ও প্রহৃত হয়ে তাড়িত হয়েছি। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, কোথাও অন্নদাস হয়ে আর থাকব না। আপনি মালিক, বিশ্বসুদ্ধ লোক আপনার দয়ার গাথা গায়, সেই কথা শুনে তীর্থযাত্রীর মতন আপনার পায়ের কাছে এসে পৌঁছেছি। আপনার বিশাল রাজত্ব, এই রাজত্বের মধ্যে কোথাও যদি কোনও কাজ দয়া ক'রে দেন, তবেই আমরা থাকব, নইলে খোদার যা মরজি তাই হবে।

পরিতোষের কথা শুনে দুই বৃদ্ধ একেবারে চন্‌মনিয়ে উঠলেন। হকিম সাহেব কিছুক্ষণ ধ'রে গড়গড় ক'রে ফারসীতে নবাব সাহেবকে কি সব বললেন, তার একটি বর্ণও বোধগম্য হ'ল না। তাঁর কথা শেষ হতে নবাব সাহেব আমাদের বললেন, কিন্তু তোমরা তো ছেলেমানুষ, এখনও খেলে বেড়ানোর বয়স পেরোয়-নি, তোমাদের ওপরে কি কাজের ভার দেওয়া যেতে পারে?

এবারে আমি বললুম, হুজুর, আপনার বাড়িতে ছোট ছেলেপুলে যদি থাকে তো তাদের পড়াবার ভার আমাদের ওপর দিতে পারেন। ইংরিজী, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্রে আমরা এক-একটি দিগ্‌গজ। আমাদের বয়স দেখে আমাদের বিদ্যার মাপ করবেন না।

আমার কথা শুনে দুই বৃদ্ধ একেবারে অবাক! বোধ হয় পাছে নিজের বিদ্যা ধরে প'ড়ে যায়, সেইজন্য হকিম সাহেব এবার ফারসী ছেড়ে উর্দু ভাষাতেই নবাব সাহেবকে বললেন, বাংগালীর ছেলেরা খুবই তালিম-ইয়াফ্‌তা হয়। আমি কলকাতায় অনেকদিন বাস করেছি, আমি জানি।

দুই বৃদ্ধে পরামর্শ চলতে লাগল, কখনও ফারসীতে কখনও উর্দুতে। ওদিকে সূর্য প্রায় ডুবে গেলেন, সামান্য একটু আলোতে তাঁদের মুখ দেখা যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা চলবার পর নবাব সাহেব আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, হ্যাঁ, আছে, বাড়িতে ছোট বাচ্চা আছে, আমার নাতি আছে। সে আমাদের লেখাপড়া কিছু কিছু জানে, কোরানশরিফ পড়তে পারে। তোমরা যদি তাকে বাংগালী, আংরেজী, সংস্কৃত, তারিখ ও আর যা যা বললে শেখাতে পার, তা হ'লে তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ তো থাকবই, তা ছাড়া তোমাদের আখেরে ভাল হবে।

এই গুরুদেবের কথা আমাকে কিছু বলবে চিত্রা? যাঁর শ্রীপদারবিন্দের ছাপ তোমার কপালে উঠেছে, তাঁর সম্বন্ধে আমি ভয়ানক কৌতূহল বোধ করছি।

চিত্রার মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করিল। সে বুঝিতে পারিল, কথাটা অনুচিত হইয়াছে। তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্য সে বলিল, দেখ, আমার হয়তো ভক্তির অভাব আছে। কিন্তু তোমরা যাঁকে দেবতার মত শ্রদ্ধা কর, তিনি যে বাস্তবিক শ্রদ্ধার পাত্র, সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। তুমি তো আমাকে পরশু আসতে বলেছ, তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাওয়া কি দোষের?

চিত্রার মুখের রেখাগুলি নরম হইল। সে বলিল, রাধাভাবে সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। গুরুদেব বিরহিণী শ্রীরাধার পূর্ণ অবতার।

সুমন্তের হাতের সিঙাড়া মুখে না পৌঁছিতেই তাহার মুখ হাঁ হইয়া গেল।

মাপ কর চিত্রা, তুমি বোধ হয় 'গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের অবতার' এই কথা বলতে চাও?

সুমন্তের অজ্ঞতা উদারভাবে মার্জনা করিয়া চিত্রা একটু অনুকম্পার হাসি হাসিল।

না সুমন্তদা, তিনি শ্রীরাধার অবতার। শোন তবে, বলছি সব কথা। শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে শ্রীরাধা একদিন সখীবৃন্দে পরিবেষ্টিতা হয়ে শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় ব'সে আছেন। সন্ধ্যা হয় হয়। অধিক বিলম্বে বাড়িতে গুরুজনের হাতে লাঞ্ছনার ভয় আছে। ক্রমে তিনি অধীরা হয়ে উঠলেন। সখীরা নানা ছন্দে শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করতে লাগলেন। শ্রীরাধার কানে সে নিন্দা বিষবৎ হ'লেও তিনি বাধা দিলেন না, কারণ শ্রীকৃষ্ণের অনুচিত বিলম্বে তাঁহারও বিলক্ষণ ক্রোধ হয়েছিল। সখীরা উঠে দাঁড়ালেন গৃহে ফিরবেন ব'লে, এমন সময় হাসতে হাসতে শ্রীকৃষ্ণ কদম্বগাছ থেকে নেমে এলেন। এতক্ষণ তিনি কদম্বশাখার আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন। তাঁর হাসি দেখে শ্রীরাধার ক্রোধবহ্নি জ্ব'লে উঠল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার ক'রে বললেন, হৃদয়হীন গোপবালক, রাধার জ্বালা তুমি কি বুঝবে? কৃষ্ণপদে কায়মনবাক্যে যদি আমার মতি থাকে, তবে এই শাপ দিলাম, তুমি রাধা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। আমি যেমন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব'লে কেঁদে বেড়াই, তেমনি ক'রে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব'লে কেঁদে বেড়াবে। বিরহের জ্বালায় আমার মত পাগল হবে। কুপিতা শ্রীরাধার এই শাপ শুনে শ্রীকৃষ্ণ, হায় রাধা, তুমি কি করলে—ব'লে মূর্ছিত হলেন। এই শাপের ফলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারূপে

আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণরূপী শ্রীরাধার অবতার। 'কোথায় কালা, কোথায় কালা' ব'লে তিনি সদাই পাগল। শ্রীগুরুদেব বিরহিণী রাধার অবতার।

চিত্রার চোখ হইতে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়িতেছিল, রাধার বিরহব্যথার সমবেদনায় তাহার চোখের দৃষ্টি বিধুর, অঙ্গে আক্ষেপের ভাব।

সিঙাড়াটি সুমন্তের হস্তচ্যুত হইয়া প্লেটে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার মনে হইল, তাহার গা কেমন শিরশির করিতেছে, যেন একটা মাকড়সা কি আরসোলা তাহার খালি গা বাহিয়া কিলবিল করিয়া উঠিতেছে। ভিতর হইতে অট্টহাসির বন্যা বাঁধ ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছিল, চিত্রার দিকে চাহিয়া সহসা সেই বন্যার গতি রুদ্ধ হইল।

চিত্রার চোখের জল শুকাইয়া আসিতেছিল। তাহার বিরহবিধুর ভাব কাটিয়া চোখে মুখে অনির্বচনীয় মধুর শান্ত ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সুমন্ত মুগ্ধ হইল। এত গভীর অনুভবশক্তি চিত্রার মধ্যে রহিয়াছে? কিন্তু চিত্রার মনের গতি যদি এই পথে চলিতে থাকে, কোথায় তাহা থামিবে? কোথায় ইহার শেষ? কিছুক্ষণ সে কি যেন ভাবিল। তারপর উঠিয়া হাসিমুখে সে চিত্রার কাছে বিদায় লইল, বলিল, শ্রীগুরুদেবের দর্শনলাভের জন্য সে পরশু আসিবে।

চিত্রা বলিল, হ্যাঁ, এসো সুমন্তদা, কত আনন্দ পাবে দেখো।

সিঁড়িতে নামিবার সময় সুমন্তের দৃষ্টি পড়িল কাকাতুয়া-যুগলের উপর। তাহারা আহার শেষ করিয়া তখন নিদ্রা যাইবার পূর্বে এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিবার কসরৎ করিতেছিল। সে একটির একটু কাছ ঘেঁষিয়া যাইতে সেটা কসরৎ বন্ধ করিয়া তাহার কান লক্ষ্য করিয়া ছোঁ মারিল, শিকলে টান পড়ায় সুমন্তের কান অক্ষত রহিয়া গেল। হাসিয়া সুমন্ত মনে মনে বলিল, শ্রীগরুড় কাকাতুয়া-অবতার হয়েছেন কিনা, তাই শ্রীশ্রীরাধায়-ভক্তিহীন সুমন্তের উপর এত আক্রোশ।

সে গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছে, এমন সময় প্রকাণ্ড একখানা গাড়ি আসিয়া গাড়ি-বারান্দার বাহিরে দাঁড়াইল, সিন্ধী টুপি মাথায় এক ভদ্রলোক গাড়ি হইতে নামিলেন। হোসেনভাই মূর্তিওয়ালা বা ওই রকম কেউ হবেন বোধ হয়।— সুমন্ত স্বগত মন্তব্য করিয়া গাড়িতে স্টার্ট দিল।

বাড়ি ফিরিবার পথে সুমন্ত সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা

করিতে লাগিল। গত তিন বৎসর ভারত মহাসমুদ্র হইতে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূভাগে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সে বাস করিয়াছে। বিদেশ ও বিদেশীগণের মধ্যে বাস করিয়া স্বদেশকে নূতন চোখে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, যেখানে গিয়াছে আপনাকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি মনে করিয়া সে গিয়াছে। হিমালয়ের বিপুল অবিন্যস্ত কেশভার মস্তকে, চরণ যুগল লীলাচ্ছলে মহাসাগরের বুকে প্রসারিত করিয়া তাহার জন্মভূমি ভারতবর্ষ পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। দেশে থাকিতে সে শুধু রাজনৈতিক নেতার ও কবির ভারতবর্ষকে চিনিত, সে ভারতবর্ষের ছিল শুধু একটা বাঙ্ময় সত্তা। তাহার জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষকে সে যেন প্রথম চিনিতে পারিয়াছে বিদেশের মাটিতে পা দিবার পর।

সুমন্ত ভাবিয়া পাইতেছিল না, দেশে ফিরিবার পর হইতে তাহাদের সংসারের, সমাজের, আশেপাশের মানুষের শত সহস্র ত্রুটি কেন নিয়ত কাঁটার মত তাহাকে বিঁধিতেছিল। এই সব ত্রুটি কি নূতন দেখা দিয়াছে, না তাহার চোখের দোষে, যাহা ত্রুটি নয়—হয়তো জাতির বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক গুণ, তাহা ত্রুটি বলিয়া মনে হইতেছে? কে এই সমস্যার সমাধান করিবে?

মিঃ সেন, তাঁহার স্ত্রী, তাঁহাদের কন্যাকে সে বাল্যকাল হইতে জানে। কি পরিবর্তন তাঁহাদের মধ্যে ঘটিয়াছে যে, আজ তাঁহারা তাহার সঙ্গে প্রায় অপরিচিতের মত ব্যবহার করিলেন? তাঁহারা মোহগ্রস্ত হইয়াছেন, না সে তাঁহাদিগকে বুঝিবার শক্তি হারাইয়াছে? অথবা ইহা শুধু টাকার মাহাত্ম্য? কিন্তু সুমন্তরাও তো বিত্তহীন নহে!

সচকিত হইয়া সুমন্ত জোরে ব্রেক কষিল, আর চার ইঞ্চি অগ্রসর হইলে অতিকায় মিলিটারি ট্রাকখানা গাড়িসুদ্ধ তাহাকে চূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া যাইত। সুমন্ত সাবধান হইয়া গাড়ি চালাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ বাদে আবার তাহার মাথায় অসংলগ্ন চিন্তার জাল-বোনা আরম্ভ হইল। চিত্রা তাহার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সত্যই গিয়াছে কি? সুমন্তের মনে হইল, হয়তো একেবারে হতাশ হইবার কারণ নাই। অল্প সময়ের জন্য আগেকার চিত্রার আবির্ভাব ঘটিতে সে যেন দেখিয়াছে। চিত্রাকে তাহার বাড়ির বর্তমান আবহাওয়া হইতে কি ভাবে বাহিরে আনা যায়, এই চিন্তাকে

কেন্দ্র করিয়া তাহার মাথায় নানা উদ্ভট কল্পনা খেলিতে লাগিল। নিজের উদ্ভট কল্পনায় সুমন্তের হাসি পাইল। সকলের আগে দরকার বিরহিণী শ্রীরাধার অবতার শ্রীগুরুর দর্শন ও কৃপা লাভ করা। একটা বড় অসুবিধা এই যে, ছুটি শেষ হইলে তাহাকে হয়তো আবার বিদেশে যাইতে হইবে।

ইচ্ছা সত্ত্বেও গুরুদেবের যেদিন আসিবার কথা, সেদিন সুমন্ত চিত্রাদের বাড়িতে যাইতে পারিল না। তাহার দুই দিন পরে সে যাইবার সময় পাইল।

চিত্রাদের বাড়ি উৎসব-বাড়ির বেশ ধরিয়াছে। ফটকে উচ্চ মঞ্চের পর রোশনচৌকি বসিয়াছে, বিবাহের বাজনা বাজাইতেছে সানাইওয়ালা। ডাব আম্রপল্লব কলাগাছ ফুলের মালার ছড়াছড়ি, স্ত্রী পুরুষের ভিড়। ফটকের বাহিরে রাস্তায় মোটরগাড়ি, ফিটন, রিক্শা, ট্যাক্সির সারি, ভলান্টিয়ারগণ গাড়ি যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, শ্রীভক্তদিগের পৃথক প্রবেশ-পথে পাহারা দিতেছে। দুইজন লাল-পাগড়ী লাঠি হাতে ফটকের দুই পাশে টুলের উপর বসিয়া শান্তি-রক্ষা করিতেছে। শ্রীগুরুদেবের শুভাগমনের লক্ষণ চারিদিকে পরিস্ফুট।

আয়োজন দেখিয়া সুমন্ত বিস্মিত হইল। সে মনে করিয়াছিল, মিঃ সেনের গুরুদেব তাঁহার প্রাইভেট গুরু, কিন্তু সে দেখিল যে, তিনি পাব্লিক গুরু, তাঁহার খ্যাতি বহুবিস্তৃত। গুরুদেব সম্বন্ধে তাহার মনে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল।

সুমন্ত ফৌজী পোশাক ছাড়িয়া ধুতি-পাঞ্জাবি পরিয়া আসিয়াছিল। ভক্তদের মধ্যে মিশিয়া ভক্ত-দলের চাপে সে বিনা আয়াসে শ্রীগুরুদেবের পুণ্য সন্নিধানে উপস্থিত হইল।

দুই দরজার কাছে দুইটি কিউ হইয়াছে, পুরুষ ও মহিলা ভক্তদিগের। একজন করিয়া প্রবেশ করিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া অন্য দরজা দিয়া বাহির হইতেছে। নির্গমনের দরজাও দুইটি; ভলান্টিয়ারদের ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। লাইনে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে অবশেষে সুমন্তের পালা আসিল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া সুমন্তের মনে হইল, কোন বাসর ঘরে সে আসিয়া পড়িয়াছে নাকি? কনেকে কেন্দ্র করিয়া বিবাহ-বাড়ির উৎসবের শাড়ি-গহনার জৌলস ছড়াইয়া অল্পবয়স্ক শৌখিন মহিলার দল বসিয়া আছেন—না, এটা বাসর নয়। কেন্দ্রস্থানীয় ব্যক্তি কনে নহেন, কনের পোশাকে একজন স্থূলকায়

দীর্ঘ-কেশ পুরুষ, নীল কিংখাবের তাকিয়ায় দেহ এলাইয়া নিম্ন মুখে অবস্থান করিতেছেন। সুমন্ত দেখিল, তাঁহার অতি নিকটে এক পাশে চিত্রা ও বহু মহিলা বসিয়া আছেন। কিছু দূরে অন্য পাশে অন্তরঙ্গ পুরুষ ভক্তের দল। ঘরে ধূনোর ধোঁয়া, ফুলের ও উগ্র বিলাতী সেণ্টের গন্ধ।

গুরুদেব কোন্‌টি, কাহাকে প্রণাম করিতে হইবে, ভাল বুঝিতে না পারিয়া সুমন্ত ইতস্তত চাহিতে চিত্রার সঙ্গে দৃষ্টি মিলিল। ইঙ্গিতে চিত্রা তাহাকে বসিতে বলিল। একজন ভলাণ্টিয়ার ত্রস্তে ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে উঠাইয়া দিতে যাইতেছিল, চিত্রা ইশারায় তাহাকে বারণ করিল।

সুমন্ত দেখিতেছিল। একে একে পুরুষ ও নারী ভক্তগণ আসিয়া সেই স্ত্রী-বেশী স্থূলকায় ভদ্রলোকটির সম্মুখে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। কেহ কেহ যে-মোটা কাশ্মীরী কার্পেটের উপর মখমলের আস্তরণ বিছাইয়া তাকিয়া সাজাইয়া তাঁহাকে বসিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা স্পর্শ করিয়া হাত কপালে ও বুকে বুলাইয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ আবার সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ভদ্রলোকটির লম্বা চুল বিনুনি করিয়া মোটা জরির ফিতা দিয়া বাঁধা, পরনে ময়ূরকণ্ঠী বেনারসী ও ওই কাপড়ের ব্লাউজ; গলায় ও হাতে জড়োয়া অলঙ্কার, কপালে চন্দনের পত্রলেখা। মাঝে মাঝে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন, এক হাত বুকে বুলাইতেছেন ও অস্পষ্ট স্বরে কাহাকে যেন ডাকিতেছেন, নিঃসন্দেহে সুমন্ত বুঝিতে পারিল, ইনিই বিরহিণী শ্রীরাধার অবতার গুরুদেব।

ক্রমে দর্শনপিপাসু ভক্তের সংখ্যা কমিয়া আসিল। একটু অন্ধকার হইয়াছিল, হঠাৎ দুই পাশ হইতে লাল ও নীল আলো জ্বলিয়া উঠিয়া ঘরের 'পরিস্থিতি'কে রহস্যময় করিয়া দিল। সুমন্ত স্পষ্ট শুনিতে পাইল, গুরুদেব 'কালা! কালা!' বলিয়া ডাকিতেছেন ও ঘন ঘন বুকে হাত বুলাইতেছেন। মহিলা-দলের মধ্য হইতে একটা চাপা কান্নার শব্দ আসিতেছিল। সুমন্ত চাহিয়া দেখিল, চার-পাঁচ-জন মহিলা গুরুদেবের দিকে তদ্‌গতভাবে চাহিয়া কাঁদিতেছেন, চিত্রার চোখেও যেন জল টলটল করিতেছে। পাশে জোরে নিশ্বাস ফেলিবার শব্দ শুনিয়া সে চাহিয়া দেখিল, মিঃ সেনের দেহ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, চোখে জলের ধারা। সুমন্ত ভাবিল, ইহাদের সঙ্গে সেও যদি একটু কাঁদিয়া লইতে পারিত, বোধ হয় কিছু সুবিধা হইত।

হঠাৎ ঘরের আবহাওয়া বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিল। ময়ূরকণ্ঠী বেনারসীর অঞ্চল লুটাইয়া আলুথালু ভঙ্গীতে গুরুদেব উঠিয়া আসিয়া মিঃ সেনের দুই কাঁধে হাত দিয়া সজল চক্ষে করুণভাবে বলিতে লাগিলেন, বাসুদেব, আমার কালাকে দাও, আমার কালাকে দাও। মিঃ সেনের কাঁধ ছাড়িয়া তাঁহার হাঁটু ধরিয়া ঘরের মেঝেতে তিনি মাথা কুটিতে লাগিলেন, বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বার বার কালাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মিঃ সেনের দেহ ঋজু, কঠিন ভাব ধরিয়াছে, নয়ন অর্ধনিমীলিত, শ্বাস বহিতেছে কি বহিতেছে না। কে একজন অতি মৃদুস্বরে বলিল, সেনভাই সমাধিস্থ হইয়াছেন, তাঁহার বাসুদেব-ভাব প্রাপ্তি হইয়াছে।

মহিলা ভক্তদিগের অবস্থা অবর্ণনীয়। অশ্রুধারায় অনেকের গণ্ডের গোলাপী আভা বিবর্ণ, ওষ্ঠের রক্তিমা ক্ষীণ, ভাবাবেগে বেশবাস অসম্বৃত। গুরুদেবের আসনের নিকটে প্রথম লাইনে যে সকল তরুণ বয়সের মহিলা বসিয়া ছিলেন, সকলেরই সখী-ভাব প্রাপ্তি হইয়াছে। সুমন্ত শুনিতে পাইল, হাসি ও কান্নার মধ্যে পরস্পরকে ললিতা, বিশাখা ইত্যাদি নামে সম্বোধন করিয়া মৃদুস্বরে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে দুই-একটা কথা বলিতেছেন।

অতর্কিতে 'কালা রে!' বলিয়া মর্মভেদী আর্তনাদ করিয়া গুরুদেব সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তমণ্ডলী 'কালা! কালা!' করিয়া গুঞ্জন ও হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন।

ঘরের আবহাওয়ায় বৈদ্যুতিক শক্তি আরও এক শত ভোল্ট বাড়িয়া গিয়াছে, সচকিত হইয়া সুমন্ত দেখিল, সখীভাবপ্রাপ্তা কয়েকজন তরুণী চিত্রাকে বেষ্টন করিয়া আনিতেছে। চিত্রা বেষ্টনীতে বন্দী হইয়া বঙ্কিম ভঙ্গীতে পা ফেলিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া গুরুদেবের কাছে বসিল। সখীভাবপ্রাপ্তাদিগের মধ্যে একজন গুরুদেবের কানের কাছে মুখ লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, শ্রীরাধা, এই যে তোমার কালা এসেছেন, নয়ন মেলে একবার দেখ।

মিঃ সেন তখনও বাসুদেব-ভাবে সমাধিস্থ।

ঘরের আবহাওয়ার বৈদ্যুতিক শক্তি সুমন্ত আর সহ্য করিতে পারিল না, যে দরজা কাছে পাইল, সেই দরজা দিয়া ছিটকাইয়া সে বাহির হইয়া গেল। তাহার মস্তিষ্কের ও মনের অবস্থা বিবেচনা করিলে সেদিন যে সুমন্ত মিলিটারি লরির সহিত সংঘর্ষ বাঁচাইয়া গাড়ি চালাইয়া নিরাপদে বাড়ি আসিতে পারিয়া-

ছিল, তাহা শ্রীগুরুদেবের অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করিবার পুণ্যের ফল, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বোধ হয় ইহার তিন-চার দিন পরের ঘটনা। চিত্রাকে বাঁচাইবার উপায় সম্বন্ধে নানারকম সম্ভব অসম্ভব কল্পনার জাল বুনিয়া বুনিয়া সুমন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। ধর, উপস্থিত অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও কোন উপায়ে চিত্রাকে শ্রীগুরুদেবের হাত হইতে সে সরাইয়া আনিল; কিন্তু সেটা তো প্রধান কথা নহে; তাহার পিতার প্রভাব, শ্রীগুরুদেবের প্রভাব হইতে তাহার বুদ্ধি ও মনকে মুক্ত করিবে কি উপায়ে? চিত্রার সেই বঙ্কিম ভঙ্গীতে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইবার কথা মনে হইল। অতি দুঃখের মধ্যেও তাহার হাসি পাইল। আজকালকার মেয়ে, লেখাপড়া জানে, সে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে, বিরহিণী রাধার অবতার শ্রীগুরুদেবের বিরহসন্তাপ দূর করিবার জন্য সে কৃষ্ণের অংশে জন্মিয়াছে! আর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মিঃ সেনের বাসুদেব-ভাবপ্রাপ্তি? ইহারা কি এই যুগের মানুষ? ওই রকম অদ্ভুত স্নায়ুরোগগ্রস্ত মানুষ কি আর কোথাও দেখা যায় এ দেশ ছাড়া? বাড়ির সকলে তাহার কাছে গল্প শুনিয়া হাসিয়া অস্থির, এটা যে ঘোর ট্র্যাজেডি তাহা কেহ বুঝিতেছে না। কিন্তু সুমন্ত কি করিতে পারে এই ট্র্যাজেডি বন্ধ করিবার জন্য? ধর্মে অতিশয় নিষ্ঠা বড় সাংঘাতিক জিনিস, মানুষের সাধারণ বুদ্ধিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া ফেলে। ধর্মের বিলাস আরও মারাত্মক জিনিস। ধর্মবিলাসী মানুষ স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব বরণ করে।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে সেদিনকার সংবাদপত্রখানা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া অন্যমনস্কভাবে হেড-লাইনগুলি দেখিতে লাগিল। একটি হেড-লাইন দেখিল, কালা-বাজার উৎসাদনে পুলিসের প্রশংসনীয় তৎপরতা। হেড-লাইনের নীচের সংবাদ পড়িয়া সে চমকিয়া উঠিল। বিনা লাইসেন্সে পাঁচ হাজার মণ সরিষার তেল গুদামে রাখিবার জন্য সেন মুখার্জি কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ বাসুদেব সেন এন্‌ফোর্সমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের তৎপরতায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন ও পুলিস গুদাম সীল করিয়াছে। পুলিস মিঃ সেনের গৃহও তল্লাস করিয়াছে, কিন্তু আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

সুমন্ত ভাবিল, মিঃ সেনের বাসুদেব-ভাবপ্রাপ্তি এবার সম্পূর্ণ হইয়াছে দুষ্ট কংশের কারাগারে প্রেরিত হইয়া। কিন্তু চিত্রার কি হইল? সে আর বিলম্ব না করিয়া গাড়ি লইয়া বাহির হইল।

চিত্রাদের বাড়ি পৌঁছিয়া সুমন্ত দেখিল, বাড়ি নিস্তব্ধ। ভৃত্যের মুখে শুনিল, মিঃ সেন আপিস-ঘরে কাজ করিতেছেন। শুনিয়া সে কিছু আশ্চর্য হইল। তাঁহার গ্রেপ্তারের খবর কি মিথ্যা? ভৃত্যকে এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা সমীচীন হইবে কি না সে একটু ভাবিল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল, সাহেব কোথাও গিয়েছিলেন কি এর মধ্যে? ভৃত্য জানাইল, কাল দুপুরে তিনি পুলিসের সঙ্গে কাজে গিয়াছিলেন, রাত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সুমন্ত মিঃ সেনের ঘরে গেল। তিনি বেশ প্রসন্নভাবে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন। নিজেই বলিলেন, একটু পুলিসের হাঙ্গামায় পড়িয়া তিনি কাল বাইরে গিয়াছিলেন, আসিয়া দেখিলেন, খালি বাড়িতে থাকিতে ভয় পাইয়া চিত্রার মা মেয়েকে লইয়া পিত্রালয়ে গিয়াছেন। সুমন্ত বলিল, শ্রীগুরুদেব এখানে থাকিলে সে একবার দর্শন করিতে ইচ্ছুক।

মিঃ সেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, পুলিসের বিভ্রাটে শ্রীশ্রীঠাকুর হরিভাইকে রেখে নিজে আশ্রমে ফিরে গেছেন। হরিভাই রয়েছেন চিত্রা-মাকে আশ্রমে নিয়ে যাবেন ব'লে।

সুমন্ত যে হরিভাইকে চিনে না, তাহা তাঁহার খেয়াল হইল না।

সুমন্ত আনমনা হইয়া কি ভাবিল। তারপর একটু হাসিয়া বলিল, পুলিসের হাঙ্গামের কথা বললেন, পুলিসের কাজ বরাবর উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে প্রশংসনীয় তৎপরতা দেখানো।

মিঃ সেন একবার সুমন্তের দিকে ভাল করিয়া চাহিলেন। বলিলেন, তুমি যথার্থ বলেছ। এ ব্যাপারেও তাই করেছে। কাল দুপুরে তারা গুদামে পাঁচ হাজার মণ তেলের খোঁজ পেয়েছিল, অনুসন্ধান ক'রে রাত্রে তারাই আবিষ্কার করলে খালি টিন গুদামে প'ড়ে রয়েছে। নাহক হয়রানি।

মিঃ সেনের কথা শুনিয়া সুমন্ত মনে মনে একটু হাসিল। কালো-বাজারের ব্যাপারী ও এন্‌ফোর্সমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট, কাহাকে খাটো করা যায়?

মিঃ সেন কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবনার মধ্যে মাঝে মাঝে এক-একবার অন্যমনস্কের মত সুমন্তের দিকে চাহিতেছিলেন। তারপর প্রসন্নভাবে হাসিয়া সুমন্তকে বলিলেন, তোমার বিশেষ অসুবিধে না হ'লে একটা অনুরোধ করতে চাই।

সুমন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলিল, সে কি কথা কাকাবাবু, আপনি আমার কাছে সঙ্কোচ করেছেন কেন? আজ কি নতুন আমাকে দেখছেন?

মিঃ সেন আবার প্রসন্নভাবে হাস্য করিলেন। বললেন, হ্যাঁ বাবা, তুমি ঘরের ছেলের মত। বয়েস হয়েছে, ভেবেছিলাম, মেয়ের বিয়ে দিয়ে সংসার থেকে বিদায় নিয়ে বাকি কয়টা দিন শ্রীগুরুদেবের পায়ের নীচে কাটিয়ে দেব। কিন্তু মেয়ের আমার দেবাংশে জন্ম, সংসারী সে হবে না স্থির করেছে। আর সংসার করা তার সাজেও না। শ্রীগুরুদেব তাকে টেনেছেন। দিনকাল যা পড়েছে, সৎলোকের সংসারে স্থান নেই। ভেবেছি, কাজ-কারবার তুলে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে আশ্রমে চ'লে যাব। শ্রীগুরু! শ্রীগুরু!

তিনি একটু থামিলেন। সুমন্ত ভাবিয়া পাইল না, এই সাধু সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে তাহার সাহায্য কি জন্য প্রয়োজন! সে অতিমাত্র আশ্চর্য হইল, যখন মিঃ সেন বলিলেন যে, তাহাকে মিসেস সেনের পিত্রালয়ে গিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া চিত্রাকে লইয়া এ বাড়িতে আনিবার ভার লইতে হইবে।

তাহার মুখের ভাব দেখিয়া একটু হাসিয়া বললেন, তোমাকে এ অনুরোধ করতাম না, যদি সেদিন তোমায় দেখে শ্রীগুরুপদে দুর্লভ ভক্তির পরিচয় না পেতাম, চেষ্টা ক'রেও এ পরিচয় তুমি গোপন করতে পার নি বাবা! দরদী হাসিতে বিগলিত হইয়া মিঃ সেন সুমন্তের দিকে চাহিলেন।

শ্রীগুরুপদে দুর্লভ ভক্তি! সুমন্তের মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল। চেষ্টা করিয়া সে হাসি দমন করিয়া নিরীহ ঔৎসুক্যের সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করিল, কাকীমা কি চিত্রাকে আশ্রমে পাঠাতে চান না?

মিঃ সেন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বললেন, না না, তিনিও এ সম্বন্ধে খুব উৎসুক। তবে কি জান— তিনি দুই একবার কাশিলেন, তারপর বলিলেন, চিত্রার মা স্নায়ুরোগে দু বছর ধ'রে ভুগেছেন, নিউর্যাল্‌জিয়া, মেলান্‌-কোলিয়া, এইজন্যে— সে যা হোক, তুমি একটু বুঝিয়ে তাঁকে এখানে আনলে সব ঠিক হয়ে যাবে। শ্রীগুরু! শ্রীগুরু!

সুমন্ত বুঝিল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা গোলমাল চলিতেছে। চিত্রার মায়ের ব্যবহারে সে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, মনে করিয়াছিল, নূতন টাকা হইয়াছে সেজন্য পুরাতন ঘনিষ্ঠতা বোধ হয় রাখিতে চাহেন না। কিন্তু বোধ হয় তাহা নহে। গোলমালের কারণ কি হইতে পারে, সে আন্দাজ করিতে পারিল না। চিত্রাকে

আশ্রমে পাঠানো লইয়া এই গোলমাল—এরূপ সন্দেহ করিবার মত কার সে কিছুমাত্র দেখিতে পায় নাই।

চেষ্টা করিয়া দেখিবে—মিঃ সেনকে এই আশ্বাস দিয়া ঠিকানা জানিয়া লইয় সুমন্ত মিঃ সেনের কাছে বিদায় লইল।

পরের দিন মিসেস সেনের পিত্রালয়ে গিয়া সুমন্ত শুনিল, মিসেস সেন সেখানে আসেন নাই, কোথায় গিয়াছেন, কেহ জানে না। না জানার কথাটা সুমন্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিল না। মেয়েকে লইয়া এইভাবে মিসেস সেনের পলাইবার কি কারণ হইল, সে ভাবিয়া পাইল না। সে মনে করিল, কারণ যাহাই হউক, মিঃ সেনের পক্ষীয় লোককে তাঁহারা কিছু বলিবেন না। সুমন্তকে তাঁহারা চিনেন না।

সে আশা করিয়াছিল, চিত্রার সঙ্গে দেখা হইলে দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবে। সংবাদ শুনিয়া হতাশ হইয়া সে বাড়িতে ফিরিল।

সুমন্তের ছুটির মেয়াদ অর্ধেকের উপর শেষ হইয়াছে। ছুটি অন্তে তাহাকে কাম্পটি হাসপাতালে যোগ দিতে হইবে—এইরূপ সম্ভাবনার কথা শুনিতে পাইয়াছে। মনের অস্থিরতার জন্য সব কিছু তাহার কাছে বিশ্রী লাগিতেছে। চিত্রাকে সে ভালবাসে, তাহাকে ভাল না বাসিয়া অন্য কাহাকেও চিত্রা ভালবাসিলে সুমন্ত দুঃখ পাইত, কিন্তু সে দুঃখ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া যাইত। কিন্তু এ যে ব্যাপার অন্য রকম। চিত্রা আত্মসম্মোহিত, তাহার বুদ্ধি ও মন স্বাধীনভাবে কাজ করিতে অসমর্থ। বিনা দ্বিধায়, গর্ব ও আনন্দের সঙ্গেই সে আপনার সর্বনাশের দিকে আগাইতেছে—অসহায়ভাবে সুমন্তকে ইহা দেখিতে হইতেছে।

মনের অস্থিরতা দূর করিবার জন্য কয়েকদিন বাহিরে ঘুরিয়া আসিবে স্থির করিয়া তাহার এক বন্ধুকে পত্র দিল। রওনা হইবার দিন কিছু কেনাকাটা করিয়া বিকালে বাড়ি ফিরিয়া শুনিল, একজন ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন, বলিয়াছেন, সন্ধ্যার আগে আবার আসিবেন। সে সন্ধ্যার সময়ে স্টেশনে যাইবে বলা হইলে তিনি জানাইলেন, খুব জরুরি কাজ আছে, তিনি শীঘ্রই ফিরিবেন।

সুমন্ত রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময়ে সেই ভদ্রলোক

মালিকের সহস্র বৎসর পরমায়ু হোক। আমাদের যতখানি সাধ্য তার চেষ্টার ত্রুটি করব না, আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন।

আমাদের কথা শুনে কম্পিত করুণ কণ্ঠে বৃদ্ধ চীৎকার ক'রে উঠলেন, আল্লাহ্!

আর্তনাদের মতন অস্বাভাবিক সেই কণ্ঠস্বর শুনে আমার বুকের ভেতরটা গুরগুর ক'রে উঠল। চেয়ে দেখলুম, তাঁর দুই চক্ষু মুদিত, ধ্যানস্থ যোগীর মতন শীর্ণ শিথিল দক্ষিণ হস্ত আকাশের দিকে উত্তোলিত—বার্ধক্যজনিত দুর্বলতায় কম্পমান। নিবন্ত সূর্যের শেষ রশ্মিটুকুতে সেই অলৌকিক ছবিখানা ঝকঝক করতে লাগল, তারপরে সব অন্ধকার।

কিছুক্ষণ ঐ ভাবে ধ্যানস্থ থেকে হাতখানা নামিয়ে নিয়ে নবাব সাহেব আমাদের বললেন, আল্লার কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা কর বেটা, আমি কে! আমি তাঁর একজন অধম বান্দা মাত্র।

অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে উঠতে দুজন লোক একটা তোলা চেয়ার ও একজন একটা বড় আলো নিয়ে উপস্থিত হ'ল। নবাব সাহেব আসন ছেড়ে সেই জরির টুপিখানা মাথায় দিয়ে তোলা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, চল আমার ঘরে। স্থবির হয়ে পড়েছি, ঠাণ্ডা লেগে গেলে আবার সবাই বিরক্ত হবেন। সেইখানে ব'সে ধীরে-সুস্থে তোমাদের কথা শোনা যাবে। চলুন সৈয়দ সাহেব।

আমরা সকলে একতলার একটা ঘরে এসে ঢুকলুম। চমৎকার ঘর, এর আগে এমন সুন্দর ঘর কখনও দেখি-নি। ঘরখানা নীচু, মাঝখানে একটা বড় ঝাড় ঝুলছে। আমরা এতদিন সাদা ঝাড়ই দেখেছি, এটা কিন্তু রঙিন ঝাড়, বোধ হয় কুড়ি-পঁচিশটা রঙ-বেরঙের গেলাসে মোমবাতি জ্বলছে। সিলিঙে কড়ি-বরগা কিছু নেই। সেখানে চমৎকার নক্শার মধ্যে লাল, নীল, হলদে, সবুজ, সোনালী চকচকে কাঁচ বসানো, তারই মধ্যে-মধ্যে গোল, চৌকো, ছকোণা আটকোণা, লম্বা আয়না বসানো। আগে কলকাতার সব শৌখিন পানওয়ালার দোকানের সামনে যেমন নানা রঙের ফাঁপা কাঁচের বল ঝোলানো থাকত, সেই রকম নানা রঙের অসংখ্য ছোট বড় গোলক সিলিং থেকে শিকল দিয়ে ঝোলানো রয়েছে। মাঝে মাঝে এক-একটা রঙিন কাপড় মোড়া সুদৃশ্য পাখির খাঁচা ঝুলছে। ঘরের চারদিকের দেওয়ালেও সেইরকম সব রঙিন কাঁচ ও আয়না বসানো। মেঝেতে সুন্দর নরম কার্পেট পাতা, মনে হয় যেন

আবার আসিলেন। নমস্কার করিয়া সুমন্তের হাতে তিনি একখানা চিঠি দিলেন, চিঠি খুলিয়া সুমন্ত দেখিল, লিখিয়াছেন মিসেস সেন মন্দার-হিল হইতে।

তিনি লিখিয়াছেন, ভগবানের আশীর্বাদে চিত্রাকে বাঁচাইবার সুযোগ পাইয়া তিনি তাহাকে লইয়া এখানে পলাইয়া আসিয়াছেন। পত্রবাহক তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে সুমন্ত যেন অবশ্য অবিলম্বে এখানে চলিয়া আসে, সাক্ষাতে বিস্তারিত জানিতে পারিবে। চিত্রা ও তিনি তাহার অপেক্ষায় আছেন। মিসেস সেন আরও লিখিয়াছেন, চিত্রার আসল মনের কথা তিনি জানেন। সুমন্তের আগের ভাবের যদি পরিবর্তন না হইয়া থাকে, সে আসিয়া তাহার সম্মতি জানাইলে শুভকার্য শেষ করিয়া তবে তিনি ফিরিবেন। তিনি জানেন, বাপে ত্যাগ করিলেও তাহাদের ঘরে চিত্রার কোন অভাব হইবে না কখনও।

মন্দার-হিলে মিসেস সেন চিত্রাকে লইয়া গিয়াছেন! সে তো সেখানেই তাহার বন্ধুর বাড়িতে যাইতেছে। উঃ, কি ভয়ানক ভাল কাজ করিয়াছেন মিসেস সেন! আর তাঁহার প্রতি সে মনে মনে অবিচার করিয়াছিল।

পত্রবাহকের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে সে বলিল, শ্রীগুরুদেবের কৃপার পার নেই, দেখেছেন মশাই, আমিও মন্দার-হিল-যাত্রী। দয়া ক'রে কিছু খেয়ে নিয়ে আমার গাড়িতে উঠুন, শুভকাজে বিলম্ব করতে নেই।

ভদ্রলোকের আহারের ব্যবস্থা করিবার জন্য সে ভিতরে গেল।

শ্রীননীমাধব

লাভ-ক্ষতি

বঙ্গ-ভঙ্গ হইয়া গেল। ২০এ জুনের আইন-সভার বিবরণী পড়িলে বহির্দৃষ্টিতে মনে হয়, মুসলমান সদস্যগণ দলবদ্ধভাবে পূর্ববঙ্গের মুসলমান ভাইদের সঙ্গে একত্র থাকিবার জন্য ভোট দিয়াছেন। আর হিন্দু-সদস্যগণ পূর্ববঙ্গের হিন্দু-ভাইদের হইতে পৃথক থাকিবার জন্য ভোট দিয়াছেন। সুতরাং মুসলমান সদস্যগণের মনোভাব প্রশংসনীয়। আর পশ্চিমবঙ্গের সদস্যগণের মনোবৃত্তিকে ইংরেজী ভাষার একটি শব্দে প্রকাশ করা যায়—Escapism, অথবা সংস্কৃতে বলা হয়, আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি।

এই হইল বহির্দৃষ্টি। আর আসল ব্যাপারটা হইল এইরূপ—বহুকাল হইতে

জিন্না সাহেব চাহিতেছিলেন যে, হিন্দুদের মুখ দিয়া এই স্বীকারোক্তি বাহির হউক যে, হিন্দুরা পৃথক জাতি। এইজন্যই বোধ হয় কলিকাতায় প্রত্যক্ষ কর্ম-দিবস অনুষ্ঠিত হয়। তারপর নোয়াখালির বর্বরতা। মতলব ছিল, ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া হিন্দুরা পাকিস্তান মানিয়া লইবে। তথাপি হিন্দু-বাঙালীরা সুর ধরিলেন, মুসলমানদের সঙ্গে আর তাঁহারা একত্র থাকিতে পারেন না, তাঁহারা পৃথক হইবেন। তারপরে বিহারের প্রতিশোধ পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত হইতেই বাঙালীদের অনুকরণে পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখেরা বিভক্ত হইতে চাহিল। জিন্না বুঝিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞগণ এমনই একটা সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গ ও পাঞ্জাব-ভঙ্গের আন্দোলনকে তাঁহারা লুফিয়া লইলেন। আগে তাঁহাদের যে সংকোচ অন্যায়বোধ অবলুপ্ত ছিল, আর তাহা রহিল না। নিঃসঙ্কোচে জিন্নার দাবি মানিয়া লইলেন এবং কংগ্রেসও মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। এখন পাকিস্তানের কিয়দংশ খামচাইয়া আনিয়া হিন্দুস্থানে যোগ করাইতে পারিয়াছি বলিয়া বিজয়-গর্ব প্রকাশ করিতে যাওয়া লজ্জার কথা। জয় হইয়াছে জিন্না সাহেবের। কংগ্রেসকেও এ পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে।

এই বাটোয়ারা-মকদ্দমায় জয়লাভ হইয়াছে বলিয়া কোন কোন হিন্দুনেতা দেশময় আনন্দোৎসবের পরামর্শ দিয়াছেন। মকদ্দমা জিতিলে এই প্রকার ঢাক-ঢোল বাজাইবার প্রথা দেশে ছিল। তাহারই ব্যবস্থা হইতেছে।

আচার্য কৃপালনী বলিয়াছেন, বঙ্গ-বিভাগ হওয়ায় তিনি খুশি নহেন। দুই-একখানি সংবাদ-পত্রেও আনন্দোৎসবের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হইয়াছে। সে যাহাই হউক, সত্যই কি আমাদের এমন জয়লাভ হইয়াছে, যাহার জন্য আনন্দোৎসব করা যায়? বিষয়টা বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক।—

বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র ভূমি আপাতত পশ্চিমবঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। সে এক-তৃতীয়াংশ অনুর্বর ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত। আপাতত শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীহট্টের পৈতৃক ভিটা আর নদীয়ায় তাঁহার লীলাভূমি সবই পাকিস্তানে চলিয়া গেল। সীমানা-নির্ধারণ-কমিশন ভবিষ্যতে কি কাটছাঁট করেন, কেহই বলিতে পারে না। তারপর নেতারা কলিকাতা শহর পশ্চিমবঙ্গের এলাকার মধ্যে পাইলেন বলিয়া উল্লসিত। আমি তো মনে করি, বাঙালীর ইহাতে উল্লাসের কারণ বিশেষ নাই। উল্লসিত হইতে পারেন কলিকাতার অবাঙালী

ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ। তাঁহারা ভবিষ্যতে সম্প্রদায়বিশেষের গুণ্ডামির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিশ্চিন্তমনে নিজ নিজ ব্যবসাবাণিজ্য চালাইতে পারিবেন বলিয়া তাঁহাদের উল্লাসের যথার্থ হেতু আছে। কিন্তু কলিকাতা শহরটি তো নামেই বাঙালীদের, প্রকৃতপক্ষে ও স্থানটির যত মধু চুষিয়া খাইতেছেন অবাঙালীরা। কলিকাতা শহরের প্রধান অংশ ক্লাইভ স্ট্রীট, চৌরঙ্গী, লালদীঘি ইংরেজ-বণিকদের অধিকারে। বড়বাজারও মাড়ওয়ারীদের দখলে। এখন তাহারা তন্নিকটবর্ত্তী অলি-গলি এমন কি প্রায় সব মহল্লাতেই আস্তানা গাড়িয়াছে। কলুটোলা, মুরগীহাটা, চিনাবাজার সিন্ধু-গুজরাট-বোম্বাইবাসীদের দখলে। কলিকাতার প্রত্যেকটি বাজারের পণ্য-বিক্রেতা অবাঙালী। কুলি-মজুর, ফেরিওয়ালা, ধোপা, নাপিত, ভৃত্য, আপিস-আদালতের আরদালী চাপরাসী প্রায় সবই অবাঙালী। রিক্শা চালায় অবাঙালী, বাস্ ট্যাক্সি ট্রাম চালায় অবাঙালী। রেল-স্টেশনে একটি কুলিও বাঙালী নাই।

বহুদিন হইতে কলিকাতার ধনী বাঙালী গৃহস্থেরা একটি করিয়া হিন্দুস্থানী দ্বারবান রাখিতেন। এটা ছিল তাঁহাদের আভিজাত্যের পরিচয়। সেই সব চুকন্দরসিং এবং ভাই-বেরাদারেরা আসিয়া এই কয় বৎসরে কলিকাতায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরিতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বাঙালীর আছে কতকগুলি ডাইয়িং-ক্লিনিং-এর দোকান, পাইস হোটেল, চায়ের দোকান আর মৃতকল্প টেলারিং ও মনিহারির দোকান। বিশেষ বড়াই করিবার বিশেষ কিছুই নাই। আগে কেরানীর কর্ম্ম বাঙালীদের একচেটিয়া ছিল, এখন সেখানেও মান্দ্রাজী ঢুকিতেছে। সুতরাং কলিকাতায় নিজবাসভূমে পরবাসী হইয়াই বাঙালী আনন্দবোধ করিতেছেন।

১৯০৫-১২ সালের বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলন করিয়া, দুঃখবরণ করিয়া, কারাদণ্ড মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিয়া ভারতবর্ষময় জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল বাঙালী। সেই বাঙালী আজ কাঙালী। বাংলার সেই আন্দোলনের ফলে অন্য প্রদেশবাসীরা লাভবান হইয়াছেন। ঠিক সেই প্রকারে আমরা বর্ত্তমান বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে জয়লাভ করিয়া কলিকাতা শহরটি অবাঙালী ব্যবসায়ীদের জন্য নিরাপদ করিয়া দিলাম। অবাঙালীদের শ্রীবৃদ্ধি হউক, তাহার জন্য হিংসা করিব না। কিন্তু আমাদের তো বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। যাঁহারা উড়িয়া

আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদের সরাইতে আমরা পারিব না, প্রতিযোগিতায় হটাইতেও পারিব না। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-শাসনকর্তাগণ কি এমন বিধান করিতে পারিবেন, যাহাতে অবাঙালীদের শোষণকার্য ব্যাহত হয়? করিতে গেলেই সমস্ত হিন্দুস্থান নিন্দা-প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠিবে।

সেইজন্যেই এক-একবার মনে হয় যে, কলিকাতা শহরটিকে কর্তারা যদি স্বাধীন আন্তর্জাতিক শহর করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইত না। ওখানে যাঁহাদের বাড়িঘর আছে, তাঁহারা নিরাপদে থাকিতে পারিতেন, অধিকন্তু আমরা নূতন স্থানে নূতন করিয়া সম্পূর্ণ বাঙালীর স্বার্থ ও আর্থিক সামাজিক উন্নতিকল্পে রাজধানী নির্মাণ করিয়া লইতে পারিতাম। এই সুযোগ পাইলেন মুসলমান ভাইগণ। তাঁহারা ঢাকা চট্টগ্রাম শহর নিজেদের হিতার্থে নিজেদের ইচ্ছামত গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। আমরা চিরকাল নিঃস্বার্থ পরোপকার করিয়া মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে থাকিব।

পূর্ববঙ্গে যে এক কোটি বিশ লক্ষ বাঙালী-হিন্দু রহিয়া গেলেন, তাঁহাদের প্রবোধ দেওয়া হইতেছে যে, তাঁহাদের পশ্চিমবঙ্গবাসীরা রক্ষা করিবেন। কি করিয়া রক্ষা করিবেন, বলা হয় নাই। এ যেন সেই উকিলবাবুর কথা। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মক্কেলকে আশ্বাস দেওয়া হইল, এখন তো ঝুলিয়া পড়, আপিলে নিশ্চয়ই খালাস করিয়া লইব।

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের আশঙ্কার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। ধরিয়া লইলাম যে, সেখানে দাঙ্গাহাঙ্গামা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, নারীনির্যাতন হইবে না। কিন্তু মাত্র এইটুকু নিরাপত্তাই কি একটা জাতির পক্ষে প্রার্থনীয়?

প্রথমেই ভাবনা হয়, সেখানকার বালক-বালিকাদের ভবিষ্যতের শিক্ষার ব্যবস্থা কি হইবে? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব থাকিবে না। পূর্ব-পাকিস্থানের নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কি রূপ লইয়া আবির্ভূত হইবে জানি না, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে নির্বাচনে যে ভাষার ব্যবহার হইবে তাহাকে বাংলা ভাষা বলা যাইতে পারিবে কি না সন্দেহ। জিন্না সাহেবের জীবনচরিত নিশ্চয়ই পড়িতে দেওয়া হইবে। তাহা না হয় তাহারা পড়িল, কিন্তু রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের নাম তাহারা ক্রমশ ভুলিয়া যাইবে। বাংলার জীবিত ও মৃত সাহিত্যিকদের রচনা কি তাহাদের পড়িতে দেওয়া হইবে? স্কুল-কলেজের সংখ্যা হ্রাস পাইবে এবং তাহা

সম্প্রদায়বিশেষের পরিচালনাধীন থাকিবে। বাংলা সাহিত্যের চর্চা, বাঙালীর আদর্শ, সংস্কৃতি ও ভাবধারার অনুশীলন সেখানে সমাদর লাভ করিবে না। কয়েক বৎসরের মধ্যে সেখানকার বাঙালী ছাত্র ও অধিবাসীগণ ভাষায়, আচারে, আদর্শে এক অভিনব জাতিতে পরিণত হইবে। যেমন হইয়াছে অন্য প্রদেশের দীর্ঘকালব্যাপী বাসিন্দা বাঙালীগণের।

অর্থাগমের সুযোগ সেখানে হিন্দুরা কতটুকু পাইবেন? নির্দিষ্ট সংখ্যক চাকুরি পাইতেও পারেন, কিন্তু অর্থাগমের অন্য সুযোগ-সুবিধা মুসলমান ভাইগণের সঙ্গে তুল্যভাবে পাইবেন বলিয়া ভরসা হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের গভর্মেণ্ট কেমন করিয়া তাঁহাদের রক্ষা করিবেন, ভাবিয়া দেখুন। যদি কমিউমিজ্‌মের আশুপ্রচারফলে কমিউন্যালিজ্‌মের অবসান ঘটিত, তাহা হইলে ভাঙা বাংলা আবার জোড়া লাগিতে পারিত। তাহা যখন হইতেছে না, তখন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হিন্দুদের যেমন করিয়া হউক পশ্চিমবঙ্গে উঠাইয়া আনাই যুক্তিযুক্ত হইবে। ইহাতে যত দুঃখ বরণ করিতে হয়, তাহা সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু এই বৃহৎকর্ম করিবার শক্তি সাহস ও সম্পদ কি পশ্চিমবঙ্গের গভর্মেণ্টের হইবে?

শ্রীউপেন্দ্রনাথ

পদচিহ্ন

চব্বিশ

নূতন অঙ্ক, নবগ্রামের জীবন-রঙ্গমঞ্চ। পট উঠল, অভিনব পটভূমিকা সম্মুখে। রাজলক্ষ্মীর মত ব'সে আছেন নবগ্রাম-লক্ষ্মী। আলোক-সমারোহে ঝলমল করছিল নবগ্রামের মুখ। মুখই বলব। নবগ্রামের লক্ষ্মী এখন মুখ ফিরিয়েছেন পশ্চিমপ্রান্তের বহু শতাব্দীর প্রান্তরের দিকে, সেখানেই গোপীচন্দ্র গ'ড়ে তুলেছিলেন আপনার কীর্তিভূমি, নবগ্রামের গ্রাম-লক্ষ্মীর নূতন আসন।

ইস্কুল বোর্ডিং ডিস্পেন্সারির পাশে গোপীচন্দ্রের সৌভাগ্য-সায়র অথবা পুণ্য-সায়র, নূতন কাটানো দিঘীর পাড়ের বাগানের মধ্যে উত্থান-সম্মিলনী হচ্ছে। উপলক্ষ্য অনেক, আয়োজনও প্রচুর।

তরুণ আই.সি.এস. মিস্টার ডাট জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছেন। তিনি শুধু আই.সি.এস.ই নন, তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে 'ভারতবর্ষ'

মাসিক-পত্রিকায়, তিনি সাহিত্যিক-কবি। অন্য দিকে তিনি উৎসাহী কর্মী। তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে।

বাংলার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'রবিবাবু' নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, তার জন্য আনন্দ জ্ঞাপন করা হবে। তাতেও সভাপতিত্ব করবেন স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।

এই সঙ্গে সম্রাটের আয়ু ও জয় কামনা ক'রে অকপট আনুগত্য জ্ঞাপন করা হবে, তাতেও সভাপতিত্ব করবেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। ইউরোপে যুদ্ধ বেধেছে। কাগজে মোটা হরপে লেখে—মহাযুদ্ধ। ইংরিজী কাগজে লেখে—গ্রেট ওয়ার।

মীটিংগুলির শেষে হবে চা-পান। তারপর হবে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটিকার অভিনয়।

স্বর্ণবাবুর মৃত্যুর পর অল্প কিছুদিন গত হয়েছে। স্বর্ণবাবুর মৃত্যুতে গ্রামে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল বইকি, কিন্তু গোপীচন্দ্রের মৃত্যুতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, তার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। সে কথা বলেছিল অনেকে। বিচার ক'রে এ কথাও বলেছিল, তার সঙ্গে তুলনা করাই যে ভুল। গোপীচন্দ্রের মত ব্যক্তি আর স্বর্ণবাবুর মত ব্যক্তিতে কি তুলনা হয়? তবে প্রাচীনেরা, যাঁরা নাকি গোপীচন্দ্রের প্রথম অবস্থা এবং স্বর্ণবাবুর জীবনের স্বর্ণ-যুগ দেখেছিলেন, তাঁরা প্রতিবাদ না ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এই সত্যটাই উপলব্ধি করেছিলেন, কালের গতি কুটিল। পুরুষের ভাগ্য জটিল রহস্যময়।

সর্বাপেক্ষা উদারতা দেখিয়েছেন কীর্তিচন্দ্র। সমস্ত মামলা-মকদ্দমা মিটিয়ে নিয়েছেন। এরই ফলে একটি প্রীতিময় সম্বন্ধ-সূত্র স্থাপিত হবার সুযোগ পেয়েছে উভয় পরিবারের মধ্যে। স্বর্ণবাবুর ছোট ভাই মণিভূষণ তাঁদের পরিবারের কর্তা হয়েছে। স্বর্ণবাবু যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন মণিভূষণ প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল। স্বর্ণবাবুর কর্মপদ্ধতি এবং জীবনের ভাবধারার সঙ্গে তার মিলত না। গোপীচন্দ্রের ব্যবসায়ে উন্নতি দেখে সে ব্যবসায়ের পক্ষপাতী ছিল। স্বর্ণবাবু বাধা দিতেন। গোপীচন্দ্রের ছোট ছেলে পবিত্রের সাহিত্যানুরাগ, নাট্যকলাচর্চা, গ্রামে রুচি ফ্যাশন শীলতা প্রভৃতির আদর্শ স্থাপনে উদ্যোগের সে মনে মনে প্রশংসা করত। গ্রামে গভর্মেন্ট-প্রবর্তিত রাজনৈতিক ক্ষেত্রটুকুতে দারোগা, ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতির তোষামোদ না

ক'রে মর্যাদার সঙ্গে কাজ ক'রে যাওয়ার কৃতিত্বের ঈর্ষা করত। সাহেব-সুবা, বিশেষ ক'রে তরুণ ডেপুটি সাব্‌ডেপুটি ডি.এস.পি.দের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। এতকাল পর্যন্ত জমিদারেরা এঁদের 'হুজুর' বলতেন, সেলাম দিতেন। মেলামেশা আবদ্ধ ছিল মুন্সেফবাবুদের সঙ্গে। মুন্সেফবাবুরা এঁদের অপেক্ষা চিরকালই অনেক কম শাসক-মেজাজী। পবিত্রই প্রথম এঁদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করার সাহস দেখিয়েছে। ডিস্পেন্সারির পাশের সেই সুসজ্জিত ঘরগুলিতে প্রচুর আরাম এবং আহার্যের আয়োজন ক'রে, সম্ভ্রম এবং মর্যাদার সঙ্গে তাঁদের আহ্বান ক'রে পবিত্র সত্যিই এক অভিনব আভিজাত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এখানকার জমিদারেরা আয়ের দিক থেকে যতই ক্ষুদ্র হোক, আভিজাত্যের অহঙ্কারে কেউ কম ছিলেন না। যথাসাধ্য কেন, সাধ্যের সীমানা অতিক্রম ক'রেই তার পরিচয় তাঁরা দিয়ে এসেছেন বরাবর। কিন্তু পবিত্র আভিজাত্যের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তা সকলের সাধ্যাতীতই শুধু নয়, কল্পনাতীতও বটে। তাই স্বর্ণবাবুর মৃত্যুর পর, পারিবারিক কর্তৃত্বভার হাতে নিয়েই, এই মামলা মিটমাটের মসৃণ পথে অসঙ্কোচ হাসিমুখে পবিত্র এগিয়ে আসতেই, সে তার সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হ'ল। বাল্যকালে অবশ্য এই বন্ধুত্বের একটা ধূলিমলিন ভূমিকা ছিল। ঘোড়া এবং সাইকেল এই নিয়ে উভয়ের কৈশোরে একটা অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। আজ স্বর্ণবাবু আড়াল স'রে যেতেই সেই ভূমিকার সকল ধূলি অপসারিত ক'রে তারা আবার গাঢ় অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। পবিত্রের এদিকে একটি সহজ মাধুর্য ছিল। মিষ্ট কথায় এবং সরস রসিকতায় অতি অল্পেই সে সকল সঙ্কোচের বাধা অপসারিত করতে পারত। শুধু মুখের কথাতেই নয়, কাজেও সে মণিভূষণকে বন্ধুত্বের প্রতিদান সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছে। মণিভূষণই এখন সরস্বতী-নাট্য-সমাজের সেক্রেটারি, নিজে পদত্যাগ ক'রে তাকেই পবিত্র নবগ্রামের প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েৎ ক'রে দিয়েছে। স্বর্ণবাবুর পিতার প্রতিষ্ঠিত এম.ই. স্কুলের পরিত্যক্ত বাড়িটি বৈঠকখানা হিসাবে পবিত্রই বেশ রুচিমত সাজিয়ে দিয়েছে। সেইখানে প্রতি সকালে চায়ের মজলিস বসে। পবিত্র নিয়মিত আসে। অপরাহ্ণে এবং সন্ধ্যায় মজলিস বসে পবিত্রের ওখানে। আরও একটা ব্যাপার হয়েছে। সম্প্রতি কীর্তিচন্দ্র জেলায় একটি কণ্ট্রাক্ট বিজ্‌নেস আরম্ভ করেছেন। তার অংশীদার হয়েছে মণিভূষণ।

এই উদ্যান-সম্মিলনীর উদ্যোক্তা মণিভূষণ। কারণ নাট্য-সমাজের সে-ই সম্পাদক, সে-ই এখানকার প্রেসিডেণ্ট-পঞ্চায়েৎ। নাট্য-সমাজের সভাবৃন্দই কর্মী। স্কুলের শিক্ষকেরা সকলেই উপস্থিত আছেন, দাঁড়িয়ে দেখছেন; তাঁরাও ম্যাজিস্টেট সাহেবকে অভিনন্দন দেবেন; সেই হিসাবে তাঁরা এখানে নিমন্ত্রিত অতিথি নন, কিন্তু রুচি ও ফ্যাশান সম্বন্ধে অনধিকারী ব'লে কোন কিছুতে হাত দিচ্ছেন না, শুধু দাঁড়িয়ে থেকে দায়িত্ব বহন করছেন এবং সেক্রেটারি পবিত্রবাবুর প্রতি আনুরক্তি দেখাচ্ছেন।

গাছে গাছে চীনা লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, রঙিন কাগজের মালা দেওয়া হয়েছে। গাছের ডাল থেকে সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে উজ্জ্বল রঙিন কাচের বেল বা বল। সাদা কাপড়ের ফালির উপর লাল শালুর অক্ষর কেটে অনুষ্ঠানটির মর্মবাণী লিখে লম্বা বাঁশে পেরেক মেরে গাছে গাছে বেঁধে দিয়ে পিছনে ছোট কারবাইড ল্যাম্প-স্ট্যাণ্ড বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যার সময় জ্বেলে দিলে লেখাগুলি অগ্নির অক্ষরে জ্ব'লে উঠবে। এক দিকে ইংরেজীতে লেখা—Long live the king; এক দিকে সংস্কৃত হরফে লেখা—যতোধর্ম স্ততো জয়; এক দিকে বাংলাতে লেখা কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার দুটি লাইন—"জগৎকবি-সভার মাঝে আমরা করি গর্ব, বাঙালী আজি গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব।" আর এক দিকে লেখা—"মর্মরমুখরিত পল্লীপথে, এস কবি, এস রাজ-অতিথি, চড়িয়া স্বর্ণরথে।" লাইন দুটি এই সম্বর্ধনা-বাসরের জন্য বিশেষভাবে রচিত গানের অংশ; রচনা করেছে পবিত্র। গাইবে—থিয়েটারে নায়িকা সাজবার জন্যে যে সুকণ্ঠ তরুণটিকে কাশিমবাজারের মহারাজার থিয়েটার থেকে ছাড়িয়ে এখানে আনা হয়েছে, সে।

বাগানের মধ্যেই একটি স্টেজ খাটানো হয়েছে। স্টেজের সামনে হয়েছে সম্মিলনের আসর।

স্কুলের চেয়ার বেঞ্চ হাইবেঞ্চ এনে অতিথিদের বসবার ব্যবস্থা হয়েছে। হাইবেঞ্চগুলি টেবিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে। চেয়ারে বসবেন বিশিষ্ট আগন্তুকেরা—শহর থেকে সমাগত উকিল মোক্তার ব্যবসাদার শ্রেণীর অতিথি। বেঞ্চে বসবেন এখানকার লোকেরা। কয়েকটি গদি-মোড়া চেয়ার আনা হয়েছে, সেগুলির সামনে সুদৃশ্য টিপয়। সেগুলি এসেছে পবিত্রর সুসজ্জিত

অতিথি-ভবন থেকে এবং সেগুলি নির্দিষ্ট আছে অফিসিয়েলদের জন্যে। ভাট সাহেব এবং মিসেস ভাটের জন্যে স্বতন্ত্র আসন।

নবগ্রামের লোকেদের কাছে এ সম্পূর্ণ নূতন। এমন উদ্যান-সম্মিলনী এর আগে কখনও হয় নি। এমন রুচির মণ্ডপসজ্জা, এমন আসর, এমন ব্যবস্থা, সবই অভিনব। কার্ড দেখে ভিতরে যেতে দেওয়া হচ্ছে। এও নূতন। গোপীচন্দ্রের আমলেও নিমন্ত্রণ ছিল প্রায় সার্বজনীন। গ্রামের ব্রাহ্মণ এবং ভদ্রজন সকলেই নিমন্ত্রিত হতেন। চটি পায়ে চাদর ঘাড়ে ক'রে অনেকে আসতেন; বিশেষ সাজসজ্জা—কোঁচানো ধুতি, পিরান, কোট, চকচকে জুতো, চোগা চাপকান পাগড়ি প'রেও আসতেন অবস্থাপন্নেরা। এ ক্ষেত্রে নিমন্ত্রিতেরা সকলেই নূতন যুগের শিক্ষায় শিক্ষিত। সকলেই নবীন। প্রবীণেরা প্রায় সকলেই গত হয়েছেন; যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই নিমন্ত্রিত হন নি; যাঁরা হয়েছেন, তাঁরা আসেন নি। উপেক্ষাভরে নয়, উপেক্ষিত হবার আশঙ্কায়। প্রত্যক্ষভাবে উপেক্ষা কেউ করবে না, কিন্তু হংসের দলের মধ্যে বকের অবস্থা অনুমান ক'রে তাঁরা নিজে থেকেই সঙ্কুচিত হয়েছেন।

পবিত্রর তরুণ আত্মীয়েরা এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এসেছেন স্যুট প'রে, মণিভূষণ পরেছে প্যান্টের উপর কালো সার্জের গলাবন্ধ লম্বা পার্সী কোট। নাট্য-সমাজের সভ্যদের কেউ পরেছেন কোঁচানো ধুতির উপর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা চুড়িদার পাঞ্জাবি, কেউ পরেছেন শার্টের উপর ওপেনব্রেস্ট্ কোট।

প্রবেশদ্বারে পবিত্রের প্রিয়তম পারিষদ্ নাট্য-সমাজের উৎসাহী সভ্য পিরু, প্রত্যেকের বুকে একটি ক'রে কাঠিতে-বাঁধা পাতা-সমেত গোলাপকুঁড়ি গুঁজে দিচ্ছে। ভিতরে অভ্যর্থনা করছে মণিভূষণ নিজে। পবিত্রের অন্যতম পারিষদ্, মঙ্গল সিগারেটের পাত্র আগন্তুকদের সামনে এগিয়ে ধরছে। কীর্তিচন্দ্র নাই। তিনি কলকাতায় ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। পুরানো ইন্‌সল্‌ভেন্সির মামলায় সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে তিনি সুকৌশলে নির্বিঘ্নে পার হয়ে গিয়েছেন। নূতন ব্যবসায়ের পত্তন করেছেন; নিজে অবশ্য অন্তরালেই থাকেন; সে ব্যবসা যুদ্ধের সুযোগে অল্পদিনের মধ্যেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

একখানা টেলিগ্রাম তিনি পাঠিয়েছেন, যুদ্ধের ভাণ্ডারে পবিত্র যেন পাঁচ হাজার টাকা এই উপলক্ষ্যে সাহেবের হাতে দেয়।

পবিত্রের নূতন ল্যাণ্ডো এবং নূতন এক জোড়া সাদা ঘোড়ার সমন্বয়ে এল রাজ-অতিথির স্বর্ণরথ। পবিত্র নিজে আনতে গিয়েছিল। সাহেব একা এসেছেন, মেমসাহেব আসেন নি। কিন্তু সে কথা ভাববার অবকাশ হ'ল না কারও। ল্যাণ্ডোর কোচবাক্সে কোচম্যানের পাশে একজন বন্দুকধারী কন্‌স্টেবল। ব্যাপারটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কেন, কমিশনার সাহেবও এখানে এসেছেন, কিন্তু বন্দুকধারী পুলিস কখনও আসে নি। আগন্তুকদের মধ্যে সি.আই.ডি. ইন্‌স্পেক্টর কামদেববাবুর উপস্থিতিও মণিভূষণের চোখে ঠেকল। তাঁর নাম সদর শহরের নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিল না। পিরু বললে, খুব সম্ভব পবিত্র মুখে নিমন্ত্রণ করেছে। দেখা হয়ে গিয়েছে আর কি। আর— একটু মুচকে হেসে বললে, এ সুখ পাবে কোথা, বল?

মণিভূষণও একটু হাসলে। গৌরবের হাসি। সত্য কথা, জেলার কর্তৃপক্ষ একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—রুচিতে, সভ্যতায়, ফ্যাশানে, চারুকলার চর্চায় নবগ্রামই সমগ্র জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান। সদর শহরও তার কাছে পিছিয়ে আছে। এর উপর পবিত্রের আতিথেয়তা, সে একেবারে পারস্য উপন্যাসের ব্যাপার। বোগদাদের কালিফ তাঁর উজিরের কাছে আবুল কাসেম ব'লে এক ধনীর অপূর্ব এবং আদর্শ অতিথি-পরায়ণতার গল্প শুনে ক্ষুব্ধ মনেই ছদ্মবেশে কাসেমের আতিথেয়তা পরীক্ষা করবার জন্যে গিয়েছিলেন কাসেমের বাড়ি। সেখানে গিয়ে বিস্মিত হলেন তাঁর ঐশ্বর্য দেখে। বিপুল ঐশ্বর্য। বোগদাদের কালিফও সে ঐশ্বর্য দেখেন নি। কাসেম মহাসমাদরে তাঁকে গ্রহণ ক'রে ভোজ্যে পানীয়ে পরিতৃপ্ত ক'রে অপূর্ব বিস্ময়কর বস্তু দেখালেন। মণিময় স্বর্ণপাত্র, সোনার গাছে নৃত্যপর রত্নগঠিত ময়ূর, অপূর্ব রূপবতী সুধাকণ্ঠী পরিচারিকা, আরও নানা সম্পদসম্ভার। কিন্তু বাদশা সেগুলি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করবামাত্র কাসেম সেগুলি বান্দাদের হাতে দিয়ে সরিয়ে দিলেন। বাদশা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েই পরদিন প্রাতে ফিরলেন, স্থির করলেন, ফিরেই সেই মিথ্যাবাদী উজিরকে শাস্তি দেবেন। যে কৃপণ ব্যক্তি প্রশংসা করবামাত্র প্রার্থনার আশঙ্কায় জিনিসগুলি তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে বন্ধ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়, তার প্রশংসা করার অর্থ—তাঁকে নিন্দা করা ছাড়া আর কি? সে শাস্তির যোগ্য। পথে একটি সরাইখানায় এসে তিনি

এইমাত্র কিনে এনে পাতা হয়েছে। এক কোণে একটা নেয়ারের খাটে সুন্দর বিছানা। খাটের এমন সুন্দর পায়া কখনও দেখি-নি, যেন চারটে বেঁটে মুগুর ও তাতে লাট্টুর মাথার মতন চকচকে রঙ করা। দেখে মনে হতে লাগল, আমরা যেন আরব্য উপন্যাসের একখানা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছি।

ঘরের মেঝেতে পাতা সেই কার্পেটের ওপরেই সকলে বসলুম। একটু পরেই একজন চাকর এসে একটা লাঠির মাথায় বাঁকানো লোহা দিয়ে টপটপ ক'রে ঝাড়ের অর্ধেক বাতি নিবিয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

এই কদিনের অত্যাচারে শরীর ও মন এমন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল যে, সেই ঠাণ্ডা আলো ও শান্ত পরিবেশের মধ্যে ব'সে থাকতে থাকতে কেমন যেন একটা নেশায় দেহমন ভ'রে আসতে লাগল। নবাব সাহেব আমাদের নামধাম জিজ্ঞাসা করলেন। বাড়িতে কে আছে, কেন বাড়ি থেকে বেরিয়েছি—সেই সনাতন প্রশ্ন, তারপরে সব চুপচাপ।

কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে হকিম সাহেব একবার হাই তুলে চোখ চেয়েই আমাদের বললেন, তোমাদের খুবই ক্লান্ত ব'লে মনে হচ্ছে, অসুখ-বিসুখ কিছু করে নি তো?

বললুম, আমাদের শরীর ও মনের ওপর দিয়ে এ কদিন অমানুষিক অত্যাচার গিয়েছে, আমরা সত্যিই বড় ক্লান্ত।

হকিম সাহেব অনেকক্ষণ ধ'রে আমাদের দুজনের নাড়ী পরীক্ষা ক'রে মৃদুস্বরে নবাব সাহেবকে কি বলতেই তিনি চমকে উঠে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তো হিন্দু, আমাদের ঘরে খেলে তোমাদের তো জাত মারা যাবে। আজ না হয় বাজারের কোনও হিন্দুর দোকান থেকে খাবার আনবার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে, কিন্তু রোজ বাজারের পুরি-মিঠাই খেলে তো অসুস্থ হয়ে পড়বে।

পরিতোষ এতক্ষণ দেওয়ালে হেলান দিয়ে একেবারে নিঝঝুম হয়ে ব'সে ছিল, আহারের প্রসঙ্গ শুরু হতেই সে গা-ঝাড়া দিয়ে বললে, মালিক! যে হিন্দুর জাত মারা যায়, আমরা সে হিন্দু নই। আমরা আপনার এখানেই খাব, তবে আমাদের দেশের হিন্দুরা গরু শুয়োর খায় না, সেগুলো আর আমাদের দেবেন না।

পরিতোষের কথা শুনে হকিম সাহেব 'তোবা তোবা' ব'লে কানে হাত

বিব্রত হলেন, সেখানে লোক-লস্কর উট-ঘোড়া নিয়ে সম্ভবত কোন বিত্তশালী ব্যক্তি তাঁর পূর্বেই এসে আশ্রয় নিয়েছেন। পরবর্তী সরাইখানা ছাড়া তাঁর আর বিশ্রামের উপায় নাই। হঠাৎ এক সুন্দর পরিচ্ছদ পরিহিত রূপবান বালক ভৃত্য এসে তাঁকে অভিবাদন করতেই তিনি বিস্মিত হলেন। এই রূপবান বালক ভৃত্যটিকে তিনি কাসেমের বাড়িতে দেখেছেন, ছেলেটির রূপের এবং কর্মপরায়ণতার যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ের সৃষ্টি ক'রে ছেলেটি তাঁকে বললে, তারা তাঁরই জন্য প্রতীক্ষা করছে। সে, সেই সুন্দরী পরিচারিকা এবং সেই সকল সম্পদ যার যার তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, সবই আবুল কাসেম পূর্বরাত্রেই এই সরাইখানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁরই জন্য। যে হেতু না, আবুল কাসেমের আতিথেয়তার নিয়ম হ'ল, অতিথি যে বস্তুর প্রশংসা করবেন, সে বস্তু হবে তাঁর। পাছে লজ্জায় অতিথি নিতে অস্বীকার করেন, প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করতে লজ্জা পান, তাই এই ভাবে নিকটবর্তী সরাইয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় অতিথির জন্য।

পবিত্রের আতিথেয়তায় তারই আমেজ আছে। মধ্যে মধ্যে মণিভূষণ ভাবে, পবিত্রকে সে খেতাব দেবে—আবুল কাসেব। সি.আই.ডি. কামদেব-বাবু নতুন এসেছেন জেলায়। আলাপ স্বল্প। কিন্তু পবিত্রের খ্যাতির বাঁশীর সুর যে কানে গেলেই মন মাতিয়ে তোলে। চোখের দেখার অপেক্ষা রাখে না।

অভ্যাগতেরা আসন গ্রহণ করলেন। পবিত্র ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে মণিভূষণকে বললে, তাড়াতাড়ি করতে হবে। সময় অল্প। সাহেব রাত্রে থাকবেন না। চ'লে যাবেন।

মুচকি হেসে মণিভূষণ বললে, মেমসাহেব আসেন নাই যখন, তখন সাহেবকে ফিরতে হবে বইকি।

না। ব্যাপার গুরুতর। সাংঘাতিক কাণ্ড। কাগজে কাস্টম হাউস থেকে রডা কোম্পানির মসার পিস্তল চুরির খবর পড়েছ তো? সি. আই. ডি.র খবর হচ্ছে, তারই কিছু মাল আমাদের জেলায় এসে ঢুকেছে।

বল কি?

দেখছ না, বন্দুকধারী পুলিস সঙ্গে এসেছে। ওপরের হুকুম। কাল কলকাতায় পাথুরেঘাটায় একজন স্পাইকে গুলি মেরেছে। সাহেব আসতেই চান না। শুধু আমি গিয়েছিলাম ব'লেই এসেছেন। বললেন, আপনি নিজে

একজন সাহিত্যিক, কেবল সেই ব'লেই আমি যাচ্ছি। আমাকে এখানে রাত্রি এগারোটার আগেই ফিরতে হবে। এস.ডি.ও., এস.পি. আসতে পারলেন না। কখন কি খবর আসে।

মণিভূষণ বিরক্ত হ'ল। বললে, এ ব্যাটার ছেলেরা করছে কি বল তো? জ্বালালে তো।

ওদিক থেকে সাহেব ঘুরে তাকালেন পবিত্রর দিকে।

একজন ডেপুটি উঠে ডাকলেন, পবিত্রবাবু।

পবিত্র এগিয়ে এসে আসনের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, এইবার আমাদের কাজ আরম্ভ হবে প্রথমেই হবে সম্ভাষণ-সঙ্গীত।

সঙ্গে সঙ্গে গান আরম্ভ হয়ে গেল।

ছাপা কাগজের তাড়া নিয়ে বিলি আরম্ভ করলে মণিভূষণ, পবিত্রর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাদের সকলের পিছনে স্কুলের একজন শিক্ষক তাঁদের 'অভিনন্দন-পত্র বিলি করছিলেন। গান, অভিনন্দন-পত্র, কবিতা—সবই ছাপানো হয়েছে। সবগুলিরই রচয়িতা পবিত্র। সাহেবের জন্য সেগুলি সিল্কের রুমালের উপরে ছাপানো হয়েছে এবং ফ্রেম দিয়ে বাঁধানোও হয়েছে। সেগুলি পাঠের পর দেওয়া হবে

সমস্ত অনুষ্ঠানেরই সভাপতি মিস্টার ভাট। তাকে যে অংশে অভিনন্দন দেওয়া হবে, তাতেও তিনিই সভাপতি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিদ্যমানে অন্য কেউ সভাপতি হতে পারে না। পারতেন এক জজ সাহেব, কিন্তু তিনি আসেন নি। তিনি আই.সি.এস. নন, মুন্সেফ থেকে বৃদ্ধ বয়সে জজ হয়েছেন। মিস্টার ভাট তাঁকে উপেক্ষা ক'রে থাকেন। সেই কারণেই তিনি আসেন নি। মিস্টার ভাটও তাঁকে অভিনন্দন দেওয়ার অনুষ্ঠানে কোন সভাপতির প্রয়োজন অনুভব করলেন না। গান শেষ হতেই মাল্যদান করা হ'ল তাঁকে। মালা গলায় নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, আমাদের হাতে সময় খুব কম। আমাকে রাত্রি এগারোটার আগেই সদরে পৌঁছতে হবে। ইম্পর্ট্যান্ট বিজ্‌নেস আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে। এই বর্তমান সময়টা—দিস প্রেজেন্ট্ টাইম, ইউ সী অত্যন্ত—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। আপনারা জানেন, ইউরোপে গর্বান্ধ শক্তিমদমত্ত জার্মানি অন্যায় অছিলায় ওয়র ডিক্লেয়ার করেছে, বেল্‌জিয়ামের মত একটি পীস-লাভিং সুশিক্ষিত জাতির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার বুকের উপর

দিয়ে ব্রুট ফোর্সের, আই মীন, বর্বর শক্তির অভিযান চালিয়ে দিলে। তার প্রতিবাদে অন্যায়ের প্রতিরোধকল্পে হিজ ম্যাজেষ্টিজ গভর্মেণ্ট জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। আজ সর্ব সময়ে আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা অন্যায়কারীকে শাস্তি দেবার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছি। আমাদের সর্বস্ব পণ করতে হবে। মনি, মেন—সমস্ত প্রয়োজনমত সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আর একটি কথা। আমাদের দেশে একদল পাগল- ইন্‌সেন—ইয়েস, ইন্‌সেন ইয়ংমেন আজ নানা রকম অশান্তির সৃষ্টি করছে। তাদের সম্বন্ধে সাবধান হ'তে হবে। আমরা ই গুয়ান, সম্রাট আমাদের দেবতা।- সর্বদা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, আপনারা সম্রাটের লঙ লাইফ অ্যাণ্ড, আই মীন, দীর্ঘজীবন এবং যুদ্ধে জয় কামনা ক'রে এই অনুষ্ঠান করেছেন। আরও খুশি হয়েছি আমি, এখানকার সর্বপ্রধান ব্যক্তি মিস্টার মুখার্জি—পবিত্রবাবু পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছেন ওয়র ফাণ্ডে—যুদ্ধ ভাণ্ডার-তহবিলে।

চারিদিকে হাততালির শব্দ উঠল

সাহেব এই ছেদের সুবিধায় থেমে বক্তব্য শেষ ক'রে বললে, নাউ টু আদার, আই মীন, অন্যান্য সভার কাজ হবে এইবার। প্রোগ্রাম কই? পবিত্রবাবু, প্রোগ্রাম আর কিছু কাগজ।

ছুটে বেরিয়ে গেলেন স্কুলের একজন শিক্ষক। এ ভারটা ছিল মাস্টার মশায়দের উপরে। মণিভূষণ দিয়েছিল। ওঁরা এসবের হাল-হদিশ ভাল জানেন, ইংরিজী ভাল জানেন, হাতের লেখা ভাল। কিন্তু ভুল হয়ে গিয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে মাস্টার মশায়েরা নিজেদের যেন খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না, কোন কিছু করতেও সাহস পাচ্ছিলেন না। তাঁরা দিতে ভুলে গিয়েছেন। প্রোগ্রাম হেডমাস্টার তৈরি করেছেন, সেটা তাঁর ঘরে টেবিলের উপরেই প'ড়ে আছে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে এক দিস্তা ফুলস্কেপ কাগজ এনে নামিয়ে দিলেন টেবিলের উপর, উপরের পাতাতেই প্রোগ্রাম লেখা ছিল। এর পরের দফায় ছিল সম্পাদকের বক্তব্য। তিনি সেটাকে বাদ দিলেন, বললেন, এর পর রয়েছে সম্পাদকের বক্তব্য। আমাদের সময় কম। সভার উদ্দেশ্য সকলেই জানেন। সম্রাটের আয়ু এবং জয় কামনা করছি আমরা। সে সম্বন্ধে আমার কথা আপনারা শুনেছেন। আর কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ

পেয়েছেন, তার জন্যে আমরা আনন্দ প্রকাশ করব। আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন তিনি। আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, নিজেদের গর্বিত মনে করছি তাঁর এই কৃতিত্বে। এই প্রস্তাবের একটি নকল তাঁর কাছে আমরা পাঠাব। ওয়েল, এর পরের কাজ হ'ল অ্যাড্রেস পাঠ। ওয়েল, সেই কাজ আরম্ভ হোক। পবিত্রবাবু।

মানপত্রগুলি সাহেব স্মিত হাস্যের সঙ্গে গ্রহণ করছিলেন। সর্বশেষে দেওয়া হ'ল থিয়েটার-ক্লাবের মানপত্র। মানপত্রটি পাঠ করলে পবিত্র নিজে। পড়া শেষ ক'রে সেখানি সাহেবের হাতে দিতে গিয়ে সে বিস্মিত হয়ে গেল। সাহেব একখানি হাতে-লেখা ফুলস্কেপ কাগজ গভীর মন দিয়ে পড়ছেন। হাততালির শব্দে সাহেব মুখ তুলে বললেন, এটি কে লিখেছে পবিত্রবাবু—দিস পিস?

পবিত্র বিস্মিত হয়ে বললে, জানি না তো। কে দিলে আপনাকে?

এইটার সঙ্গে পিছনে আটকে ছিল। তিনি প্রোগ্রাম লেখা ফুলস্কেপের দিস্তাটি দেখালেন। কে লিখেছে এটি?

পবিত্র বললে, হাতের লেখা আমাদের গ্রামের একটি ছেলের।

স্টুডেণ্ট?

ইয়েস সার্। এ স্টুডেণ্ট অব দি সেকেণ্ড ক্লাস। ইয়েস। সেকেণ্ড ক্লাস।—ব'লেই সে ডাকলে, মাস্টার মশাই!

ব্যস্ত হয়ে হেডমাস্টার এগিয়ে আসতেই পবিত্র বললে, এ কবিতাটি?

উদ্বিগ্ন হয়ে হেডমাস্টার বললেন, ওটা? ওটা কে দিলে?

আপনাদের প্রোগ্রামের কাগজের তলায় আটকে ছিল। কি রকম আঠা লেগে জুড়ে গিয়েছিল। ওটা কি গৌরীকান্তের লেখা নয়?

হ্যাঁ। আমি অবশ্য—। এর পরই তিনি ইংরিজীতে বললেন, আমি আমার অসাবধানতার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি সার্। That boy—

সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, ছেলেটি এখানে আছে?

পবিত্র ব্যস্ত হয়ে মুখ ফেরালে। সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, একটা কাগজ বিচিত্রভাবে সাহেবের হাতে গিয়েছে—এটা সকলে বুঝেছে, কিন্তু কাগজটা কি, বেনামী দরখাস্ত অথবা অন্য কিছু, ঠিক বুঝতে পারছে না। পবিত্র ব্যস্ত হয়ে উদ্বিগ্ন মণিভূষণকে বললে, দেখ তো, গৌরীকান্ত আছে কি না?

না, সে তো এখানে নেই।

বাইরে। বাইরে। বাইরে তো অনেকে রয়েছে, ছেলেরাও অনেকে আছে, দেখ দেখ।

সাহেব বললেন, আপনি এটা পড়ুন পবিত্রবাবু। সময় কম। You read it।

পবিত্র পড়লে—

"অজয়ের পুণ্য নীরে পূত চিত্তে ঘট আনো ভ'রে,
নান্নুরের মাটি দিয়ে বেদী বাঁধি রাখো তার 'পরে,
সেখানে আহ্বান করো নবযুগে নূতন কবিরে—
বাংলার ভারতের প্রিয়তম ভাস্বর রবিরে।
প্রাচ্যের রবির রশ্মি প্রতীচীর শীতল সাগরে,
তরঙ্গের শীর্ষে আজি সপ্তবর্ণে ঝলমল করে,
কুয়াশা-ধূসর সেথা বসতির মাথার আকাশ
ধন্য হ'ল স্পর্শে তার, হ'ল পুণ্য নীলের প্রকাশ।"

পবিত্র প'ড়ে গেল কবিতাটি। হেডমাস্টার ক্ষুব্ধ মনে ব'সে রইলেন। ছেলেটিকে কোনমতেই তিনি বশে আনতে পারছেন না। কবিতাটি প'ড়েই তিনি বলেছিলেন, না, এ চলবে না। কবিতাটির কোথাও এক ছত্রে এই বিশিষ্ট অতিথিটির স্তবগান করা হয় নাই। কবিতাটি টেবিলের উপরেই প'ড়ে ছিল, তার উপর গাম-পট রাখা হয়েছিল, আজ প্রোগ্রাম তৈরির সময় ওই কাগজখানার উপরে ফুলস্কেপের দিস্তাটি রেখে প্রোগ্রাম তৈরি করেছেন। আঠায় সেঁটে গিয়ে কাগজখানা চ'লে এসে সাহেবের হাতে পড়েছে। গৌরীকান্তকে পাওয়া যায় নাই। মণিভূষণ ফিরে এল। তবে সে বাড়িতে লোক পাঠিয়েছে। কবিতাপাঠ শেষ ক'রে পবিত্র বললে, এ কবিতাটি রচনা করেছে আমাদের স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসের একটি ছাত্র। নাম গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়। আমাদের গ্রামেই বাড়ি।

মণিভূষণ ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। যে লোককে সে গৌরীকান্তের বাড়ি পাঠিয়েছিল, সে ফিরে এসেছে, বাইরে দাঁড়িয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

লোকটি বললে, গৌরীবাবু বাড়িতেও নাই। তাঁর মা বললেন—কোথা থেকে বন্ধু এসেছে, তাকে নিয়ে বেড়াতে গেছেন, এখনও ফেরেন নি।

কামদেববাবু তার নোট-বই খুলে পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছিলেন।

সাহেব অভিনন্দনের উত্তরে বললেন, এমন একখানি পল্লীগ্রাম তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। পবিত্রর, স্বর্গীয় গোপীচন্দ্রের প্রশংসা করলেন। তাঁরাই এনেছেন এই পল্লীর মানুষদের অন্ধকার থেকে আলোকে। সরকারী ইতিবৃত্ত থেকে এখানকার অতীত অবস্থা তাঁর না-জানা নয়। স্বল্প আয়ের অশিক্ষিত জমিদার-মণ্ডলীর দলাদলির ইতিহাস সে সমস্ত। এর মধ্যে কবিতা-রচয়িতা গৌরীকান্তের কথাও তিনি বললেন। তার কাব্য-প্রতিভার স্ফুরণের মূলে এই ইস্কুল এবং পবিত্রর সাহিত্যরচনার দৃষ্টান্ত ও উৎসাহ, এর জন্যেও তিনি ধন্যবাদ দিলেন। আর বললেন, তাঁকে সাহিত্যিক হিসাবে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়েছে, তার জন্যে তিনি আনন্দিত। সাহিত্যকে তিনি ভালবাসেন। সাহিত্য রচনা করবার তাঁর ইচ্ছা আছে। বাংলা সাহিত্যে এখনও অনেক অভাব। বিদেশের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তবে তাঁর অবসর কম। তবু তিনি চেষ্টা করবেন। সে বিষয়ে তাঁর ইচ্ছা আছে।

পবিত্র খুশি হ'ল। গৌরীকান্তের প্রশংসাতেও সে খুশি হ'ল। এ উদারতা তার অকৃত্রিম।

কামদেববাবু পবিত্রকে ডেকে বললেন, আজ ফিরতে হ'ল পবিত্রবাবু, কিন্তু আসব কয়েক দিনের মধ্যে। একটা এন্‌কোয়ারি আছে,—স্কুলের নলিনী বাগচী ব'লে একটি ছেলে এখানে কার বাড়ি আসে যায়? বাগচীরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, এখানকার সকলে রাঢ়ী। এখানে সে কার বাড়ি যায় আসে, এ খবরটি একটু নেবেন তো। বুঝতেই পারছেন, স্ট্রিক্‌ট্‌লি কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল! তবে গৌরীকান্তের মামা রবি যখন ধরা পড়ে, তখন আপনারা যে সাহায্য করেছেন, সে রেকর্ড আমি দেখেছি। এবং আপনারা এখনও যে ভাবে আমাদের সাহায্য করেন, তাও জানি। বুঝেছেন?

পবিত্রর কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেল।

রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে তখন নূতন কালের দৃশ্য-যোজনার আয়োজন চলছিল। গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে চন্দ্রালোকিত প্রান্তরে দুটি ছেলে ব'সে ছিল। মৃদুস্বরে কথা বলছিল আর নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়ে ছুঁড়ছিল।

দূরে পশ্চিমপ্রান্তে আলোকসমারোহ দেখা যাচ্ছে। একটা ফাঁক দিয়ে

একটা আলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কারও জ্যোতির্ময় সদাজাগ্রত স্থির দৃষ্টির মত। রাধাকান্ত থাকলে তিনি বলতেন, গ্রাম-লক্ষ্মীর দৃষ্টি। এক চক্ষু তাঁর নিবদ্ধ বর্তমানের উপর, অপর চক্ষুর দৃষ্টি ভবিষ্যতের সাধনায় দূরদিগন্তে নিবদ্ধ। ছেলে দুটি ব'সে ছিল আলোর দিকে পিছন ফিরে। মধ্যে মধ্যে তারা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করছে—

"ওরে তুই ওঠ আজ, আগুন লেগেছে কোথা—" [ক্রমশ]

তারাশঙ্কর

সংবাদ-সাহিত্য

জ ১২ শ্রাবণ, বসিয়া বসিয়া আষাঢ় মাসের "সংবাদ-সাহিত্য" লিখিতেছি আর ভাবিতেছি সোনার বাংলার রাজধানী একদা-নিশীথ-সুন্দরী এই প্রাসাদময়ী কলিকাতায় আর কতদিন আমাদিগকে বিবিধ বাধার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে, আবার কবে আমরা নিশ্চিন্তভাবে তাগাদা দিবার জন্য কাগজওয়ালা ও দপ্তরীদের বাড়ি হাঁটাহাঁটি করিতে পারিব, অসহায়ভাবে পড়িয়া পড়িয়া মার খাওয়ার দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইব? নিরুপায় মন স্বভাবতই একটি বহুবিজ্ঞাপিত বহুবাঞ্ছিত নির্দিষ্ট দিনের প্রতি ধাওয়া করিতেছে, যেদিন পশ্চিমবঙ্গে আমাদের সকল দুঃখের অবসান হইবে, নিজেদের লোককে আমরা নিজেরা মুক্তি বা ফাঁসি দিতে পারিব, দুর্ভিক্ষে মরিয়া গেলেও নিজেদের অক্ষমতায় লাঞ্ছিত হইব, কাহারও উপর দোষারোপ করিব না। সেই

শনিবারের চিঠি'র শ্রাবণ সংখ্যা ১৫ আগষ্ট (২৯ শ্রাবণ) নূতন জাতীয় পতাকা-চিহ্নিত হইয়া বাহির হইবে।

শুভদিন সমাগত—যেদিন আমাদের চক্রচিহ্নশোভিত ত্রিবর্ণ পতাকা ফোর্ট উইলিয়মের শিখরদেশে পত্‌পত্‌ করিয়া উড়িতে থাকিবে, কলিকাতার লাট-প্রাসাদের গম্বুজনিম্নে বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীতের উদাত্ত স্বর গম্‌গম্‌ করিবে এবং গান্ধীজীর আগমনে গড়ের মাঠে আমরা এক শো আট কামান দাগিতে পারিব। আরও কি কি করিতে পারিব, তাহার তালিকা পেটে গজগজ করিলেও

বলিতে ভাষা জুয়াইতেছে না। উটরাম ঘাটে কানায় কানায় পরিপূর্ণ টলমল উচ্ছল গঙ্গায় আমাদের পণ্য-বোঝাই অর্ণবপোতগুলি উদ্‌ভ্রান্ত তরঙ্গাঘাতে দুলিতে দুলিতে মুহুর্মুহু আকাশচেরা বংশীধ্বনি করিতে থাকিবে—

গোপালদার অকস্মাৎ রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইবার এমন নাটকীয় মুহূর্তটি কাজে লাগাইতে পারিলাম না, কারণ এখনও তাঁহার অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত হয় নাই। যে শুভদিনের কথা আমাদের মনকে আজ ভরিয়া তুলিতেছে, সেই শুভদিনে তাঁহার পুনরাবির্ভাব ঘটিবে। সেই দিন আসিতে আর বিলম্ব নাই।

১৫ আগস্ট ১৯৪৭, ৩০ শ্রাবণ ১৩৫৪, শুক্রবার। এই পুণ্যদিনে স্বভাবত যাহা ঘটা উচিত, রবীন্দ্রনাথ প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে তাহার ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। এই সুদিনের কল্পনা করিয়া তিনি দেশমাতার উদ্দেশে বলিয়াছিলেন—

"জননি, সময় নিকটবর্তী হইয়াছে, স্কুলের ছুটি হইয়াছে, সভা ভাঙিয়াছে, এইবার তোমার কুটিরপ্রাঙ্গণের অভিমুখে তোমার ক্ষুধিত সন্তানের পদধ্বনি শুনা যাইতেছে। এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ, তোমার প্রসারিত শীতল-পাটির উপরে আমাদের ছোটো বড়ো সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রুগদ্‌গদ আশীর্বচনের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক।"

বুঝিতেছি, মা প্রস্তুত হইয়া আছেন, কিন্তু আমরা—তাঁহার অযোগ্য সন্তানেরা স্কুলের ছুটি হওয়া সত্ত্বেও বাড়ি না ফিরিয়া পথেই কলহে কোলাহলে মত্ত হইয়াছি। পরস্পরকে আঘাত করিয়া রাজপথে ধুলা ও কর্দমে লুটাইতেছি, মায়ের কুটিরের প্রসারিত শীতলপাটির আকর্ষণ এখনও তেমন প্রবল হইয়া উঠে নাই।

আমরা দাঙ্গা করিতেছি। আমাদের মধ্যে মহৎ যাঁহারা, যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা প্রত্যেকেই বারম্বার প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেছেন, সাম্প্রদায়িক কলহে লিপ্ত হইও না, তৃতীয় পক্ষের ফাঁদে পা দিও না, দেশের সর্বনাশ ঘটাইও না। জানি না, তাঁহারা গোপনে অন্যবিধ ঘোষণা করিতেছেন কি না, কিন্তু দাঙ্গা থামিতেছে না। এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত ঘটনার কথা শুনিয়া এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য কেনা-বেচার দুর্গতি স্বচক্ষে দেখিয়া নিজেরাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত হইতেছি। স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, নিজের পাড়ায় কায়দায় পাইয়া অন্য পাড়ার একজন নিরীহকে 'কজা' করিলে অন্য পাড়ায় নিজের পাড়ার পাঁচজন নিরীহের হত, আহত অথবা গুম হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। তথাপি একজনকে কজা করার পৈশাচিক লোভ থামিতেছে না। মনে হইতেছে, এখন আর নিছক শিক্ষা দেওয়ার অথবা

প্রতিশোধ লওয়ার স্পৃহা হইতে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতেছে না, অনভ্যস্তেরা অভ্যস্ত হইয়াছে, একটা দারুণ নেশায় তাহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। এ নেশা বর্বর মানুষের আদিমতম নেশা, পরস্পর রক্তদর্শনের নেশা। ধর্মের নামে নেশা সর্বাপেক্ষা ভাল জমে বলিয়া মানুষ ধর্মের দোহাই পাড়িয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। যাহা আত্মরক্ষার জন্য একদিন একান্ত প্রয়োজন ছিল, আজ তাহা অনাবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও তাহার গতি রোধ করা যাইতেছে না। লিখিতে লিখিতেই শুনিতেছি, মানিকতলা ও চিৎপুর এলাকা ঘন ঘন শক্তিশেলের আকাশবিদারী ধ্বনিতে মুখর হইয়া উঠিতেছে। এখন হয় অকারণ পুলকে, নয় সমাজে শৃঙ্খলা থাকা যাহাদের স্বার্থের বিরোধী, মাত্র তাহাদের কারসাজিতে এই সব ঘটিতেছে। সামান্য কয়েকজনের খেয়ালখেলা গোটা সমাজটাকে সকল দিক দিয়া বিপর্যস্ত করিয়া দিতেছে। অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই, দাঙ্গাই দাঙ্গার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাংলা দেশে যতদিন লীগ-শাসন বজায় ছিল, ততদিন "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান"-নীতি অশিক্ষিত বর্বর সমাজে প্রচারের ফলে যে ভয়াবহ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অনিবার্য হইয়া উঠে, তাহারই জের তুষানলের মত ধিকিধিকি জ্বলিতে দেওয়া হইয়াছিল। একমাত্র গবর্মেণ্ট যাহা রোধ করিতে পারে, গবর্মেণ্ট তাহাকেই প্রশ্রয় দিয়া জীয়াইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া সর্বত্র আমাদের দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। আজ কলিকাতায় তথা পশ্চিমবঙ্গে লীগ-শাসনের অবসান ঘটিতে চলিয়াছে, দাঙ্গা-নিবারণী বৈধ শক্তি কংগ্রেসের আয়ত্তে আসিতেছে। আজও যদি দাঙ্গা বন্ধ না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, কংগ্রেস-শাসন অক্ষমের শাসন অথবা আমাদের মধ্যেই কেহ কেহ—প্রবল এবং নেতৃস্থানীয় কেউ কেউ যে-উপায়েই হউক এই সাম্প্রদায়িক কলহ কৌশলে বজায় রাখিয়া কংগ্রেসকে খেলো করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। পনেরোই আগস্টকে সত্যকার জয়যুক্ত করিতে হইলে এই দাঙ্গা যে কোনও মূল্যে বন্ধ করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার সহকর্মীরা প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছেন দেখিতে পাইতেছি, তাঁহারা ক্ষমতা পূর্ণভাবে হাতে পাইয়াছেন কি না জানি না। না পাইয়া থাকিলে এখনও আশা আছে। যদি পাইয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, 'এলোমেলো ক'রে দে মা'র দলকে তাঁহারা আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, বাংলা পলিটিক্সে বৃত্তান্তর্গত-বৃত্তের জঘন্য ষড়যন্ত্র এখনও অবাধে চলিতেছে। বাংলা দেশে পনেরোই আগস্ট নিষ্ফল হইতে চলিয়াছে। সেদিন মায়ের

কুটিরের শঙ্খ বোধ হয় বাজিবে না, প্রদীপ বোধ হয় জ্বলিবে না, শীতলপাটি পর্যন্ত আমরা পৌঁছিতে পারিব না।

*　　　*　　　*

গোপালদা অতশত জানেন না, পনেরোই আগস্টের তাৎপর্যে পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া এই গানটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

চক্র-শোভিত উড়ে নিশান
নবভারতের বাজে বিষাণ
কে আছ কোথায় ছুটে এস সবে
জ্ঞানী ও কর্মী ধনী-কিষাণ।
পনেরো আগস্ট পুণ্য দিন
প্রাচীন ভারতে জাগে নবীন
হের তিনরঙা পতাকার তলে
মিলিত হিন্দু-মুসলমান॥
নতুন যাত্রা শুরু এবার
মিলেছে সুযোগ জনসেবার
মৃত্যু-সাধনা সফল হয়েছে
গাই সবে মিলি জীবন-গান॥

—

বাউণ্ডারি কমিশনের চরম রায় এখন পর্যন্ত প্রকাশিত না হইলেও বাংলা দেশ যে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন সমস্যা—দুই বিভাগের কি কি নাম হইবে। যাহারা দীর্ঘকাল আমাদের বুকের উপর বসিয়া অবাধে দাড়ি উপড়াইয়াছে, তাহারা নাম দিয়াছে—পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ। এই নামকরণের যে দোষই থাক্, পশ্চিম ও পূর্ব বিশেষণ ঘুচাইয়া একদিন পুনর্মিলিত হইবার সম্ভাবনা এই নামের মধ্যেই নিহিত রহিল। কার্জনের আমলের বঙ্গদেশ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের নজির রহিয়াছে। কিন্তু আসলে যাঁহারা পূর্ববঙ্গের প্রধান অংশীদার হইলেন, তাঁহারা গত কয় বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশকে পূর্ব-পাকিস্তান ছাড়া আর কিছু বলেন না এবং তাঁহাদের হাইকমাণ্ড মূল ভারতবর্ষ নামটাকেই বাতিল করিয়া তাঁহাদের খণ্ডিত অংশকে পাকিস্তান নাম দিয়াছেন। পূর্বের তাঁবেদারেরা যে পূর্বপাকিস্তান ছাড়া অন্য কোনও

দিয়ে বিড়বিড় ক'রে কি সব বলতে আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে নবাব সাহেব অতি মিষ্টি সুরে পরিতোষকে বললেন, বেটা, তোমরা আমার ঘরে খাবে এ আমার সৌভাগ্য। নিশ্চিন্ত থাক, মোটা গোশ্‌ত্‌ আমাদের বাড়িতে ঢোকে না আর ওই যে জিনিসটির নাম করলে, ও জিনিসটি পৃথিবীর কোনও মুসলমানের ঘরেই স্থান পায় না, ও আমাদের হারাম।

এতক্ষণে হকিম সাহেব চোখ খুলে আমাদের দিকে চেয়ে মুখভঙ্গী করলেন, অর্থাৎ কেমন হ'ল তো?

সেখানে খেতে রাজি হওয়ায় দেখলুম, নবাব সাহেব আমাদের ওপর বেশ খুশিই হয়ে উঠলেন। তিনি বলতে লাগলেন, তোমরা আমার বাচ্চার শিক্ষক হ'লে, তোমরা এ বাড়ির মাননীয় ব্যক্তি। আমি আর কদিন আছি! তোমরা ছাত্রকে সৎপরামর্শ দিও, আল্লা তোমাদের ভাল করবেন।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

দুইখানি প্রাচীন সাময়িক-পত্র

'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণ'।—"মাহ শ্রাবণ সন ১২৩৬ সাল"—ইংরেজী ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণ' নামে একখানি সাময়িক-"পুস্তকে"র "প্রথম খণ্ড" (পৃ. ৪৮) এবং পৌষ মাসে "২ সংখ্যা" প্রকাশিত হয়। ইহার আর কোন সংখ্যার সন্ধান পাওয়া যায় না। কালাচাঁদ রায় 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা'র পরিচালক ছিলেন বলিয়া মনে হয়: "যাহার এই পুস্তক লইতে ইচ্ছা হইবেক তিনি বহুবাজারের গিরিধর বাবুর বাটীতে শ্রীকালাচাঁদ রায়ের নিকটে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। মূল্য ১ এক টাকা।" ইহা "তিমিরনাশক যন্ত্রে প্রকাশিত ও মুদ্রাঙ্কিত" হইত।

'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণ' প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "অনুষ্ঠানপত্রে" এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—

"আমরা সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা নামে এক নূতন গ্রন্থ প্রকাশ করিবার মানসে বিজ্ঞ গুণজ্ঞ লোকের নিকটে জানাইতেছি যে তাহাতে নানাদিগ্দেশীয় বৃত্তান্ত ও ব্যবহার ও চরিত্র ও আর২ বিষয়ের বিবরণ গৌড়দেশীয় সাধুভাষায় লিখিত হইবেক এবং এই দেশের পূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান অবস্থা সকল বিশেষরূপে প্রকাশ

নাম ব্যবহার করিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। মনে হয়, অদূরভবিষ্যতে তাঁহারা শাসনব্যবস্থার সুবিধা লইয়া পূর্ববঙ্গ নামের সার্থকতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিবেন। বঙ্গদেশকে এই অগৌরব ও লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আগেই সতর্ক হওয়া ভাল। আমাদের মনে হয়, বর্তমানে পশ্চিম অংশকেই বঙ্গদেশ নামে অভিহিত করা সমীচীন। যদি ভবিষ্যতে পাকিস্তানীদের মনের পরিবর্তন হয়, অথবা ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের সম্মিলনে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন হয়, তখন সঙ্কুচিত বঙ্গদেশের পরিধি বিস্তৃততর করিলেই চলিবে, যে নাম অব্যবহারের দ্বারা পূর্ব-পাকিস্তানের আওতায় হারাইয়া যাইবে, আজ সেই নাম দেওয়ার কোনই অর্থ হয় না। শিক্ষামন্ত্রী জিয়াউদ্দিন ইতিমধ্যেই ফতোয়া জারি করিয়াছেন—পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা হইবে উর্দু। বাঙালী মুসলমানেরা এই আদেশ যদি মানিয়া লন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বঙ্গদেশ নামের প্রতি তাঁহাদের কোনও শ্রদ্ধা নাই, সুতরাং পূর্ববঙ্গ নামটা বর্জন করিতে তাঁহাদের আনন্দই হইবে। যাহা অনিবার্য, তাহা আগে হইতে স্বীকার করিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

* * *

সরকারী আপিসের সরঞ্জাম লইয়া বাটোয়ারা-কমিশনে যে টানা-হেঁচড়া চলিতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে, ভাষা ও সাহিত্যের বখরাও ইঁহারা দাবি করিবেন, পাওনা তো লওয়া যাক, পরে গুদামজাত করিলেই চলিবে, হিস্সা ছাড়ি কেন? এইখানেই আমাদের আশঙ্কা সর্বাধিক। নোয়াখালি চট্টগ্রামে বহুল-প্রচারিত 'ছেক ছোনাভানের পুথি' অথবা 'ভেলুয়া সুন্দরীর কেচ্ছা' যাঁহাদের একমাত্র সাহিত্য, তাঁহারা ছুটিখানের মহাভারত, আলাওলের পদ্মাবতী, ময়নামতীর গান, ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা একান্ত নিজস্ব বলিয়া দাবি করিয়া বসিলে আমাদের সমূহ ক্ষতি হইবে। আশা করি, ইঁহারা এই সকল অনাবশ্যক বস্তুর দাবি করিবেন না। ইতিমধ্যেই মক্তব-মাদ্রাসার প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকগুলিতে যে ধরনের নূতন মালমসলার সমাবেশ হইয়াছে এবং পাকিস্তানী দৈনিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাগুলিতে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানিত করিবার যে উদগ্র চেষ্টা চলিয়াছে তাহাতে আশা করা যায়, উপরোক্ত প্রাচীন বস্তুগুলি তো বটেই, আধুনিক কাজি নজরুল ইসলামকেও তাঁহারা বর্জন করিবার সাহস দেখাইবেন। গত ২৭ জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ আপিসে নজরুল সম্বন্ধে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহাতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। জনৈক পাকিস্তানী সাহিত্যিক

নজরুলের হিন্দুর বেদ-পুরাণ সংস্পর্শদোষের উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন যে, নজরুলকে প্রাক্-পাকিস্তান-যুগের কবি বলিয়া গ্রাহ্য করা হউক, পাকিস্তানের কবি হওয়ার গৌরব তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। সাধু সাধু। ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব নিশ্চয়ই এতদিনে তাঁহার 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' 'পাকিস্তানী ভাষা ব্যাকরণ' রূপে ঢালিয়া সাজিতেছেন। 'ইত্তেহাদে' দেখিলাম, মৌলানা আকরাম খাঁ সাহেবের কোরান অনুবাদে "ঊষা নিশাপতি দিনপতি" প্রভৃতি কথা থাকার জন্য তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে; পূর্ব-পাকিস্তানে ওই সংস্কৃত-ঘেঁষা অনুবাদের স্থান হইতেই পারে না। তা ছাড়া উর্দুর ফতোয়া তো আছেই। মোটের উপর মনে হইতেছে, ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়া আমাদের বিশেষ আশঙ্কার কারণ নাই, পূর্ববর্তী গৌরবের যাহা কিছু হিঁদু-ছোঁয়াচদুষ্ট, তাহার সব কটিই না পাক বলিয়া গণ্য হইবে। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আমরা ভবিষ্যতের কোনও আশা বর্তমান অবস্থায় তো করি না।

* *

বাংলা দেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস বিভাগ লইয়াও একটা সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা পুনর্মিলনের স্বপ্ন দেখেন, এই বিভাগের কল্পনাও তাঁহাদের অসহ্য। কিন্তু রাষ্ট্রের দিক দিয়া দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে একই প্রতিষ্ঠান সমান কার্যকরী হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে তাঁহারা ভাবিয়া দেখিতেছেন না। নিজ ও পর রাষ্ট্রে কর্মপদ্ধতি এক হইবে না, হইতে পারে না, এক জায়গায় পুরাপুরি গঠনের কাজ, অন্যত্র সংগ্রামের কাজ চালাইতে হইবে। পাকিস্তান-কংগ্রেসের প্রধান চেষ্টা হইবে—ভ্রান্ত পাকিস্তানকে পুনরায় ভারত-সমবায়ে ফিরাইয়া আনার। পাকিস্তান সরকার তাহা বরদাস্ত করিবেন না, সুতরাং সংঘর্ষ অনিবার্য। যাঁহারা চিরকাল সংঘর্ষ ও সঙ্ঘাত কূটনীতিতে হাত পাকাইয়াছেন, তাঁহারা একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া সেই কাজে আত্মনিয়োগ করিলে মূলের সংগঠনকার্য নিরুদ্বেগে চলিতে পারে।

—

দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র একটি ভারতীয় পৌরাণিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছেন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের স্বাতন্ত্র্য-নীতি তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে আয়ত্ত করিতে অপারগ হইয়া যেন তিনি ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ রচনা করিয়া তুলকালাম বাধাইয়া দিয়াছেন। আশা করি, বিশ্বামিত্রের মত তিনিও শেষরক্ষা করিতে পারিবেন।

—

অভূতভদ্ভাবে চৗ—'দৈনিক বসুমতী' পাকিস্তানী 'আজাদ'-'ইত্তেহাদ'কে ঘায়েল করিতে গিয়া তদ্ভাবে এমনই ভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন যে, বাচনভঙ্গীতে আর কোন পার্থক্য ধরা যাইতেছে না। সম্ভবত উপীনদাদা নবগঠিত বঙ্গে জার্নালিজমের একটা পাকা স্বদেশী আদর্শ স্থাপন করিয়া যশস্বী হইতে চান। বোমা মারিয়া তিনি যাহা করিতে পারেন নাই, এর ওর তার বাপান্ত ও শ্বশুরান্ত করিয়া সম্ভবত বুড়া বয়সে সেই কীর্তি অর্জন করিতে চান। 'ঊনপঞ্চাশী'র লেখকের মাথায় এখন ঊনপঞ্চাশ পবন ভর করিয়াছে, বেচারা 'বসুমতী' টলমল করিতেছে।

—

একটি বৈদেশিক গল্প মনে পড়িতেছে। স্কট্‌ল্যাণ্ডের কোনও এক শহরের ট্রাম কোম্পানির কর্তৃপক্ষ একবার জনসাধারণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ট্রামের ভাড়া দুই পেনি কমাইয়া দেন। এই শুভ ঘোষণার তিন দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ প্রায় দশ হাজার প্রতিবাদপত্র পাইয়া চমকাইয়া উঠেন। ভাড়া কমাইব, তাহাতেও আপত্তি! ব্যাপার কি? প্রতিবাদকারীরা পত্রে কারণ দর্শান নাই। ট্রাম-কর্তৃপক্ষ নিরুপায় হইয়া একটি সভায় সকলকে আহ্বান করিয়া কারণ জানিতে চাহেন। প্রতিবাদকারীদের পক্ষে মুখপাত্র যিনি, তিনি সবিনয়ে নিবেদন করেন যে, ভাড়া কমাইবার বিপক্ষে তাঁহাদের একমাত্র আপত্তি এই যে, তাহার ফলে তাঁহাদের প্রত্যহ চার পেনি করিয়া লোকসান হইতেছে। কর্তৃপক্ষ নালিশ শুনিয়া অবাক। কি রকম? মুখপাত্র বলিলেন, আমরা কেহই ট্রামের প্যাসেঞ্জার নহি, প্রত্যহ হাঁটিয়াই আপিস যাতায়াত করিয়া থাকি। পূর্বে এই বাবদে আমাদের যে পয়সা বাঁচিত, ভাড়া কমানোর দরুন তাহা অপেক্ষা প্রত্যহ চার পেনি কম বাঁচিতেছে। এ লোকসান আমরা বরদাস্ত করিব না। কর্তৃপক্ষ জবাব যাহা দিয়াছিলেন, তাহা ছাপার অক্ষরের উপযুক্ত নয়।

* * *

ছাপাখানার দর ও পুস্তক-প্রকাশের বাধা লইয়া কিছুকাল দুই-একটি সংবাদপত্রে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। বাগে পাইয়া ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত আদায় করিবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত অন্যায়। ছাপাখানা-সমিতি যে দর বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই পুস্তক-প্রকাশের পক্ষে সাধারণ ক্ষেত্রে ঘোর অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের নিজেদের বিশ্বাস, লোক-দেখানো দর একটা বাঁধা থাকিলেও প্রত্যেক ছাপাখানাই নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে

বাঁধা খরিদ্দারদিগকে সন্তুষ্ট রাখিয়া ব্যবসা বজায় রাখিতেছেন। কাজের চাপ অত্যন্ত বেশি, তাই নবাগত খরিদ্দারকে সমিতির দর দেখাইয়া তাহারা বিদায় দিয়া থাকেন, তাহাতে অনেক অবাঞ্ছিত বিতর্কের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ছাপাখানার খরচ বাড়িয়াছে, যুদ্ধের দরুন অনেকের পয়সা বাড়িয়াছে, বইয়ের দাম বাড়িয়াছে—সব কিছুই পরস্পরকে মানাইয়া চলিতেছে। যাহারা ব্যবসা করে, তাহারা এমন মূর্খ কেহ নয় যে, বিনা কারণে খরিদ্দার চটাইবে। যাহা হউক ইহা এমন একটি কঠিন ব্যাপার কিছু নয়, যাহার মীমাংসা হইতে পারে না। ইহার জন্য কাগজে এত কালি ছড়াছড়ির প্রয়োজন ছিল না।

* * *

সব চাইতে কৌতুকের ব্যাপার এই যে, এই আন্দোলনের সঙ্গে এমন ব্যক্তিও সংশ্লিষ্ট আছেন যিনি অনেক দিন ধরিয়াই ছাপাখানার সহিত কারবার করিতেছেন, কিন্তু যে দরই হোক ছাপাখানাকে মূল্য দেওয়ার দায়িত্ব স্বীকার করেন না। দর বাড়াতে উদ্ধৃত গল্প অনুযায়ী তাহার আনন্দিত হইবারই কথা।

২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতিথিকে উপলক্ষ্য করিয়া কোনও সভাসমিতি করার বিরুদ্ধে একদল সাহিত্যিকের সহিযুক্ত ফতোয়া অদ্য ২৮ জুলাই সংবাদপত্রে দেখিলাম। মহাপুরুষদের তিরোভাব বা তিরোধান দিবসে উৎসব হয় না—এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা দেশের কোনও খবর তো রাখেনই না, পত্রিকাটাও খুলিয়া দেখেন না। বাংলা দেশের গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁহাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে তাঁহারাই জানেন, বিদ্যাসাগর মধুসূদন বঙ্কিম—অনধিকারী হইলেও আমরা সকলেরই বাৎসরিক শ্রাদ্ধই করিয়া আসিয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদে বৎসরে বৎসরে ইহার সাক্ষ্য মিলিবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বহুবার এরূপ মৃত্যুস্মৃতিদিবস পালন করিয়াছেন। আজ হঠাৎ এইরূপ একটা চিন্তালেশহীন আদেশ জারি করিয়া রবীন্দ্রনাথকে অপমান করিবার অর্থ কি? রবীন্দ্রনাথকে লইয়া উৎসব আমরা যে কোনও দিন করিতে পারি, তাঁহার তিরোধান-দিবসও কম স্মরণীয়, কম পুণ্যময় নয়। আমরা পঁচিশে বৈশাখের মত বাইশে শ্রাবণও পালন করিব এবং সকলকেই পালন করিতে বলিব। পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণের কথা জানি না, বুদ্ধদেব যীশুখ্রীষ্টের কথা আমরা ভুলিব কেন?

কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বর্তমানে ব্যবসায়ের কোন্ পর্যায়ে উঠিয়াছে, নীচের সত্য গল্পটি হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। গল্পটির সত্যতা অনস্বীকার্য, কারণ ইহা নির্ভরযোগ্য সংগ্রহ। বউবাজার অঞ্চলের এক চীনাম্যানকে সেদিন বলিতে শোনা গিয়াছে—বেঙ্গলীজ নো গুড, নাইফ ফাইট, ক্রিকব্যাট ফাইট, অ্যাসিড ফাইট, অ্যাণ্ড দেন রিভলবার ফাইট, পিস্তল ফাইট, আই গো আসাম বর্ডার, হেভি ইনভেস্টমেন্ট, স্টেনগান ব্রেনগান রিভলবার পিস্টল, কাম ব্যাক, নো বায়ার, বেঙ্গল কার্ট, ওনলি ওয়ার্ড ফাইট মাউথ ফাইট, মাউথ ফাইট ওয়ার্ড ফাইট, হেভি লস, বেঙ্গলীজ নো গুড।

—

উপাধি বর্জন সম্পর্কে আমাদিগকে সমর্থন করিয়া অনেকেই পত্র লিখিতেছেন, বিবিধ অসুবিধার কথাও কেহ কেহ জানাইতেছেন। সর্বাপেক্ষা অসুবিধা ঘটিতেছে উপাধির দ্বারা লোক চিহ্নিত করার সুবিধা বর্জন লইয়া। শহরে যেখানে বাড়িতে নাম অথবা নম্বর আছে সেখানে অসুবিধা নাই, কিন্তু গ্রামে একই নামে বিভিন্ন-উপাধিযুক্ত বহু লোক থাকিলে গোল বাধিবেই। সাহিত্যক্ষেত্রে নামের অসুবিধার কথা বন্ধুবর বিভূতিভূষণ দ্বারভাঙ্গা হইতে জানাইয়াছেন। সে অসুবিধা আমরা নামের সঙ্গে ধামের উল্লেখ করিয়া দূর করিব, দ্বারভাঙ্গার বিভূতিভূষণের সঙ্গে বনগ্রাম-বারাকপুরের বিভূতির গোল বাধিবে না। এই সকল সুবিধা ও অসুবিধার কথা বিশেষ করিয়া কমিশন বসাইয়া স্থির করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে নদীয়া-শান্তিপুরের শ্রীমতিলাল, নওগাঁর শ্রীশম্ভুনাথ, শ্রীশোভন, চট্টগ্রামের ভূপতিরঞ্জন, রাজাভাতখাওয়ার দ্বিজেন্দ্রনাথ, খুলনার শ্রীবীরেন, হ্যাপিভ্যালি দার্জিলিঙের শ্রীঅমিয়নাথ, ভবানীপুর বেচু ডাক্তার লেনের শ্রীক্ষিতিমোহন, অখিল মিস্ত্রি লেনের শ্রীঅনিলকুমার, বীরভূম-চিতুরার শ্রীকমলাকান্ত, রাজশাহী-ঘোড়ামারার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ, দমদম রোডের আবুল খায়ের এবং শ্রীহট্টের শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি যে সকল মন্তব্য ও প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা সেই কমিশনের নিকট উপস্থাপিত হইবে। যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, আমরা তাহা সর্বত্র বিজ্ঞাপিত করিব।

—

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত [দাস]

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ [দাস] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৯শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৪

১৫ই আগস্ট

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু সাধকের সাধনার কাম্য সুপ্রভাত ১৫ই আগস্ট সুস্বাগত—সুদীর্ঘ প্রায় দুই-শতাব্দী-ব্যাপী অন্ধকার রাত্রির অবসানে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে ব্রাহ্ম-মুহূর্তের সঙ্গে তুলনীয়।

পূর্ণ স্বাধীনতা এখনও আসে নাই, ইংরেজ-আধিপত্যের সম্পূর্ণ অবসান এখনও হয় নাই, তাই সূর্য উদিত হয়েছে—এ কথা বলতে পারছি না। কিন্তু সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, অন্ধকার অপসৃত, রক্তাভ আলোয় ভ'রে উঠেছে পূর্বদিগন্ত।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল এই বাংলা দেশে; বাংলা সাহিত্যের 'আনন্দমঠ' থেকে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল। অন্তরীক্ষলোকের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাংলার সাহিত্য-সাধক প্রশ্ন করেছিলেন, "আমার মনস্কাম কি পূর্ণ হইবে না?

উত্তর হইল, তোমার পণ কি?

পণ আমার জীবনসর্বস্ব।

জীবন তুচ্ছ; সকলেই দিতে পারে।

আর কি আছে? আর কি দিব?

ভক্তি।

সেই ভক্তিকে সম্বল ক'রে রাত্রি-অবসানের তপস্যা আরম্ভ হয়েছিল। ক্রমে সে তপস্যার প্রভাব সমগ্র ভারতবর্ষে সঞ্চারিত হ'ল; তপস্বী বাঙালীর কণ্ঠে সেদিন গান ধ্বনিত হয়েছিল, "একলা চল রে, যদি ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।" সৌভাগ্যের কথা, আশঙ্কা সত্য হয় নাই, দেশ-দেশান্তরের সুপ্ত মানুষ ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল, রুদ্ধদ্বার উন্মোচিত ক'রে পথের উপর এসে তপস্বীদের আলোক-উৎসসন্ধানে যাত্রাপথের মিছিলে যোগ দিয়েছিল। রাত্রির ঘনান্ধকার উদ্ভাসিত ক'রে জ্ব'লে উঠেছিল হাজার হাজার যাত্রীর বুকের পঞ্জরাস্থি দিয়ে রচিত হাজার হাজার মশাল। সে আলোককে নির্বাপিত করবার জন্য আসুরিক মায়ায় রাত্রির অন্ধকার ঘন গাঢ় হয়ে উঠল; বজ্রগর্ভ মেঘ আকাশ ছেয়ে দিল। পথ হয়ে উঠল কণ্টকসঙ্কুল, সরীসৃপ-অধ্যুষিত, বায়ুমণ্ডল হ'ল ঝঞ্ঝাতাড়িত, সমুদ্র হ'ল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ, তটভূমি পড়ল ভেঙে, বনস্পতি করল আর্তনাদ। তবু আমরা ভীত হই নি, পশ্চাদপসরণ

করি নি ; ক্ষান্ত হয় নি আমাদের যাত্রাপথের চলা। তারই ফলে অকুতোভয়ে অহিংসা-মন্ত্রের তপস্বীর নেতৃত্বে আজ আমরা উপনীত হয়েছি আলোক-উৎসের অনতিদূরে।

আজ এই মুহূর্তটিকে প্রণাম করি ভূমিষ্ঠ হয়ে। ললাটে লাগবে যে ধরিত্রীর স্পর্শচিহ্ন, তা থাক্ আমার ললাটে অক্ষয় হয়ে, তারই মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাক্ ১৫ই আগস্টের প্রভাত। আবার আরম্ভ করি যাত্রা। কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষে হবে যে অভিনব সূর্যোদয়—তাকে আবাহন করবার পথে যাত্রা। আজিকার প্রভাতসমীরস্পর্শে সঞ্জীবনীশক্তিকে অনুভব করছি। সঞ্জীবিত দেহ মন নিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। "নূতন উষার স্বর্ণদ্বার" উন্মোচিত হয়েছে। আজ প্রশ্ন—সেই মুক্ত দ্বারপথে, হে সূর্যদেবতা, তোমার আবির্ভাবে আর বিলম্ব কত, যে সূর্য আমাদের অহরহ আহ্বান জানিয়ে বলবে, আলোক-উৎসসন্ধানী বিহঙ্গ, 'এখনই অন্ধ বন্ধ ক'রো না পাখা ?'

২

এই মুহূর্তকে প্রণাম করার সঙ্গে অভিবাদন করি ত্রিবর্ণরঞ্জিত চক্রশোভিত জাতীয় জীবনের জয়ধ্বজাকে। ওই জয়ধ্বজা অব্যাহত গৌরবে অমিতবীর্যে আকাশের পটভূমিতে উড্ডীন থাক্ মানুষের ইতিহাসের অন্তকাল পর্যন্ত। স্বাস্থ্যে শিক্ষায় শক্তিতে, ত্যাগে সংযমে সম্পদে, সাম্যে নিরভিমানতায় মর্যাদায় উদ্বুদ্ধ করুক ভারতবর্ষের মানুষকে ; মধ্যবর্তী চক্রপথে আমাদের দৃষ্টি হোক ঊর্ধ্বগ।

তারপর প্রণাম করি, স্মরণ করি, অন্তরলোকের এতকালের রিক্ত সিংহাসনকে পুষ্পে পত্রে চন্দনে গন্ধে স্বর্ণে সম্পদে সজ্জিত ক'রে নূতন ক'রে বরণ করি বাংলার—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধের স্বর্গগত বীরবৃন্দকে, সমবেত কণ্ঠে নিবেদন করি—জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে ! তোমাদের তপস্যায় তোমাদের উৎসর্গিত প্রাণের স্পর্শে জাগ্রত হয়েছে পঞ্জাব সিন্ধু মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ ; তোমাদের শঙ্খনিনাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্রের বারি, জলধিতরঙ্গ হয়েছে আকাশস্পর্শোচ্ছ্রিত। অন্ধকার হয়েছে মথিত ; বন্ধুর পথের সকল কণ্টক নিজেদের চরণে দলিত ক'রে পথ করেছ সরল নিষ্কণ্টক। আজ রাত্রির অবসানে উষাকালের পুণ্যচ্ছটা উদিত হয়েছে, উদয়গিরিশীর্ষে সূর্যোদয়কে আবাহন করবার প্রাক্কালে সমগ্র ভারতবর্ষের জাগ্রত জনতা তোমাদের চরণে নতমস্তক হয়েছে। আমাদের

জীবন-রাজ্যের তোমরা রাজরাজেশ্বর; বিধাতার অংশ-সম্ভূত ইতিহাসকে তোমরা রচনা করেছ, ইতিহাসের তোমরা নায়ক, তোমরা ছিলে, তোমরা আছ; তোমরা থাকবে আমাদের জীবনে, আমাদের ইতিহাসে, আমাদের কাব্যে গানে, আমাদের সাহিত্যে শিল্পে, আমাদের আদর্শে, জাতির জননীর মুখের শিশুশিক্ষার গানে। নিত্য প্রভাতে তোমাদের আলেখ্য দেখে আমাদের হবে সুপ্রভাত।

৩

ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ১৫ই আগস্ট। আমরা আবেগ-উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে গ্রহণ করছি; পৃথিবী তীক্ষ্ণ পরীক্ষার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে ১৫ই আগস্টকে, বিচার করছে, বিশ্লেষণ করছে তার স্বরূপকে।

আমাদেরও বিচার করতে হবে তার স্বরূপকে। ভারতবর্ষের মহাকবি কবিগুরু এর রূপ তাঁর ভবিষ্যৎদৃষ্টি দিয়ে দেখে গেছেন। ব'লে গেছেন, "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে, কি লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কি বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে!"

সে কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ আজ একাধিক শতাব্দীর শোষণে সকল সম্পদে রিক্ত হয়েছে, অন্নাভাবে পথে প্রান্তরে কীটপতঙ্গের মত মৃত্যু বরণ করেছে কোটি কোটি মানুষ, বস্ত্রাভাবে মেয়েরা দিয়েছে গলায় দড়ি; ভারতের যুবক আজ অস্থিপঞ্জরসার; কৃষিক্ষেত্র রিক্ত মৃত্তিকায় পরিণত হয়েছে; যে দারুণ দৈন্যের মধ্যে কৃষকের খাদ্য জোটে নি, সেই অভাবের কারণেই ভূমি পায় নি খাদ্য। কৃষিক্ষেত্রে প্রাচীন জলসেচনের ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে, এই বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকপ্রণালীসম্মত নূতন সেচনব্যবস্থা নাই। অনাবৃষ্টিতে কৃষিক্ষেত্রের মৃত্তিকা সত্যই ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদে। সে ক্রন্দন আমি শুনেছি। কুটীরশিল্প ধ্বংস করেছে নিজেদের বাণিজ্যের কুটিল স্বার্থের চক্রান্তে; এত বড় বিরাট ভারতবর্ষ, এত খনিজ সম্পদ, এত আরণ্য সম্পদ, এত কৃষি সম্পদ থাকতেও যন্ত্রশিল্পের প্রসার অধিকারে বঞ্চিত হয়ে ঘরের অলঙ্কারের সোনার বিনিময়ে বিদেশী রপ্তানি কাচ কিনছে। যতগুলি যন্ত্রশিল্প গ'ড়ে উঠেছে, তার মধ্যে পাট চা আজও নিয়ন্ত্রণ করছে ইংরেজ।

দেশীয় মিল গ'ড়ে উঠেছে কিছু, তারাও চালিত হচ্ছে ইংরেজদের মুনাফালোভী আদর্শের অনুকরণে। ভারতের শ্রমিকদের দুরবস্থা অবর্ণনীয়।

শিক্ষার দিক দিয়ে ভারতবর্ষের অবস্থা সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। যারা শিক্ষা পায় নি তাদের কথা থাক্; যারা শিক্ষা পেয়েছে, তাদের অবস্থা আজ বিচার করতে গেলে এই শুভপ্রভাতের নূতন পুণ্যরশ্মিও ম্লান হয়ে আসবে। ইংরেজের জয় এইখানেই সবচেয়ে দৃঢ়। এ কথা সত্য নয় বা এর অর্থ এ নয় যে, আমাদের প্রাচীনকালের শিক্ষার পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। বিংশ শতাব্দীতে আমাদের বিজ্ঞানের শিক্ষার শোচনীয়তার কথা স্মরণ করছি আজ। আজ স্মরণ করতে লজ্জা পাচ্ছি যে, দেশের সাহিত্য, দেশের শিল্প, আজও শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেণীর কাছেই সর্বাধিক অবহেলিত।

রোমানরা ব্রিটেনে সাড়ে তিন শো বছর রাজত্ব ক'রে ব্রিটনদের যে ক্ষতি করেছিল, তার হিসাব ইংরেজ তার ইতিহাসে ক'রে রেখেছে, ভারতবর্ষের ছেলেদের তা পড়তে হয়েছে, দেশবিদেশে তা প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু দু শো বছরের কম পরিমাণ সময় রাজত্ব ক'রে ইংরেজ ভারতবর্ষের যে ক্ষয়-ক্ষতি ক'রে গেল, তার হিসেব ওজনে ব্রিটনদের ক্ষয়-ক্ষতির চেয়ে অনেক বেশি হবে। সর্বাপেক্ষা সর্বনাশ ক'রে গেল ভারতবর্ষের জীবনক্ষেত্র দ্বিধাবিভক্ত ক'রে দিয়ে। বনবাসী নল ও দময়ন্তী একখানি কাপড়ের দুটি প্রান্ত দুজনে প'রে বিশ্রাম করছিলেন; দময়ন্তীর সুপ্ত অবস্থার সুযোগে শানিত ছুরি যুগিয়ে দিয়েছিল কলি; সেই ছুরিতে কাপড়খানাকে কাটবার ইঙ্গিত দিয়ে, পরিত্রাণ-লাভের নিন্দনীয় প্রবৃত্তির চেয়েও নিন্দনীয় মন্দ প্রবৃত্তি জাগিয়েছে, আমাদের মধ্যে পাশব-প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দিয়ে। দু শো বছর ধ'রে আমরা যে মহান সাধনা করেছি, তার মধ্যে পাপের বীজ বপন ক'রে সযত্নজলসেচনে অঙ্কুরিত পল্লবিত ক'রে তাকে বিষফলে ফলবান ক'রে দিয়ে গেল। যুদ্ধজয়ের জন্য বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করার অপরাধের চেয়েও এ অপরাধ বিধাতার বিচারে গুরুতর ব'লেই গণ্য হবে ভবিষ্যতে। সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলা দেশ। বাংলার সংস্কৃতির উর্বর ক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গ এবং কর্মশক্তির ফলদা ক্ষেত্র পূর্ববঙ্গ আজ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল।

আজ তবুও ইংরেজকে শুভবুদ্ধির জন্য, তার বেদনাদায়ক ত্যাগের জন্য ধন্যবাদ দেব। পৃথিবীর ইতিহাসে তার আজিকার এই কর্ম তাকে মহৎ সম্মানের অধিকারী ক'রে রাখবে।

৪

আজ স্মরণ করি ইতিহাসের অতীত অধ্যায়গুলিকে। ১৮৫৭ সালকে স্মরণ করি, ১৮৮৫ সালকে স্মরণ করি, ১৯০৫ সালকে স্মরণ করি, ১৯২১ সালকে স্মরণ করি, ১৯৩০-৩১-৩৩ সালকে স্মরণ করি, ১৯৪২ সালকে স্মরণ করি, প্রণাম করি। কল্পনা করি ১৯৪৮ সালের জুন মাসকে।

সকল ক্ষয় এবং ক্ষতিকে পূর্ণ করবার আয়োজনের জন্য প্রস্তুত হবার সংকল্প গ্রহণ করি।

ক্ষয়-ক্ষতি অনেক। শুধু ইংরেজের কৃত ক্ষয় ক্ষতি নয়, আমাদের নিজেদের কৃত ক্ষয়-ক্ষতিরও হিসাব করতে হবে। হিন্দু ও মুসলমানের বিভেদকে অপসারিত করতে হবে। যে সংশয়ের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ আমাদের হত্যার প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করেছে, সে সংশয়কে নিরসন করতে হবে। হিন্দুর মধ্যে চরমতম অপরাধ—অস্পৃশ্যতার বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। ধনবণ্টনের বৈষম্য দূরীভূত করতে হবে। ভূমিকে উর্বর করতে হবে। মাতাকে স্বাস্থ্যময়ী শক্তিশালিনী করতে হবে। শিশুকে স্বাস্থ্য দিতে হবে, শিক্ষা দিতে হবে। অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করতে হবে। কাজ অনেক—অনেক—অনেক। ১৫ই আগস্টের পুণ্য-প্রভাত সেই কাজের হিসাব নিয়ে এসেছে।

এই পুণ্য-প্রভাতে আর্য এস, অনার্য এস, হিন্দু এস, মুসলমান এস, খ্রীষ্টান এস, ব্রাহ্মণ এস, চণ্ডাল এস, সকলে মিলে একসঙ্গে ধর মঙ্গলকলস, পূর্ণ কর পবিত্র জীবন-সলিলে। সেই সলিলে হোক ভারতবর্ষের অভিষেক। ভারতবর্ষ মহামানবের সাগর-তীর-তীর্থে পরিণত হোক। পূর্ব এবং পশ্চিমের আদানে প্রদানে পৃথিবীর বুকে রূপায়িত করতে সমর্থ হোক নূতন দিন, নূতন সভ্যতা, নূতন সংস্কৃতি। দেশে দেশে মন্দ্রিত ভেরীনাদের মধ্যে ভারতবর্ষের ভেরীনাদ গগন স্পর্শ করুক। ১৫ই আগস্টের পুণ্যপ্রভাতে হোক তার শুভারম্ভ। অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু॥

তারাশঙ্কর

১৫ আগস্ট

দীর্ঘ দুই শতাব্দীর ব্যাকুলতা জমাট বাঁধিয়া
যে ক্ষেত্র রচিত হ'ল পরাধীন মরভূ-প্রান্তরে,
যে ক্ষেত্র কর্ষিত হ'ল বহু লক্ষ বাসনার ব্যগ্র সমবায়ে,
কবি-জন-চিত্তরসে সিক্ত হ'ল যুগ যুগ ধরি,

করা যাইবেক যাহাতে অন্য দেশীয় লোক অনায়াসে বিবেচনা করিতে সমর্থ হইয়া যথার্থ ও অযথার্থ বুঝিতে পারিবেন। দ্বিতীয় লোকেরদের নীতি শিক্ষার্থে এবং জ্ঞান বৃদ্ধ্যর্থে অন্য২ দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরদিগের তর্কসিদ্ধান্ত এবং আমার-দিগের শাস্ত্র হইতে তদনুযায়ি বিষয় সকল যাহা সংস্কৃত না জানিলে জ্ঞাত হইতে পারা যায় না তাহা ভাষায় রচনা করিয়া গ্রন্থমধ্যে প্রকাশ করা যাইবেক…। তৃতীয় এই দেশীয় ব্যবহার ও চরিত্র এবং শাস্ত্র যাহা অন্য দেশীয় লোকেরা সবিশেষ না জানিয়া নানাপ্রকার দোষোল্লাস করিয়াছেন তাহা উদ্ধারণার্থে ঐ সকল ব্যবহার প্রচলিত হইবার এবং তাহার তাৎপর্য্যতা জানাইয়া তাহারদিগকে নিষ্কলঙ্ক করিতে চেষ্টা করা যাইবেক পরন্তু গ্রন্থের শেষ খণ্ডে ব্যবহারদর্পণ সঙ্কেত করিয়া এই দেশীয় লোকেরা অন্য দেশীয় লোকের ব্যবহার যাহা গ্রহণ করিতেছেন তাহাতে যে দোষ তাহা প্রদর্শন করাইয়া সদাচার এবং সদ্ব্যবহার যাহাতে হয় এমত উপায় লিখা যাইবেক…।"

"অনুষ্ঠানপত্র" ও "ভূমিকা" ছাড়া 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা…'র ১ম খণ্ডে দুইটি প্রবন্ধ আছে :—১। Colonization কোলোনাইজেসিয়ান অর্থাৎ এতদ্দেশে ইংরাজ লোকের বসতি এবং জমীদারী প্রভৃতি কর্ম্ম করণ বিষয়; ২। পারস্য ভাষা পরিবর্ত্তনে ইংরাজী ভাষা আদালতে প্রচলিত হইবার বিষয়ে বিবেচনা। এই উভয় বিষয়েই 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা'-কার ঘোর বিরোধী ছিলেন। "কোলোনাই-জেসিয়ান" ব্যবস্থায় যে-সকল অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার আলোচনা করিয়া উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন :—

"এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে কোলোনাইজেসিয়ান কোনক্রমে আবশ্যক হয় না। এবং এইক্ষণে যেরূপ নিয়মানুসারে সাহেব লোক ইউরোপ হইতে এখানে আসিতেছেন তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া তাহারা বিনা অনুমতিতে যখন যেখানে স্বেচ্ছা তখন সেখানে আসিবেন ও বসতি করিবেন ইহা হইলে অধিক উৎপাত হইবেক। কোন২ স্থানে সাহেব লোক এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার ও দৌরাত্ম্য করিয়া থাকেন যে তাহা বিবেচনা করিলে আমরা প্রার্থনা করি যে ঐ নিয়মের আরো প্রাবল্য হয় পরিবর্ত্তন কোন ক্রমে উচিত নহে।" (পৃ. ২৭-২৮)

আদালতে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজী প্রচলন সম্বন্ধে 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা'-কারের বক্তব্য এইরূপ :—

ত্যাগপূত তপস্যায় লক্ষ তাপসের
মৃত্তিকার অন্ধকারে কবে উপ্ত হ'ল বীজ কেহ তা জানে না ;
সহস্র বন্ধনে বদ্ধ পীড়িত আর্তের
ক্ষুব্ধ কামনার কথা ইতিহাস লেখে নি আজিও,
লিখিবে না হয়তো কখনো।
শুধু মহাকালভালে চিহ্নিত হইয়া আছে একটি দিবস
কামনার বীজটুকু অঙ্কুরিত হ'ল যেই দিন,
ভারতপশ্চিমপ্রান্তে তাল নারিকেল নীল সমুদ্রসৈকতে
মৃত্তিকার বক্ষ ভেদি আকাশে তুলিল মাথা তরু এক পত্রপুষ্পহীন
(আঠারো শো পচাশির পবিত্র আটাশে ডিসেম্বর
বেলা বারোটায়)।
তার পর বৎসরে বৎসরে
ধীরে ধীরে বাড়িয়াছে সহস্র বাধার সাথে যুঝি
আলবালে বহু ভক্ত সেচন করেছে অকপটে
নিপীড়ন-বেদনার লবণাক্ত বহু অশ্রুজল
ফেলেছে সহস্র বীর গাঢ়তপ্ত বক্ষরক্তধারা
অসহায় আত্মবলিদানে—
কারো ইতিহাসে আছে, কারো নাই পরিচয় কোনো।
ধীরে ধীরে ধীরে
ধরিল সে পুষ্পতরু অপরূপ শাখাপত্রশোভা
ধীরে ধীরে এড়াইয়া বাহিরের শত অন্তরায়।
বিশ্বজন চেয়ে দেখে অপূর্ব বিস্ময়ে—
বন্ধ্যা তরু দিকে দিকে শাখাবাহু করিছে বিস্তার,
এ পোড়া দেশের উষরতা
ব্যর্থ ক'রে দিল তবু চিরকাম্য মঞ্জরীবিকাশ—
বহু-ব্যর্থতার ইতিহাস
দিনে দিনে প্রতিদিন হইল সঞ্চিত।
মোরা কাঁদিলাম দুখে, মরিলাম বিফল-প্রয়াসে।
আমাদের ব্যর্থতায় বিচলিত এল যাদুকর
দক্ষিণ সমুদ্র হতে মন্ত্র তার করিল প্রয়োগ

১৫ আগস্ট

(উনিশ শো কুড়ির সেই স্মরণীয় পয়লা আগস্ট)।
সেই মন্ত্রে শিহরিল তরুমূল মাটির আঁধারে,
উল্লাসে অধীর হ'ল গন্ধলোভী আলোক-বাতাস,
কাঁপিল অসীম ব্যোম আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলা লেগে।
তবু ফুটিল না ফুল, ব্যর্থ হ'ল সব আয়োজন—
ব্যর্থ হ'ল লক্ষ লক্ষ মানুষের অপরূপ প্রাণ বলিদান।
তারা হ'ল চিরজীবী আমাদের কৃতজ্ঞ স্মরণে।
নিষ্ফল বিলাপ মাঝে এইটুকু সান্ত্বনার সুর।
সহসা উঠিল ঝড় নিস্তরঙ্গ মরুবালুদেশে,
তরঙ্গে তরঙ্গে জাগে মৃত্তিকার ক্ষুব্ধ ব্যাকুলতা,
অন্ধকারে তরুমূল শিহরিল সে আঘাত লেগে
কোটি কোটি মানুষের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার ঝড়ে,
অন্ধ আঁখি ঢাকিল গগন—
(উনিশ শো বিয়াল্লিশ বন্য হ'ল আগস্টে নয়ই)।
ছিন্নভিন্ন হ'ল তরু ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা-আলোড়নে
ছিন্ন হ'ল শাখাপত্রশোভা।
ভাবিলাম, ভেঙে বুঝি পড়িয়াছে মোদের প্রত্যাশা,
ভাঙিয়া পড়েছে তরু নির্মূল হইয়া
বর্ষণ প্লাবনে আর মুহুর্মুহু বজ্রগর্জনে।
মোরা আঁখি মুদি ভয়ে ভয়ে,
অন্ধ ভবিষ্যৎ স্মরি মোরা কাঁদি ব্যর্থ মনঃক্ষোভে।
অকস্মাৎ শুনি বাণী, মাভৈঃ মাভৈঃ
ভেসে আসে এশিয়ার পূর্বপ্রান্ত হতে—
চকিত হইয়া উঠি, চেয়ে দেখি কেটেছে শর্বরী,
থেমেছে প্রবল ঝড়, শান্ত মহাদেশ
নবারুণ আভা জাগে পূর্বদিগঙ্গনে
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ মরুস্থল।
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, ছিন্নভিন্ন তরুশাখা 'পরে
ধরেছে কোরক ক্ষুদ্র বিকচ-উন্মুখ
সমুদ্র-মন্থনশেষে অমৃতের মত।

ঝঞ্ঝাহত তরুশিরে যুগান্তের প্রার্থিত কুসুম
বেদনার্ত ভারতের সুগোপন কামনার ধন
পুণ্যশুভ্র পনেরো আগস্ট।

জাতীয় পতাকা

১৫ই আগস্ট ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা নূতন জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করিবে। পরাধীনতার অভিশাপ—বিদেশী পতাকার পরিবর্তে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক সরকারী ভবনে ও প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে নূতন জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইবে; বহু যুগ ধরিয়া স্বাধীনতার সৈনিকবৃন্দের দুঃখবরণ ও আত্মবিসর্জন সার্থক হইবে।

পৃথিবীতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্রের পতাকা তথা শাসন-কর্তৃত্ব পরিবর্তনের সময় যে বিপ্লব সংঘটিত হয়, তাহার পিছনে থাকে বহু প্রাণহানি ও রক্তপাত। ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে ইংরেজ শাসনের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অবসান ঘটাইয়া আজ ভারতবাসী তাহার নিজস্ব জাতীয় পতাকা বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে, অথচ ইহার জন্য বিশেষ কোন অশান্তি বা রক্তপাত ঘটে নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা এক বিস্ময়কর ঘটনা। জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বহু ভারতবাসী হাসিমুখে নির্যাতনকে বরণ করিয়া লইয়াছে এবং বহু ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে জনসংখ্যার তুলনায় সে কয়জন? স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে, তবু কিরূপেই বা এই সুফল-প্রাপ্তি ঘটিল?

কংগ্রেসের অহিংস সংগ্রাম এবং সত্যাগ্রহ-আন্দোলনই এই শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা-হস্তান্তরকরণের মুখ্য কারণ। মহান কর্মী মহাত্মা গান্ধী অহিংস সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের প্রবর্তন দ্বারা পৃথিবীকে শান্তি-সৃষ্টির নূতন পথ দেখাইয়াছেন, তাঁহার নেতৃত্বের ফলেই আজ বিনা রক্তপাতে একটি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়া ভারতবর্ষ তাহার স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। ইহা আমাদের বিচার্য বিষয় নহে, ভাবীকালে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস রচিত হইবে, তাহাই ইহার সাক্ষ্য দিবে। আজিকার দিনে সাহস এবং ত্যাগ, শান্তি এবং সত্য, বিশ্বাস এবং শক্তির প্রতীক জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করিবার সময় জাতীয় পতাকার প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি স্বাধীনতাপিপাসু সমগ্র জাতি সশ্রদ্ধ নতি জানাইতেছে।

অশোকচক্রবিশিষ্ট যে পতাকা, তাহা এক দিকে যেমন দরিদ্র জনসাধারণের

দুঃখ-দুর্দশা অবসানের প্রতীক, অন্য দিকে সেইরূপ পৃথিবীর অন্যতম সর্বশ্রে মানব মহারাজা অশোক—যিনি নিজেকে প্রজাগণের শাসক না ভাবিয়া প্রজাগণের সেবক ভাবিতেন এবং যিনি যুদ্ধে জয়ী হইয়াও চিরদিনের জন্য যুদ্ধবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অহিংসা ধর্ম অবলম্বন করেন—তাঁহার প্রেম, শান্তি ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক। জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক এই পতাকা বিশ্বের মাঝে শান্তির বার্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়া নূতন যুগের সৃষ্টি করিবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। দেশবরেণ্য পণ্ডিত জওহরলাল এই ঘোষণাই করিয়া বলিয়াছেন, ইহা কোন সাম্রাজ্যবাদী বা পররাজ্যগ্রাসী জাতির পতাকা নয়, ইহা স্বাধীনতার প্রতীক। এই পতাকা যেখানেই যাউক না কেন, সর্বত্রই উহা মুক্তির বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইবে। ভারতবর্ষ প্রত্যেক দেশের মিত্র হইতে অভিলাষী, স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত প্রত্যেক জাতিকে ভারতবর্ষ সাহায্য করিতে উৎসুক—ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা এই বার্তা লইয়াই বিশ্বের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিবে। ইহা কেবলমাত্র মৌখিক স্বীকৃতি নহে। ইহাই ভারতীয় ইউনিয়নের জাতীয় পতাকার প্রাণ-ধর্ম, ইহাই ভারতবর্ষের জীবনবেদ।

জাতীয়-পতাকা-উত্তোলনের আনুষ্ঠানিক উৎসব যেরূপ আমাদের আশার বাণী শুনাইবে, সমগ্র দেশ তথা বিশ্ব ব্যাপিয়া শান্তি ও সাম্যের বাণী প্রচার করিবে, কোটি কোটি জনগণের মধ্যে আনন্দ ও শুভেচ্ছার সঞ্চার করিবে, সেইরূপ ভাবেই ইহা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্যের কথা, গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। পতাকা-উত্তোলন-উৎসব সম্পূর্ণ ও সঠিক হইলেই চলিবে না; আগামী কালে পতাকার সম্মান যাহাতে বজায় থাকে, পতাকার গৌরব যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দায়িত্বপালনের মধ্য দিয়াই এই সম্মান রক্ষিত হইবে, দেশগঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াই ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি করা যাইবে, এবং ঠিক তখনই জগৎসম্মুখে ইহা এক সত্যকারের স্বাধীন ও সুগঠিত দেশের পতাকা হিসাবে সম্মানিত হইবে।

এই দায়িত্ব কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মীর নহে, ইহা সমগ্র দেশবাসীরই দায়িত্ব। যে কেহ এই পতাকা উত্তোলন করিবে, পতাকা অভিবাদন জানাইবে, নীতিগতভাবে সে-ই এই দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য। দীর্ঘকালব্যাপী যে স্বাধীনতা-আন্দোলন সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে সমষ্টিগতভাবে আমরা অংশ গ্রহণ করি নাই, উপযুক্ত সময়ে অসময়ে তাহার

প্রতি কটাক্ষ করিয়াছি। যাহা করিয়াছি, তাহার মধ্যে গৌরববোধ করিবার কিছুই নাই, বরং লজ্জারই যথেষ্ট আছে। আজ এই উৎসবে পূর্বকৃত দোষ স্বীকার করিয়া লইয়া ভবিষ্যৎ দেশগঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে। এই দেশ আমাদের, দেশকে মনোমত গঠন করিবার দায়িত্বও আমাদের, আমাদের জাতীয় পতাকা সত্যকারের জাতীয়তাবাদের, নৈষ্ঠিক দেশপ্রেমের দ্যোতক—এই বোধ নিজ নিজ মনে আনয়ন করিতে হইবে, আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলেই পতাকা উত্তোলনের অধিকার আমাদের জন্মাইবে। ইহার অন্যথায় পতাকা-উত্তোলন-উৎসব প্রাণহীন অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হইবে।

এই শুভবুদ্ধি আমাদের হউক, অন্তরের সহিত ইহা কামনা করিয়া অহিংসা, শান্তি ও শৌর্যের প্রতীক এই জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানাই।

শ্রীঅতুল্য

স্বাধীনতা এবং স্ব-রাজ

গান্ধীজীর কাছে জাতীয় স্বাধীনতা এবং স্ব-রাজ দুই স্বতন্ত্র বস্তু। স্বরাজ বলিতে তিনি সেই অবস্থাকে বোঝেন, যেখানে ব্যক্তি পূর্ণতম স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; জাতির মুক্তি ব্যক্তির পূর্ণতম মুক্তির সহায়ক এবং পরিপোষক। কিন্তু দুইটি এক বস্তু নয়।

ব্যক্তির পূর্ণ মুক্তির অর্থ কিন্তু ইহা নয় যে, সে আর সমাজ বা সংঘের আজ্ঞাধীন থাকিবে না, অপর সকল ব্যক্তির সহিত অসংশ্লিষ্টভাবে জীবনযাপন করিবে। আজিকার জগতে মানুষের জীবন রাষ্ট্র অর্থাৎ দণ্ডশক্তির দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়; কিছু পরিমাণ স্বেচ্ছাধীন নানা সংস্থানের দ্বারা পরিচালিত হয়। গান্ধীজীর কল্পনায় যে আদর্শ সমাজ গড়িয়া উঠিবে, সেখানে সমাজের সকল কর্ম স্বেচ্ছাধীন বহু সংস্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, মানুষ সানন্দে নিজের হাতে গড়া সংস্থানের আজ্ঞাধীন হইয়া চলিবে। হয়তো জগৎ ঠিক এই কল্পিত অবস্থায় কোনও দিন পৌঁছিবে না, দণ্ডশক্তির প্রয়োজন বহুকাল ধরিয়া থাকিয়াই যাইবে। তবু গান্ধীজী মনে করেন, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি না করিয়া স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব বাড়ানোই আমাদের প্রয়োজন। সেই পথেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পূর্ণতম বিকাশলাভের সুযোগ পায়।

জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইল, এতদিন বিদেশী স্বার্থ এবং দণ্ডশক্তির যে গুরুভার আমাদের উপরে চাপিয়া ছিল, তাহা অপসারিত হইয়াছে। অর্থাৎ

বিদেশী স্বার্থপোষণকারী রাষ্ট্রের পরিবর্তে স্বদেশী রাষ্ট্র গঠিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু স্বদেশী রাষ্ট্র এবং স্ব-রাজ এক নয়। স্বরাজসাধনার জন্য গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে মানুষকে আর্থিক ও সামাজিক সমতার আদর্শ লইয়া নূতন সমাজ-বন্ধন রচনা করিতে হইবে। গান্ধীজীর আঠারো-দফা গঠনকর্মের সহায়তায় কংগ্রেসকর্মীগণ ভালমন্দের ভিতর দিয়া এতদিন সেই চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বারংবার ইংরেজের দণ্ডশক্তি সেই চেষ্টাকে পরাস্ত করিয়াছে। আজ জাতীয় স্বাধীনতালাভের ফলে সেই বিপুল বাধা অপসারিত হইল। ইহা কম লাভের কথা নয়। এবার যদি আমরা গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে নূতন সংগঠন করিয়া মানুষের আর্থিক ও সামাজিক জীবনকে স্বেচ্ছায়ত্ত করিতে পারি, তবেই স্ব-রাজের ভিত্তি দৃঢ়স্থাপিত হইবে।

১৫ই আগস্ট আমাদের স্বরাজ-সাধনার সংকল্প এবং নূতন উদ্যমের শুভারম্ভের দিবস হউক।

শ্রীনির্মলকুমার

৯ই আগষ্ট স্মরণে

বিধাতার কঠিন অভিশাপ ভারতের কণ্ঠদেশে যেদিন পরাধীনতার দুশ্ছেদ্য নাগপাশ জড়িয়ে দিয়েছিল, প্রায় দু শতাব্দী ধ'রে তিলে তিলে যা শোষণ করেছিল আমাদের জীবনীশক্তি, গ্রাস করেছিল আমাদের পূর্বতন ঐশ্বর্য ও তপস্যাফল, আমাদের সাময়িক মোহবশে অজ্ঞানতার অন্ধকারে আমরা ডুবে ছিলাম, তামসিক জড়তা আচ্ছন্ন করেছিল আমাদের—আমাদের সেই আত্ম-বিস্মৃতি ও আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে সেদিন নিরীহ বাণিজ্যের আপাতক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে প্রবেশ করেছিল যে শনি

বিনষ্ট করেছিল আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি একতা

ধ্বংস করেছিল আমাদের কৃষি ও কুটির-শিল্প

শোষণ করেছিল আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ

দুর্ভিক্ষে মহামারীতে ছারখার করেছিল এ সমৃদ্ধ দেশ

দৈন্যে কুশিক্ষায় নিপীড়নে নিষ্পেষণে দেশের সবল সরল মানুষকে ক'রে তুলেছিল পশুর অধম

দেহকে করেছিল দুর্বল, আত্মাকে করেছিল কলুষিত

গজভুক্ত কপিত্থবৎ নিঃশেষ ক'রে এনেছিল এই সোনার ভারতকে

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সেই শনিকে তাড়াবার প্রথম চেষ্টা করেছিল ভারতের ক্ষাত্রশক্তি, কিন্তু সফল হয় নি

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের নবজাগ্রত চৈতন্য অথবা মস্তিষ্ক-শক্তি তার বিরুদ্ধে জানিয়েছিল বাচনিক প্রতিবাদ

তারপর বৎসরে বৎসরে এই প্রতিবাদ প্রবলতর হতে হতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে সাংঘাতিক ভাবে জাগ্রত করেছিল দেশের বিপ্লবী শক্তিকে ; কিন্তু সে শক্তিও পরাস্ত হয়েছিল পরের ও নিজেদের বিবিধ ষড়যন্ত্রে

বরাবরই প্রতিবাদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল উচ্চতর স্তরের মধ্যে, তন্দ্রাহত মহাভারতের প্রাণশক্তি এতটুকু বিচলিত হয় নি।

এল ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ, এলেন মহাত্মা গান্ধী, আহ্বান করলেন সকলকে, শহরের সভ্যতাভিমানী ভদ্রলোককে এবং সভ্যতা-অজ্ঞানী গ্রামের কিষাণকে

প্রচার করলেন খদ্দরের মহামন্ত্র, পুনঃপ্রবর্তন করলেন স্বাধীন চিন্তার প্রতীক চরখার, পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহপাশ থেকে মুক্তির মন্ত্র শোনালেন চরখার ঘর্ঘরে

জেগে উঠল ভারতবর্ষ, আসল সত্যকার ভারতবর্ষ—ঝাঁপিয়ে পড়ল সংগ্রামে

কিন্তু সে বিক্ষিপ্ত সংগ্রামও জয়যুক্ত হ'ল না, কারণ, প্রস্তুত হয় নি জনতা

১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩৩—খণ্ড খণ্ড ভাবে নিপীড়ন ও নিগ্রহের ভেতর দিয়ে প্রস্তুত হতে থাকল স্বাধীনতার সৈনিকেরা—মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে, নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে, গুজরাটে ও বাংলায়, বিহারে ও উড়িষ্যায়, মধ্যপ্রদেশে এবং মাদ্রাজে

শনির কবল থেকে তবুও মুক্তি পেল না ভারত, কূট-চক্রান্ত বিস্তার ক'রে গৃহ-দ্বন্দ্বের সর্বনাশা বিষবীজ সে বপন ক'রে যেতে লাগল। মনে হ'ল, আমরা পৌছতে পারব না স্বাধীনতার সিংহদ্বারে, শনির কুটিল শাসন থেকে কখনও মুক্তি পাবে না এই হতভাগ্য দেশ। দ্বিতীয় জাগতিক মহাযুদ্ধের নিরর্থক অজুহাতে ভারত-রক্ষা-আইনের কঠিন শৃঙ্খলে মুক্তিকামীকে আবার হ'ল আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

ভারতবর্ষের জাগ্রত আত্মা মহাত্মা গান্ধী পরাধীনতার দুরপনেয় কলঙ্ক থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্যে শেষ পাশুপত অস্ত্রটি প্রয়োগ করলেন। এই অস্ত্রের কথা তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রথম উল্লেখ করেছিলেন, কাশীবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী বক্তৃতায়। তিনি সেদিন ঘোষণা করেছিলেন, "ভারতবর্ষের মুক্তির জন্যে যদি প্রয়োজন বোধ করি, ইংরেজদের এখান থেকে বিদায় নেওয়া দরকার অথবা তাদের তাড়িয়ে দিতেই হবে, আমি

সে কথা ঘোষণা করতে দ্বিধা করব না এবং আমি আশা করি, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আমি মরতে পর্যন্ত প্রস্তুত থাকব।"

ছাব্বিশ বছর পরে সেই দিন এল। মহাত্মা গান্ধী দ্বিধা করলেন না। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মে তারিখের 'হরিজনে' তিনি ঘোষণা করলেন, ইংরেজের এবার যেতেই হবে—

"Even at the risk of being called mad, I had to tell the truth (i.e., about the imperative need for the withdrawal of British power from India) if I was to be true to myself, I regard it as my solid contribution to the War and to India's deliverance from the peril that is and the peril that is threatening...In this struggle every risk has to be run in order to cure ourselves of the biggest disease—a disease which has sapped our manhood and almost made us feel as if we must for ever be slaves. It is an insufferable thing. The cost of the cure, I know, will be heavy. No price is too heavy to pay for the deliverance."

১৪ই জুলাই ১৯৪২—এক সপ্তাহ ধ'রে গভীরভাবে আলোচনা করবার পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি "ভারত ছাড়" প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। ওই দিন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গান্ধীজী "Do or Die"—"করিব অথবা মরিব" মন্ত্রের আভাষ দিলেন।

ওদিকে বঙ্গগৌরব সুভাষচন্দ্র ভারতমাতার স্নেহাশ্রয়-চ্যুত হয়ে এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে তাঁর বিপ্লবী ও সংগঠনী শক্তি-প্রভাবে সমস্ত প্রবাসী ভারতবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে গান্ধীজীর "করিব অথবা মরিব" মন্ত্রকে পূর্ণ রূপ দান করবার চেষ্টা করলেন। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সেই মহতী চেষ্টাও নিষ্ফল হয়েছিল।

তারপর এল শুভ ৮ই আগস্ট, কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন বসল বোম্বাইয়ের গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে অবস্থিত চমৎকারভাবে সজ্জিত প্রশস্ত সৌধে। বেলা ২টো ৪৫ মিনিটের সময় আরম্ভ হ'ল সভা।

সেই চিরস্মরণীয় গম্ভীর সভাটি আজ পুরো পাঁচ বছর পরে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি। নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটির আড়াই শো সভ্য বসেছেন পাশাপাশি, শুভ্র খদ্দরে তাঁদের দেহ আবৃত, মাথায় গান্ধীটুপি—উৎসাহ ও উত্তেজনায় তাঁদের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত, মৃদু গুঞ্জন উঠেছে তাঁদের মধ্যে। সমস্ত সভাস্থল জুড়ে ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকার তলে তলে দশ হাজার দর্শক বিস্ময়-স্তব্ধ, উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাঁরা প্রতীক্ষা করছেন। ঠিক তিনটের সময় গান্ধীজী

প্রবেশ করতেই তুমুল জয়ধ্বনি উঠল—মহাত্মা গান্ধীকি জয়, বন্দে মাতরম্। শীর্ণদেহ পুরুষ শান্ত পদক্ষেপে মঞ্চে আরোহণ করলেন, একবার প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে শান্ত হতে বললেন সভাকে। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র শান্ত হ'ল। মঞ্চের ওপর অপেক্ষা করছিলেন সৌম্যদর্শন আজাদ, চিন্তাকুল জহওরলাল, কর্মগৌরবদৃপ্ত প্যাটেল, কৌতুকদীপ্ত সরোজিনী, আরও সবাই ছিলেন, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ যাঁরা রচনা করছেন। সবাই সম্ভ্রমভরে উঠে দাঁড়ালেন।

শুনতে পাচ্ছি, সমবেতকণ্ঠে বন্দেমাতরম্ গান, আশা ও উদ্দীপনায় সমস্ত সভা যেন রোমাঞ্চিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। আজকে মাকে বন্দনা করা সার্থক এই তপস্বীদের, সন্তানরা যুদ্ধযাত্রা করবেন, যেন মায়ের আশীর্বাদের জন্যে তাঁরা দাঁড়িয়েছেন। নিশ্চয়ই মা আশীর্বাদ করলেন। কৃতার্থ হয়ে উপবেশন করলেন সবাই।

উঠলেন সভাপতি আবুল কালাম আজাদ। শুনতে পাচ্ছি, তিনি বলছেন—

"আর প্রতিশ্রুতি মাত্র নয়, আমরা অবিলম্বে ভারতীয় স্বাধীনতার ঘোষণা চাই, আমরা তখনই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছে সর্ববিধ সাহায্যের চুক্তি নিয়ে এগিয়ে আসতে পারব। ভারতীয়দের হাতে রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি সম্পূর্ণ প্রত্যর্পণ করা ছাড়া "ভারত ছাড়" বুলির অন্য কোনও অর্থ নেই। নব সম্ভাবনার মুহূর্ত (Zero hour) দ্রুত এগিয়ে আসছে, সুতরাং ব্রিটিশ ও তাঁদের সহযোগী রাষ্ট্রদের কাছে কংগ্রেস এই শেষবারের জন্যে আবেদন জানাচ্ছেন। এঁরা যদি অন্ধ ও বধির না হয়ে গিয়ে থাকেন, তা হ'লে এই আবেদনকে উপেক্ষা করবেন না।"

দেখতে পাচ্ছি, চিন্তাক্লিষ্ট জহওরলাল উঠছেন প্রস্তাবের খসড়াটি বাঁ হাতে নিয়ে সভার সামনে সেটি উপস্থাপিত করবার জন্যে। ভূমিকাস্বরূপ তিনি বলছেন—

"আমরা আজ এমন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছি, যা গৃহীত হ'লে আমাদের আর ফেরবার পথ নেই। কংগ্রেস আজ বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ঝাঁপ দিচ্ছে, ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে হয় আজ সে উঠবে, নয় তলিয়ে যাবে। কংগ্রেসের এটা হবে জীবন-মরণ সংগ্রাম। আমরা স্বাধীনতার জন্যে বেঁচে আছি, স্বাধীনতার জন্যে মরতেও পারব।"

সর্দার প্যাটেল তখন উঠলেন প্রস্তাব সমর্থন করতে। ধীর গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলছেন, শুনতে পাচ্ছি—

ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলছেন, কিন্তু তাঁদের এই উক্তির মধ্যে কোনও আন্তরিকতা নেই। বেতারে এবং সংবাদপত্রে তাঁরা প্রচার করছেন, বার্মাতে জাপানীরা যে গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেছে তা পুতুল গবর্মেণ্ট ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, দিল্লীতে এখন কোন্ গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত ?"

"ভারত ছাড়" প্রস্তাব বিপুল উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনার মধ্যে গৃহীত হয়ে গেল। আশীর্বাদ করতে উঠলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি বললেন, "আমি আজ আপনাদের একটি মন্ত্র—একটি ছোট মন্ত্র দান করব। আপনাদের অন্তরে এই মন্ত্র আপনারা সাদরে ধারণ করুন এবং নিশ্বাসে ও প্রশ্বাসে জপ করুন। মন্ত্রটি এই—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। আমরা হয় ভারতবর্ষকে স্বাধীন করব, নয় মৃত্যু বরণ করব। আমরা বেঁচে থেকে এই দাসত্বের বিস্তার আর দেখতে চাই না।"

রাত দশটায় শেষ হ'ল এই ঐতিহাসিক সভা। মহাত্মা গান্ধী সদলবলে ফিরে গেলেন বিড়লা-ভবনে।

৯ই আগস্ট রাত্রি প্রভাত হ'ল। ভোর চারটেয় মহাত্মা গান্ধী উষা-প্রার্থনার পর শুনলেন, তাঁকে, মহাদেব দেশাইকে আর মীরা বেনকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে বোম্বাইয়ের পুলিস-কমিশনার স্বয়ং তিনটি গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। ভোর পাঁচটায় তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস-কার্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্যেরা নিজ নিজ বাসস্থানে ধৃত হলেন। সমস্ত দেশ জুড়ে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষে আগস্ট বিপ্লবের আগুন জ্ব'লে উঠল।

জ্ব'লে উঠল বাংলার মেদিনীপুর, বালুরঘাট, বোম্বাইয়ের সাতারা, উড়িষ্যার কোরাপুর, আসামের গোয়ালপাড়া ও দরং, মধ্যপ্রদেশের অস্তি ও চিমুর, সমগ্র বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশের বিশেষ ক'রে বালিয়া জেলা এবং বিহারের বিশেষ ক'রে পূর্ণিয়া জেলা।

প্রায় পঁচিশ হাজার ভারতবাসী এই মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি দিলে, রাজকীয় শক্তির হাতে ধৃত হ'ল ষাট হাজার লোক, ভারতরক্ষা আইনের কবলে বন্দী হ'ল আঠারো হাজার বিপ্লবী, সরকারী হিসাবে হত হ'ল হাজার এবং আহত হ'ল ষোল শো বীর দেশকর্মী।

জওহরলাল কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে বললেন—

"১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে যা ঘটেছে তার জন্য আমি গর্বিত। যদি ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের

"আমারদিগের সহস্র লোকের মধ্যে এক জন ইংরাজী জানেন তিনিও সাধারণ কর্ম্মোপযুক্ত কতকগুলিন কথামাত্র জানেন আদালতের কথার শব্দমাত্র শ্রুত আছেন। আমারদিগের পারস্য ভাষা লিখিবার এবং ইহাতে পারদর্শী হইবার অনেক উপায় আছে যেহেতুক প্রায় প্রতি গ্রামে ধনবান ও ভদ্র গৃহস্থ লোকের বাটীতে আখন আছে তাহারদিগের নিকটে অনায়াসে শিক্ষা হইতে পারে দ্বিতীয় ক্রোশ দুই ক্রোশের অন্তরে প্রায় সকল স্থানেই এ দেশের মধ্যে মোসলমান লোক বাস করিয়া আছে তাহারদিগের স্থানে অল্প ব্যয়ে অথবা বিনা ব্যয়ে অধ্যয়ন হইতে পারে কিন্তু ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করাতে অধিক ব্যয় অপেক্ষা করে এবং কলিকাতা ব্যতিরিক্ত প্রায় সর্ব্বত্র অধ্যয়ন হইতে পারে না এবং যদ্যপিস্যাৎ আমারদিগের মধ্যে কেহ ভালরূপে ইংরাজী শিক্ষিতে পারেন তথাপি বিলাতীয় উকিল কৌন্সলির ন্যায় আদালতের কাগজ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইতে পারিবেন না ··· ··· কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা পারসিতে জবানবন্দি ও রুবকারি ও আর২ কাগজ পত্রাদি অনায়াসে উত্তম রূপে লিখিয়া আদালতের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছি অতএব পারস্য ভাষা রহিত হইয়া ইংরাজী ভাষা প্রচলিত হওয়াতে অনেক প্রকারে উৎপাত হইবেক এবং কর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মিবেক ও কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা ভার হইবেক অতএব সুযোগ কিছুই দেখা যায় না··· ।" (পৃ. ৪৩-৪৫)

'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা'র অনুষ্ঠানপত্র এবং প্রবন্ধ দুইটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, উহা রক্ষণশীল মতেরই পোষকতা করিত।

'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা'র সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা" প্রবন্ধে ('বিশ্বভারতী পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র ১৩৫০) কিঞ্চিৎ অসতর্কতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "একই বৎসর এই পত্রিকা ও ঐ একই মাসে রামমোহনের স্কুলের ছাত্রগণের একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সভা স্থাপন হইতে মনে হয় যে উভয়ের যোগ আছে।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা'র প্রকাশকাল—১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস। কিন্তু রামমোহনের স্কুলের ছাত্র-সভা স্থাপিত হয় উহার এক বৎসরেরও কিছু দিন পরে—প্রভাতবাবু নিজেই বলিয়াছেন, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে। তাহা হইলে "একই বৎসর এই পত্রিকা ও ঐ একই মাসে···প্রতিষ্ঠিত সভা" কথাগুলি প্রভাতবাবু লিখিলেন কেমন করিয়া?

অত্যাচারে দেশের লোক ভয় পেয়ে শান্ত হ'ত, তা হ'লে আমি অনুশোচনা করতাম। কাপুরুষতার বশবর্তী হয়ে ভারতবাসীরা যে কয়েক যুগের সাধনাকে নিষ্ফল করে দেয় নি এইটেই ১৯৪২-এর বড় কথা।"

সেই ৯ই আগস্টের বিপুল বলিদান সার্থকতা লাভ করতে চলেছে আগামী ১৫ই আগস্টে। আজ তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ৯ই আগস্টকে, আর স্মরণ করছি ভারতের সেই সব বীর স্ত্রী-পুরুষকে, যাঁরা নিজেদের পঞ্জরাস্থি দিয়ে এই ভারতভূমি থেকে শনিবিতাড়নে সহায় হয়েছেন। বন্দে মাতরম্।

পতাকা

পতাকা বহন কর হে বীরের দল,
হও উজ্জ্বল সবে হও নির্মল।

সবুজ দিয়েছে সুর জীবন-গানের
সবুজে স্বপ্ন জাগে সজীব প্রাণের,
বাঁচিবার মত বাঁচা কি সম্মানের
চক্র ডাকিয়া বলে—চল্, চল্, চল্।
হে বীরের দল।

শুভ্রে সমন্বয় শুভ্রে আলো
শুভ্রে ঘুচিয়া গেছে সকল কালো
আলোক জ্বালো, ওগো, আলোক জ্বালো,
চক্র ডাকিয়া বলে—চল, চল্, চল্।
হে বীরের দল।

গৈরিকে ভারতের পরম বাণী—
যা আছে পরের তরে দাও গো আনি,
আনন্দ লাভ কর, হে সন্ধানি,
চক্র ডাকিয়া বলে—চল্, চল্, চল্।
হে বীরের দল।

"বনফুল"

নতুন দিনের গান

[শ্রীগোপালদা বিরচিত অপ্রকাশিত ও বিভিন্ন সাময়িকপত্রে সদ্য-প্রকাশিত কয়েকটি নতুন গান এখানে একত্র মুদ্রিত হইল। কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘের শ্রীযুক্ত সুকৃতি [সেন] এগুলিতে সুর সংযোজনা করিয়াছেন। একটি গান আষাঢ়ের "সংবাদ-সাহিত্য" বিভাগেও প্রকাশিত হইয়াছে।]

(১)

চক্রচিহ্ন-শোভী ত্রিবর্ণ পতাকা ধন্য ভারতে আজ,
নিবীর্যেরে নির্ভয় করি শঙ্কাহরণ ডঙ্কা বাজ্।
শৃঙ্খলহীন এল সুদিন
শোধ হবে মহাজাতির ঋণ,
বহু শহীদের বহু বলিদানে আসনে টলিল ব্রিটিশরাজ।
শুধু ভাঙনের সাধনা করেছি সকলে করেছি মৃত্যুপণ,
গড়িবার কাল এসেছে, এবার নবজীবনের অন্বেষণ।
শঙ্কাহরণ ডঙ্কা বাজ্
চেতন লভুক মৃত সমাজ,
ভাই ভাই মিলে ঘুচাই সকলে ভারতমাতার দৈন্য-লাজ॥

(২)

নতুন হাওয়া লাগল পালে হাওয়ায় ভাসে নতুন সুর,
দিল্লী চলো, দিল্লী চলো, দিল্লী নহে অনেক দূর।
পথের বাধা নেইকো আর,
নাই রহিল নিশানদার,
লাখো নিশান উড়ছে হের, করছে আলো মিনার-চূড়।
উঠল ধ্বনি "ভারত ছাড়" পাঁচটি বছর আগে,
আসমুদ্র ভারতভূমি তন্দ্রা হতে জাগে।
আজকে এল পরম ক্ষণ,
মিলবে সবার কাম্য ধন,
স্বাধীনতার গানে সবার অধীর চিত্ত পরিপূর॥

(৩)

ভারতজোড়া ছিলাম মোরা সবাই হরিজন,
মন্দিরে মার আজকে প্রথম পেলাম নিমন্ত্রণ।

স্বাধীনতার বেদীতলে
বসব মোরা কুতূহলে
পরমধনে হলাম ধনী, নই তো অকিঞ্চন।
আজকে কারো 'পরে মোদের নেইকো অভিমান,
ভারতভূমির লক্ষ্য—শুধু ধরারই কল্যাণ।
মার খেয়েছি যাদের হাতে
মিটল বিবাদ তাদের সাথে,
মৈত্রী-প্রীতির মাঝেই হবে সফল আয়োজন॥

(৪)

আজিকে যাত্রা হ'ল নির্ভয়,
সম্মুখে পথ উৎসবময়।
জাগ্রত জনগণ রয় আর কতখন
সাম্রাজ্যের দৃঢ়বন্ধন ?
তিমির রাত্রিশেষে এনু আলোকের দেশে
আজ চিরমুক্তির গাই জয়।
(পনেরো আগস্টের গাই জয়।)
মুখে মুখে জয়হিন্দ্ মন্ত্র
বিফল করেছে ষড়যন্ত্র।
জাগে ভারতের প্রাণ আনিল পরিত্রাণ
মৃত্যুঞ্জয়ী মার সন্তান,
সত্য সাধনা যার ভয় কিছু নাহি তার
শিখা অধোমুখী কভু নাহি হয়॥

(৫)

মুক্তি-পথিক ক্লান্তি ভোল, শান্ত হ'ল রণ,
রাতের শেষে ঘুমের দেশে আলোর জাগরণ।
অধীনতার পঙ্ক হতে ভাসছি বিমল জলস্রোতে
সব-পেয়েছির তটে এবার সফল উত্তরণ।

তোমরা সবাই জয়ধ্বনি করো
উচ্চে তোল মাভৈঃ শঙ্খনাদ,
পড়ল যারা তাদের তুলে ধরো
পিছেই ফেলে চল বিসম্বাদ।

স্বাধীনতার তোরণ হলাম পার
ভেঙে পুরাতনের কারাগার—
পুণ্যপ্রাতে লও দু হাতে নিশান তিনবরণ ॥

(৬)

ছিঁড়িল বন্ধন, টুটিল শৃঙ্খল,
নূতন এ প্রভাতে কে তোরা যাবি চল্।
পতাকা তিনরঙা সবলে হাতে ধর্,
ফেলে দে মন হতে সকল ভয়-ডর।
মুক্তি অভিযান, মায়ের জয়গান,
কণ্ঠে গেয়ে যাই সকলে অচপল।

এখনও বহু বাধা হইতে হবে পার,
আত্মকলহের বিষম পারাবার।

গড়িব সবে মিলি ভুলিয়া মত-পথ,
পুরানো ভিত্তিতে নূতন ইমারত।
এখনও বহু প্রাণ চাই যে বলিদান,
রাখিতে মা'র মান স্বাগত বীরদল ॥

(৭)

মহা-ভারতের মুক্তিতীর্থপথে
চলেছিলে যারা দুই শতাব্দী ধরি,
পিষ্ট হয়েছ দুঃশাসনের রথে,
অথবা বেঁচেছ ফাঁসির মঞ্চে মরি।
অঙ্গে মাখিয়া সকলের অপমান
যাহারা গেয়েছ মাতৃমুক্তি-গান,

তিমির রাত্রি নাহিক যাত্রী,
তোমরা জেগেছ আশাহীন শর্বরী।

মরা দেশে যারা এনেছ ঝড়ের দোল,
হাঁকিয়া বলেছ, "ওরে ভয় নাই, কারার দুয়ার খোল্।"

পাষাণ-প্রাচীর সহসা ভাঙিল কবে
মাতে মহাদেশ মুক্তি-মহোৎসবে
শহীদ-স্মরণ ভোলে জনগণ—
সকলের হয়ে তোমাদেরে নতি করি॥

তারাশঙ্কর

তারাশঙ্করের পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সুবৃহৎ ডায়রি আছে। বীরভূম জেলার লাভপুরে নিতান্ত গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করিয়াও তিনি তাঁহার দেশ ও কালকে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তুলিয়াছিলেন ফোটোগ্রাফ।

পুত্র তারাশঙ্কর দেশ ও কালকে ধরিয়া রাখিবার জন্য ছবি আঁকিতেছেন। পিতার তোলা ফোটোগ্রাফগুলি তিনি এখনও মাঝে মাঝে দেখেন এবং পরিপ্রেক্ষিত ঠিক করিয়া লন। এইখানেই পিতা-পুত্রের যোগ।

মাতা প্রভাবতী প্রবাসী বাঙালীর সন্তান, পাটনায় শহরে মেয়ে, স্বভাবতই উদারদৃষ্টিসম্পন্ন। তারাশঙ্করের রচনায় গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্ব আছে, ক্ষুদ্র গণ্ডি ও বৃহত্তর পরিধির দ্বন্দ্ব।

তারাশঙ্করের ক্রমবর্ধমান গল্প ও উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁহার জীবনের অন্তরঙ্গ ইতিহাস ওতপ্রোত হইয়া আছে, সেই ইতিহাস চলমান, তিনি এখনও ফুরাইয়া যান নাই। দেশের কবি-সমালোচক-সম্প্রদায় এই অন্তরঙ্গ জীবনী-রচনায় তৎপর হইতেছেন। এই জীবনী রচিত হইলে দেখা যাইবে যে, এই শিল্পী মানুষটির জীবন বিচিত্র। পুরাতন ও নূতন, অতীত ও ভবিষ্যৎ, বনেদী জমিদার ও সাম্যবাদী বিপ্লবী, গ্রাম ও নগর, সংস্কার ও সংস্কারমুক্তির সমবায়ে তারাশঙ্কর একটি অতিশয় জটিল গ্রন্থি। এই গ্রন্থি উন্মোচন করিতে তিনিই পারিবেন, যিনি কারাগারের 'পাষাণপুরী' হইতে নিষ্ঠার সঙ্গে 'হাঁসুলী বাঁক' পর্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিবেন, এবং বক বাবাজীর আখড়ায়, রায়-বাড়ির জলসাঘরে,

কলিকাতার চা-খানায় অথবা সীতারামের পাঠশালায় যিনি আটক পড়িবেন না। তারাশঙ্কর শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে লইয়া কোথায় পৌছাইয়া দিবেন বলিতে পারি না। তাঁহার নিত্যনব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা বাঁধা পথে চলিতেছে না, এইটুকুই আমরা বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিতেছি।

তাঁহার বহিরঙ্গ-জীবনের স্থায়ী কাহিনী খুব দীর্ঘ নয়। সাহস করিয়া সেটুকু আমরা এখনই লিপিবদ্ধ করিতে পারি। ভবিষ্যৎ জীবনীকারের তাহা সহায় হইবে।

১৩০৫ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ (ইংরেজী ১৮৯৮; ২৩ জুলাই) শনিবার লাভপুরে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশবেই (১৩১৩ আশ্বিন মাসে নবমী পূজার দিন) তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। দুই বিধবা নারী—মা ও পিসীমার স্নেহের দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনি মানুষ হন। 'ধাত্রী দেবতা'র শিবনাথের কাহিনীতে এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস আছে। এই দুই বৃদ্ধা এখনও জীবিত।

লাভপুরের উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষার পত্তন হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই.এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু কলেজের শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হইতে না হইতে রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে স্বাধীন মতামতের জন্য সে যুগের অত্যুৎসাহী পুলিসের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয় এবং তিনি গৃহেই নজরবন্দী হইয়া থাকেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন এই বন্ধন শিথিল হয়, তখন তিনি পীড়িত দেহ লইয়া আর একবার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পথে চলিবার চেষ্টা করেন। কলিকাতার সাউথ সুবার্বান কলেজে (বর্তমানে আশুতোষ কলেজ) ভর্তি হইয়া কয়েক মাসের মধ্যেই শারীরিক কারণে তাঁহার গতানুগতিক শিক্ষা রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং তিনি ১৯১৯ সালে কয়লা-ব্যবসায়ী আত্মীয়কুলের আওতায় কয়লার ব্যবসায় শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।

সে শিক্ষাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জনের সুযোগ পান নাই। মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ-আন্দোলনের ঢেউ সেখানেও তাঁহাকে স্থানচ্যুত করে এবং তিনি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসে যোগদান করিয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। কিন্তু কবি-শিল্পীর মনে কর্মীর উৎসাহ স্বভাবতই দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয় না, ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে আমরা তাঁহাকে ওলাউঠা-মহামারী-আক্রান্ত

বীরভূমের উৎসাহী জনসেবক হিসাবে দেখিতে পাই। 'পথের ডাক' নাটকে এই সময়ের কিছু ছবি আছে।

যে সৃষ্টিপ্রতিভা তাঁহার মধ্যে নীহারিকা অবস্থায় ছিল, এই সময়ে তাহা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। সমাজসেবার অবকাশকাল তিনি সকল সাহিত্যিকের প্রথম-উপজীব্য কবিতা-রচনার দ্বারা বিনোদন করিতে থাকেন। তাঁহার এই যুগের কৌতুককর কাব্যসাধনা 'ত্রিপত্র' নামক অধুনা-সম্পূর্ণ-দুষ্প্রাপ্য একটি কাব্যপুস্তিকায় বিধৃত হইয়া আছে, তাহার মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলে আরও ঠিক বলা হইবে।

ওলাউঠা-মহামারীর মত তারাশঙ্করের জাতের মানুষের সমাজসেবার উৎসাহও স্তিমিত হইয়া আসে, মন বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতে চায়। বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। পড়াশুনার ধারা ধরিয়া চলা আর সম্ভব নয়। সুতরাং চাকুরি খুঁজিতে হয়। করিবার মধ্যে নাড়াচাড়া করিয়াছেন কয়লা লইয়া। জমিদারিও বেশ বোঝেন, কিন্তু জমিদারি করিতে হইলে গ্রামের গণ্ডির মধ্যেই বদ্ধ থাকিতে হয়। সে অসহ্য। সুতরাং স্বল্পপরিচিত কয়লাকে ভেলা করিয়াই তারাশঙ্কর এবার ভাসিলেন, উপস্থিত হইলেন কানপুরে। মাত্র ছয় মাস চাকুরি করিলেন বটে, কিন্তু জীবনে নূতন সুর লাগিল, উচ্ছৃঙ্খলতার সুর, বাঁধন-ছেঁড়ার শিকল-ভাঙার সুর বলিলে কাব্য করিয়া বলা হয়। ফলে তাঁহার জীবনে—বহু-স্নেহলালিত জীবনে দুঃখ আসিল, মাটির পুতুল তারাশঙ্কর পোড় খাইয়া পাথর হইতে লাগিলেন। বিবাহিত জীবন আরম্ভ হইয়াছিল অনেক পূর্বে—১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে স্বগ্রামে শ্রীমতী উমা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এইবারে সত্যকার সাংসারিক জীবন আরম্ভ হইল। তারাশঙ্কর—পরাজিত নিষ্ফল তারাশঙ্কর কানপুর হইতে লাভপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

পল্লীগ্রামের উত্তমবিত্ত ও মধ্যমবিত্ত বেকার সমাজে সেদিনও পর্যন্ত নাটকাভিনয়ই একমাত্র সাংস্কৃতিক অবলম্বন ছিল। গ্রামের স্তিমিত জীবনধারা দৈনন্দিন মহড়া ও পর্বকালীন অভিনয়ে সাময়িকভাবে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিত, আবর্তের সৃষ্টি করিত। বেকার তারাশঙ্কর সেই আবর্তে পড়িলেন। কাব্য-লক্ষ্মীর পূর্বতন পরিহাসে নাট্যলক্ষ্মী দমিলেন না। ঘূর্ণমান সৃজনী-নীহারিকা এবার নাটকে রূপপরিগ্রহ করিল। তারাশঙ্কর 'মারহাটা-তর্পণ' নাটক রচনা

করিলেন। আদর্শ ছিল ঘরেই, লাভপুরের নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, কুড়মিঠার হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। নির্মলশিববাবু তখন 'রাতকানা'র খ্যাতিতে ভাস্বর;

ফোটো আমিনুর রসিদ চৌধুরী (শ্রীহট্ট)

কলিকাতার অপরেশ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত তাঁহার রশ্মি ধাবিত হইয়াছে। তিনিই হইলেন পৃষ্ঠপোষক। 'মারহাটা-তর্পণ' গ্রামে মহাসমারোহে অভিনীত হইল। তাহার পর বৃহত্তর খ্যাতির অন্বেষণে নাটকের পাণ্ডুলিপি নির্মলশিব-মারফৎ অপরেশ-সমুদ্র পর্যন্ত প্রধাবিত হইয়া হারাইয়া গেল। সে নাটকের এইখানেই যবনিকা।

উপন্যাসেরও সূত্রপাত এই সময়ে। "দীনার দান" নামক ছোট উপন্যাসখানি রচিত হইয়া নির্মলশিববাবুরই সহায়তায় সাপ্তাহিক 'শিশির' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'দীনার দান' তখন-পর্যন্ত-দীন-তারাশঙ্করের দান বলিয়া যথাযোগ্য মর্যাদায় গৃহীত হয় না। কালের কুটিল প্রবাহে তাহাও হারাইয়া যায়।

গ্রামের সমাজ-জীবনে তারাশঙ্কর তখন প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতেছেন। বেকার জমিদার যে ভাবে গ্রামোন্নয়নে ব্রতী হয় ঠিক সে ভাবে নয়, একটু ঘনিষ্ঠ-ভাবে—হাতে-কলমে তিনি কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ সম্মুখে, মনেও সৃষ্টির আগুন! ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—তিন বৎসর কাল তিনি গ্রামের কাজে জড়াইয়া পড়িয়াছেন, ম্যালেরিয়া-নিবারণী-বাহিনীর কর্তৃত্ব করিতেছেন, গ্রাম-পঞ্চায়েতের (ইউনিয়ন বোর্ড) মোড়লিও (প্রেসিডেণ্ট) দুই বৎসর করিয়াছেন।

কিন্তু এই আধা-সরকারী জোয়ালে যুক্ত থাকা স্বভাববিদ্রোহী তারাশঙ্করের পক্ষে বেশিদিন সম্ভব নয়। অসহযোগ-আন্দোলনের তৃতীয় ঢেউ আসিতেই ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তারাশঙ্কর জোয়াল ছিঁড়িলেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের এই অনাচার স্থানীয় পুলিস-বিভাগের সহ্য হইল না, তারাশঙ্কর ধৃত ও কারারুদ্ধ হইলেন। একেবারে সিউড়ির জেলখানায়। সেখানে মাত্র চার মাসের বসতি তাঁহার জীবনের ধারা সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া দিল। কবি ও শিল্পী তারাশঙ্কর উদ্দেশ্যহীনভাবে লক্ষ্যহীন পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা যেন পথের সন্ধান পাইলেন। এখনকার পূর্বের সমস্ত অতীত জীবন তাঁহার ভিত্তিনিম্নে আমূল প্রোথিত হইয়া গেল, শুরু হইল নূতন প্রাসাদ-গঠন। বাংলা সাহিত্য জয়যুক্ত হইল।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে যাঁহারা তাঁহার সহবাসী ছিলেন, তাঁহাদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই, ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। কারা হইতে

নিষ্কৃতি লাভের দিন ইঁহারা তারাশঙ্করকে সম্বর্ধিত করিয়া কামনা করিয়াছিলেন, তিনি যেন শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করেন। তারাশঙ্কর এই সহৃদয় আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন, "না। আপনাদিগকে প্রণাম নিবেদন করিয়া আমি বিদায় লইতেছি। বুঝিয়াছি, নিছক রাজনীতি আমার ক্ষেত্র নহে। যে বঙ্গভারতীকে আমি উপেক্ষা করিয়াছি, এবার তাহারই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিব মনস্থ করিয়াছি.

সাহিত্যযশাভিলাষী তারাশঙ্কর সুতরাং এবারে প্রস্তুত হইয়াই ভারতীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। দীনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'কল্লোলে' তখন শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র বাংলা কথা-সাহিত্যে নূতন ভঙ্গীর আমদানি করিতেছেন। এই নূতনত্ব তারাশঙ্করকে আকৃষ্ট করিল। নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি 'রসকলি' গল্পটি রচনা করিলেন, নিজের ভাল লাগিল। তিনি তাহা প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দিলেন একটি গতানুগতিক প্রসিদ্ধ মাসিক-পত্রিকায়, সেখানে তারাশঙ্করের নূতন পরীক্ষা সম্বর্ধিত হইল না। সুতরাং তারাশঙ্কর 'কল্লোলে'র শরণ লইলেন। 'রসকলি' দ্রুত গৃহীত হইল, আরও লেখার প্রার্থনাও দীনেশ দাশ জানাইলেন ; কিন্তু বহু আশা লইয়া স্বয়ং তারাশঙ্কর যখন 'কল্লোল'-গৃহে দর্শন দিলেন, অতি-আধুনিকতায় প্রমত্ত কল্লোলী দল তাঁহাকে সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করিলেন না, ডিম্বকে যথাযোগ্য খাতির করিয়া তাঁহারা হংসকে অনাদর করিলেন। অভিমানক্ষুব্ধ তারাশঙ্কর প্রতিহত হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত স্থানে সাবিত্রীপ্রসন্নের 'উপাসনা'য় সাময়িকভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহা ১৯৩১-৩২ সালের কথা। 'চৈতালী ঘূর্ণি' ও 'পাষাণপুরী' এই দুইখানি উপন্যাস এই কালের মধ্যে লিখিত ও প্রকাশিত হয়। তিনি তখন মাকুর মতন কলিকাতা-লাভপুর করিতেছেন। পত্রিকা-সম্পাদক ও পুস্তক-প্রকাশকদের দরজায় দরজায় তাঁহার মাথাটিও কিঞ্চিৎ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে।

'চৈতালী ঘূর্ণি' ও 'পাষাণপুরী' প্রকাশকালে আশানুরূপ সমাদর লাভ করে নাই। তারাশঙ্কর না যশে না বাসে কলিকাতায় তখনও প্রতিষ্ঠিত হন নাই। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন দুই বৎসর পরে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়া। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকা ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ইহার অব্যবহিত পূর্বে সম্পাদক সজনীকান্তের সহিত তারাশঙ্করের পরিচয় হয়। সজনীকান্ত তখন 'বঙ্গশ্রী'র লেখা-সংগ্রহে তৎপর ছিলেন, কিন্তু তিনি

প্রভাতবাবুর মতে, "রামমোহন-ভক্তের দল সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা নামে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন।...প্রথম খণ্ডে 'এতদ্দেশে গোরালোকের বসতি এবং জমিদারী বিষয়' ও 'পারস্য ভাষা পরিবর্ত্তনে আদালতে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত হইবার বিষয়' আলোচিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য ও প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে উহা রামমোহন-দলীয় সাময়িক পত্রিকা।" প্রভাতবাবু রামমোহন-ভক্তদের অযথা প্রাধান্য দিতে গিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। রামমোহন বা রামমোহন-ভক্তেরা কলোনাইজেশনের সমর্থনই করিয়াছিলেন, ইহা জানা কথা। কিন্তু 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা' করিয়াছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত; উহা "রামমোহন-দলীয় সাময়িক পত্রিকা" হইলে এরূপ সম্ভব হইত কি? 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণ' যেমন রক্ষণশীল মতবাদী ছিল, তেমনি আবার উহার প্রকাশকও ছিল রক্ষণশীল-দলের একটি প্রতিষ্ঠান; উহা "শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস দাসের" "তিমিরনাশক যন্ত্রে প্রকাশিত এবং মুদ্রাঙ্কিত" হইত। 'তিমিরনাশক' সংবাদপত্র সে-যুগে রক্ষণশীল-দলের সমর্থনকারী ছিল ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দ্রষ্টব্য)। 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা' প্রগতিশীল রামমোহন-ভক্তদের সাময়িক পত্রিকা হইলে, রক্ষণশীল-দলীয় প্রতিষ্ঠান কখনও উহার প্রকাশক হইতে পারিত না।

'বীণা'।—১২৮৫ সালের বৈশাখ (১৮৭৮, এপ্রিল) মাস হইতে কবি নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় একখানি অভিনব মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন; উহা 'বীণা (নানাবিষয়িণী কবিতাপ্রসবিনী মাসিক পত্রিকা)'। কেবলমাত্র কবিতা-পরিপূর্ণ মাসিক পত্রিকা ইহাই প্রথম। 'বীণা' চারি বৎসর চলিয়াছিল ইহার পুরাতন সংখ্যাগুলি বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। সম্প্রতি ১ম বর্ষের সংখ্যাগুলি আমার হস্তগত হইয়াছে।

'বীণা'র ১ম সংখ্যার সূচনায় সম্পাদকের রচিত একটি গীত মুদ্রিত হইয়াছে উহা এইরূপ:—

গীত।

ঝিঁঝিটী—একতালা।

(আস্থায়ী)

বাজল বীণা, নাচল জল,
বিজলী চমকে জলদ-গায়;

তারাশঙ্করকে উপেক্ষা করিলেন। পোড়-খাওয়া তারাশঙ্করের তখন প্রচুর আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছে। তিনি স্বয়ং অগ্রসর হইয়া আসিলেন "শ্মশান-ঘাট" গল্পটি লইয়া। এই গল্পটি স্নেহ-স্মৃতির দিক দিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। তিনি সস্ত শ্মশান-ঘাটের চিতাবহ্নির উত্তাপদগ্ধ—প্রিয়তমা কন্যা বুলুকে চিতায় তুলিয়া দিয়া আসিয়াছেন। খ্যাতির দিক দিয়াও এই গল্পটি স্মরণীয়। "শ্মশান-ঘাট"—পরবর্তী কালে "সন্ধ্যামণি", ইহাকেই তারাশঙ্করের সাহিত্য-সাধনার দ্বিতীয় বা সফল পর্বের "অবতরণিকা" বলা চলে। এখান হইতেই নিরুদ্বেগ-নির্ভয়পথে তারাশঙ্করের জয়রথ ধাবিত হইয়াছে নব নব যশের অন্বেষণে, নব নব খ্যাতির প্রতিষ্ঠায়। অন্য দিকে তাঁহার যাকু-জীবনও সমাপ্ত হইয়া আসিল। তিনি আত্মীয়-গৃহে, পরে কলিকাতার দক্ষিণপ্রান্তে এক টিনের ঘরে বাসা বাঁধেন, তাহার পর বউবাজারের মেস, হ্যারিসন রোডের বোর্ডিং এবং মোহনবাগান রো হইয়া ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বাগবাজারস্থিত বর্তমান বাসাবাড়িতে শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসুর সহায়তায় আশ্রয় লাভ করেন। পরবর্তী বৎসরে বরানগরে নিজস্ব গৃহ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সে ইতিহাস বর্তমান বর্ষে অতীত ইতিহাস মাত্র। টালায় বিস্তৃত ভূমি সংগ্রহ করা সত্ত্বেও তিনি এখনও বাগবাজারের মায়া বা মোহ কাটাইতে পারেন নাই।

তিনি এই পর্বে রাজনীতির সংস্রব পরিত্যাগ করিলেও আইন এবং শৃঙ্খলার মালিকেরা পূর্বতন খ্যাতিমাহাত্ম্যে অনেকদিন পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। ইহাদের নিবিড় প্রেমপাশ এড়াইবার জন্য তারাশঙ্করকে কলিকাতাবাসের একটা যুক্তিপূর্ণ কারণ দর্শাইতে হইয়াছিল, তিনি কিছুকালের জন্য 'শনিবারের চিঠি'র সহ-সম্পাদকের ভোল গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সজনীকান্তের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত 'বঙ্গশ্রী'র প্রথম দুই বৎসরের ইতিহাসের সহিত তারাশঙ্করের বঙ্গদেশের চিত্তজয়ের গৌরবময় ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া আছে। এই কালের শেষের দিকে "জমিদারের মেয়ে" ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গশ্রী'তে বাহির হইতে আরম্ভ হয়। সজনীকান্ত "বঙ্গশ্রী'র সম্পাদকত্বে ইস্তফা দিয়া আসিলে (১৯৩৫, ১৫ জানুয়ারি) তিনিও 'বঙ্গশ্রী'র সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং "জমিদারের মেয়ে" 'ধাত্রী দেবতা'-রূপে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আকারে 'শনিবারের চিঠি'তে আবার গোড়া হইতেই প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তারাশঙ্কর তখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

আজ সাহিত্য ও জীবনের বহু বিভাগে তারাশঙ্কর যশস্বী হইয়াছেন। নাট্যমঞ্চে, ছায়াছবির পরদায়, গ্রামোফোন-রেকর্ডে সর্বত্রই আজ তিনি বিজয়ী। তাঁহার ছোটগল্প উপন্যাস ও নাটকে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ। এইগুলির প্রত্যেকটির রচনার ইতিহাস আছে এবং এগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে তিনি ওতপ্রোত হইয়া আছেন। ভবিষ্যৎ জীবনীকারকে তারাশঙ্করের অন্তরঙ্গ জীবনের ছবি আঁকিবার জন্য এগুলির সাহায্য লইতে হইবে। আমরা সে গভীর গহনে প্রবেশ করিব না।

তারাশঙ্কর মানুষটি সম্পর্কেও আমরা আপাতত নীরব থাকিব। আগেই বলিয়াছি, মানুষটি অতিশয় জটিল। কিন্তু বয়সধর্মে, জীবনের সার্থকতায় এবং নিত্য নব নব প্রাপ্তির প্রসন্নতায় জটিল মানুষটিও প্রেমে ও রসে সরল হইয়া আসিতেছে। মানুষের প্রতি তাঁহার সুগভীর প্রেমের পরিচয় আমরা ক্রমশ পাইতেছি। আশা করিতেছি, তাঁহার সাহিত্যবুদ্ধি প্রেমে স্নিগ্ধ হইয়া তাঁহার জীবনকে মহামহিমায় মণ্ডিত করিবে। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের (কানপুর, ১৯৪৪) সাহিত্য-শাখার সভাপতি অথবা কলিকাতার (১৯৪৭) মূলের উদ্বোধক তারাশঙ্করকে আমরা তখন খুঁজিব না। আমরা খুঁজিব রসিক তারাশঙ্করকে, কবি তারাশঙ্করকে।

তারাশঙ্কর কি ভালবাসেন অর্থাৎ তাঁহার hobby কি, ইংরেজী মতে এ খবরটা অত্যাবশ্যক। তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন—মানুষ পাইলে গুছাইয়া কথা বলিতে; তাহার পর, আগে ভালবাসিতেন চাষ-আবাদ গার্ডেনিং (বাংলা খুঁজিয়া পাইলাম না, বাগান শব্দটি প্রয়োগে নৈতিক আপত্তি হইতে পারে); বর্তমানে ভালবাসেন নাতিনী-নাতিদের। মাঝে মাঝে তাহাদের অত্যাচার বাংলা সাহিত্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে, এমনও দেখিতে পাই। গৃহিণী, দুই পুত্র, দুই কন্যা ও এক জামাতা লইয়া তারাশঙ্করের দুই পুরুষের সংসার, তৃতীয় পুরুষ তাঁহার উপন্যাস-সংখ্যার মত ক্রমবর্ধমান।

১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ৮ আশ্বিন তারিখে তারাশঙ্কর উনপঞ্চাশের বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাহিত্যরসিক বন্ধুরা ১০ শ্রাবণ রবিবার নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীটের কে. বি. ক্লাব-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া তাঁহাকে লইয়া একটি ছোটখাটো ঘরোয়া উৎসব করেন। বাংলা দেশের

অনেক খ্যাতিমান কবি ও কথাশিল্পী স্বয়ং অথবা প্রশস্তিপত্র মারফৎ এই উৎসবকে সার্থক করিয়া তুলেন। প্রশস্তিপত্রগুলি এই প্রসঙ্গের শেষে মুদ্রিত হইল। শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কমলাকান্ত পাঠক, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীমতী বাসন্তী রায় নিজেরা উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব প্রশস্তি পাঠ করেন। বক্তৃতা করেন শ্রীযুক্ত অমল হোম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, যোগেশ ভট্টাচার্য ও গজেন মিত্র। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বতন্ত্র নিবন্ধাকারে তাঁহাদের বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাও এই সঙ্গে ('তারাশঙ্কর-প্রশস্তি'র পূর্বে) মুদ্রিত হইল। প্রথমে শ্রীযুক্ত সুকৃতি সেন এই উৎসবের জন্য রচিত নিম্নলিখিত কথাগুলিতে সুর যোজনা করিয়া গান করেন—

ভালবাসা দিয়ে বরি বন্ধুরে, প্রেমের গর্বে লই যে নাম,
প্রতিভাদীপ্ত মধ্য-আকাশে ঘাসের ফুলের লও প্রণাম॥
প্রসন্ন হাসি ভাসুক এবার
মন্দিত খর-সৌরভভার
মোদের কামনা, নিদাঘ-দিনের হোক রমণীয় এ পরিণাম॥

বন্ধু-কামনা, এই আনন্দ সারা দেশ জুড়ে সবার হোক,
তব কালিন্দী ধাত্রীদেবতা-কল্যাণে হোক বিগতশোক,
হে কবি, তোমারে করি যে বরণ
গণদেবতার আনো জাগরণ,
মন্বন্তর পার ক'রে দিয়ে নির্ভয় কর পঞ্চগ্রাম॥

বাংলা দেশের সাহিত্যিক ও শিল্পীগণের পক্ষে সজনীকান্ত দাস পরে এই কবিতাটি পাঠ করেন—

তারাশঙ্কর,
অর্ধেক শতাব্দী ধরি জীবধাত্রী ধরিত্রীর স্নেহ
তোমারে করেছে রক্ষা, মাটিরে কর নি অস্বীকার—
এড়াতে পেরেছ তাই সর্বনাশা যুগের সন্দেহ,
ভালবাসা জয়ী হ'ল, প্রেম হ'ল রক্ষী প্রতিভার।

আমাদের দুঃখদৈন্য আমাদের বিক্ষোভ-শঙ্কার
তুমি বার্তাবহ বন্ধু, দিতেছ সার্থক বাণীদেহ—
সর্বহারা গৃহহারা স্বার্থের সংঘাতে বারম্বার
রচিছে কল্পনা তব, আমাদের ভবিষ্যৎ গেহ।
আমরা কৃতার্থ আজ বন্ধু-তারাশঙ্কর-সোহাগে,
একদিন এই নামে ধন্য হবে নিখিল সংসার;
সেদিন সুদূর নহে, উর্ধ্বে হেরি যশঃসূর্য জাগে
দিকে দিকে খুলিতেছে বদ্ধ যত হৃদয়ের দ্বার।
গর্বভরে আজ মোরা দাঁড়াই সবার পুরোভাগে
জীবনের মাঝখানে জানাই তোমারে নমস্কার॥

প্রশস্তিপত্রগুলি পাঠ করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সর্বশেষে তারাশঙ্কর নিম্নলিখিত ভাষণ দেন—

"আমার পঞ্চাশৎ বৎসর প্রবেশের মুখে আমার সাহিত্যজীবনের গুরুজন বন্ধুজন স্নেহভাজনেরা মিলে আজ সাদরে আহ্বান ক'রে দিলেন যে স্নেহাশীর্বাদ, যে অজস্র-ধারায় প্রীতি, অকপট অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা, তাতে আমার দুই হাতের অঞ্জলি পরিপূর্ণ হয়ে অন্তরের সকল আধারকে ছাপিয়ে আমার চারিপাশে অপরিমেয় সৌভাগ্যের মত ছড়িয়ে প'ড়ে গেল। আমার এমন আধার আর নাই, যার মধ্যে সঞ্চয় ক'রে রাখি। আমার অঞ্জলিতে, আমার অন্তরে যেটুকু ধরেছে, তাই আমার অবশিষ্ট জীবনের জন্য পর্যাপ্ত হয়ে রইল, বাকি জীবনপথে চলার কালে পাথেয়ের আমার অভাব হবে না। গুরুজনদের প্রণাম জানাচ্ছি, বন্ধুজনকে অন্তর উজাড় ক'রে প্রীতি নিবেদন করছি, স্নেহভাজনদের স্নেহ-আশীর্বাদ জানাচ্ছি; আপনাদের জয়ে বাংলা সাহিত্য জয়যুক্ত হোক।

অসঙ্কোচে অকপটেই আজ স্বীকার করছি যে, সাহিত্যসাধনার আসরে এসে প্রথম প্রহরে কিছু কিছু গ্লানি এবং বেদনা অনুভব করেছিলাম, ক্রমে ক্রমে তার অনেক অংশ দূরীভূত হ'লেও কিছুটা যেন যায় নি, সুপ্ত ক্ষোভের মত অন্তরে লুকিয়ে ছিল। আজ সে সমস্তই ধুয়ে মুছে গেল, আমাকে লজ্জিত ক'রে দিয়ে গেল। মনে মনে বুঝতে পেরেছি যে, সে ক্ষোভ ছিল অহেতুক, আমারই অন্তরের ক্ষুদ্রতা থেকেই তার উৎপত্তি হয়েছিল। আজ আপনাদের ভালবাসার

উদার প্রকাশে আমি ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পেলাম। জীবনের সংশয়কণ্টক এবং ক্ষোভের বন্ধুরতায় বন্ধুর প্রান্তরে আপনারা প্রেমে স্নেহে শ্রদ্ধার শুভ্র মর্মরে দেবালয় গ'ড়ে দিলেন।

আপনারা বিশ্বাস করবেন, জীবনে সাহিত্যসাধনায় অগ্রসর হয়েছিলাম এ-সব পাবার স্বপ্ন নিয়ে নয়, আমি এই সাধনায় অগ্রসর হয়েছিলাম অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। জীবনের প্রথম যৌবন থেকেই দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অগ্নি-সাধনার শিখার স্পর্শ পেয়েছিলাম। এ আগুন মনের গহনে লাগলে আর নেবে না। তার সঙ্গে অবশ্য সাহিত্যপ্রীতি ছিল, সাহিত্যকে প্রাণের বস্তুর মতই ভালবাসতাম; বিবাহে প্রীতিউপহার লিখতাম, শারদীয় পূজায় আগমনী লিখতাম, আমাদের গ্রাম লাভপুরে স্বর্গীয় নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের সহযোগিতায় মাসে মাসে সাহিত্যসভার আয়োজন করতেন, সেখানে কবিতা পড়তাম। তাঁরা দুজনে সংশোধন ক'রে দিতেন। ওখানে শখের অভিনয়ের আসর ছিল সমৃদ্ধ, অভিনয়ও ছিল বহুপ্রশংসিত, সেখানে অভিনয়ের জন্য নাটকও লিখেছিলাম। সে নাটকখানিকে স্বর্গীয় নির্মলশিববাবু কলকাতায় কোন রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষের হাতে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেখানি না প'ড়েই ফেরত দিয়েছিলেন, তার জন্য নাটকখানিকে নিজেই আগুনে সমর্পণ করেছিলাম। কারণ তখন সাহিত্যিক হবার, সাহিত্যসেবা করবার কল্পনাটাই বড় ছিল না। এই কল্পনাকে প্রথম আকৃষ্ট করে বাংলার বিখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ ও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুটি গল্প। এমনই গল্প লিখবার বাসনায় 'রসকলি' গল্পটি লিখি। বাংলার কোন বিখ্যাত মাসিকপত্রে পাঠাই। কিন্তু বৎসর খানেক ধ'রে গল্পটি সম্পাদক-মণ্ডলীর বিবেচনাধীন থাকায় নাটক-রচনার মত গল্প-রচনার বাসনারও পরিসমাপ্তি ঘটাবার ইচ্ছায় গল্পটি ফেরত নিই। কিন্তু কি মনে হয়, শেষ চেষ্টা করবার জন্য পাঠাই 'কল্লোলে'। স্বর্গীয় দীনেশ দাসকে নমস্কার জানাই, তিনি সঙ্গে সঙ্গে গল্পটি মনোনীত ক'রে নূতন গল্প পাঠাতে অনুরোধ করেন। সেদিন যদি তিনি আমাকে আহ্বান না জানাতেন, তবে এ পথে আমি আসতাম না।

তারপরই এল উনিশ শো তিরিশ সাল। আমার জীবনে তখনও রাজনীতিই ছিল প্রধান। জেলে গেলাম। সেই জেলখানাতেই আমার রাজনৈতিক জীবন এবং সাহিত্যিক জীবন এক হয়ে গেল। কারাপ্রাচীরের

অন্তরালে হাজার হাজার বাংলার তরুণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার তপস্যা করে—বন্ধনের মধ্যে মুক্তির তপস্যা। রাত্রে অন্ধকারের দিকে চেয়ে তারই পথ খোঁজে; ঘুমের মধ্যেও তারই স্বপ্ন দেখে। প্রিয়জনের মুখ, স্নেহসিঞ্চিত গৃহকোণ তারা যেন ভুলে গেছে। শাসনকে তুচ্ছ করে, অস্ত্রকে ভয় করে না, মৃত্যুর মধ্যে মানস-বধূকে পাওয়ার পরমানন্দকে আস্বাদন করে, এই এদের কথা—এই হাজার হাজার তরুণের বুকের আগুনের শিখার বিচিত্র রূপকে সাহিত্যের মধ্যে স্থান দেবার কল্পনায় আমার দ্বিধাবিভক্ত জীবন পূর্ণতা লাভ করলে। আমাকে আমি খুঁজে পেলাম। জেলখানার বিদায়-আসরে সেই কথা নিবেদন ক'রে প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদায় নিয়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করলাম। এই সময় আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তান একটি কন্যার মৃত্যু আমাকে দিয়ে গেল গভীরতম বেদনার অমৃতস্বাদ। মানুষের বেদনাকে আমি যেন বুঝতে পারলাম।

সেই বেদনার মধ্যে আকস্মিকভাবে পেলাম সজনীকান্তকে। কবি শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্নকে নমস্কার জানাই, তাঁকেও স্মরণ করি। তিনিও এর পূর্বে আমার গাঢ় প্রীতির স্বাদ অনুভবের সুযোগ দিয়েছিলেন। 'কল্লোলে'র বন্ধুরা আমাকে আসরে ঠাঁই দিয়েছিলেন, কিন্তু অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ করেন নি। তাঁরা হয়তো আমার সঙ্গে কোথাও যেন অমিল অনুভব করেছিলেন, তাঁরা প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু প্রীতি দেন নি। সজনীকান্ত তখন 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সম্পাদক, সহকারী ছিলেন কিরণকুমার রায়। কিরণকুমারের মধ্যস্থতায় সজনীকান্তের সঙ্গে গাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল। অকপটে স্বীকার করব, সজনীকান্ত উৎসাহিত করেছেন, লেখা সংশোধন ক'রে দিয়েছেন, অনেক—অনেক করেছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলব, রাজনীতি নিয়ে যারা জীবনের এবং সাহিত্যক্ষেত্রের চিরন্তন গণ্ডি সংসারের স্নেহনীড় উপেক্ষা করেছে, প্রেম কামনা বাসনাকে যারা ভুলেছে, তাদের নিয়ে সাহিত্যরচনায় এবং রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে মানুষের জীবনাদর্শের যে বিপ্লব সাধিত হচ্ছে, নূতন জীবনাদর্শের মতবাদকে নিয়ে সাহিত্যরচনায় অন্য সকলের সঙ্গে সজনীকান্তও আমার সম্পর্কে শঙ্কিত হয়েছিলেন। বন্ধুবর প্রবোধকুমারও এ সম্পর্কে আমাকে একটি পোস্টকার্ড লিখেছিলেন। আমি এ কথার মধ্যে আত্মপ্রচার করছি না। আমার রচনা সম্পর্কে মোহ নেই, এমন

কথা আমি বলছি না। তবে সে দাবি নিয়ে আজ আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াই নি। সাহিত্যের বিচার হবে কালের দরবারে। আমি অসঙ্কোচে আপনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছি ভালবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষায়; আমি আমাদের সমসাময়িকগণের মধ্যে বয়সে জ্যেষ্ঠ সেই দাবিতে। শ্রেষ্ঠত্বের দাবি আমার নয়। এই যুগ অনেক জনের কীর্তিতে সমৃদ্ধ, একক কারও যুগ এ নয়। সাহিত্যিক শিল্পীজনের সম্মান আমাদের জাতীয় জীবনের সচেতনতার কথাই ঘোষণা করছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার প্রথম তোরণ অতিক্রম করছে। ভবিষ্যতে বন্ধুজনের সকলেই সম্মানিত হবেন দেশের কাছে। সমসাময়িকগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হিসাবে আমিই হব অগ্রণী সেসব আয়োজনের ক্ষেত্রে। আজ মনে হচ্ছে, এই দেশে জন্মলাভ করেছি পরম সৌভাগ্যের ফলে। আমার জীবনসাধনার মূল্য এমন স্নেহে শ্রদ্ধায় ভালবাসায় পেয়ে জন্মকে সার্থক ব'লে মনে করছি। সম্মান নয়, যশ নয়, ভালবাসাই মানুষের জীবনের পরম কামনার ধন। যাঁরা আমাকে সেই পরম সম্পদ এমন অজস্র ধারে দিলেন, তাঁরা হয়ে রইলেন আমার কাছে জীবনদেবতার দূত। যাঁরা দেন, তাঁরাই তো দাতা, আমি তো গ্রহীতা। আপনাদের দানে আমি ধন্য, আমি কৃতজ্ঞ, আমার জীবনের সকল দীনতাকে আপনারা মোচন ক'রে দিলেন। আপনাদের আমি প্রণাম জানাই, দান-গ্রহণকারী পরিপূর্ণ-চিত্ততার যে অধিকারে আশীর্বাদ জানায়, সেই অধিকারে আশীর্বাদও জানাই, আপনারা জয়যুক্ত হউন, পরম সম্পদে ভ'রে উঠুক আপনাদের জীবন, আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে জয়যুক্ত হোক সাহিত্য শিল্প দেশ ও জাতি। "বন্দে মাতরম্।"

সবশেষে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার উদ্বোধন-সঙ্গীতের একটি প্যারডি করিয়া সুরসহযোগে গান করিলে আনন্দ ও জয়ধ্বনির মধ্যে সভা সমাপ্ত হয়। নলিনীকান্তের মারাত্মক হাসির গানটিও এখানে নথিভুক্ত হইল—

গর্ব তোমার কোথায় বন্ধু, খর্ব হতেছে তোমার নাম।
মাথা কাটা গেছে, ঠ্যাং কাটা গেল—কোথায় আশিস্ কোথা প্রণাম?
আপনার হাতে ধরি তরবার,
শ্রী-সম্পদ তব করেছ সাবাড়,
সম্প্রতি কাটা বাঁড়ুজ্জেটাও—বড় শোচনীয় এ পরিণাম!

যেটুকু রয়েছে সেটুকুই নিয়ে পাবলিশারেরা চকিত-চোখ,
তব 'কালিন্দী' 'ধাত্রী দেবতা'-কল্যাণে তারা বিগতশোক।
সকলে মিলিয়া করিছে দোহন
সজনী, গজেন, মনোজমোহন,
তুমি কামধেনু ভরাইছ কেঁড়ে পাথার করিয়া মাথার ঘাম।

আজ তারাশঙ্করের জন্মোৎসবে যোগ দিতে পেরে আমি গৌরব অনুভব করছি। তারাশঙ্করকে আমি অনেকদিন থেকেই জানি, দশ-পনেরো বছর আগে বন্ধুবর রমেশ সেনের আড্ডায় তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে। তারপর মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা হ'ত। তখন আমিও কলকাতার অধিবাসী। কিন্তু ভাল ক'রে তখন তাকে জানতাম না, কলকাতায় বহুপরিচিত ও অর্ধ-পরিচিতদের ভিড়ের মধ্যে সেও একজন।

সে সময়ের একটি কথা আমার বেশ মনে আছে। তখন তারাশঙ্করের 'রাইকমল' বেরিয়েছে এবং অনেকের মুখে মুখে বইখানার সুখ্যাতিও ছড়িয়েছে। এক বর্ষার দিনে একখণ্ড 'রাইকমল' যোগাড় ক'রে দেশের বাড়িতে দুদিনের কিসের একটা ছুটিতে বেড়াতে গেলাম। একা ব'সে নির্জন ঘরে 'রাইকমল' পড়তে আরম্ভ করলাম সন্ধ্যার পরে। অনেক রাত্রে বইখানা শেষ হ'ল। তখন জানলা দিয়ে বাইরের জোনাকি-জ্বলা বাঁশবাগানের দিকে চেয়ে আমার মনে হ'ল, সাহিত্যে একটি নতুন সুরের সন্ধান পাওয়া গেল এই বইয়ের মধ্যে। এক অজানা জগতের সঙ্গে নতুন পরিচয়ের আনন্দ। বীরভূমের মাটির গন্ধ পেলাম বইয়ের ছত্রে ছত্রে। আমার মনে আছে, দেশের লাইব্রেরিতে বইখানা আমি দিয়ে সকলকে বলেছিলাম, বইখানা প'ড়ে দেখ, নতুন জিনিস পাবে।

কিন্তু তারাশঙ্করকে ভাল ক'রে জানলাম আজ বছর চারেক আগে, কানপুর প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে একই ট্রেনের কামরায় আমরা যাই এবং আসি, কানপুরে একই ঘরে আমরা তিন দিন বাস করি। তারাশঙ্করের মধ্যে যে সহজ, সরল, ভদ্র, অমায়িক ও সুরসিক লোকটি বাস করে, তাকে আবিষ্কার করলাম ওই কয়দিনে। অনেক লোকের সঙ্গে এর চেয়েও বেশিদিন একত্র বাস করেছি, কিন্তু এমন নিবিড় আত্মীয়তা কারও সঙ্গে হয় নি। এমন

আনন্দজনক বন্ধুত্ব কারও সঙ্গে গ'ড়ে ওঠে নি। এ কথাও বলব, মনকে স্পর্শ করবার এই যে ক্ষমতা, তারাশঙ্করের মধ্যে এর যে প্রকাশ ওই কদিনে আমি মনেপ্রাণে অনুভব করেছিলাম, অনেক হাজারের মধ্যে তা এক-আধজনের থাকে। তারাশঙ্করের বন্ধুত্বলাভ আমার জীবনের একটি দুর্লভ ঘটনা।

যশোর জেলার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আমি তারাশঙ্করকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি তার শুভ জন্মদিনে। বহুদিন ধ'রে এই দিনটি বার বার ফিরে আসুক, সে শত শরৎ পরমায়ু নিয়ে বঙ্গবাণীর দেউলকে দিন দিন নবতর অর্ঘ্যে মণ্ডিত করুক, দেশ ও জাতিকে নতুন পথের নির্দেশ দিয়ে চলুক তার জয়শ্রীমণ্ডিত লেখনী।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ যে শুধু তারাশঙ্করের সাহিত্যিক ও শিল্পী বন্ধুরা তাঁকে অভিনন্দন জানালেন বা অদূরভবিষ্যতে সমগ্র বাংলা তথা ভারতের মনীষীরা অভিনন্দন জানাবেন, সেইটাই তো বড় কথা নয়, আজ রসিক অরসিক নির্বিশেষে বাংলা দেশের সমস্ত পাঠক-সাধারণের কণ্ঠ থেকেই স্বতঃ-উৎসারিতভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে অভিনন্দন উচ্চারিত হচ্ছে, আমাদের চেনা ও জানায় বাইরে লক্ষ হৃদয়ের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিরন্তর প্রার্থনা করছে, তারাশঙ্কর শতায়ু হোন, শতাধিকায়ু হোন। এ যেমন আমাদের ভরসা, তেমনই আশা ও গর্বেরও কারণ বটে।

আশা এই জন্য যে, অনাগত দিনের যে সব সহায়-সম্বল-হীন নিঃসঙ্গ তরুণরা এই পথে আসবেন, তাঁদের পক্ষে মস্তবড় সান্ত্বনা হয়ে রইল তারাশঙ্করের সাফল্যের এই ইতিহাস।

তারাশঙ্কর আজ সকলের ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন নিজের শক্তি এবং নিষ্ঠার জোরে। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে বৈদ্যুতিক শক্তির জোরে, সূর্য যেমন সমস্ত জলাশয় থেকে বাষ্প আহরণ করেন নিজের অমিত তেজে, তেমনই ক'রেই তারাশঙ্কর আজ সমস্ত দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা নিজের দিকে টেনে আনতে পেরেছেন শুধু মাত্র নিজের ক্ষমতায়, সাহিত্যিক প্রতিভা ও চিন্তাশীলতার জোরে।

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

১৯৩৮ সাল। মফস্বলের মুখচোরা ছেলে নতুন কলকাতায় এসে পোস্ট্-গ্র্যাজুয়েটে ভর্তি হয়েছি।

এই সময় একদিন নার্ভাসভাবে 'শনিবারের চিঠি'র আখড়ায় ব'সে ছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম সজনীদার কণ্ঠস্বরে, নারাণ, এঁকে চেনো? ইনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

মফস্বলের ছেলের সর্বাঙ্গ শিরশির ক'রে শিউরে উঠল। লক্ষ্যই করি নি, ঘরে কখন নতুন একটি লোক এসে ঢুকেছেন। খালি গা, গলায় মালার মত ক'রে সাদা ধবধবে পৈতে জড়ানো, পৈতের সঙ্গে গোটা-দুই মোটা মোটা আংটি দুলছে। পুরু চশমার আড়ালে দুটি চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি।

আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তখন 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর 'ধাত্রী দেবতা'র জন্যে মাসের পর মাস প্রতীক্ষা ক'রে থাকি, 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'নীলকণ্ঠ', 'পাষাণপুরী' এবং অন্যান্য ছোটগল্প প'ড়ে এই লোকটি সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা আর কৌতূহলের অন্ত নেই। এ-হেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খালি গায়ে পৈতের সঙ্গে আংটি জড়িয়ে আমার সামনে আবির্ভূত! এ কি বিশ্বাস করা সম্ভব?

বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের আবির্ভাবের মধ্যেও যেন এই বিস্ময়ের চমক আছে।

'কল্লোল-'কালিকলমে'র পাতায় যে বিদ্রোহ একদিন বাংলা সাহিত্যকে সব দিক দিয়ে ভাঙনের প্রেরণা দিয়েছিল, সে বিদ্রোহ ধোপে টিঁকল না। বুদ্ধিজীবীর সাহস এবং ইন্টেলেক্ট্-বিলাসের আশ্রয়ে যে বিপ্লবের স্বপ্ন 'কল্লোলে'র লেখকেরা দেখেছিলেন, সে বিপ্লববোধ হয়ে রইল নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সংকীর্ণ। শেভিয়ান নায়িকাকে এঁরা কল্পনা করলেন বাঙালীর ঘরে, বস্তির মজুরদের দিকে তাকিয়ে তাদের যৌন-বিকৃতিকেই এঁরা সবচেয়ে বড় সমস্যা ব'লে ধ'রে নিলেন এবং বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদেই এঁরা শুনলেন "ভুখা ভগবানের" আর্তনাদ। উপযুক্ত সমাজচেতনার অভাবে এঁদের বিদ্রোহ-বুদ্ধি অবদমনের দেওয়ালে মাথা ঠুকেই মরল, দেশকে সত্যিকারের কিছু দিতে পারল না।

অথচ, এঁদের চাইতে দেশকে অনেক বড় ক'রে দেখেছিলেন শরৎচন্দ্র। পল্লীসমাজের জন্যে তাঁর চোখ দিয়ে যে জল পড়েছে, তার সঙ্গে মিশে রয়েছে তাঁর বুকের রক্ত। তাঁর অসার্থক নায়িকা কমল 'কল্লোল'-পন্থীদের চাইতে আরও এক ধাপ এগিয়ে সমাজের সমস্ত কিছুকে নাড়াচাড়া দিতে চেয়েছে নিষ্ঠুর হাতে। তাঁর সব্যসাচী দেখেছে সমস্ত দেশ জুড়ে এক অগ্নিস্রাবী

টুটল নিদ, ফুটল ফুল,
সচল ভেল অচল বায়।
(অন্তরা)
বাণী-বীণা বাজে ধীরি ধীরি,
দায়রা দায়রা দারা দিরি দিরি ;
ধেত্তা ধিধি, তেত্তা তিতি
সঙ্গত ধীর মধুর ভায়।
(সঞ্চারী)
ভওঁর ভওঁরী বীণাকে সঙ্গ
গুঁজরি' গুঁজরি' করত রঙ্গ,
তা'কো সঙ্গ, নীরব বঙ্গ !
তুঁ ভি গা রে সুর মিলায় ;
(আভোগ)
নয়ী বীণা, বৈণিক নয়ো,
তন্ত্র নয়ো, মন্ত্র নয়ো,
নয়ো প্রবন্ধ, নয়ো প্রসঙ্গ ;
নমহুঁ বীণাপাণি-পায়।

ক্রোড়পত্রী-রূপে গীতটির একটি স্বরলিপিও ১ম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে ; উহা বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের অন্যতর সঙ্গীত-অধ্যাপক মদনমোহন বর্ম্মণ-কৃত। প্রথম বর্ষের 'বীণা'য় ক্রোড়পত্রী-রূপে সর্বসমেত ৮টি বাংলা গানের স্বরলিপি স্থান পাইয়াছে ; তন্মধ্যে ৩টি অধ্যাপক মদনমোহন বর্ম্মণ, ৩টি বৈকুণ্ঠনাথ বসু ও ২টি অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী-কৃত। প্রথম বর্ষের 'বীণা'র সহিত পরিচয় থাকিলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীকার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ লিখিতেন না যে :—"জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় 'ভারতী' ও 'সাধনা' মাসিক-পত্রে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।" 'বীণা'র এক বৎসর পূর্বে 'ভারতী'র আবির্ভাব বটে, কিন্তু প্রথম তিন বৎসরের 'ভারতী'তে কোন স্বরলিপি মুদ্রিত হয় নাই, চতুর্থ বর্ষে "স্বর-রহস্য" প্রবন্ধে (মাঘ ১২৮৭, ইং ১৮৮১) একটি গীতের স্বরলিপি আছে। 'সাধনা' 'বীণা'র অনেক পরে প্রকাশিত। প্রকৃতপক্ষে মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় কথা ও সুর-সম্বলিত

মহাবিপ্লবের জলজ্জ্যোতিরূপ—সেই অগ্নিতাণ্ডবে পরাধীনতার নাগপাশ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

কিন্তু পল্লীসমাজ, কমল আর সব্যসাচীর মধ্যগত যে একটি ঐক্যসূত্র রয়েছে, এরা আসলে যে একটি বস্তুরই খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপ, শরৎচন্দ্র তা ধরতে পারেন নি। উপযুক্ত সমাজচৈতন্য তাঁর সহায়ক ছিল না, তাই সব্যসাচীর মত বিপ্লবীর কল্পনাসত্ত্বেও শরৎচন্দ্র শুধু প্রশ্নই জানিয়ে গেলেন, উত্তর দিতে পারলেন না।

বাংলা সাহিত্যে বিচ্ছিন্নভাবে তখন প্রচুর উপকরণ ছড়িয়ে প'ড়ে ছিল। এগুলির সমন্বয় এবং সামঞ্জস্য বিধান করতে পারলে শুধু 'কল্লোল'-পন্থীদের বিদ্রোহই পথ খুঁজে পাবে না, সেই সঙ্গে বর্মার বিপ্লবী নেতা সব্যসাচী এগিয়ে এসে বাংলার পল্লী-সমাজের গ্লানিগ্রস্ত ঘুণ-ধরা জীবনকেও উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে নবজীবনের দিকে, এটা কারও কাছেই তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। অথচ সেই সময় এমন একজন শক্তিমানের আবির্ভাব প্রয়োজন ছিল, যিনি এই বিক্ষিপ্ত উপকরণগুলোকে বিচার ক'রে এবং সংহত ক'রে পরিপূর্ণ যুগ-সাহিত্য গ'ড়ে তুলতে পারবেন। এই যুগের দাবি মেটালেন তারাশঙ্কর। তাই বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব চমকপ্রদ হ'লেও তিনি অনিবার্য।

তারাশঙ্কর রচনায় বহন ক'রে আনলেন শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্য; শৈলজানন্দের ধারায় কয়লাকুঠির অন্ধকারে কিংবা ময়ূরাক্ষী আর কোপাইয়ের ম্লান ছায়ায় পেলেন এক বিস্তীর্ণতর জীবন-জিজ্ঞাসা; এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে সব্যসাচীর বিপ্লবী সংকল্প। এই ত্রিবেণী-সঙ্গমেই গ'ড়ে উঠল তারাশঙ্করের সাহিত্য। বিশ্বব্যাপী যুগসন্ধির আঘাতে-সংঘাতে তাঁর প্রতিভার ক্রম-বিকাশ, জরিষ্ণু-সামন্ততন্ত্রের বেষ্টনী-প্রমুক্ত হয়ে তাই তিনি চলিষ্ণু সমাজতন্ত্রের সহযাত্রী।

তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠতার মর্মতত্ত্বও এইখানে। তিনি চিন্তাবিলাসী আকস্মিক বিপ্লবী নন, স্তরে স্তরে, নিশ্চিত প্রত্যয়ের দৃঢ়পদপাতে তিনি অগ্রসর। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যেই তাঁকে বুঝতে এবং বিচার করতে হবে। তাঁর যে প্রশ্নকাতর মন পাষাণপুরীর লোহার গরাদে অসহায়ভাবে মাথা ঠুকেছে কিংবা নীলকণ্ঠের বিষজ্বালায় জর্জরিত হয়ে গেছে, সেই মনই এসে 'ধাত্রী দেবতা'র "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে আশ্বাস খুঁজে পেয়েছে। সে মন আরও অগ্রসর হয়েছে 'কালিন্দী'তে—যন্ত্রবাদের সঙ্গে সামন্তবাদের সংঘাত উপলব্ধি ক'রে তিনি 'গণদেবতা'র দেবায়তনে এসে পৌঁছেছেন। দেবু পণ্ডিত, পণ্ডিত

সীতারামের ভেতর দিয়ে একটির পরে একটি আলো জ্ব'লে উঠেছে তাঁর দৃষ্টির সামনে আর সেই আলোর দীপালিতে ঝলমল ক'রে উঠেছে তাঁর আধুনিকতম সৃষ্টি এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'হাঁসুলী বাঁক'। এই 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর শুধু "বাঁশবাদি"র কাহারদেরই ফুটিয়ে তোলেন নি—ব্রাত্য, মন্ত্রহীন ভারতবর্ষে যুগান্তরের দোলা যেন রূপকচ্ছলে এতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

শুধু বিস্তীর্ণ পটভূমিকা, শুধু গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে অকুণ্ঠ অন্তরঙ্গতা, শুধু রাজনৈতিক চেতনা—এগুলিই তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় নয়। বিপ্লবের বিভিন্ন প্রবাহগুলি তাঁর রচনায় সমাবিষ্ট হয়ে একটা পরিপূর্ণ যুগ-সাহিত্যের মূর্তি গ্রহণ করেছে, এইটেই তাঁর সব চাইতে বড় সাফল্য। যুগস্রষ্টা হয়তো তিনি নন, কিন্তু চলমান যুগের তিনি সার্থক কাহিনীকার এবং গণ-সাহিত্যের নির্ভীক অগ্রদূত।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর-প্রশস্তি

আগামী ২৫শে জুলাই আমার কল্যাণীয় ও প্রিয় তারাশঙ্কর ভায়ার পঞ্চাশৎ জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে ২৭শে জুলাই আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠানে উপস্থিতির অনুরোধ জানিয়েছ। এর কি আর বলবার অপেক্ষা ছিল ভাই, এর সবটাই যে আমার প্রাণের প্রতিধ্বনি, না গিয়ে থাকতে পারতুম না। কিন্তু আমার এখন এটা যে সত্যিকার বাঁচা নয়, দুঃখ ভোগের জন্যে কেবল দেহটা আছে। শঙ্কর-ভায়াকে পত্র লেখা পর্যন্ত বন্ধ করেছি, কারণ দু-কথায় পত্র লেখায় আমি কোনদিন অভ্যস্ত নই; প্রাণের কথা উজাড় ক'রে না লিখে স্বস্তি পাই না। দু-কথায় 'কেমন আছ' জানবার শখ আমার নেই, তার চেয়ে না লেখাই ভাল। চিরদিন বাজে কথা নিয়েই আমার কাজ ছিল বা আনন্দ ছিল। কাজের কথা কোনদিন আসে নি, আসেও না। এখন প্রিয়দের বিরক্ত করা আপনিই থেমেছে।

পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমধুসূদন ও ভূদেবচন্দ্রকে নমস্কার ক'রে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আমার তিন যুগই দেখা হ'ল। বাংলা ভাষাই বলতুম। বঙ্কিমচন্দ্র একটা অভিনব সুর কানে ও প্রাণে পৌঁছে দিতে লাগলেন, সাহিত্যের

সূত্রপাত হ'ল, সাহিত্য কথাটি শুনলুম। তার সূক্ষ্ম রস রসিকেরা মনে প্রাণে অনুভব করতে লাগলেন, বাঃ, কি প্রাণস্পর্শী ভাষাবিন্যাসের কারিগরি, প্রকাশের কি মধুর ভাব! তখনও ঠিক বুঝি নি, কিন্তু আনন্দ পাই, রসমাধুর্য পাঠের মোহ বাড়ায়, 'বঙ্গদর্শন' কবে আসবে তার প্রতীক্ষায় থাকি। অক্ষয় সরকার দীনবন্ধুকে খুঁজি। 'আর্যদর্শনে' যোগীন বিদ্যাভূষণ আমাদের অবস্থা ও দেশের কথা ওজস্বিনী ভাষায় শোনান। বয়সের নেশায় তাও ভাল লাগে। লেখক-প্রধানেরা প্রায়ই ডেপুটি। সেটাকে ডেপুটির যুগও বলা যেতে পারে।

মাইকেল চ'লে গেলেন, হেম বাঁড়ুজ্জে কবিপ্রধান—জাতীয় কবি। পরে ডেপুটি নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' আমাদের মাতিয়ে দেয়। সাহিত্যরসের সঙ্গে বীররস পেলুম। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠে' পট-পরিবর্তন।

অনেক পরে শরৎবাবুর আকস্মিক প্রকাশ। 'যমুনা'য় তাঁর "রামের সুমতি" "বিন্দুর ছেলে" সকলকে চমকে দিলে। যুগ বদলে গেল। সাহিত্যরস এসে গেছে, দেশের কথা সাড়া দিয়েছে। এবার পল্লীসমাজের অবগুণ্ঠন মোচন চলল। শরতের অপূর্ব লেখনী সমাজের আবর্জনা দেখাতে আরম্ভ করেছে, কেউ চটছেন, কিন্তু সাহিত্যের জয় রোকে না। সাহিত্য বেড়ে চলল। তার দায়িত্ব সম্বন্ধে শরৎ ছিলেন অটল। প্রায় একই সময় প্রমথ চৌধুরীর অভিনব ব্যঞ্জনারীতি সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে।

এখন বর্তমানের কথা। ইতিপূর্বে আমরা সাহিত্যোদ্যানে বাগান-আলো-করা পদ্ম-গ্রাণ্ডিফ্লোরা পেয়েছি, যা শোভায় সৌন্দর্যে ও সুগন্ধে তুলনাহীন। কিন্তু বর্তমান আমাদের সাহিত্যোদ্যানকে বিবিধ বা নানা উল্লেখযোগ্য ফুলে সাজিয়ে দিয়েছে, যা এক যুগে প্রায়ই দেখা যায় না, যা যে-কোন সভ্য দেশের গর্বের বস্তু। এখন আমার কোন কথা মনে থাকে না, আত্মীয়-স্বজনের নামও ভুলে যাই, সুতরাং নাম করতে পারব না, সে সাহস রাখাও আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তবে বলতে পারি, আমার শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার হতে আরম্ভ ক'রে ১০।১৫ জন সুসাহিত্যিকের নাম করতেই হয়, যাঁদের কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি পাবার জন্যে পাঠকমাত্রেই উদ্‌গ্রীব থাকেন। তাঁরা সকলেই বাংলার কৃতী সন্তান। এতগুলি শক্তিমান সাহিত্যিক এক যুগে পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা। তাঁদের কাছে আমার দুঃস্থ দেশ অনেক আশা রাখে। তাঁরাও নিশ্চিন্ত নন।

স্থান-কালের গণ্ডির মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে আনা যায় না ব'লেই তাঁর কথা উল্লেখ করি নি। সাহিত্যের প্রথম যুগেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বরমাল্য লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয়ে ও তৃতীয়ে তিনি সে মাল্যের মর্যাদা মণি-মুক্তায় মণ্ডিত ক'রে গেছেন। তাঁর জ্যোতিতে সাহিত্য-জগৎ জ্যোতির্ময়, বাংলা ও বাঙালী আজ ধন্য।

আজ যাঁর জন্মবাসরে এই আনন্দ-আসরের অনুষ্ঠান, তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। আমি একবার তাঁদের গ্রাম—লাভপুরে ৺নির্মলশিববাবুর অতিথি-রূপে যাই। অনেকেই দেখা করতে আসেন, তারাশঙ্কর-ভায়াকেও পাই। তাঁর আনন্দ-উৎফুল্ল উৎসাহপূর্ণ বদন আমাকে আকৃষ্ট করে। কে এ যুবকটি? গ্রামের একজন আমার পাশেই ছিলেন, তিনি নিম্নকণ্ঠে একটা বিরুদ্ধ মন্তব্য করেন, বলেন, তারাশঙ্কর সম্প্রতি জেল থেকে বেরিয়েছেন। সেটাকে যেন তুচ্ছ করবার বাহাদুরি। কথাটা আমার ভাল লাগে নি, ব'লে ফেলেছিলুম, লাল-পাগড়ি দেখলে আমরা কাল মনে ক'রে কাঁপি, সে মিছে ভয়টা যদি ওরা ভেঙে দেয়, মন্দ কি? আমি তো দেখছি, লেখাপড়া-জানা ভাল ছেলেরাই জেল থেকে বেরুচ্ছে। থাক্, সে অবান্তর কথা বাড়াব. না। তারাশঙ্করের কাছে আমরা যা পেয়েছি ও পরে পাবার আশা রাখি, তা আমাদের সাহিত্যকে যথেষ্টই দিয়েছে ও দেবে। তারাশঙ্করের লেখায় তাঁর রাষ্ট্রীয়-চেতনা ও পল্লীগ্রাম ও পল্লী-জীবনের প্রতি আন্তরিক টান বিশেষভাবে নজরে পড়ে। পল্লীগ্রামের কত অজানা কথা, কত নীরব সত্য, কি সুন্দর সুখপাঠ্যভাবে তাঁর লেখনী-সাহায্যে প্রকাশ পেয়েছে। তারা কেবল উপন্যাস পাঠের আনন্দই দেয় না, পল্লী-ইতিহাসের ভাবী লেখকদের সাহায্যও করবে। আমার মত পল্লীগ্রামের ছায়াশীতল কোলে জন্মগ্রহণ ক'রে ভাগ্যক্রমে যাঁরা তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, তাঁদের কাছে এ লেখার বিশেষ মূল্য আছে। বাংলার ভাগ্যবিপর্যয়ের ভীষণ সময়ে শঙ্কর-ভায়ার মত যাঁরা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে দেশসেবার কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছেন, দেশের ভাবধারাকে সকল সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে সর্বসাধারণের কল্যাণের পথে পরিচালিত ক'রে, তাঁরা সে ব্রতের উদ্‌যাপন করুন—এই প্রার্থনা করি।

প্রিয় ও কল্যাণীয় তারাশঙ্কর সুস্বাস্থ্যে দীর্ঘজীবী হয়ে সাহিত্যসেবায় মগ্ন থাকুন, যশস্বী হোন—এই শুভকামনা জানাই।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমান্ তারাশঙ্করের প্রতিভার সমাদর করিবার জন্য তোমরা যে আনন্দ-উৎসবের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছ, তাহাতে আমি অপর কাহারও অপেক্ষা কম পুলকিত নহি। শ্রীমান্ তারাশঙ্কর আমার একান্ত প্রাণের, তাহার চরিত্র-মাধুর্যে ও উপন্যাস-লিখন-ভঙ্গীতে আমরা সকলেই মুগ্ধ। দেশ যে যোগ্যজনের আদর করিতে শিখিয়াছে, ইহা অতি আশার লক্ষণ। ইহা ভবিষ্যৎ লেখকদিগকে অনুপ্রেরণা দান করিবে। আমি উপস্থিত হইয়া শ্রীমান্ তারাশঙ্করকে সম্বর্ধনা করিবার সুযোগ পাইলে সুখী হইতাম, কিন্তু বার্ধক্য ও ব্যাধি একযোগে আমাকে বঞ্চিত করিল। ইতি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার কল্পনালোক
অপরূপ আমি তাহা চিনি,
বসতি করেন সেথা
শিব সাথে শিবসীমন্তিনী।
কোথাও ডম্বরু বাজে,
কোথা শুনি মহোক্ষের স্বর।
অহি নাচে শিখী সনে,
সিংহ নাড়ে কনক কেশর।
শঙ্খ ও শিঙার সাথে
কি অপূর্ব বেণু-বীণারব,
তৃতীয় আঁখির দৃষ্টি
সুন্দরের বসায় উৎসব।
সুলভে দুর্লভ করে,
লৌকিককে করে অলৌকিক।
ভস্মেতে বিভূতি আনে
আনন্দেতে ভাসে দশ দিক।
তুমি যে সার্থকনামা
অগর্বিত হে তারাশঙ্কর।
শতজীবী হও তুমি
রাজরাজেশ্বরী দিন বর।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

একদা সরস ছিল যে রাঢ়ের মাটি
সারা দেশ তায় পেয়েছিল রস খাঁটি,
শুকায়ে উষর সে মাটি হইল ক্রমে,
এবে জীবন্ত কঙ্কাল তায় ভ্রমে।
সে মাটিতে পুন নব রস সন্ধান
পাইয়াছ তুমি হে গুণি ভাগ্যবান্।
সেই রসধারা বিলালে গৌড়জনে,
তোমার বাণীতে ফিরে পাই হারাধনে।
ও মাটির খাঁটি মালিক যাদের জানি,
শুনি ও-কণ্ঠে তাদেরি প্রাণের বাণী।
শুনি ও-কণ্ঠে অজয়ের জয়গান,
কিরাতদুহিতা কালিন্দী-কলতান।
ময়ূরাক্ষীর স্বচ্ছ চাহনিখানি
তব জয়পথে হইয়াছে হাতসানি।
রসসাধকেরে আদি কবিদের দেশে
তোমার মাঝারে পাইলাম নববেশে।
জানি জানি সখা কোথা পেলে রসকূপ,
সে রসেরে দিতে পারি নাই বাণীরূপ,
তোমা পানে তাই অবাক হইয়া চাই
আমার আকূতি তোমারি ভাষণে পাই।
তুমিই সহিলে স্রষ্টার ব্যথা সবি
পূরা আনন্দ উপভোগে আমি লভি।
অর্ধশতে এ তোমার অর্ধোদয়,
শতদলে যেন জীবন পূর্ণ হয়।
অর্ধ জীবন সংগ্রামে কাটিয়াছে,
বাকি অর্ধেক স্বাধীন বঙ্গ যাচে।
রাখিয়াছ মোর রাঢ় বঙ্গের মান,
করি তোমা তাই স্নেহালিঙ্গন দান।

শ্রীকালিদাস রায়

১

আপন মানস-সৃষ্ট পাত্রপাত্রী-মুখে
শতাব্দীর ইতিহাস যাঁদের রচনা,
যাঁদেরে ঘেরিয়া মহাকাল স-কৌতুকে
শতাব্দীর ইতিহাস করেন যোজনা,
তুমি তাঁহাদেরি একজনা।

২

আজি অর্ধ শতাব্দীর পথে
তোমারে দেখিয়া গেনু,
আশিস্ করিনু দান—
শতাব্দী সার্থক কর বাণী-সেবা-ব্রতে।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আমি কাহারও (যাহাদিগকে স্নেহ করি ; যাহাদের দীর্ঘায়ু কামনা করি) পঞ্চাশৎ-বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে শুনিলে কেমন একটা বিষাদ ও আশঙ্কা বোধ করি। ওটা অতিশয় অযুক্তিযুক্ত তাহা মানি, কিন্তু ওই পঞ্চাশ বৎসরটাকে আমি ভয় করি। যতদিন তোমরা চারের কোঠায় আছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকি, অনেক আশা ও ভরসা করি ; কিন্তু পঞ্চাশের পরেই আয়ু-সূর্য ঢলিয়া যায়, তার পরে যত বৎসরই বাঁচি না কেন, সে যেন দাবি নয়, একটা অনুগ্রহ। তাই যদিও আমি তোমার 'শত শরৎ' আয়ুঃ কামনা করি, তোমার প্রতিভা আরও দৃঢ়সার ও পূর্ণপরিণত হোক এই প্রার্থনা করি, তথাপি এই পঞ্চাশৎ-বর্ষটিকে দৃষ্টির আড়ালে রাখিতে চাই। তোমার শক্তি এখনও অক্ষুন্ন আছে, তাহার প্রমাণ আমি পাইতেছি, এবং বর্তমানকালের কথাশিল্পীগণের মধ্যে তুমিই যে অগ্রগণ্য, ইহা আমার নিজস্ব বিশ্বাস। আমি আশা করি, তুমি তোমার ওই শক্তির দ্বারা বাংলা ও বাঙালীর আত্মাটিকে আরও গভীর এবং আরও সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত কর। তোমার পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে ইহাই আমার প্রাণের কামনা ও আশীর্বাদ।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

তারাশঙ্করের বয়েস হ'ল পঞ্চাশ বৎসর। যৌবনাগমের মতন এই বয়সটিও মানুষের পক্ষে সাংঘাতিক। যিনি এই বয়সে পৌঁছলেন এবং যাঁরা তাঁর চার-পাশে রইলেন, উভয়ের পক্ষেই সময়টি সাংঘাতিক বিবেচিত হওয়ায় শাস্ত্রকারেরা এক পক্ষকে সংসার থেকে দূরে থাকতেই ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু এখনকার

দিনে লোককে কষ্ট ক'রে আর বনে যেতে হয় না, এ বয়সে পৌছলে অধিকাংশ লোকই ত্রিভুবন অরণ্যময় দেখতে থাকেন—চারপাশে যাঁরা থাকেন, নেহাৎ মোটা রকমের কিছু সম্ভাবনা না থাকলে, সকলেই এই বাহুল্যটিকে বর্জন করতে চান—কেউ বা মনে, কেউ বা প্রকাশ্যেই।

কিন্তু এ হ'ল সাধারণ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা। যাঁরা অসাধারণ, তাঁদের জন্য নিজের গৃহকোণে প্রতিদিন 'শুদ্ধি'র ব্যবস্থা থাকলেও সমাজের ব্যবস্থা অন্যরকম। এঁরা কেউ এ বয়সে পৌছলে কুলোর পরিবর্তে মালার ব্যবস্থা করার রীতি প্রচলিত আছে। তাঁর দানের প্রতিদানস্বরূপ সমাজ সংঘবদ্ধ হয়ে এই বয়সে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানায়, বিশেষরূপে অভিনন্দিত ক'রে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দেয়। উভয়ের পক্ষেই এই দিনটি একটি বিশেষ দিনরূপে গণ্য হয়।

আমাদের বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তারাশঙ্কর অসাধারণ ব্যক্তি। তাই তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁকে অভিনন্দিত করবার জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। বন্ধুসমাজে ব'সে সাক্ষাতে এবং অসাক্ষাতে তাঁর কাব্যের গুণাবলীর যে আলোচনা এতদিন ধ'রে আমরা ক'রে এসেছি, আজকের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ আছে। এই অনুষ্ঠানের যে একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে, তা উপস্থিত বন্ধুমাত্রেই স্বীকার করবেন—তা যদি না থাকত, তা হ'লে এই অনুষ্ঠানের আয়োজনই হ'ত না।

এ কথা নিশ্চিত, তারাশঙ্কর বঙ্গভারতীর বীণায় যে নূতন স্বর্ণ-তার যোজনা করেছেন, তার সঙ্গীত কেবল শব্দের ঝঙ্কার মাত্র নয়। তাঁর কাব্যের মধ্যে গভীর মর্মস্পর্শী সহানুভূতির যে সুর অসংখ্য হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, আমিও তাদের মধ্যে একজন। দুঃখ-সুখের বিপুল ও বিচিত্র অনুভূতির আলোড়ন তুলেছে আমার মানস-সরোবরে যে শক্তি, তাঁর সেই শক্তিকে আমি এখানে প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তারাশঙ্কর' দীর্ঘ দিন জীবিত থাকুন। আমি তাঁর অগ্রজ, আমি আশীর্বাদ করছি এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, তাঁর শক্তির ভাণ্ডার অক্ষয় হোক।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

তোমার পঞ্চাশৎ জন্মবাসরে তোমার পূর্ণ পুরুষায়ুঃ কামনা করি। তোমার লেখনী অক্ষয় হোক। তোমার যশ অম্লান হোক।

আজকাল বিজ্ঞানের যুগে life begins at fifty। পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং

ব্রজেৎ—এ যুগে অচল। সুতরাং তুমি জীবনের যে নতুন অধ্যায় আরম্ভ করলে; তা হবে নবযৌবনের সৃষ্টিশক্তিতে গরীয়ান, অথচ বহুদর্শিতার প্রবীণতায় দৃঢ়—এক কথায় বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা। এই জরাহীন বৃদ্ধত্ব তুমি আজীবন ভোগ কর এবং বঙ্গবাসীর চিত্তকে তোমার মনের মাধুরী দিয়ে মধুমত্তর ক'রে তোল।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধু,

তোমার মহিমা, তোমার আসন
তোমার জন্মদিনের ভাষণ
রচনা করেছ তুমিই নিজে,
চলেছ স্বপ্ন-সরণি বাহিয়া
আপনার মনে কি গান গাহিয়া
ভাবিয়া পাই না বলিব কি যে।

আজিকে তোমার জনম-লগনে
শ্রাবণের ঘোর ঘন বরষণে
জানি না কি ভাব জাগায়ে তোলে,
বক্ষে কি তাহা পড়িবে ভাঙিয়া
জবায় কি তাহা উঠিবে রাঙিয়া
জানি না কি ভাষা আভাসে দোলে।

মহাকাশ ভরা কার অন্তরে
কোন্ সঙ্গীত ভাসে মন্থরে
আগামী দিনের ছন্দভারে
তারই প্রত্যাশা তারি আগ্রহ
বিদ্যুতে আজি জাগে অহরহ
শিহরে শ্রাবণ অন্ধকারে।

দাঁড়ায়েছে আজি তোমারে ঘিরিয়া
প্রত্যাশা-ভরা অসংখ্য হিয়া
এসেছে অকবি এসেছে কবি
এসেছে জনতা এসেছে পথিক

এসেছে রসিক এসেছে বণিক
　　শ্রাবণ-গগনে জেগেছে ছবি।

টগর যূথীর ছন্দ লইয়া
ভক্তি-শুভ্র অর্ঘ্য বহিয়া
　　এসেছে অসীম চিরন্তন
কেয়া-করবীরা প্রণাম জানায়
বনফুল-লীলা বাদলের বায়
　　গন্ধ ছড়ায় আকুল মন।

"বনফুল"

বন্ধুবর তারাশঙ্করের পঞ্চাশৎ জন্মদিন উপলক্ষ্যে সবার সঙ্গে আমার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি তাঁকে। তিনি শতায়ু হোন—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা, অর্থাৎ আজকের দিনটিকে যেন তাঁর জীবনের মধ্যাহ্ন, তাঁর সাহিত্য-জীবনের যৌবন ব'লে মনে করতে পারি আমরা।

মানুষের নিজের পরমায়ু সম্বন্ধে যে একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা আছে, তার বশেই সশরীরে উপস্থিত হতে পারলাম না আপনাদের উৎসবে। ভেবে দেখলাম, উপস্থিত হ'লেই থাকতাম অনুপস্থিত,—মনটা নিজেকে আগলে থাকতেই হ'ত হয়রান, এখন নিশ্চিন্ত মুক্তিতে সে আপনাদের উৎসবে লিপ্ত হয়ে রইল।

তারাশঙ্কর দেশের হৃদয়টি কি ভাবে জয় করেছেন এই থেকেই বোঝা যায় যে, এই দারুণ দুর্দিনের মধ্যেও সে তাঁর জীবনের এই অতি বিশেষ দিনটিকে অনভিনন্দিত যেতে দিলে না। এই প্রীতিটুকু হোক শাশ্বত।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

তোমার পঞ্চাশৎ জন্মতিথি পালনের ব্যবস্থা করিয়া সজনীবাবু অত্যন্ত সময়োচিত কার্য করিয়াছেন এবং সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইবেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ।

তোমার পঞ্চাশৎ জন্মতিথিতে শিক্ষিত বাঙালী সমাজের আনন্দিত হইবার কথা। আর আমরা যাহারা তোমার সাহিত্য-সতীর্থ, তাহাদের যুগপৎ আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হইবার বিষয়। তুমি অচিরকালের মধ্যে প্রতিভার বলে পাঠক সমাজের চিত্তে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসন গ্রহণ করিয়াছ, আমরাও

স্বরলিপি প্রকাশের গৌরব 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র। 'বীণা' প্রকাশের প্রায় ৯ বৎসর পূর্ব্বে—১৭৯১ শকের কার্ত্তিক (ইং ১৮৬৯, অক্টোবর) সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র শেষে অতিরিক্ত ৬ পৃষ্ঠায় "সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার চিহ্নাবলী" ও পাঁচটি ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি মুদ্রিত হইয়াছে। স্বরলিপি-কার সম্ভবতঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর; তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:—"বাঙ্গালায় প্রথম স্বরলিপি যে আমার রচিত, তাহা একেবারে নিঃসন্দেহ। শৌরীন্দ্রমোহন [ঠাকুর] তাহার পরে তাড়াতাড়ি একটা স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া ছাপাইয়া দিল।"—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্য্যায়, পৃ. ২০৪।

প্রথম বর্ষের 'বীণা'র অধিকাংশ রচনাই সম্পাদকের। অন্যান্য লেখকগণের মধ্যে বহরমপুরের রামদাস সেন, 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ও হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জানেন ?

"জানেন? আমরা সিংহ ছিলাম
মধ্য এশিয়া দেশে,
যদিও এখন আঁদাড়ে পাঁদাড়ে
ঘুরিতেছি এই বেশে।
চক্ষে মোদের থাকিত আগুন,
মাথায় কেশর-তাজ,
নখরে জ্বলিত ছোরার দীপ্তি,
কণ্ঠে বাজিত বাজ।
লম্ফে লম্ফে হতাম আমরা
গিরি মরুভূমি পার,
থাবার আঘাতে মেরেছি কতই
হাতী ঘোড়া গণ্ডার।
জানি না মোদের পূর্বপুরুষ
কিসে যে ভুলিয়া গেলেন,

তাহার অংশভাক্। আমাদের সকলের সাহিত্য-সাধনা তোমার মাধ্যমে আশাতীত পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, আমাদের যাহা সাধ ছিল তোমার ক্ষেত্রে তাহা সাধ্য হইয়াছে। তোমার মূর্তিতে আমরা নিজেদের পরিপূর্ণ সাফল্য দেখিয়া যে গৌরব অনুভব করিতেছি, সাধারণ পাঠক তাহার কতটুকু বুঝিতে পারিবে জানি না। প্রদীপের শিখাটুকুই জ্বলে, কিন্তু সেই শিখাকে সমস্ত প্রদীপটি লালন করিতেছে। বাঙালী সাহিত্যিক-সমাজের তুমি সেই প্রতিভা-ভাস্বর শিখা। তুমি আমাদেরই পূর্ণ স্বরূপ। এই জন্মতিথি উপলক্ষ্যে যে শ্রদ্ধা তুমি সাধারণের নিকট হইতে পাইবে, তাহার সঙ্গে আমার এই পরম প্রীতির ক্ষীণ ধারাটি যোগ করিয়া দিয়া ধন্য হইলাম।

তোমার জীবনের অতিক্রান্ত পঞ্চাশ বৎসর আরও পঞ্চাশকে লাভ করুক। তুমি শত শরৎ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ কর। তোমার লেখনী অমিতশ্রী হোক।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

অন্তরে জোরালো তাগিদ, আজ গিয়ে আপনার সঙ্গে ব'সে একটু আনন্দ করি, পারিবারিক দুর্যোগ ঠেকিয়ে রাখছে। তাই দূর থেকেই আপনার কাছে অনুরোধ জানাই, কবি-সাহিত্যিকের বয়সের যে দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন, তা অতিক্রম করা চাই। এ শুধু অনুরোধ নয়, দাবি, শুধু আমার নয়, সকলের।

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরু গরবের ধন আমাদের—ওগো তারাশঙ্কর,
জন্মবর্ষ-স্মরণোৎসবে তব—
স্নেহ-শ্রদ্ধার চন্দনদ্রবে-মাখানো আমার প্রণতি তোমারে নিবেদি যুগ্মকর।
আমি আসিয়াছি—গোকুলের দূত
শতধা-শীর্ণ বৃন্দারণ্য হতে—
আসিয়াছি আমি—তব কৈশোর-লীলানিকেতন বনের বার্তা ব'য়ে;
মনের কথাটি তার—
অঞ্চলে নিধি—পঞ্চাশোর্ধ্বে ফিরিয়া পাইবে,—বাসনা চমৎকার!
জানে,—রাজা আসি রাখালিয়া-খেলা খেলিতে পারে না বনে,
কিন্তু বাধা কি বাসনা জাগিতে মনে!

আজি রাজসমারোহে—
পুত্রগরবে স্ফীতবক্ষের বিগলিত ক্ষীরধারে
বিরহের মধুবেদনায় কালি মথিয়া যতনে জননী যশোদা তব
কাজর করিয়া পাঠায়ে দিয়েছে হেথা ;
বাসনার সাথে পূত স্নেহাশ্রু মিশায়ে দিয়েছে দই-হলুদের ফোঁটা—
বাৎসল্যের দুগ্ধবারিধি-মন্থনজাত নবনী দিয়েছে ধড়ার আঁচলে বাঁধি !
কহিয়া দিয়াছে মোরে—
ওরে, ব'লে দিস চুপি-চুপি কানে-কানে—

সভাকোলাহল থেমে যাবে যবে—নিভে যাবে দীপমালা—
বসিবে যখন একাকী আপন ঘরে—
তখনি যেন সে আহীরিণী-মা'র যত্ন এ উপায়ন
নিভৃতে গ্রহণ করে।
আমি আসিয়াছি—গ্রাম্য আভীর—
যত রাখালের সখ্য করিয়া জমা—
বক্ষে এনেছি ব'য়ে,—
কানুর গরবে গরবিতদের মরমের প্রীতি শরমের পুটে ল'য়ে
আসিয়াছি দিতে আজি এ রাজোৎসবে।
দিতে সঙ্কোচ—নিতেও লজ্জা—এমনি এ উপায়ন,
তবু আনিয়াছি—কোনমতে মানা মানে নি আহীরি-মন !

হে কীর্তিমান—বক্ষ যে আজ ফুলিছে গরবভারে—
'গৌরীকান্ত'-চরণাঙ্কিত পন্থাটি ঘিরে-ঘিরে
দেশের চিত্ত তীর্থ করিয়া ঘুরিছে বিভোর হিয়া ;
গোকুলই তীর্থ—মধুপুরী শুধু মথুরানাথের রাজকাহিনীর স্নেহহীন ইতিহাস।
ওগো বরেণ্য, ওগো প্রণম্যতম,
অন্তরঙ্গ—ওগো সোদর্যোপম,
অমরের পরমায়ুতে বরণ করিবারে তোমা পাঠালো 'তারা-মা' মোরে,
আশীর্বচন পাঠায়ে দিয়েছে সাথে—

বলেছে আমারে মা তার আশিস্ করিতে উচ্চারণ—
'শশ্বজ্জীব—কীর্ত্তৌ জীব—শান্তৌ জীব—ওম্।'

শ্রীকমলাকান্ত পাঠক

শুধু গান শুধু ফুল নয়
সমগ্র জীবন ভ'রে
যে বিরোধ যে বিস্ময়
স্বেদ আর শোণিতের
ক্ষয় ক্ষতি জয় পরাজয়
সংগ্রামের সাধনার মত
অরণ্য গভীর ঘন বিশাল বিপুল
কাব্য হোক
সর্বগ্রাহী জীবনের মত
এই তো প্রয়াস, এই তো প্রত্যাশা!

পাতায় পাতায় কাটাকুটি
দুঃখ ক্ষোভ, অসন্তোষ
কত যে ভ্রূকুটি
তারপরে ভাব আর ভাবনার রূপ
থরে থরে মিতাক্ষরা শ্লোক
এই কি ব্যঞ্জনা তার
অন্তর্গূঢ় বাণী
সুন্দর ফুলের মত হোক,
শ্বাপদসংকুল অরণ্যানী
জীবন কাব্যের পাক ছন্দোময় ভাষা!

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

আঁধারের ঘন-কালো গুণ্ঠনে গুণ্ঠিত দুঃখের দীপ হাতে রাত্রি—
ঘিরিয়াছে চারি ধারে, মুদ্রিত দু নয়ন স্পন্দিত হিয়া মোরা যাত্রী॥
স্বার্থের হানাহানি, আর্তের অসহায় সকরুণ ক্রন্দন-ছন্দ
চিত্তের মাঝে নিতি জাগরূক করি দেয় হিংসা ও করুণার দ্বন্দ্ব।
উজ্জ্বল তব আঁখি পঙ্কিল পন্থায় ব্যথিত পরাণে স্থির দৃষ্টি
ধীরে ধীরে তারি ছবি আঁকিছ লেখনীপাতে তোমারে আপনি কর সৃষ্টি।
ধরণীর শঙ্কিত সন্তান মোরা, শুনি দুরু-দুরু-কম্পিত বক্ষে
নূতন আশার বাণী আনি দাও অন্তরে আলো এনে দাও ম্লান চক্ষে॥
আজি তব জীবনের মণি-দীপ-কক্ষটি পঞ্চাশ দীপে হ'ল পূর্ণ।
উজ্জ্বল প্রভা ঝলে দশ দিক উজলিয়া আঁধারের ভীতি করে চূর্ণ॥
আনন্দে নির্বাক সমুখের দিনগুলি সুন্দর নির্মল কান্ত
অজানার বন্ধন টুটি নিতি দেখা দিক দুখানি চরণ ফেলি শান্ত॥
চলিবার পথ তব, আপনার সারাদেহে নিজ হাতে শত দীপ জাললো।
আমি আসি এনে দিনু আমার প্রণতি-গাঁথা প্রীতিফুলে ছন্দের মাল্য॥

শ্রীবাসন্তী রায়

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

নবাব সাহেবদের বাড়ির জীবনযাত্রা আমাদের কাছে অভিনব হ'লেও ক্রমে তাতেই অভ্যস্থ হয়ে পড়তে লাগলুম। সকালবেলা উঠে হকিম সাহেবের সেই উল্টে পাল্টে নাড়ী দেখা, অভিনিবেশ সহকারে দর্শন করা, তারপরে সারাদিন ধ'রে কবুতর ওড়ানো, ঘুড়ি ওড়ানো, দিন-দুপুরে ও রাত-দুপুর অবধি পিয়ারা সাহেবের আসরে ব'সে গালগল্প ওড়ানো, মধ্যে মধ্যে কুস্তির দঙ্গল দেখা ও তারই ফাঁকে ফাঁকে 'ডিরেক্ট মেথডে' ছাত্রকে ইংরিজী ও বাংলা শেখাবার চেষ্টা চলতে লাগল।

পিয়ারা সাহেবের আড্ডাটি ছিল আমাদের কাছে মহাবিদ্যালয়-স্বরূপ। সেখানে ব'সে দেশের ও দশের কত অদ্ভুত ইতিহাসই যে শুনতে লাগলুম, তার আর ইয়ত্তা নেই, সেসব ইতিহাস কোন কেতাবেই লেখা নেই, কখনও লেখা হবে কি না জানি না; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে তা লোকের মুখে মুখেই চ'লে আসছে। বাঙালী-ঘরের ছেলেরা এবং অধিকাংশ বুড়োরাও ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তের কত প্রাইভেট কথাই যে জানে না, তাই নিয়ে দুই বন্ধুতে মাঝে মাঝে আলোচনা ও হাসাহাসি করি—এই ভাবে আমাদের দিন কাটতে লাগল।

এরই ফাঁকে ফাঁকে কোন কোন দিন চুন্নি মিয়া এসে পড়ে হারোয়ার খবর নিয়ে, সে এই এসে পড়ল ব'লে।

চুন্নি মিয়া খবর দিলে, কাশীতে চিঠি চ'লে গিয়েছে, লোকটাকে তারা চিনতেও পেরেছে।

একদিন রাতে চুন্নি মিয়া চিঠি নিয়ে এসে প'ড়ে শোনালে। তাদের ওখানকার এজেন্টরা বড়ে ভাইয়ের চেহারার বর্ণনা করেছে, শুনে মনে হ'ল, একেবারে হুবহু ঠিক।

দেখতে দেখতে প্রায় মাসখানেক কেটে গেল, তখনও হারোয়ার পাত্তা নেই। জিজ্ঞাসা করলে কিংবা তাড়া দিলে চুন্নি মিয়া মিনতি করতে থাকে, আর কটা দিন দেখুন। এতদিন যখন সবুর করেছেনই, তখন আর কটা দিন অপেক্ষা করুন। হুজুরের কাজ পড়েছে জেনে সে তো সেখানকার কাজ ফেলেই চ'লে আসতে চায়, আমিই তাকে বারণ করেছি, কারণ এখানে মোটা কিছু 'রকম' মেলবার আশা আছে।

একদিন চুন্নি মিয়াকে জিজ্ঞাসাই ক'রে ফেলা গেল, যে কাজে হারোয়া মিয়া গিয়েছে, তাতে কত পাবে আশা করছ ?

চুন্নি মিয়া বললে, হুজুরের আশীর্বাদে কাজ যদি সুসারে সম্পন্ন হয়, তা হ'লে আর আমাদের খেটে খেতে হবে না। বছরে হাজার দশেক টাকা পাওয়া যেতে পারে এমন জমিজমা পেয়ে যাব।

জিজ্ঞাসা করলুম, আর কার্যটি যদি অতিসারে পরিণত হয়, তা হ'লে ?

তা হ'লেও অন্তত আট দশ হাজার টাকা পাওয়া তো যাবেই, তা ছাড়া—

পিয়ারা সাহেব উচ্চ হেসে বললে, বেশি ব'কো না। এদের ছেলেমানুষ দেখছ বটে, কিন্তু এরা বাঙালীর ছেলে। বাক্যি-সাক্যি শুনে বুঝতে পারছ না ?

পিয়ারা সাহেবের কথা শেষ হবার আগেই চুন্নি মিয়া খপ ক'রে দু হাত দিয়ে তার একখানা পা চেপে ধ'রে বললে, আপনার দিব্যি।

তারপর নিজের ছানি-পড়া চোখটা দেখিয়ে আমাদের বললে, মিথ্যে কথা যদি ব'লে থাকি, তা হ'লে আমার এই চোখটা যেন নষ্ট হয়ে যায়।

জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা ধরুন, কাজকর্ম করিয়ে নিয়ে শেষকালে যদি তারা কিছু না দেয় ?

চুন্নি মিয়া বললে, আপনি ঠিকই বলেছেন, আপনার কথা খুবই সত্যি। এ রকম যে একেবারেই না হয়, তাও নয়। কিন্তু এরা তা করবে না, কারণ এরা ভারি জমিদার, হামেশাই এদের এ রকম কাজ করবার জন্যে লোকের দরকার হয়। এরা যদি কারুকে ফাঁকি দেয় কিংবা অঙ্গীকৃত পুরস্কারের কমও দেয়, তা হ'লে দু-দিনের মধ্যেই চারিদিকে সেই বিশ্বাসঘাতকতার কথা র'টে যাবে, তখন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেও এ কাজের জন্যে আর কোথাও লোক পাবে না। সাহেবজাদা বলুন, আমি সত্যি বলছি কি না।

পিয়ারা সাহেব বললে, হ্যাঁ, সত্যি কথা। বরঞ্চ এদের হাতের মুঠোর মধ্যে রাখবার জন্যে কিছু বেশিই দিতে হয়। চাঁদির জুতো না পড়লে এরা শায়েস্তা হয় না।

খুব একটা হাসি প'ড়ে গেল। রহস্যটা চুন্নি মিয়াও বেশ উপভোগ করলে।

ওদিকে ওদের কাজ যেমন অগ্রসর হতে লাগল, এদিকে আমরাও নিশ্চিন্ত ছিলুম না। আশা, উৎকণ্ঠা ও ভয়—এই ত্রিবিধ রসের সাগরে নিশিদিন হাবুডুবু খেতে লাগলুম। কাছাকাছি কেউ না থাকলেই আমরা এ বিষয়ে পরামর্শ

করতে লেগে যেতুম। দিন পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই মনে হ'ল, সে রাত্রে ঝোঁকের মাথায় লোকটাকে প্রাণদণ্ড দিয়ে ফেলা ঠিক হয় নি। একদিন পিয়ারা সাহেবের কাছে কথ'টা প্রকাশ করা মাত্র সে বললে, ঠিক বলছেন। কারুকে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলবার পক্ষপাতী আমিও নই। চোখ দুটো অন্ধ ক'রে ছেড়ে দেওয়া যাবে, তা হ'লে যতদিন বাঁচবে ততদিন তার পাপের ফল ভোগ করিতে হবে।

সেইখানে ব'সেই পরামর্শ ক'রে ঠিক করা গেল যে, দুটো চোখ নয়, একটা চোখ কানা ক'রে দিলেই যথেষ্ট সাজা হবে 'খন।

কয়েকদিন যেতে না যেতে সে চোখটাও মাফ ক'রে দেওয়া হ'ল। এমনই ক'রে প্রায় প্রতি রাত্রেই পিয়ারা সাহেবের আসরে ব'সে অমরনাথ বন্দ্যোউপাধ্যায়ের নাক কান হাত পা ছাঁটার দণ্ড দিয়ে নবাব সাহেবের ঘরে ঢুকেই গুরু দণ্ড দিয়ে ফেলার জন্যে অনুতাপ হতে লাগল। শেষকালে একদিন স্থির ক'রে ফেলা গেল, লোকটাকে ধ'রে নিয়ে এসে শুধু বলব—তুমি আমাদের ওপর যা অত্যাচার করেছ, এখুনি আমরা তার সমুচিত প্রতিশোধ নিতে পারি; কিন্তু তোমার মতন ঘৃণ্য জানোয়ারকে হত্যা ক'রে হস্ত কলঙ্কিত করব না। যাও।—এই ব'লে দুজনে একটি একটি ক'রে ঠেসে লাথি মেরে বিছুয়াটি কেড়ে নিয়ে বিদেয় ক'রে দেব।

এই বিধানটি আমাদের দুজনেরই বেড়ে লাগল। কিন্তু প্রতিদিনই দণ্ডাদেশ বদলাতে বদলাতে পিয়ারা সাহেবও একটু যেন কেমনধারা হয়ে পড়েছিল। সেইজন্যে তার কাছে কথাটা পাড়তে সঙ্কোচ হতে লাগল।

সেই রাত্রি থেকে পিয়ারা সাহেবের সঙ্গেই আমাদের রাত্রের আহারের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে নবাব সাহেবের বড় অসুবিধা হতে লাগল, কারণ জ্ঞান হওয়া অবধি বাইরের লোক নিয়ে খেতে বসা শুধু তাঁর অভ্যাস নয়, একেবারে সংস্কার দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাই সকালবেলা আমরা তাঁর সঙ্গে খেতুম, আর রাতে বাড়ির দু-তিনজন অথবা কখনও কখনও তার চেয়েও বেশি চাকরের দল নিয়ে তিনি খেতে বসতেন।

একদিন রাত্রে আহারাদির পর পিয়ারা সাহেবের সঙ্গে গালগল্প চলেছে ও তারই মধ্যে তাকে ইংরিজী ও বাংলা শেখাবার চেষ্টা করছি, এমন সময় চুন্নি মিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, হুজুর, বড় ভাল খবর আছে।

কি বৃত্তান্ত, কি খবর, তা না শুনেই দেখলুম, পিয়ারা সাহেব একেবারে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

একটা জিনিস আমরা এখানে এসেই লক্ষ্য করেছিলুম যে, এরা, ঠাকুরদা ও নাতি উভয়েই, অন্যের—সে পরিচিত অপরিচিত আপনার বা পর যারই হোক না কেন—কিছু ভাল হয়েছে শুনলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং কেউ দুঃখ পেয়েছে শুনলে তেমনই দুঃখিত হয়ে পড়ে।

দুষ্ট লোক পরের সুখে হিংসা করে ও পরের দুঃখে আনন্দিত হয়। সাধারণ লোক পরের সুখে হিংসা করে এবং পরের দুঃখ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকে। অসাধারণ লোক পরের দুঃখে দুঃখী হয়, কিন্তু পরের সুখ সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। ভাল লোকে পরের দুঃখে দুঃখী এবং পরের সুখে সুখী হয়। কিন্তু পরের সুখ-দুঃখকে এমন ভাবে ভোগ করা যে সম্ভব হতে পারে, তা এখানেই প্রথম দেখলুম। সত্যি কথা বলতে কি, এমন বিমৎসর লোক জীবনে কমই দেখেছি।

যা হোক, চুন্নি মিয়ার সুখবরটি এই যে, হারোয়ার চিঠি এসেছে—সে লিখেছে যে সেখানকার কার্যটি পরিপাটীরূপে সম্পাদিত হয়েছে। মহারাজা এত খুশি হয়েছেন যে, জমিদারি ছাড়া তাদের বেশ মোটা টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করবেন বলেছেন। টাকাটি হস্তগত হতেই এখন যা দু-এক দিন দেরি। টাকাটা পেলেই হারোয়া চ'লে আসবে।

চুন্নি মিয়া কিছুক্ষণ বকবক ক'রে চ'লে গেল। দেখলুম, চুন্নি মিয়াদের এই ভাগ্যোদয়ে পিয়ারা সাহেব খুবই খুশি হয়ে উঠলেন। মেজাজ শরীফ দেখে—বড়ে ভাইকে ধ'রে নিয়ে এসে অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার প্ল্যানটি তাকে ব'লে ফেললুম।

আমাদের প্রস্তাব শুনে, দেখলুম, পিয়ারা সাহেব ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে, দেখুন, সে লোকটা যদিও আসলে আপনাদেরই দুশমন, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্যে আমিও তাকে নিজের দুশমন ব'লেই মনে করি। আপনারা আমার চেয়ে বয়সে ছোট হ'লেও আমার গুরুজন। আপনাদের রায়ের ওপরে কথা বলা আমার শোভা পায় না—আমার কাজ তাকে ধ'রে নিয়ে এসে আপনাদের পায়ের কাছে ফেলে দেওয়া। তারপরে আপনারা তাকে মারুন বা রাখুন, সে আপনাদের অভিরুচি।

যাক, একটা কষ্টকর বোঝা মনের ওপর থেকে নেমে গেল—যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

পিয়ারা সাহেব আবার তখুনি বললে, কিন্তু সে লোকটা আমার 'জানিদুশমন' অর্থাৎ জীবনশত্রু হয়ে থাকবে চিরদিন। তা থাকুক, আমি তা গ্রাহ্য করি না।

পিয়ারা সাহেবের সঙ্গে রাত্রে আহারের ব্যবস্থা হ'লেও শোবার ব্যবস্থা ছিল নবাব সাহেবের ঘরেই। একদিন সকালে হকিম সাহেব সেই রকম ঘণ্টাখানেক ধ'রে নবাব সাহেবের নাড়ী টেপাটেপি ক'রে বললেন, নাড়ীটা তো ভাল ঠেকছে না।

নবাব সাহেব মৃদু হেসে বললেন, বোধ হয় ডাক এল।

হকিম সাহেব সে কথা শুনে হাসতে হাসতে উঠে চ'লে গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পিয়ারা সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। পিয়ারা সাহেব তার ঠাকুরদার কাছে গিয়ে ব'সে জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন?

নবাব সাহেব মৃদু হেসে বললেন, যেমন রোজ থাকি, সেই রকমই আছি। হকিম সাহেব বলছেন, আজকে নাড়ীটা নাকি সুবিধার নয়—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আর সুবিধার যদি নাই হয়, তাতেই বা এমন কি এসে যাচ্ছে—একদিন তো যেতেই হবে, আমি সর্বদাই তৈরি হয়ে আছি।

নবাব সাহেবের কথা শুনে পিয়ারা সাহেবের চক্ষু সজল হয়ে উঠল। সে ধরা-ধরা গলায় বললে, না না, অমন কথা বলবেন না। আপনি ছাড়া আমি আর কারুকে জানি না। শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত আমি আপনার কোলে নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে আছি। আপনি চ'লে গেলে পৃথিবীতে আমার কে থাকবে?—আমি বড় অসহায়।

পিয়ারা সাহেবের কণ্ঠের করুণ সুরে আমরা সকলেই অভিভূত হয়ে পড়লুম। নবাব সাহেবও কিছুক্ষণ ঘাড় নীচু ক'রে থেকে নাতির দিকে মুখ তুলে উদাসভাবে বললেন, তবুও বেটা, যেতে তো হবেই একদিন।

এই ধরনের কথাবার্তা এইখানেই শেষ হয়ে গেল। হকিম সাহেব বললেন যে, বেলা তিনটের সময় এসে তিনি একবার পঁচিশ নাড়ী পরীক্ষা ক'রে দেখে তবে শেষ রায় দেবেন।

সেদিন দুপুরবেলা নবাব সাহেব আমাদের সঙ্গে ব'সে রীতিমত অর্থাৎ প্রত্যহ যতখানি আহার করেন, তা করলেন। নাড়ী খারাপের খবর পেয়ে বাইরের অনেক লোক আসতে লাগল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, যাদের এতদিন কখনও দেখি নি। তিনি সকলের সঙ্গেই আলাপ করলেন। তারা চ'লে যাবার পর

প্রতিদিন যেমন কিছুক্ষণ ঘুমোতেন, তারও ব্যতিক্রম হ'ল না। ঘুম থেকে উঠে ছাতে না যাওয়া পর্যন্ত রোজ যেমন মালা জপ করতেন, তেমনই জপ আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে হকিম সাহেব ও পিয়ারা সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের সঙ্গে ওইখানকারই চার-পাঁচজন মাননীয় কর্মচারী এসে নবাব সাহেবকে খুব নীচু হয়ে কুনিশ করলে। নবাব সাহেব তাদের প্রত্যেককে অভিবাদন ক'রে বসতে অনুরোধ করলেন। হকিম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আজ দিবানিদ্রা কেমন হয়েছিল?

নবাব সাহেব সে প্রশ্নের উত্তরে মৃদু হাসিলেন মাত্র, কোন জবাব দিলেন না।

হকিম সাহেব বললেন, আপনার নাড়ী পরীক্ষা করব, অনুগ্রহ ক'রে উঠে খাটে শয়ন করুন।

নবাব সাহেব তাঁর স্বভাবসুলভ মৃদু হেসে বললেন, সে কি হয়! এঁরা নীচে ব'সে রইলেন, আর আমি ওপরে শোব?

হকিম সাহেব বললেন, তাতে কি হয়েছে? আপনি আমাদের সকলেরই বজউর্‌গ অর্থাৎ শ্রদ্ধেয়।

নবাব সাহেব কিছুতেই খাটে উঠে শুতে রাজি নন, শেষকালে ঘরসুদ্ধ লোকের আগ্রহাতিশয্যে তিনি খাটে উঠে চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। নাড়ী দেখা শুরু হ'ল।

প্রথমে হাতের কব্জি, তারপরে কনুই বগল কাঁধ, ঘাড় কানের পেছন, তারপরে পেট থেকে আরম্ভ ক'রে পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা পর্যন্ত—দেহের দুই অঙ্গের অস্থি সন্ধি ও গ্রন্থিতে বারে বারে হকিম সাহেব মৃত্যুদূতের সন্ধান করতে লাগলেন। সেই থেকে সন্ধ্যে অবধি এই ভাবে নাড়ী দেখে বললেন, নাঃ; বিশেষ কিছুই নয়। আমি 'কাল সকালে ওষুধ নিয়ে এসে নিজে খাইয়ে দেব।

নবাব সাহেবকে বললেন, আপনি কিন্তু আর জমিতে শুতে পাবেন না।

হকিম সাহেবের পেছনে পেছনে আমরা, ঘরসুদ্ধ সকলেই, পিয়ারা সাহেবের বৈঠকখানায় এসে উপস্থিত হলুম। মুখে কেউ কিছু না বললেও সকলেই উদ্‌গ্রীব—অর্থাৎ কি রকম দেখলেন?

কিন্তু কারুকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হ'ল না। হকিম সাহেব নিজে থেকেই ঘোষণা করলেন, ডাক এসে গিয়েছে, বড় জোর মাস খানেক, কি মাস

সভায় দু-একজন লোক মুখের ওপর জোর ক'রে এমন বিস্ময়ের ভাব নিয়ে পিয়ারা সাহেবকে এমন সব সান্ত্বনার বাণী শোনাতে লাগল যে, তা শুনে আমাদের মনে হ'ল, নবাব সাহেবের যে শেষকালে মৃত্যু ঘটবে এমন কথা তারা কোনদিন কল্পনাই করতে পারে নি।

কিন্তু পিয়ারা সাহেব নিস্পন্দ হয়ে ব'সে রইল, কারুর কথার জবাব দিলে না। তার ভাব-গতিক দেখে আগন্তুক সকলেই একে একে উঠে চ'লে গেল। আমাদেরও উঠে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু যাবার অন্য কোন চুলো নেই ব'লেই সেখানে ব'সে রইলুম।

লোকগুলো চ'লে যাবার অনেকক্ষণ পরে পিয়ারা সাহেব হকিম সাহেবের একখানা হাত নিজের দু হাত দিয়ে তুলে নিয়ে বললে, হকিম সাহেব, আপনি তো জানেন, কোন্ ছেলেবেলায় বাপ-মাকে হারিয়েছি, তাঁদের কথা ভুলেই গিয়েছি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ওঁর কোলেই আমার এতদিন কেটেছে। উনি চ'লে গেলে আমি কি করব?

হকিম সাহেব বললেন, এ তো বরদাস্ত করতেই হবে সাহেবজাদা, অন্য উপায় তো নেই, অত উতলা হ'লে চলবে কেন?

পিয়ারা সাহেব আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় হকিম সাহেব আবার শুরু করলেন, আমাকে দেখুন। কোন্ দূর অতীতে, তখন আমরা নওজোয়ান, সেই সময় আপনার ঠাকুরদার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমরা কাছাকাছিই আছি। আমাদের মধ্যে কোনদিন মনোমালিন্য হয় নি। সেই বন্ধু আমার চ'লে যাচ্ছে। কি করব? এ মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় তো আর নেই। তবে কিনা আমারও তো দিন ঘনিয়ে এসেছে, এই যা।

কিছুক্ষণ বাদে হকিম সাহেব চ'লে গেলেন। দেখতে না দেখতে নবাব সাহেবের আসন্ন মৃত্যুর কথা বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই নবাব-বাড়ি একেবারে যেন নিঝুম হয়ে পড়ল। সেখানে বড় ছোট কর্মচারী থেকে আরম্ভ ক'রে সামান্য ভৃত্যরাও চীৎকার ক'রে গল্প, কথা বলা এবং ঝগড়া করত, কিন্তু কি জাদুমন্ত্রে হঠাৎ যেন সব চুপ হয়ে গেল। পিয়ারা সাহেবের আড্ডায় প্রতিদিন যাদের মুখে হাসি খোশগল্প ও বাত্তেল্লার ফোয়ারা ছুটত, সেদিন দেখলুম, তারা অত্যন্ত সংযত হয়ে অর্থাৎ জুতোর আওয়াজটি পর্যন্ত না হয়

খাইবার পাস অতিক্রমিয়া
        এ দেশে চলিয়া এলেন।
বহু শতাব্দী এই পোড়া দেশে
        বাস করিবার পর
এই দশা হায় হয়েছে মোদের
        কণ্ঠে ফোটে না স্বর।
ধোঁয়ার ভয়েতে পালাই এখন,
        পাখার বাতাসে ডরি,
আঁধারে আড়ালে লুকাইয়া থাকি,
        শিশুর চাপড়ে মরি।
এই দুর্দশা হয়েছে জানেন
        জল-বাতাসের গুণে—
কর্ণকুহরে কহিল মশক।
        অবাক হইনু শুনে।

"বনফুল"

কোন্ পথে

নরহরিবাবুর কলকাতার বাসায় আজ সকালে দেশ থেকে কানাই মণ্ডল আর শ্রীনাথ মণ্ডল এসে উপস্থিত। ওরফে ওরা কানু মোড়ল আর ছিনাথ মোড়ল। নরহরিবাবুর দেশের জমি ওরা ভাগে চাষ করে। নরহরিবাবু অর্থাৎ নরু বাঁড়ুজ্জে আদায়-তহশীলে যাবার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছিলেন ওদের কাছ থেকে। চাষীদের কলকাতা আসা বড় হয়ে ওঠে না; এ সময়ে আবার সাম্প্রদায়িক আতঙ্ক। তাই দিনে দিনেই এরা শহরে আসার কাজগুলো, যথা—হাঁপানির জন্যে ইফাজোল ট্যাবলেট, দুই বউয়ের জন্যে দু জোড়া ঢাকাই শাঁখা, এক শিশি আলতা, আর একখানা যশোরের চিরুনি কেনা শেষ ক'রে, সন্ধ্যায় দুই ভাই নরুবাবুর খাস কামরায়, মানে বাইরের ঘরে, মেঝেতে শতরঞ্জির ওপর ব'সে আছে। শীত পড়ি পড়ি করায় কানু মোড়লের হাঁপানির টানও উঠি উঠি করছে; তাই গায়ে তার একখানা গায়ের কাপড় জড়ানো। ছিনাথের গায়ে হাফ-শার্ট। নরুবাবু বনাত-মোড়া টেবিলের ধারে সাজানো

এমন ভাবে আসরে এসে বসতে লাগল। অতি ধীরে সংক্ষেপে পিয়ারা সাহেবকে একটি কি দুটি প্রশ্ন ক'রে ব'সে রইল।

সেদিন আর একটি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যে কথাটা এখানে না ব'লে থাকতে পারছি না। এদিকে পুরুষেরা এই তুষ্ণী-ভাব অবলম্বন করামাত্রই ওদিকের ওঁরা যেন চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগলেন। এতদিন আছি, কিন্তু নারী-কণ্ঠস্বর কখনও কর্ণগোচর হয় নি। শুনেছিলুম, পরপুরুষের কর্ণে কণ্ঠস্বর যাতে না পৌঁছোয়, এই ভাবে স্বরগ্রাম সাধতে ছেলেবেলা থেকেই তাঁদের তালিম দেওয়া হয়ে থাকে। বাড়ির মহিলাদের তো দূরের কথা, দাসীদের ওপর পর্যন্ত সেই হুকুম ছিল। কিন্তু সেদিন হঠাৎ কি যে হ'ল, তা বোঝবার তো উপায় নেই। তবে দূরে কাছে নারীদের কণ্ঠস্বর—কখনও ঝগড়া কখনও অন্য সব কথা শুনতে পেতে লাগলুম। পিয়ারা সাহেবও যে শুনতে না পাচ্ছিল, তা নয়। মধ্যে মধ্যে তার মুখখানা বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠলেও সে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

সাংখ্য বলেন, পুরুষ নিষ্ক্রিয় হ'লেই প্রকৃতি উদ্ধতা হন।

সেই রাত্রি থেকেই আমাদের অন্যত্র শোবার ব্যবস্থা হ'ল। কারণ আমরা নীচে শোব আর নবাব সাহেব খাটের ওপরে শোবেন—এ ব্যবস্থায় তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। পিয়ারা সাহেবের দরবার-ঘরের লাগা একটা ঘরে আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া হ'ল।

পরের দিন সকালে আমরা নবাব সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম, কিন্তু তাঁর ঘরের কাছে গিয়ে দেখলুম যে, সেখান থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে সেই অন্তঃপুর পর্যন্ত কানাৎ প'ড়ে গিয়েছে। সেখান থেকে মেয়েরা হরদম নবাব সাহেবের ঘরে যাতায়াত করছেন। তাঁর এক পত্নী কাল রাত্রি থেকে সেই ঘরেই বাস করছেন। এক পিয়ারা সাহেব ও হকিম সাহেব ছাড়া সেখানে অপর লোকের প্রবেশ নিষেধ।

পরের দিন শুনলুম, নবাব সাহেবের অবস্থার কোনও ব্যতিক্রমই হয় নি। যথাপূর্বং সারারাত্রি জপ ও প্রার্থনা চলেছে, তবে গত রাত্রে আহার কিছু কম করেছেন।

পিয়ারা যেমন উতলা হয়ে পড়েছিল, তাতে আমাদের মনে হয়েছিল, ঠাকুরদাদা যাবার আগেই তার একটা ভালমন্দ কিছু হয়ে না যায়, কিন্তু দেখলুম, দিন দুয়েকের মধ্যেই সে বেশ সামলে নিলে।

সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুবই রহস্যজনক ব'লে বোধ হতে লাগল।

ঠিক এই রকম না হ'লেও প্রায় এরই কাছাকাছি একটা গল্প আরব্য উপন্যাসে পড়া গিয়েছিল বটে, কিন্তু আধুনিক যুগে চিকিৎসক বা জ্যোতিষীর কথার ওপরে বিশ্বাস ক'রে এতখানি বাড়াবাড়িটা কি জানি আমরা বরদাস্ত করতে পারছিলুম না। সেই রাত্রে আড্ডা দেবার সময় পিয়ারা সাহেবকে ব'লে ফেললুম, হকিম সাহেবের কথায় এতখানি আস্থা স্থাপন করাটা যেন একটু বাড়াবাড়ি ব'লে বোধ হচ্ছে। উনি তো আর দেবতা নন যে, যা মুখ দিয়ে বেরুবে তাই ফ'লে যাবে!

পিয়ারা সাহেব জবাব দিলে, উনি একেবারে দেবতা। এ বাড়ির অনেকের মৃত্যু-সম্বন্ধে উনি আগেই ব'লে দিয়েছেন। আমি নিজে দু-তিনবার দেখেছি, একেবারে হুবহু মিলে গিয়েছে!

এর ওপরে আর কথা চলে না।

ঘটনাস্রোত খুবই দ্রুত অগ্রসর হতে আরম্ভ করলে। বোধ হয় দিন তিনেক পরে একদিন সকালবেলা উঠে দেখি, চাকরদের মধ্যে সাজগোজ করবার খুব ধুম লেগে গিয়েছে। বেলা কিছু এগিয়ে যাবার পর পিয়ারা সাহেব আমাদের ডেকে বললে, আমাকে আজই বিশেষ কাজে একবার গাজিপুরে যেতে হচ্ছে। সেখান থেকে ফিরেই যেতে হবে পাটনায়, সেখান থেকে কলকাতা হয়ে আবার ফিরতে হবে পাটনায়, এখন এই চলল, ইংরেজী বাংলা শেখা সব মাথায় উঠল।

কতদিনে ফিরে এসে আবার শান্ত হয়ে বসতে পারবেন ব'লে মনে হয়?

পিয়ারা সাহেব ওপর দিকে একখানা হাত তুলে বললে, একমাত্র খোদাই জানেন। আমাদের এই যে সব বিষয়-আশয়, তারই একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে হবে।

সে বলতে লাগল, আমাদের বিষয়ের ভাগ-বাটোয়ারা—সে এক মহা হাঙ্গামার ব্যাপার। তার ওপরে, বিশেষ ক'রে আমাদের পরিবারে, এই হাঙ্গামা আরও প্যাঁচোয়া হয়ে পড়েছে। আমার ঠাকুরদার চারটি বিবাহ—ছোট পত্নী এখনও বর্তমান। আমার বাবার আরও তিন ভাই ছিল। বাবার চার বিয়ে, আমার মা ছাড়া আর তিনজনই বেঁচে আছেন। চাচাদের প্রত্যেকেরই দুটি তিনটি ক'রে বিয়ে, চাচারা সকলেই গত হয়েছেন বটে, কিন্তু শত্রুমুখে ছাই দিয়ে দু-একজন ছাড়া তাঁদের স্ত্রীরা সকলেই জীবিত। বাড়িতে ছেলের পাল ছিল,

সব ম'রে ম'রে আমি একা দাঁড়িয়েছি। নিজের বোন ও খুড়তুতো বোন অগুনতি। দুটো খুড়তুতো বোন আমার কাঁধে পড়েছে আর বাকি সবার এখানে সেখানে বিয়ে হয়েছে। ঠাকুরদা এদের কারুকেই বঞ্চিত করতে চান না, সকলকেই যার যা প্রাপ্য দিয়ে যাবেন, এবং এই কার্যটি তিনি বেঁচে থাকতে থাকতেই ক'রে যেতে চান, নইলে ভবিষ্যতে অনেক বাধা এসে উপস্থিত হতে পারে। আর এই বৃহৎ কাজের ভার বৃদ্ধ আমার ওপরে চাপিয়েছেন, 'না' বলি এমন সাধ্য আমার নেই।

কথায় কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ল যে, পিয়ারা সাহেব এখন গাজিপুরে চলেছে বিবাহ করতে। অনেক দিন আগে সেখানকার এক মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহের কথাবার্তা পাকা হয়েই ছিল। নবাব সাহেব প্রকাশ করেছেন, তিনি যাবার আগেই যেন এই বিবাহ-কার্যটি সমাধা হয়।

বলা বাহুল্য, পিয়ারা সাহেবের দুই পত্নী বর্তমান।

তাকে ঠাট্টা ক'রে বললুম, দুটি পত্নী তো ঘরে রয়েইছে, আর কেন?

পিয়ারা সাহেব হেসে বললে, হ্যাঁ, তারা বিবাহিত পত্নী বটে, কিন্তু তারা তো আমাদের ঘরেরই মেয়ে, ঘরকি মুরগী দাল বরাবর। অর্থাৎ ঘরের মুরগীতে মাংসের স্বাদ নেই, তা খেতে ডালের মতন।

সেদিন দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পর এ-কথা সে-কথার ভনিতা ক'রে পিয়ারা সাহেব বললে, আমার তকদির এমনই মন্দ যে, আপনাদের মত গুণী লোককে পেয়েও কিছু শিখতে পারলুম না। তবে এ কথা আপনারা নিশ্চয়ই মনে রাখবেন যে, সুবিধা হ'লেই আমি আপনাদের ডেকে পাঠাব।

আজও তার সে সুবিধা হয়ে ওঠে নি, হয়তো মুরগীর ঝাঁকে প'ড়ে আমাদের কথা সে স্রেফ ভুলেই গিয়েছে।

কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর পিয়ারা সাহেব বললে, আজ রাতের গাড়িতেই আমাকে গাজিপুর রওনা হতে হবে। সেখানে তার করা হয়েছিল, তারা দিন ঠিক ক'রে জবাব দিয়েছে। আপনারা আজই যেতে পারেন কিংবা কালও যেতে পারেন, ইচ্ছে করলে দু দিন দশ দিন অথবা যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারেন।

পিয়ারা সাহেব আমাদের এক-একজনকে কুড়িটা ক'রে নগদ টাকা ও একটা [illegible]

রাত্রেই লোক-লস্কর ও জনকয়েক সাময়িক অভিভাবককে সঙ্গে নিয়ে গাজিপুর যাত্রা করলেন।

আমাদের যাত্রার দিন স্থির না হ'লেও বিদায়ের পালা শুরু হয়ে গেল। মনে হতে লাগল, বৃথাই হ'ল গৃহত্যাগ, বৃথাই হ'ল এতদিনের দুঃখ-সুখ-যন্ত্রণা-ভোগ, বৃথাই হ'ল অমরনাথ বন্দ্যোউপাধ্যায়কে ক্ষমা করা; লাভ হ'ল এই কয়েকটি মাসের অভিজ্ঞতা,—দুর্লভ সে অভিজ্ঞতা।

প্রতিদিনই অতি ক্ষুণ্ণ মনে সেই কয়েকখানা ধুতি ও জামা আর সেই পাড়ওয়ালা রেশমের চাদরখানা নানা রকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ট্রাঙ্কের এ-কোণে ও-কোণে গুছিয়ে রাখি, পরের দিন আবার অন্য ভাবে সাজাই। অদৃষ্ট আমাদের সঙ্গে যা অভদ্র ব্যবহার করলে, অতি সংক্ষেপে মধ্যে মধ্যে তারই আলোচনা করি দুই বন্ধুতে। গৃহত্যাগের সময় আশা আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা দিয়ে মনের মধ্যে যে মনোহর প্রাসাদ তৈরি করেছিলুম, নিষ্ঠুর অদৃষ্ট অতি বর্বর আঘাতে তা চূর্ণ ক'রে দিলে। তার কাছে এই অতি অপমানকর আত্মসমর্পণ-জনিত অন্তর্দাহের মধ্যেও যে কয়েকটি মুখ সেদিন মনের মধ্যে ফুটে উঠেছিল, ইহজন্মে তো বটেই, জন্মজন্মান্তরেও তারা আমার আত্মীয়তাসূত্রে বাঁধা হয়ে রইল।

আর, দিদিমণি! তার সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়েছিল কি না—এমন একটা প্রশ্ন পাঠক-পাঠিকার মনে জাগা স্বাভাবিক।

হ্যাঁ, তার সঙ্গে আর একবার দেখা হয়েছিল, সেই কথাটা ব'লেই এবারের পর্ব শেষ করি।

ত্রিশ বছর পরে—তখন আমি মহা কাজের লোক। কাজের ঠেলায় তাঁতের মাকুর মতন ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি ঠিকরে ঠিকরে বেড়াচ্ছি। দুর্ভাগ্যের ঘন তমিস্রা ভেদ ক'রে ভাগ্যাচলের শিখরে সুখসূর্যের প্রথম রশ্মি পড়েছে মাত্র, এমন সময় কয়েকদিনের ব্যবধানে বাবা মা চ'লে গেলেন। কাজের তাড়ার মধ্যে থাকলে শোক তেমন লাগে না, অগ্নিশিখার ভেতর দিয়ে খুব জোরে হাতখানা ঘুরিয়ে দিলে যেমন তাত লাগে কিন্তু পোড়ে না, তেমনই আর কি!

ছুটোছুটির কাজ ক'মে গেলেও শুধু আগের দমেই ঘোরপাক খাচ্ছি, এমন

সময় আমার ভেতরকার সেই লোকটা, যে আমায় কখনও কোথাও ঘর বাঁধতে দিলে না, সেই চির-উদাসী আবার একদিন মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠল। মনের মধ্যে 'সব ঝুটা হায়'-এর কেত্তন শুরু হয়ে গেল। সাংসারিক দায়িত্বের ধামা চাপা দিয়ে সেই বৈরাগ্যের দম বন্ধ ক'রে মারবার চেষ্টা করছি, এমন সময় চোখে প'ড়ে গেল উপনিষদের অমূল্য উপদেশ—যদ হরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ; অর্থাৎ কিনা বৈরাগ্যটা উদয় হওয়ামাত্রই খ'সে পড়বে।

অতএব খ'সেই পড়া গেল। দিন কয়েক এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ালুম, কিন্তু কিছুই ভাল লাগে না, মনের মধ্যে দারুণ অশান্তির দাহন, অথচ তার প্রত্যক্ষ কোন কারণ খুঁজে পাই না। সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা। সেই রকম ঘুরতে ঘুরতে একদিন দ্বিপ্রহরে বৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

আজ বৃন্দাবনের অনেক উন্নতি হয়েছে শহরের আঙ্গিকের দিক দিয়ে; কিন্তু বেশিদিনের কথা নয়, সেদিনেও বৃন্দাবনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। যা হোক, বৃন্দাবন আমার অজানা স্থান নয়। বন্ধুবান্ধব সহ দু-তিনবার এর আগে সেখানে গিয়েছি, সারাদিন ঘুরে ফিরে বিকেল নাগাদ মথুরায় ফিরে এসেছি, রাত কখনও কাটাই নি সেখানে। বোধ হয় তাই না-জানার একটা মোহ ছিল বৃন্দাবনের প্রতি।

দারুণ গ্রীষ্মকাল, বোধ হয় জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। সেখানে পৌঁছেই মনে হ'ল, যেন অদৃশ্য এক অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, গ্রীষ্ম অসহ্য মনে হতে লাগল। মন্দিরগুলো তেতে আগুন, রাস্তায় ধূলোর ঝড়, গাছের পাতাগুলো ঝুরি-ভাজা, যমুনার নমুনা মাত্র সার।

রান্না ও ফাই-ফরমাশ খাটবার জন্যে একজন লোক ছিল। তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, এ রকম সাংঘাতিক গরম আর কতদিন থাকবে?

সে বললে, আরও মাসখানেক তো বটেই, তারপরে আস্তে আস্তে গরমটা সহনীয় হবে।

এই লোকটাই একদিন কথায় কথায় বললে যে, সেখান থেকে কিছু দূরেই বড় বড় জঙ্গল আছে, আর সে জায়গাগুলো বেশ ঠাণ্ডা। অনেক লোক গরমের সময়টা সেইখানেই কাটায়, চারিদিক বেশ ফাঁকা কিনা!

কথাটা শুনেই আমার সন্দেহ হ'ল, জঙ্গল, অথচ চারিদিক ফাঁকা কি রকম? জিজ্ঞাসা করলুম, গাছ-টাছ আছে বাপু সে জঙ্গলে?

সে ঘাড় নেড়ে বললে, অনেক—অনেক গাছ দেখবেন সেখানে।

একদিন দ্বিপ্রাহরিক আহারাদির পর ছাতি মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল বনের উদ্দেশে, ঠাণ্ডা হবার আশায়। অত্যন্ত হতভাগা ছাড়া রাস্তায় অন্য লোকজন নেই। তাদেরই কারুকে কারুকে জিজ্ঞাসা ক'রে শেষকালে জঙ্গলে গিয়ে তো উপস্থিত হওয়া গেল।

বৃন্দাবনের বাহাদুরি আছে বাবা! জঙ্গল মানে, ধু ধু করছে বিরাট প্রান্তর, এক মাইলের মধ্যে এখানে-সেখানে গেঁটে-সেটে-বেঁটে তিন-চারটে গাছ দেখতে পাওয়া যায় কি না-যায়! থেকে থেকে আগুন-বাতাস হুঙ্কার ছেড়ে ছুটোছুটি করছে, এরই নাম জঙ্গল।

সেই লক্ষ গোপিনীর তপ্ত বিরহশ্বাসে প্রায় রোস্ট হয়ে বাসস্থানে ফিরে এসে তিন ঘটি বিনা বরফে গুড়ের শরবত পান ক'রে কথঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হওয়া গেল।

তারপরে বৃন্দাবনের ভিখারিণী! ভোর হতে না হতেই পালে পালে ভিখারিণী বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়, বিশেষ ক'রে মন্দিরগুলোর আশপাশেই তারা ওত পেতে থাকে আর দেবদর্শনাভিলাষী নরনারী, বিশেষ ক'রে নতুন মুখ ও যাত্রী দেখলেই ছেঁকে ধরে। আক্রান্ত ব্যক্তি ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠলেও নিস্তার নেই, তারা গাড়ির পেছন পেছন ছুটতে থাকে মাইলের পর মাইল। তারপর দম ফুরিয়ে গেলে থেমে যায় আর ম্লান মুখে চলন্ত গাড়ির দিকে চেয়ে থাকে, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দম ফিরে পেলে আবার অন্য যাত্রীর সন্ধানে ছোটে।

ভারতবর্ষের বহু তীর্থের ভিখারী ও ভিখারিণীদের অত্যাচারের অভিজ্ঞতা আমার আছে। তাদের অসৌজন্যের জন্য অনেক ভাল জায়গা থেকে ধুলো-পায়েই বিদায় নিতে হয়েছে। মনে পড়ে, একবার আমরা কয়েকটি বন্ধু মিলে ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখতে গিয়েছিলুম। ভুবনেশ্বর থেকে শেষরাত্রে গরুর গাড়ি চ'ড়ে উদয়গিরি খণ্ডগিরি দেখতে যাওয়া হ'ল। পথে পালে পালে ভিখিরী আক্রমণ করলে। দুই-একটা ছোট ছেলে-মেয়েকে একটা ক'রে পয়সা দেওয়া-মাত্র কোথা থেকে পঙ্গপালের মতন ছোট ছেলেমেয়ের দল চারদিক থেকে ছুটে আসতে লাগল আমাদের গাড়ি লক্ষ্য ক'রে, আর সেই কয়েক মাইল পথ তারা আমাদের সঙ্গে গেল আর সেই রকম চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আমাদের সঙ্গেই ভুবনেশ্বরে ফিরে এল। পরে শুনলুম, সেখানে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। যাই

হোক, মানুষের সেই অবস্থা দেখে মনে মনে সেই দেশের অভিভাবকদের দোষ দিয়েছি মাত্র, তাদের দুরবস্থার জন্যে নিজেকে দায়ী মনে হয় নি। কিন্তু বৃন্দাবনের সেই দৃশ্য দেখে সেখানকার লোকদের মধ্যে সেদিন নিজেকে অত্যন্ত হীন ব'লে মনে হয়েছিল, তার কারণ, এই ভিখারিণীদের মধ্যে শতকরা একশোটিই হচ্ছে বাংলা দেশের নারী। সে এক বিস্ময়কর অবমাননায় প্রতিদিন অন্তর কলুষিত হতে লাগল। বাংলা দেশের প্রত্যেক নরনারীরই এ বিষয়ে দায়িত্ব আছে।

রোজই সকালবেলা কিছু পয়সা নিয়ে গিয়ে এদের মধ্যে বিতরণ করতুম। একটা বিশেষ জায়গায় গিয়ে পৌঁছলেই চারদিক থেকে নারীকণ্ঠের কাতর চীৎকার উঠত, বাবা দাও, একটি পয়সা দাও—

বাপ রে! আজও যদি স্বপ্নে ঘুরতে ঘুরতে কখনও বৃন্দাবনে গিয়ে পড়ি তো তাদের চোখে পড়বার আগেই ঘুম ছুটে যায়।

বৃন্দাবন ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। ভারতবর্ষে যত তীর্থস্থান আছে, ভক্তিহীন লোকের বাস করবার পক্ষে বৃন্দাবন তার মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট স্থান। ভক্তিহীন ব্যক্তির মুক্তি নেই, বিশেষজ্ঞেরা এমন একটা মন্তব্য মাঝে-মাঝে প্রকাশ ক'রে থাকেন বটে; কিন্তু আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, ভক্তিহীন লোকও যদি বৃন্দাবনে বাস করেন তো কেবলমাত্র ওখানে বাস করার কৃচ্ছ্রসাধনেই তিনি মুক্তিলাভ করবেন।

কিছুদিন বৃন্দাবনে কাটিয়ে মথুরায় এসে ডেরা বাঁধলুম। হ্যাঁ, মথুরা একটা জায়গা বটে! বৃন্দাবনের সঙ্গে মথুরার আকাশ-পাতাল তফাত। ব্রজের দুলাল বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় এসে আর সেখানে ফিরে যান নি—এইটুকু জানলেই মথুরা-বৃন্দাবনের মধ্যে তফাতটা বুঝতে পারা যাবে।

কিন্তু তথাপি বৃন্দাবন থেকে মধ্যে মধ্যে আমি একটা আশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলুম। এ রকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে নতুন নয়। যদিও অনেকবার একে প্রত্যাখ্যান করেছি, কিন্তু যতবার সাড়া দিয়েছি ততবারই দেখেছি, এর মূলে আমার জন্যে নূতনতর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে আছে। এবারেও এই আহ্বানকে উপেক্ষা না ক'রে মধ্যে মধ্যে টাঙ্গা ভাড়া ক'রে সকালবেলা বৃন্দাবনে গিয়ে মন্দির ইত্যাদি দর্শন ক'রে দুপুরের মধ্যে ফিরে আসতে লাগলুম।

বোধ হয় বার তিনেক এই ভাবে যাতায়াত করবার পর সেদিন গোবিন্দজীর

ভাঙা মন্দিরের কাছ অবধি গিয়েই বুঝতে পারলুম, কিসের একটা উৎসব লেগেছে। বৃন্দাবনে অবিশ্যি সপ্তাহে একটা না একটা উৎসব লেগেই আছে। কিন্তু সেদিনকার উৎসবের মধ্যে যেন একটু বিশেষত্ব ছিল। রাজ্যের লোক রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। টাঙ্গা তো দূরের কথা, অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে সেই ভিড়ে পথ ক'রে চলাও দুষ্কর। ভিড়ের মধ্যে ভিখিরী ও তথাকথিত সন্ন্যাসীই বেশি, ভিখিরীদের মধ্যে অধিকাংশই ভিখারিণী আর সন্ন্যাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ভিখারী।

টাঙ্গা থেকে নেমে কয়েক পা চলতে না চলতে ভিখারিণীর দল আমাকে একেবারে ছেঁকে ধরলে। তাদের মধ্যে অনেকেরই মুখ আমার চেনা, অনেকেই আমাকে চেনে, বিশেষ দিনে আমার মতন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে তারা বিশেষ রকম উৎসাহিত হয়ে সমস্বরে তান ধরলে, বাবা দেন, একটা পয়সা দেন, দয়া ক'রে একটা পয়সা দেন—

ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে বেশি ঘোরাফেরা না ক'রে একটা মন্দিরে কিছুক্ষণ কাটিয়েই কোন রকমে চোখ কান বুজে ছুটে গিয়ে তো টাঙ্গায় উঠে বসলুম; কিন্তু পালাব কোথায়? ভাল ক'রে চেপে বসবার আগেই ভিখিরী-পল্টন টাঙ্গা সমেত আমাকে ঘিরে ফেললে।

পকেটে হাত পড়ল। খুচরো পয়সা যা ছিল, একটা একটা ক'রে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে টাঙ্গা চালিয়ে দিলুম।

আমার টাঙ্গার পেছনে এক পাল ভিখারিণী ছুটতে আরম্ভ করলে। টাঙ্গার ঘড়ঘড়ানি ও সেই সঙ্গে সমস্বরে নারীকণ্ঠের কাতর চীৎকার—বাবা, দেন দেন —একটা পয়সা ফেলে দেন। শেষকালে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে স্রেফ তাদের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্যে টাঙ্গাওয়ালাকে বললুম, এই, জোরসে চালাও।

আমার কথা শুনে টাঙ্গাওয়ালা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে। সে দৃষ্টির অর্থ—এত সামান্য কারণে বিরক্ত হ'লে কি চলে? তারপরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখে 'চকাস' আওয়াজ ক'রে রাশে সামান্য একটু টান দিলে।

টাঙ্গার ঘোড়া, বিশেষ ক'রে বৃন্দাবনী টাঙ্গার ঘোড়া, তারা শাপভ্রষ্ট জীব, রাশটানের ওজন অনুভব ক'রেই বুঝে নিলে। সোয়ারীকে খুশি করবার জন্যে কয়েক কদম একটু জোরে ছুটে আবার বিলম্বিত লয়ে নেমে এল। ইতিমধ্যে বিপরীত দিক থেকে যাত্রীপূর্ণ কয়েকটা টাঙ্গা এসে পড়তেই নতুন আসামী পেয়ে

ভিক্ষার্থীর দল তাদের পেছনে লেগে গেল; শুধু একজন আমাকে ছাড়লে না, টাঙ্গার পেছনে সমানে ছুটতে লাগল। মুখে এক কথা—বাবা দেন, একটা পয়সা ফেলে দেন—

ভিখারিণী স্থূলকায়া, রঙ রোদে ঘুরে ঘুরে তামাটে হয়ে গিয়েছে, মাথা ন্যাড়াই ছিল, বিন্দু বিন্দু খোঁচা খোঁচা পাকা চুল, পেছন দিকে আধ-ইঞ্চি-টাক একটু চৈতন, মুখাকৃতি একেবারে চৈনিক।

তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হতে লাগল, আমার কোনও এক আত্মীয়ার সঙ্গে যেন সে মুখের সাদৃশ্য আছে। অথচ আশ্চর্য এই, কার মুখ যে তা সেটা কিছুতেই স্মরণ করতে পারছিলুম না। তার ভাষায় সেই পূর্ববঙ্গীয় সুরেই সব ঘুলিয়ে দিতে লাগল। কার মুখ এ—কার মুখ? হঠাৎ বিস্মৃতির ঘন তমসার মধ্যে স্মৃতির বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল—দিদিমণি!

চলতি গাড়ি থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ভিখারিণীকে ধ'রে বললুম, দিদিমণি, আমাকে চিনতে পারছ? আমি—

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে সে বললে, স্থ—অ—বি—র!

আশ্চর্য! সে কি আমায় আগেই চিনতে পেরেছিল?

দিদিমণিকে তখুনি টাঙ্গায় তুলে নিয়ে তার বাড়ি গেলুম। ছোট একতলা বাড়ি, তারই দুটো ঘর। এক ঘরে শোওয়া থাকা চলে, অন্য ঘরে একটা মাঝারি-গোছের তক্তাপোশের ওপর কম ক'রে গুটি পঁচিশ দেবতা—মানে, একই দেবতা নানা রকমের পোজ মেরে শুয়ে, ব'সে, ত্রিভঙ্গ হয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে রয়েছেন, এটির নাম ঠাকুর-ঘর। এঁদের প্রত্যেককেই আলাদাভাবে পরিচর্যা করতে হয়।

দিদিমণি তার শোবার ঘরে একটা মাদুর পেতে আমাকে বসিয়ে সামনে বসল। পাঁচ-সাত মিনিট চুপচাপ কাটবার পর সে বললে, ব'স্, আমি এখুনি আসছি।

বোধ হয় ঘণ্টাখানেক বাদে ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আবার আমার সামনে ব'সে ডাক দিলে, যমুনা!

তখুনি একটি বাঙালী বিধবা দরজায় এসে দাঁড়াল। দিদিমণি বললে, ঘরে অতিথ এসেছেন।

কথাটা শুনেই সে চ'লে গেল।

চুপ ক'রে ব'সে আছি দিদিমণির দিকে চেয়ে, সেও আমার দিকে চেয়ে আছে। কারুর মুখে কথা নেই। আমার মনের মধ্যে লক্ষ প্রশ্নের ঝড় চলেছে, বলবার ইচ্ছে হতে লাগল, তোমার সেই বাজারের টাকা নিয়ে আমরা পালাই নি। ইচ্ছা হ'ল, একবার জিজ্ঞাসা করি, আমাদের অতগুলো চিঠির একটারও জবাব দিলে না কেন?

কিন্তু তখুনি মনে হ'ল, এতদিন পরে সে প্রশ্ন তুলে লাভ কি? সেদিন জীবনের সমস্তটাই ছিল ভবিষ্যতের গর্ভে। সেই ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনাই নির্ভর করেছিল আমাদের সেই চিঠিগুলির উত্তরের মধ্যে। আজ জীবনের সমস্তটাই চ'লে গেছে অতীতের গর্ভে, সে চিঠির কোন মূল্যই আমার কাছে আজ আর নেই। কেন চিঠি লেখ নি?—এ প্রশ্নও নিষ্প্রয়োজন, শুধুমাত্র কৌতূহল-নিবৃত্তি ছাড়া। সে রকম কুকুর-কৌতূহল আমার নেই।

দিদিমণির নিজের কথা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা করতে লাগল।—রাজরাণী হয়ে কেমন ক'রে সে আজ পথের ভিখারিণী হয়েছে? এই অবস্থায় নিশ্চয় সে একদিনের মধ্যেই এসে পৌছোয় নি। কি ক'রে ধাপে ধাপে, স্তরে স্তরে নামতে নামতে, কত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অদৃষ্ট তাকে টানতে টানতে এখানে এনে ফেলেছে? কি প্রশ্ন করব? কোন্ প্রশ্নটা আগে করব?

সেই ঝড়ের মধ্যে থেকে থেকে আর একটা সুর মনের মধ্যে ঝঙ্কার দিতে লাগল, কতদিন ধ'রে, কত অভাবনীয় আপদের মধ্যে দিয়ে তার দিন কেটেছে, কত অশ্রু, কত ব্যর্থার কাহিনী—কি হবে সে সুদীর্ঘ ইতিহাস শুনে? শত জীবনের বিনিময়েও তো তার দাগ মোছা যাবে না! থাক্, সে কথা শুনে কাজ নেই, কৌতূহলের বিনিময়ে আর নতুন আঘাত অর্জন করতে চাই নে।

দিদিমণিকে দেখতে লাগলুম, মুখখানা ঘিরে একটা করুণ ভাব থমথম করছে, কিন্তু দেখতে দেখতে মনে হয়, যেন কারুণ্যের আবরণ দেওয়া রহস্যময় হাসি সেটা।

চুপ ক'রে ব'সে আছি তার মুখের দিকে চেয়ে, একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য সে আমার চোখের ওপর চোখ রাখলে। কি নিরন্বয় পরিবর্তন হয়েছে তার চোখের ও দৃষ্টির! যে চোখ মুহুর্মুহু ঘৃণা, আনন্দ, উদ্বেগ, ভয়, দয়া, করুণা, অনুনয় ও ঔদ্ধত্যে ঝলকে উঠত, সে চোখ একেবারে স্থির হয়ে গিয়েছে। অন্তর

চেয়ার-শ্রেণীর একখানিতে নিশ্চিন্ত আরামে ব'সে, সন্ধ্যা সাতটায়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সুযোগে সস্তায়-কেনা একস্রোত বেতার মারফৎ ইংরেজীতে সংবাদ শুনছেন। ভদ্রলোক ওকালতি এবং শেয়ার-মার্কেট করেন। দুর্ভিক্ষ এবং সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের উর্ধ্বে এঁর অবস্থান ; তাই চোখে মুখে নাকে কানে অব্যাহত প্রশান্তি।

চাকর টেবিলে চা দিয়ে গেল, ধোঁয়ায় তার সুরভি গিয়ে ঢুকল ছিনাথ আর কানুর নাকে। চায়ের যে এমন গন্ধ হ'তে পারে, তা এদের জানবার কোন সুযোগও হয় নি, অবকাশও মেলে নি। একবার কেশে নিয়ে কানু বললে, খাসা খোসবু তো !

নরু বাঁড়ুজ্জে নীরবে আত্মস্ফীতির ক্ষীণ হাসি হাসলেন। বেতারে সংবাদটুকু পাছে ফসকে যায়, এইজন্যে উত্তর দিলেন না। মেয়ে চপলা ঘরে ঢুকে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে নেহাৎ ব্যবহারিক কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, বাবা, তুমি রাতে লুচি খাবে, না রুটি ? বাবার উত্তরের জন্য কোনরকম উদ্বেগ প্রকাশ না ক'রেই চপলা পাশের টিপয়ে রাখা 'বেতার-জগৎ'খানা তুলে নিয়ে দেখতে গিয়ে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব'লে উঠল, সময়মত একখানা নতুন 'বেতার-জগৎ' তুমি আর কিছুতেই কিনে উঠতে পারলে না বাবা। নরু বাঁড়ুজ্জে সে কথাতেও নির্বাক। চপলা চকিতে সেদিক থেকে মুখ ফেরাতেই চোখে প'ড়ে গেল চাষী দুজন—তার দিকে নিক্ষিপ্ত-দৃষ্টি। তাদের শ্রদ্ধাহীন বিস্ময়ের আঘাতে অপমানিত, অথচ আদৃত হয়ে সে কি করবে ভেবে ঠিক না করতে পেরে ঝপ ক'রে গিয়ে বেতারের প্লাগ খুলে দিলে ; বললে, কী ওই একঘেয়ে দাঙ্গার খবর শুনছ ? তার চেয়ে—

নরু একটু বিরক্ত মুখে বললে, এদের দুজনকে দু কাপ চা পাঠিয়ে দাও গে। আর আমি লুচিই খাব।

এখন আবার চা ?

কানুর বয়স বেশি। সে ক্ষুব্ধ বিস্ময় কাটিয়ে ভদ্রতার আবেগে ব'লে উঠল, না না, বাবু, আমাদের চা খাওয়ার—

নরু। হরিকে বল না, ক'রে দেবে।

আচ্ছা, মাকে বলি গে।—ব'লে বেতারের প্লাগ লাগিয়ে দিতেই গান বেজে উঠল, প্রিয় হে প্রিয়, ফিরাবে কি শূন্য হাতে···

শান্ত, তাই চোখে কোন ভাবই প্রতিফলিত হয় না। যে চোখ শরৎপ্রভাতের সৌরকরোজ্জ্বল শিশির-বিন্দুর মত ঝলমল করত, সে চোখ যেন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে, যেন উর্মিমুখর সাগর একটা প্রাকৃতিক বিপ্লবে শান্ত হয়ে গিয়েছে।

চুপচাপ ব'সে আছি দুজনে মুখোমুখি। সময় বা ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্ঞান আমার ছিল না, এমন কি দেহের অস্তিত্ব পর্যন্ত মন থেকে মধ্যে মধ্যে লোপ পেয়ে যেতে লাগল। শুধু মনে হতে লাগল, আমি যেন একটা চিন্তার যন্ত্র মাত্র, আমার মধ্যে ব'সে কে যেন চিন্তার চক্র ঘুরিয়ে চলেছে।

এই রকম চলেছে, হঠাৎ দিদিমণি দু হাত দিয়ে আমার মাথাটা ধ'রে তার দিকে আমাকে আকর্ষণ করলে। আমি সেদিকে একটু এগিয়ে গিয়ে চোখ বুজে ফেললুম। মনে হ'ল, এবার বুঝি তার গাম্ভীর্যের আবরণ খ'সে গেল, সেই আগেকার মতন আমার মাথাটা আদরে চেপে ধরবে! কিন্তু অনেকক্ষণ ধ'রে মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সে বললে, চুলগুলো সব পেকে গেছে যে!

খাবার ডাক পড়ল। উঠে গিয়ে বারান্দার মতন একটা জায়গায় খেতে বসলুম। কি খেলুম, খেলুম কি না-খেলুম, তাও মনে নেই, উঠে এসে আবার সেই মাদুরে বসলুম।

কিছুক্ষণ বাদে দিদিমণি, বোধ হয় খাওয়া-দাওয়া সেরে, আমার কাছে এসে বসল।

বেলা প'ড়ে আসতে লাগল। টাঙ্গাওয়ালা এসে তাড়া দিয়ে বললে, তার কাছে বাতি নেই, অন্ধকার হয়ে গেলে রাস্তায় পুলিসে ধরবে।

দিদিমণিকে বললুম, এবার যেতে হবে।

দিদিমণি কিছুই বললে না। কোথায় যেতে হবে, কোথায় থাকি—কোনও প্রশ্নই নয়।

বিদায়ের আগে তার হাত দুখানা ধ'রে কাছে নিয়ে এলুম, দেখলুম, বাঁ হাতের তর্জনীমূলে সেই গভীর ক্ষতচিহ্ন জ্বলজ্বল করছে।

আমার মূর্ছিত অতীত চমকে উঠে বিস্মিত বর্তমানের দিকে চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে হাত দুখানা তার কোলের ওপরে নামিয়ে দিলুম।

উঠি উঠি করছি, এমন সময় দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলে, পরিতোষ কোথায়?

পরিতোষ নেই শুনে সে কোনও কথাই বললে না। আবার দেখলুম, সে চোখে কোন আলোড়নই নেই।

টাঙ্গাওয়ালা আর একবার তাড়া দিতেই উঠে পড়লুম। দিদিমণিও আমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। বিদায়ের সময় বললুম, দিদিমণি, তোমার কি অর্থকষ্ট আছে? আমার কাছে কোনও সঙ্কোচ ক'রো না। বল, অর্থের প্রয়োজন থাকে তো আমি রয়েছি, তোমার কোনও ভাবনা নেই।

দিদিমণি বললে, গোবিন্দের ইচ্ছায় আমার কোনও অভাব নাই।

প্রণাম ক'রে টাঙ্গায় গিয়ে উঠলুম।

দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত

"মহাস্থবির"

পদচিহ্ন

পঁচিশ

কাশীর বউ নিত্য রাত্রে কাজকর্ম শেষ ক'রে বই পড়েন। আগে পড়তেন উপন্যাস, কাব্য, নাটক; এখন আর ওসবে তাঁর রুচি যেন চ'লে গেছে, এখন পড়েন পুরাণ। রাধাকান্তবাবুর যে সমস্ত শাস্ত্র-পুরাণ সংগ্রহ ছিল, সেইগুলি তিনি একে একে শেষ করছেন। একবার পড়া তাঁর হয়ে গেছে, আবার সেগুলিকে ঘুরিয়ে পড়তে শুরু করেছেন। তিনি আজ পড়ছিলেন শ্রীমদ্‌ভাগবতের বঙ্গানুবাদ। পড়ছিলেন ধ্রুবোপাখ্যান। উত্তানপাদের প্রথমা মহিষী সুনীতির বেদনা তাঁর জীবনের বেদনার সঙ্গে যেন এক সুরে বেজে ওঠে। ধ্রুবের তপস্যার সার্থকতায় সুনীতির দুঃখের অবসানে তাঁর সকল ক্ষোভ যেন শান্ত হয়ে যায়।

খানিকটা সাদৃশ্যও আছে। কাশীর বউ যখন নতুন বউ হিসেবে এ গ্রামে এলেন, তখন এখানকার নারী-সমাজ তাঁকে দেখে চমৎকৃত হয়ে উঠেছিল। শহরের রুচি, শহরের শীলতা, জীবনবাদের নূতন আদর্শ নিয়ে তিনি এসেছিলেন; লেখাপড়ায় সেলাইয়ে তাঁর নৈপুণ্য, কথায় বার্তায় নূতন ভাষা নূতন ব্যঞ্জনা, এখানকার নারী-সমাজকে বিস্মিত এবং মুগ্ধ ক'রে তুলেছিল। পাড়ার বউয়েরা, তরুণী ঝিউড়ী মেয়েরা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে ঘিরে একটি মণ্ডলীর সৃষ্টি করেছিল। রাধাকান্ত ছিলেন, চারিপাশের সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা তিনিই ব্যর্থ ক'রে দিতেন। রাধাকান্তকে প্রভাবান্বিত ক'রে কাশীর বউ তাঁর মধ্য দিয়ে শুধু নারী-সমাজেই নয়, পুরুষের সমাজের মধ্যেও নিজেকে প্রসারিত ক'রে দিতেন। কিন্তু নবগ্রামের জীবন-নাট্যের বিগত অঙ্কের শেষের দিকে

গোপীকান্তের ছেলেদের পূর্ণপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবস্থা হয়ে পড়ল অবহেলিত সুনীতির মত।

পবিত্রের বধূ এসেছে কলকাতা থেকে। ধনীর কন্যা, সুন্দরী; বেশ-ভূষায় প্রসাধনকলায় কাশীর বউ অপেক্ষা অনেক গুণে পারদর্শিনী; লেখাপড়ায় কাশীর বউয়ের সমকক্ষ তিনি নন, কিন্তু তার প্রয়োজন নবগ্রামের নারী-সমাজে ছিল না। নাটক-নভেলগুলি পড়ার মত এবং চিঠি লেখার মত লেখাপড়া জানাই এখানে যথেষ্ট। তা তিনি জানেন। অন্য দিকে নবগ্রামের জীবনে পবিত্র যে নূতন সুর যোজনা করছে—আভিজাত্যে, বেশ-ভূষার উন্নততর পারিপাট্যে, ললিতকলার চেষ্টায়, নাট্যাভিনয়ের রোমান্সের মধ্য দিয়ে, তাতে পবিত্রের বধূ ধরিত্রীরাণীই ছিলেন উজ্জ্বলতর আদর্শ। তার উপর গোপীচন্দ্রের পুত্রবধূ, নবগ্রাম-অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মর্যাদা ও প্রতাপশালী পরিবারের বধূ হিসাবে এখানকার নারী-সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মান ও আকর্ষণের পাত্রী হয়ে উঠেছিলেন।

কাশীর বউয়ের মত সেকালের রূপকথার গল্পে তাঁর রুচি নাই, মুখে গল্প তিনি বলতে পারেন কি না কেউ জানে না, তবে মুখে গল্প তিনি বলেন না। তাঁর বাড়িতে প্রচুর উপন্যাস নাটক ও গল্পের বই আছে, তিনি তা পড়তে দিয়ে থাকেন এবং দুপুরবেলা মজলিস ক'রে প'ড়েও থাকেন। তিনি এখানে নববধূরূপে এসে একখানি গান গেয়েই এখানকার তরুণী-সমাজের মনোহরণ ক'রে নিয়েছিলেন। এখানকার নারী-সমাজের নিয়মানুসারে নতুন বউ এলে দুপুরে পাড়াঘরের মেয়েরা এসে মজলিস ক'রে বসেন, কন্যার বাড়িতে আসরে বা নতুন জামাইয়ের আসরে বরকে যেমন গান গাইতে হয়, তেমনই নতুন বউকেও গান গাইতে হয় শ্বশুরবাড়ির তরুণীদের আসরে; বয়স্কা গুরুজনেরাও আড়ালে আশেপাশে থেকে লুকিয়ে সে গান শুনে থাকেন। ধরিত্রীরাণীকে গান গাইতে বললে, তিনি গেয়েছিলেন—

হেসে নাও দুদিন বই তো নয়,
কে জানে কার কখন সন্ধ্যা হয়!

গানখানি সেই দিনই চুপিচুপি অনেক বউ-ঝি নূতন বউয়ের কাছে লিখে নিয়েছিল। ধরিত্রীরাণী ক্রমে ক্রমে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধেও তিনি অনেকটা সচেতন। বিশেষ ক'রে পত্নী বর্তমানে

বিবাহ, বউদের উপর শাশুড়ী-ননদের অবিচার-অত্যাচার সম্পর্কে তিনি কঠিন সমালোচনা ক'রে থাকেন। কটু স্পষ্ট কথা বলতেও তিনি দ্বিধা করেন না।

কাশীর বউ ভাগবতের ধ্রুবোপাখ্যান পড়ছিলেন। হঠাৎ ধরিত্রীরাণী এসে উপস্থিত হলেন। আশ্চর্য হয়ে গেলেন কাশীর বউ।

বাইরের দরজার কড়াটা যে ভাবে নড়েছিল, তাতেই তিনি অনুমান করেছিলেন, আগন্তুক যে-সে নয়।

বই থেকে মুখ তুলে তিনি প্রশ্ন করলেন, কে ?

আমি, বড় বাড়ির ঝি—মঞ্জরী। দোর খুলুন।

ঝি মঞ্জরী অত্যন্ত প্রতাপশালিনী ঝি। গৃহকর্ত্রী গিন্নীমা অর্থাৎ গোপীচন্দ্রের পত্নীর কাছে তিরস্কৃতা হয়ে পাড়া মাতিয়ে ভগবান অদৃষ্ট এবং বড়লোককে তিরস্কার করে, তার পক্ষে ওই ভাবে কড়া নাড়াটা স্বাভাবিক। একটু হাসলেন কাশীর বউ নিজের মনেই। কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে উঠে দাঁড়ালেন, এত রাত্রে কি প্রয়োজন ? তবু অধীর হওয়া তাঁর স্বভাব নয়, ধীরভাবে এসেই তিনি দরজা খুলে দিলেন এবং বিস্মিত হয়ে গেলেন। মঞ্জরীর পিছনে পবিত্রের বউ ধরিত্রীরাণী দাঁড়িয়ে।

এ কি ?—নিজেকে সংযত ক'রে কাশীর বউ বললেন, এত রাত্রে তুমি ?

হেসে ধরিত্রী বললেন, কেন ? আসতে নেই ?

আছে বইকি। কিন্তু আস না তো।

চল, বাড়ির ভিতরে চল।

নবগ্রামে গোপীচন্দ্রের ছেলেরা প্রবল প্রতাপে অধিষ্ঠিত হ'লেও এ সমাজের বিগত দিক্‌পালদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ ক'রে চলতে সাহস করেন না। সমাজের মধ্যে যথেষ্ট সম্ভ্রম ক'রেই চলতে হয়। অবশ্য সে সম্ভ্রম তাঁদের ঔদার্য এবং সদাচারের নিদর্শন। কীর্তিচন্দ্র এবং পবিত্র পূজনীয়দের 'আপনি' ব'লেই সম্বোধন ক'রে থাকেন, কিন্তু ধরিত্রী সম্বন্ধে এবং বয়সে কনিষ্ঠ হয়েও 'তুমি' বলেন সকলকে।

ধরিত্রী বললেন, আমাকে উনি পাঠালেন তোমার কাছে।

পবিত্র ? কেন ?

ধরিত্রী কাশীর বউয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কিছু মনে ক'রো না, আগে থেকেই ব'লে রাখছি, তোমাদের ভালর জন্যেই পাঠিয়েছেন তিনি।

বল।

জান নিশ্চয়, আজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছিলেন?

হ্যাঁ। আজ অনেক উৎসব হ'ল, শুনেছি।

হ্যাঁ। গার্ডেন পার্টি দিলেন সাহেবকে। ওআর ফাণ্ডে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিলেন। রবি ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, তাও ছিল।

কাশীর বউ কোন উত্তর দিলেন না। হাসলেন একটু—ভদ্রতাসম্মত হাসি।

গৌরীকান্ত একটা পদ্য লিখেছিল, সাহেব তার প্রশংসা করেছেন। উনিও প্রশংসা করছিলেন। বলছিলেন, ভবিষ্যতে ভাল লিখতে পারবে। কিন্তু—কিন্তু কামদেববাবু সি. আই. ডি. এসেছিলেন, তিনি ওঁকে গৌরীকান্ত সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। তোমার ভাই—রবি তো এখান থেকেই অ্যারেস্ট হয়েছিল, তখন থেকে তোমাদের উপর নজরও আছে পুলিসের।

হেসে কাশীর বউ বললেন, তার তো উপায় নেই। এমন কি আজ যদি বলি—রবি আমার ভাই নয়, কিংবা ভাই ব'লে তাকে স্বীকার করি না, তবুও তো ওরা তা মানবে না।

তা তো মানবেই না ভাই। যে গর্ত থেকে একটা সাপ বেরোয়, সে গর্তের উপর নজর যে রাখবেই গৃহস্থ।

সেই কথা তো আমিও বলছি। অন্যায় তো বলছি নে।—হেসে উঠলেন কাশীর বউ।

ধরিত্রীরাণী ভুরু কুঁচকে বললেন, তোমার ছেলের আচার-আচরণ সম্বন্ধে নানা কথা উঠেছে। হেডমাস্টার ওঁকে বলেছেন, কামদেববাবু বলেছেন তুমি তাকে একটু সাবধান ক'রো।

কাশীর বউ চুপ ক'রে রইলেন।

ধরিত্রী বললেন, আচ্ছা, গৌরীর কাছে কি নলিনী বাগচী ব'লে কোন ছেলে আসা-যাওয়া করে?

কাশীর বউ তার মুখের দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে বললেন, না।

কথা বলার ভঙ্গীটা ধরিত্রীরাণীর ভাল লাগল না; কাশীর বউয়ের চোখের চাউনিটাই কেমন যেন উদ্ধত; কিন্তু এমন কথায় কোন শঙ্কা প্রকাশ না ক'রে সেই কুঞ্চিত ভ্রূর নীচে তীক্ষ্ণ নিঃশঙ্ক দৃষ্টি ধরিত্রীরাণীকে রূঢ় আঘাত দিলে। গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, না হ'লেই ভাল। কিন্তু হ'লে সাবধান হ'য়ো ভাই। দিনকাল বড় খারাপ। ও দিকে যুদ্ধ লেগেছে। এ দিকে এই সব

হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ছেলের দল নানান উৎপাত জুড়েছে। গভর্মেণ্ট এখন এস
একবারেই সহ্য করবে না। কলকাতায় সরকারী গুদাম থেকে বন্দুক গুলি চুরি
গিয়েছে। ওঁকে চুপিচুপি সায়েব বলেছেন, এ জেলাতেও নাকি কতকগুলে
বন্দুক গুলি এসেছে। চারিদিক খানাতল্লাস হবে। গ্রামের হিত চান, কল্যা
চান, কারও অহিত অকল্যাণ হয় এ চান না, তাই আমাকে তোমার কাছে
পাঠালেন। আবার গভর্মেণ্টের কাছেও তো দায়িত্ব আছে। এখানে কো
কিছু যদি বের হয়, তবে সায়েব বলবেন—অমুকবাবু, আপনি থাকতে আপনা
গ্রামে এই সব কাণ্ড!

কাশীর বউ হেসে বললেন, বুঝেছি ভাই। যা বললে তুমি, তাতে না-বোঝবা
কি আছে? পবিত্র দীর্ঘজীবী হোক, ভগবান তার উন্নতি করুন দিন দিন
জেলায় দেশে তার খ্যাতি বাড়ুক। এ কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে
গৌরীকান্তকে আমি সাবধান ক'রে দেব।

ধরিত্রীরাণী উঠলেন। কাশীর বউয়ের শেষের কথাগুলি ভাল লেগেছি
তাঁর। প্রসন্ন মনেই উঠে বললেন, হ্যাঁ, তাই ক'রো। তা হ'লে উঠলাম।

উঠানে নেমে খানিকটা গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, হ্যাঁ, আর একট
কথা—

মঞ্জরী ঝি আফিং খায়, সন্ধ্যে থেকেই তার আমেজ লাগে, এতক্ষণ ধ'রে সে
ব'সে আপন মনে ঢুলছিল, উঠে লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে সে নারাজ; বাড়ি
পুরনো ঝি, পবিত্রের বউকে পাল্কি থেকে নামতে দেখেছে, তার উপর সে হ'
মঞ্জরী, সে বললে, তোমার বাপু ভারি বদ স্বভাব। কথা বলতে লাগলে আ
ফুরোবে না। বউমানুষ, বড়লোকের ঘরের লক্ষী, এই রাত্রে এর-ওর বাড়ি
যাব! কথা কইতে লাগবা তো থামবা না! সে আলোটা নামি
উঠানেই ব'সে পড়ল। ব'সে ঘুমানোর তার চমৎকার অভ্যাস করা আছে।

ধারিত্রীরাণী বললেন, তোর বড্ড বাড় বেড়েছে মঞ্জরী।

কাশীর বউ বাধা দিয়ে বললেন, ওর কথা ধ'রো না। ওর চিরটা কা
একভাবে গেল।

না না। ওর বড্ড বাড়। কি বললে বল তো? এর-ওর বাড়ি!
হারামজাদী তো পুরনো লোক, এইখানেই তো তিন কাল কাটল, কার বাড়ি
এসেছি হারামজাদী জানে না?

যেতে দাও ভাই। তাতে কোন দোষ হয় নি। আমি কিছু মনে করি নি।

একটু স্তব্ধ থেকে কাশীর বউ হাসলেন, হেসে বললেন, তুমি হয়তো কিছু মনে করবে, নইলে একটা সত্যি কথা বলতাম।

কেন, সত্যি কথা শুনে কিছু মনে করব কেন?—ভ্রূভঙ্গী ক'রে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন ধরিত্রীরাণী। তারপর আবার বললেন, বল, শুনি।

হেসেই কাশীর বউ বললেন, ওরাই হ'ল সংসারের খাঁটি মানুষ, ওরাই বলে খাঁটি কথা। ওরা ইটকে বলে ইট, পাথরকে বলে পাথর, ইটে পাথরে বড় বড় বাড়ি তৈরি হ'লে সে বাড়িকে খাতির করে, অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, আবার বাড়ি ভেঙে ইট-পাথর ছড়িয়ে পড়লে ইট-পাথরকে ইট-পাথরই বলে, ভাঙা বাড়ির দিকে চেয়েও দেখে না আমাদের মত, সে বাড়ির ইট-পাথর কুড়িয়ে সাজিয়েও রাখে না। ওরাই হ'ল খাঁটি মানুষ।

ধরিত্রীরাণী স্তব্ধ হয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ, কথাগুলির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগগুলি তাঁর সমস্ত অন্তরের ঘন সান্নিধ্যে এসেও স্পর্শ না ক'রে কোন আঘাতের প্রত্যক্ষ অপরাধ এড়িয়ে শুধু চারিপাশে খেলা ক'রে অত্যন্ত একটা অস্বস্তিকর অনুভূতিতে তাঁকে যেন অভিভূত ক'রে দিয়েছিল। এর উত্তরে কোন রূঢ় কথা বলা যায় না। কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে তিনি চুপ ক'রে রইলেন।

কাশীর বউই বললেন, আর একটা কথা কি বলছিলে?

বলছিলাম তোমাদের ওই ভাগ্নে-গোষ্ঠীর চারুর কথা। মেয়েটাকে শ্বশুর-বাড়ি পাঠায় না কেন? অত্যন্ত ধিঙ্গী মেয়ে। ওঁর কাছে শুনছিলাম। এর পরে শেষ পর্যন্ত একটা কেলেঙ্কারি না হয়ে যাবে না। ও তো তোমার কাছেই আসে যায়, কি শিক্ষা দিচ্ছ ওকে?

হঠাৎ কথার সুর স্বর সব পরিবর্তন ক'রে ধরিত্রীরাণী বললেন, কি জানি, তোমার আবার মত-টতই আলাদা। গোয়ালপাড়ার সেই কুলত্যাগিনী মেয়েটা—সেই ষোড়শী—সে পর্যন্ত তোমায় প্রণাম করতে আসে, তুমি তাকে ঘরে বসতে দাও—

ধরিত্রীরাণী আর দাঁড়ালেন না। মঞ্জরীকে একটা ঠেলা দিয়ে ডাকলেন, এই, ওঠ্। ব'সে ব'সেই ঢুলছে!

মঞ্জরী চমকে উঠে আলোটা নিয়ে পিছনে পিছনে ছুটল। ধরিত্রীরাণী সম্ভবত মনের আবেগের বেগেই খানিকটা দ্রুতপদক্ষেপে চলেছিলেন।

কাশীর বউ বাইরের দরজা বন্ধ ক'রে একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কিছু ভেবে নিলেন। ভাদ্র মাসের রাত্রি, আকাশে চাঁদ ডুবে গিয়েছে, কাটা-কাটা মেঘ জমা হচ্ছে চারিদিকে, কোথায় কোন্ দিক্‌প্রান্তে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তার দীপ্তিতে ঘন ঘন চকিত হয়ে উঠছে রাত্রির অন্ধকার। এর মধ্যে ঘুম থেকে তুলবেন? তাঁর মাতৃহৃদয় বেদনাতুর হয়ে উঠল।

মা!—মৃদু চাপা গলায় ডাকলে কেউ।

কাশীর বউ দ্রুত এগিয়ে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, উপরের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে নলিনী, সন্ধ্যায় যে তরুণটি প্রান্তরের মধ্যে গৌরীকান্তের সঙ্গে ব'সে আবৃত্তি করছিল—ওরে তুই ওঠ্ আজি, আগুন লেগেছে কোথা।

নলিনী! তুমি কি ঘুমোও নি বাবা?

ঘুমিয়েছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল কথাবার্তার সাড়ায়।

গৌরীকান্ত?

সে ঘুমুচ্ছে। আমি সব শুনেছি মা।

শুনেছ সব?

হেসে নলিনী ছেলেটি বললে, শুনেছি। আমি এখুনি বেরিয়ে যাব মা।

এখুনি? এই রাত্রে? আকাশের দিকে চেয়ে দেখেছ?

দেখেছি। কিন্তু উপায় কি? একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, বৃষ্টি খুব জোর না হ'লে সুবিধেই হবে আমার। অল্পস্বল্প বৃষ্টির মধ্যে আমিও দিব্যি এগিয়ে যাব, কারও সঙ্গে দেখাশুনোও হবে না।

কিন্তু গাড়ি? গাড়ি তো গোয়ালপাড়ায়। শেষরাত্রে গাড়ি আনবার কথা আছে।

গৌরীকান্তকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে চ'লে যাব। ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।

কাশীর বউ চুপ ক'রে থাকলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি ভাবছিলেন, এই দুর্যোগের মধ্যে গৌরী ফিরবে কি ক'রে? কিন্তু কোনও উপায়ও নাই। নলিনীই বললে, অপেক্ষা করবার তো উপায় নাই, ভোররাত্রি পর্যন্ত পুলিস যদি বাড়ি ঘিরেই ফেলে, তখন কি করব? আমি গৌরীকে ডাকি। আপনার সেই ঝুলিয়ে-রাখা বড় কুমড়োটা আমি নেব আর কিছু তরকারি।

বড় একটা কুমড়ো। তার মাঝখানে তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়ে চৌকো একটা ফালি সুকৌশলে কেটে তার ভিতর থেকে বীজগুলো বের ক'রে তার মধ্যে পুরে দিলে ছুটো পিস্তলের খোলা অংশগুলি, তারপর আবার সেই চৌকো অংশটি কুমড়োর মধ্যে টিপে চেপে লাগিয়ে দেওয়া হ'ল ; একটা ঝুড়ির মধ্যে সেটিকে রেখে, তার ওপর কিছু পুঁইশাক, কিছু আলমপুরী ডাঁটা-জাতীয় শাকের ঝাড়, কিছু আলু চাপিয়ে হেসে নলিনী বললে, দেশের বাড়ির শাক-সব্জি নিয়ে চললাম। চমৎকার মিষ্টি কুমড়ো। আহা, এমন কুমড়ো আর হয় না! কুমড়ো দীর্ঘজীবী হোক। গৌরীকান্ত, তুমি ব্যাগটা নাও। আমি এটা মাথার উপরে তুললাম।

কাশীর বউ বললেন, গৌরী, তুই বরং গোয়ালপাড়াতেই রাত্রিটা থেকে যাস।

নলিনী বললে, না। ভাববেন না, ওকে আমি গ্রামের ধার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে গিয়ে রওনা হব।

চ'লে গেল ওরা। টিপিটিপি বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে ততক্ষণে। কাশীর বউ দরজা বন্ধ ক'রে খোলা বইখানার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে ব'সে রইলেন।

ষোড়শীর খুড়তুতো ভাইকে ব'লে রেখেছে গৌরীকান্ত। তার বন্ধু যাবে গরুর গাড়ির দুর্গম পথে কাটোয়া। এ দিকটায় রেলপথ নাই। ষোড়শী যে ভক্তি ক'রে থাকে কাশীর বউকে এবং গৌরীকান্তকে যে গভীর স্নেহ করে, তা তার আত্মীয় এবং জ্ঞাতিদের মধ্যেও সংক্রামিত বা সঞ্চারিত হয়েছে। ষোড়শী তাদের বংশের লজ্জা কলঙ্ক, কিন্তু এই দীর্ঘকালে সে লজ্জা সে কলঙ্ক পুরানো ক্ষতের মত স'য়ে গিয়েছে। শুধু সহ্য হয়ে যাওয়াই নয়, ভিক্ষুকের ক্ষতের মত জীবিকানির্বাহে সহায়তা করার জন্য যত্নের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। ষোড়শী এখন তাদের সাহায্য ক'রে থাকে। যখন দেশে ঘরে আসে, তখন নানা জনকে নানা সামগ্রী দেয়। নেয় না শুধু রঙলালের ছেলেরা। তার বড় ছেলে নবীন চাকরি করছে কীর্তিচন্দ্রের ঘরে, এক ছেলে এম. এ. এবং ল পরীক্ষা দিয়েছে এবার। এক ছেলে ম্যাট্রিক দেবে। তাদের আচার আচরণ গ্রাম থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে আজকাল। কিন্তু বাকি সকলে গোপনতার ছল ক'রে প্রকাশ্যেই ষোড়শীর দেওয়া জিনিস গ্রহণ ক'রে থাকে। খুড়তুতো

ভাইদের নামে মনিঅর্ডার আসে, তারা সাক্ষী রেখেই সই ক'রে টাকা নেয়। কথা ওঠেই না। উঠলে বলে, টাকাটা তাদের ষোড়শীর বাপের কাছ থেকে প্রাপ্য ছিল। ষোড়শী নিজে ব'লে গেছে ভাইদের, কাশীর মায়ের কাজ শত কাজ ফেলে ক'রে দিও। নইলে আমার সঙ্গে ভাল হবে না।

শুধু সে ভয়ই দেখায় না, পুণ্যের লোভ দেখিয়ে বলে, এমন মানুষ আর হয় না। টাকা দেখে, মাথা নুইয়ে যা করিস তার ফল এপারে পাবি, কিন্তু ওপার তো আছে, ওই মা লক্ষ্মীর কাজ ক'রে দিলে ওপারে ফল পাবি।

এ ছাড়াও ষোড়শীর ভাই আরও একটা কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। যেদিন ষোড়শী গ্রামের লোকের—ওই নবীন প্রমুখদের সমালোচনায় বিদ্রোহ ক'রে গ্রাম ছেড়ে চ'লে গিয়েছিল নবগ্রামে কীর্তিচন্দ্রের আশ্রয়ের সন্ধানে, যেদিন পথে সে স্বর্ণবাবুর ভাগিনেয় অমূল্য এবং লক্ষ্মীকান্তের হাতে পড়েছিল, কিশোরবাবু উদ্ধার ক'রে নিয়ে গিয়ে রেখেছিলেন এই কাশীর মায়ের আশ্রয়ে, সেদিনকার কথা। এমন মেয়েকে এমন স্নেহে যে মা আশ্রয় দেয়, সে মায়ের প্রতি তারা শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা পোষণ না ক'রে মানুষ ব'লে কোন্ মুখে পরিচয় দেবে? যে মা আজও ষোড়শীকে কন্যা ব'লেই সমাদর ক'রে ঘরে বসতে দেন, জল খেতে দেন, ষোড়শীর ভাই হয়ে তারা সে মায়ের অনুগত না হয়ে তাঁর কাজ না ক'রে দিয়ে পরকালে কি কৈফিয়ৎ দেবে? তার পরে আছে গৌরীকান্তের নিজের আকর্ষণ। প্রতি রবিবার এই ভালঘরের ছেলেটি আরও কয়েকটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বস্তা কাঁধে তাদের দোরে এসে দাঁড়ায় হাসিমুখে, ভিক্ষের মত নিয়ে যায় মুঠির চাল। ওই চাল গরিব-দুঃখী গৃহস্থদের গোপনে পৌঁছে দেয়। এই সব কারণেই এই পরিবারটির সঙ্গে গৌরীকান্তদের একটি অসঙ্কোচ দাবি করার মত সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছে। ষোড়শীর খুড়তুতো ভাই রসরাজ গৌরীকান্তকে এত ভালবাসে যে, তার নিজের রসরাজ নামকে বদলে সানন্দে গৌরীকান্তের দেওয়া 'অশ্বরাজ' নাম স্বীকার ক'রে নিয়েছে। সে এক কৌতুকের কথা। রাধাকান্তবাবুর মৃত্যুর পর, গৌরীর বয়স তখন আট কি দশ,—সেবার হয়েছিল 'অর্ধোদয়' গঙ্গাস্নানের যোগ। কাশীর বউ গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন রসরাজের গো-গাড়ি ভাড়া ক'রে। রসরাজের সঙ্গে গৌরীকান্তের সেই প্রথম পরিচয়। অন্যান্য গাড়োয়ানেরা রসরাজকে 'অস' 'অস' ব'লে ডাকছিল। গৌরীকান্ত শব্দটার অর্থ বুঝতে না

চপলা স্থির হয়ে গেল চেয়ারে।

নরু ডেকে উঠলেন, হরি! হরি আসতেই বললেন, দু কাপ চা ক'রে এনে দে এদের।

কানু। ছেড়ে দ্যান বাবু। চা তো আমাদের খাওয়া অব্যেস নেই।

অতি ভদ্র অথচ কঠিন আদেশের স্বরে নরু বললেন, অভ্যাস না থাকলেও খেতে দোষ কি? তোমরা যে আজ আমার অতিথি।

ছিনাথ এতক্ষণে কথা কইল, তাইলে অতিথকে দুটো মুড়ি-ধুড়ি দিতে বলুন ক্যানে বাবু? ও চা-পানিতে আমাদের ক্ষিদের কিছু হয় না।

নরু বড় লজ্জিত হয়ে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, এদের জল খেতে দেওয়া হয় নি?

চপলা গান শোনার এই বারম্বার ব্যাঘাতে চঞ্চল হয়ে উঠে চ'লে গেল ঘর থেকে। ছিনাথের বয়েস কম, তাই মুখের বাঁধও কম; ব'লে ফেললে, আপনার এ মেয়েটি বড় বেয়াড়া বাবু।

কানু। এই ছিনাথ!

নরু কথাটি শুনেও না শুনে ছিনাথকে বললেন, ওইটে একটু খুলে দাও তো হে।

বেতারে তখনও গান হচ্ছে—সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে··

ছিনাথ। ওসব কল-কব্জার ব্যাপার বাবু, ছুঁতে ডরাই। ও তো বলদের ল্যাজে মোচড় মারা নয়। ওটি পারব না।

তোর সব তাতেই ভয়!—ব'লে কানু উঠে প্লাগটায় এক টান মারতেই এদিকে তারে টান প'ড়ে ছোট্ট বেতার-যন্ত্রটি প্রথমে একটু হেলে তার পরেই দুম ক'রে নীচে প'ড়ে গেল। ব্যাপারটি ঘটল ক্ষণিকেই। নরু বাঁড়ুজ্জে লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে। কানু একান্ত অপ্রস্তুত হয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে ভূলুণ্ঠিত বেতার-যন্ত্রটিকে আঁকড়ে ধরতে যেতেই তিনি ব'লে উঠলেন, রাখ রাখ, আর কেরামতি দেখাতে হবে না। তখনই জানতুম—। তারপর সম্ভবত-ভগ্ন যন্ত্রটা স্বস্থানে তুলে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ছিনাথ। বলনু, তা শোনা হ'ল না। ওসব বাবুদের জিনিস; হাত দিতে গিয়ে কেন বেকুব হওয়া?

ভেতর থেকে চপলার কণ্ঠ পাওয়া গেল, বাবা যত চাষাভুষো জুটিয়ে

পেরে রসরাজকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার নাম কি? রসরাজও উত্তর দিয়েছিল, আমার নাম, দাদাভাই, 'অসআজ'। বহু গবেষণা ক'রে দশ বছরের গৌরীকান্ত স্থির করেছিল, নামটির শুদ্ধ রূপ নিশ্চয়ই অশ্বরাজ, অর্থাৎ ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা। সে তাকে এর পর ডাকতে শুরু করেছিল 'অশ্বরাজ' ব'লে। কয়েকবার শুনেই কাশীর বউ সচেতন হয়ে গৌরীকান্তের ভুল সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু রসরাজ প্রাণ খুলে হেসে বলেছিল, না না, আপুনি আমাকে 'অশ্বরাজ'ই ব'লো দাদাভাই। সত্যিই আমি ঘোড়ার মতন হাঁটতে পারি। গৌরীর প্রতি স্নেহের গাঢ়তার জন্যই বোধ হয়, সে পুলকিতচিত্তে পাড়াঘরে সকলকে তার এই দাদাভাইটির দেওয়া অভিনব নামটি জানিয়েছিল।

গোয়ালপাড়া ঢোকবার মুখেই নলিনী থমকে দাঁড়াল। গৌরীকান্ত প্রশ্ন করলে, দাঁড়ালেন কেন? মৃদুস্বরে নলিনী বললে, একটা কথা। যাবার কথা ভোররাত্রে। এখন সবে বোধ হয় এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা। বৃষ্টি নেমেছে। এর মধ্যে যেতে চাইবে রসরাজ?

গৌরী বললে, আমি বলব, যেতে হবে রসরাজদা। তা হ'লে আর আপত্তি করবে না।

আপত্তি না করুক, সন্দেহ করবে। আর আপত্তিই বা করবে না কেন? এত তাড়া কিসের?

নলিনীর কথা সত্য, আপত্তি করবে। সে বললে, আপত্তি প্রত্যাহার করলেও সন্দেহ একটা হবে, গভীর সন্দেহই ক'রে বসবে। সে সন্দেহ সম্বন্ধে এখন কোন অনুমান করতে না পারলেও পরে পুলিস যদি তাদের বাড়ি খানাতল্লাস করে কিংবা এ অঞ্চলে কোন তদন্ত হয়, তখন রসরাজ ঘটনাটা স্পষ্ট বুঝতে পারবে, তাতে সন্দেহ নাই।

নলিনী বললে, কি করা যায় বল তো?

গৌরী ভাবতে লাগল।

গৌরী!

ভাবছি নলিনীদা।

তুমি তো কবিতা লেখ, মিথ্যে একটা গল্প বানাতে পারছ না? আচ্ছা, যদি বলা যায়—সন্ধ্যেবেলা একটা টেলিগ্রাম এসেছে, এখুনি রওনা হতে হবে!

তাই বলা যাবে, চলুন।

রসরাজ সত্যই বিস্মিত হয়ে গেল। এই মধ্যরাত্রে এই বৃষ্টি মাথায় ক'রে এই কি রওনা হবার সময়! রসরাজ বললে, এই জল মাথায় ক'রে কেন এলে দাদাভাই? ছি ছি ছি! চল, আগে মায়ের কাছে যাব আমি। মা যদি বলেন তো যাব। কি এমন জরুরী কাজ, বল তো?

নলিনী বলতে যাচ্ছিল টেলিগ্রামের কথা। কিন্তু তার আগেই গৌরীকান্ত বললে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার রসরাজদা, বললে তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না।

আশ্চর্য ব্যাপার! কথাটা শুনেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল রসরাজ।

গৌরীকান্তের মাথায় চট ক'রে একটা রোমাঞ্চকর অলৌকিক রহস্যময় কৈফিয়ৎ-কাহিনী গজিয়ে উঠেছে। সে বললে, বাড়িতে কমলদার মায়ের নিশ্চয় খুব অসুখ, বাঁচেন কিনা সন্দেহ। হয়তো বাঁচবেন না রসরাজদা। নলিনীকে এখানে সে 'কমল' ব'লে ডেকে থাকে।

বাঁচবেন না! অসুখ! কি বলছ দাদাভাই? এই তো সনজেবেলা কিছু বললে না!

টেলিগ্রাম এসেছে ভাই।—নলিনী ব'লে উঠল।

গৌরী বললে, না না। রসরাজদার কাছে মিথ্যে কথা বলবেন না দাদা। ওকে সত্য কথা বলুন। কখনও অবিশ্বাস করবে না।

নলিনী অবাক হয়ে গেল। গৌরীকান্ত ব'লে গেল, এই দেখ রসরাজদা, বলতে আমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠছে। আমরা দুজনে খেয়ে শুয়েছি সবে, গল্প করছি, হঠাৎ জানলার পাশে একখানি মুখ ভেসে উঠল। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে যেন, আর দুই চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমিই প্রথম দেখে চমকে উঠে ওঁকে গা টিপে দেখালাম। উনি চমকে উঠে ডেকে উঠলেন, মা!

সেই মুখ তখন বললে, বাড়ি আয় বাবা। তোর অপেক্ষায় প্রাণটা আমার বেরুচ্ছে না। তারপরই মুখ মিলিয়ে গেল। উনি জিনিসপত্র ফেলে তখুনি একলা হেঁটে চ'লে যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু মা যেতে দিলেন না। আমাকে বললেন, তুই নিয়ে যা রসরাজের কাছে, বলবি আমার নাম ক'রে, যেন একটুও দেরি না ক'রে গাড়ি ছাড়ে।

অভিভূত রসরাজ কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে হঠাৎ ব'লে উঠল, উঠুন, গাড়িতে উঠে বসুন।

গৌরী বললে, একটু ঘুরে আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে চল, আমি নেমে যাব। গ্রামে ঢুকতে হবে না। না না, ওটুকু আমি দিব্যি চ'লে যাব।

নলিনী গৌরীকান্তকে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

মা জেগে স্তব্ধ প্রতীক্ষায় বর্ষণ মাথায় ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন ছাদের আলসের উপর ভর দিয়ে। কিছুক্ষণ বই পড়ার চেষ্টা ক'রেও পারেন নি, দোতলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল, ঘরের ভিতর আলোটা জ্বললে জানলায়, তাঁকে দেখতে পাবে বাইরে থেকে। আলোটা মৃদু ক'রে বইয়ের আড়াল দিয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন পথের দিকে। তারপর উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন ছাদে আলসেতে ভর দিয়ে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎচমকের মধ্যে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। তবে মাটির কারুর দৃষ্টি এই বৃষ্টির মধ্যে এই রাত্রে ওখানে পড়বে না বা পড়ছে না। আকাশের তারা থাকলে তারা তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত, কিন্তু তারাও নাই। কাশীর বউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন জটিল ঘটনাচক্রের কথা। আকাশ থেকে যে বিদ্যুৎ পৃথিবীর বুকের দিকে নেমে আসে, সে খুঁজে খুঁজে তাকে যারা ধরতে পারে এমন সমুন্নতশির বস্তুকে খুঁজে বেড়ায়। কচিৎ কখন মাঠের উপর মানুষ জানোয়ারের উপর পড়ে বটে, কিন্তু আকাশস্পর্শী বনস্পতির মাথায় মাথায় শিহরণ তুলে সে কোন একটির মধ্য দিয়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করে। বন্যার জল নদীর শাখায় উপশাখায় সঞ্চারিত হয়। নলিনী ছেলেটি এখানে ফুটবল-ম্যাচ খেলতে এসে গৌরীকান্তের সঙ্গে আলাপ ক'রে বাড়িতে এসে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করে। রবিবাবুর দিদি হিসেবে তাঁকে প্রগাঢ় ভক্তি জানায়। রবির ভাগ্নে হিসেবে গৌরীকান্তকে বলেছিল, ভাগ্নেরা মামার মতই হয়ে থাকে। আকাশ থেকে মাটির দিকে খ'সে-পড়া বিদ্যুতের মত খুঁজে খুঁজে এই নবগ্রামের মাঠের একক শিশু তালতরুর সঙ্গে তুলনীয় গৌরীকান্তকে আশ্রয় করেছে। যখন তিনি সমস্ত জানলেন, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। গৌরী ভিতরে ভিতরে অনেকটা জড়িয়ে পড়েছে। কেমন ক'রে ফেরাবেন ভেবে পান না।

মধ্যে মধ্যে বিপ্লবীদের মরণোন্মাদনাময় খেলার কাহিনী প'ড়ে উত্তেজনায় মনে হয়, কি করবেন ফিরিয়ে ? কখনও কখনও অতি বিষণ্ণতার মধ্যে তিনি কল্পনা ক'রে থাকেন, গৌরীকান্ত ধরা পড়েছে, তার—। শিউরে ওঠেন তিনি বার বার ঘাড় নেড়ে অস্বীকার ক'রে বলেন, না না। তবু তাঁর অন্তরের নিষ্ঠুর বিক্ষুব্ধ কল্পনা নিরস্ত হয় না। তিনি কল্পনায় দেখেন, সচকিত নবগ্রামের মানুষের চোখে ফুটে উঠেছে নূতন দৃষ্টি। নবগ্রামের গ্রামলক্ষ্মীর মুখ ওই ঐশ্বর্যসম্পদময় গোপীচন্দ্রের কীর্তিভূমি থেকে স'রে এসে রাধাকান্তের এই বিগতশ্রী ভবনটির মধ্যে গৈরিকপরিহিতা রুদ্রাক্ষশোভিতা ভাস্বরদৃষ্টি ভৈরবীর মুখশ্রীতে উদ্ভাসিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁর পাদপীঠে রিক্তা সেবিকার মত তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। নূতন দৃষ্টি লাভ ক'রে এ অঞ্চলের মানুষেরা দলে দলে এখানে ছুটে আসছে—

মা!—ডাকলে গৌরীকান্ত।

অন্য কারুর দৃষ্টিতে না পড়লেও গৌরীকান্তের দৃষ্টি ঠিক তাঁর উপর পড়েছে। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সে খুঁজছিল দোতলার আলোকিত জানলায় প্রতীক্ষমানা মাকে। জানলায় আলো না পেয়ে ইতস্তত দৃষ্টি ফেরাবার সময় বিদ্যুচ্চমকের মধ্যে মাকে আলসের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেয়েছে।

চমকে উঠে আপনাকে সংযত ক'রে নেমে গেলেন কাশীর বউ। ছাতা সত্ত্বেও সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে গৌরীকান্তের। সিক্তদেহ সন্তানকেই বুকে চেপে ধ'রে কাশীর বউ কেঁদে ফেললেন।

কাপড়-চোপড় ছেড়ে গৌরীকান্ত শুয়ে পড়ল।

গৌরীকান্তের ঘুম যখন ভাঙল, তখন তার মনে হ'ল, সব যেন অস্পষ্ট, সব যেন অর্থহীন, সমস্ত কিছুকে যেন চিনেও সে চিনতে পারছে না।

চিনতে পারলে সে কয়েকজন অপরিচিত লোককে, তাদের বেশ-ভূষা দেখে চিনলে, তারা পুলিস।

তারা বেরিয়ে গেল। একটি মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল। কে?

মেয়েটি তার মুখের উপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলে, গৌরীকাকা, চিনতে পারছ আমাকে?

গৌরীকান্ত ঘাড় নাড়লে। মেয়েটি চারু। তার শৈশব-সঙ্গিনী চারু। গৌরীকান্তের বাড়ি আজ খানাতল্লাস হয়ে গেল। পাওয়া কিছুই যায় নাই। কোন অসম্মান বা কোন রূঢ় আচরণও পুলিস করে নাই। পবিত্র এবং মণিভূষণ সারাক্ষণ উপস্থিত ছিল। কাশীর বউকে যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তার মধ্যে তারা তুজনে পাশে দাঁড়িয়ে অভয় দিয়ে বলেছে, ভয় কি! যা জানেন বলুন।

গোটা জেলাটার মধ্যে পুলিস নানা জায়গায় খানাতল্লাস করেছে।

রডা কোম্পানির অর্ডারী বিশেষ ধরনের জার্মান মসার পিস্তল, রাইফেল পিস্তল কাস্টম হাউস থেকে চুরি গিয়েছে। একজন বিপ্লববাদী ধরা পড়েছে আসানসোলে। সন্ধানে সন্ধানে এই জেলায় তার মাসীর বাড়ি খানাতল্লাস ক'রে কয়েকটা পিস্তল পেয়েছে। মেয়েটির নাম দুকড়িবালা। বোনপোর এই জিনিসগুলিকে দেবদুর্লভ বস্তুর মত যত্ন করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। নিত্য ঝাড়ামোছার জন্যই লোকের নজরে পড়ে, এবং কথাটা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে পুলিসের কাছে পৌঁছয়। কিন্তু যতগুলি পিস্তল এখানে পাওয়ার কথা, তার চেয়ে কয়েকটি কম পাওয়া গেছে। অস্পষ্ট আভাসে তারা গৌরীকান্তের বাড়ি পর্যন্ত এসেছে। গৌরীকান্ত প্রবল জ্বরে অজ্ঞান। নিউমোনিয়ার লক্ষণ পরিস্ফুট। কাশীর বউকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে পুলিস সন্তুষ্ট হয়েছে। তিনি স্থির অথচ বেদনাতুর দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে চেয়ে অকম্পিত কণ্ঠস্বরে বলেছেন, না। না। না। না।

গ্রামের মেয়েরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। গ্রামের ছেলেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে ভবিষ্যৎকালের জীবনোচ্ছ্বাসের একটা ঢেউ কেমন ক'রে যেন বর্তমানের জীবনতরঙ্গের মাথায় ভেসে উঠেছে।

কাশীর বউয়ের এই বিব্রত অবস্থায় রুগ্ন গৌরীকান্তের বিছানার পাশে চারু এসে বসল।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত [দাস]
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ [দাস] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৪

পাগল

আমাদের সাধারণ কথাবার্তায় 'পাগল' কথাটা আমরা সকলেই খুবই ব্যবহার ক'রে থাকি। আপাত অসম্ভব কেউ কিছু বললেই তখনই বলি, তুমি পাগল হয়েছ, না তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, এ রকম কখনও হয়? আজই সকালে রাস্তায় হেঁটে যেতে যেতে শুনলুম, একজন যুবক আর একজনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে, আরে, রমেশটা পাগল, তার কথায় তুমি অত বিচলিত হচ্ছ কেন? পাগল কথাটা যে খুবই একটা চলতি সাধারণ কথা, সেটা মেনে নিতে নিশ্চয়ই আপনাদের কোন অমত হবে না। কিন্তু এখন যদি আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি, পাগলামি কথাটার সত্যিই মানে কি, উন্মাদ কাকে বলে; আপনারা হয়তো একটু ইতস্তত করবেন, আমার বুদ্ধি-বিবেচনা সম্বন্ধে একটু সন্দিহান হবেন এবং শেষকালে আমার উদ্দেশ্যেই বলবেন, পাগল তুমিই, কারণ এত সহজ কথাটার অর্থ যখন তুমি বোঝ না, তখন তোমার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে। আমি পাগল—এ কথা মেনে নিতে আমার একটুও আপত্তি নেই। কারণ ওই দোষ একটু আছে ব'লেই তো সংসারে সমাজে আপনাদের সকলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারছি এবং চলেছি এতদিন। একেবারে পুরোপুরি স্বাভাবিক cent per cent normal লোক পৃথিবীতে আছে কি? সেটাই তো একটা ভাববার কথা। কবি সেইজন্যেই না বলেছেন—

"পাগলকে যে পাগল ভাবে,
এখন সে পাগল কি ঐ পাগল পাগল
একদিন সেটা বোঝা যাবে।
নয় কে পাগল ভুবন 'পরে?"

যাই হোক, আমার সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত মেনে নিলেও আপনারা পাগলামি শব্দটির যে অর্থ করেছেন—মাথার গোলমাল হওয়া, অর্থাৎ বুদ্ধির বা বিবেচনা-শক্তির বা যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বিচার করবার ক্ষমতার অভাব হওয়া, এটা একেবারেই স্বীকার করা যায় না। কেন যায় না, সেটা দেখবার একটু চেষ্টা করি।

এমন হতে পারে, যে সব পাগল আপনারা দেখেছেন, তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা সাধারণত যা হওয়া উচিত, তার চেয়ে কম। তর্কের খাতিরে যদি ধ'রেও নেওয়া যায় যে, পাগল মাত্রেরই বুদ্ধি কম, তা হ'লেও কিন্তু বলা যায় না যে, যার বুদ্ধি-বিবেচনাশক্তি কম, সে-ই পাগল। যেমন সব গাধাই চতুষ্পদ ব'লে চতুষ্পদ

জন্ত মাত্রই পাখী—এ সিদ্ধান্ত করা যায় না। এটা হ'ল স্থায়শাস্ত্রের কথা। কিন্তু ঘটনার দিক থেকে দেখলেও আমরা দেখতে পাই যে, এমন অনেক পাগল আছে, যাদের যুক্তি-তর্ক করবার ক্ষমতা কোন অংশে কম তো নয়ই, বরং তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন আইন-ব্যবসায়ীর চেয়েও বেশি। তাদের বুদ্ধি সব সময়েই সজাগ এবং অতীব প্রখর। তর্কে তাদের পরাস্ত করা সুকঠিন ব্যাপার। কয়েক বৎসর পূর্বে একজন দরিদ্র যুবক মনে করতেন যে, বাংলা দেশের এক বিশিষ্ট ধনী পরিবারের কন্যা তাঁকে ভালবাসেন এবং তাঁকে তাঁদের বাড়ি গিয়ে দেখা করতে ইশারায় জানিয়েছেন। ময়লা কাপড়-চোপড় প'রে সে যুবকটি একদিন তাঁদের বাড়িতে প্রবেশও করেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করায় তাঁর আসবার কারণ যে তাঁর প্রেমপ্রার্থিনী ধনীকন্যার সঙ্গে গোপনে দেখা করা, সে কথাও বলেছিলেন। ফল কি হয়েছিল, তা অবশ্য আর বলবার দরকার নেই। কিন্তু আমি যে বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটা হচ্ছে এই যে, সেই যুবকটি অঙ্কশাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। শক্ত শক্ত অঙ্ক, যা বহু ছাত্রের এবং অনেক শিক্ষকেরও মাথা ঘুরিয়ে দেয়, তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিনা আয়াসেই ক'ষে ফেলতে পারতেন। এঁর বুদ্ধি বা যুক্তিযুক্ত বিচার করবার ক্ষমতা ছিল না—এ কথা নিশ্চয়ই বলবেন না। এমন কি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কইলে সহজে ধরতেই কেউ পারত না যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর কোন তফাত আছে। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে যদি সেই ধনী ব্যক্তির বা তাঁর কন্যার কথা কেউ তুলত, তখনই হ'ত গোলমাল। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, কন্যাটি সত্যই তাঁকে খুব ভালবাসত। যতই তাঁকে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করা যেত যে, এ ব্যাপার অসম্ভব, কিছুতেই তাঁকে বোঝানো যেত না। তর্ক তিনিও কিছু কম করতেন না, আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন যে, তাঁর ধারণা সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত এবং এর মধ্যে অসম্ভব কিছু ছিল না। যাই হোক, ইনি উন্মাদই বটে, তবে বুদ্ধিহীনতা এঁর উন্মত্ততার কারণ একেবারেই নয়। যুক্তি-তর্কের প্রণালীতে তাঁর দোষ ছিল না, দোষ ছিল তাঁর ভিত্তিতে। আর সেই ভিত্তি হচ্ছে তাঁর একটা ভ্রান্ত বদ্ধমূল ধারণা। প্রশ্ন আমাদের সেইখানে। কেন, কি ক'রে এ রকম একটা ভুল ধারণা তাঁর অন্য বিষয়ে স্বাভাবিক মনকে এ রকম ভাবে অধিকার ক'রে বসল?

ওই যে লোকটি একেবারে নির্বিকারভাবে চুপ ক'রে ব'সে রয়েছে, কথা জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় না, শোনেও না, খেতে দিলে খায় না, তার বাড়ি-ঘর

সব পুড়ে গেছে—এ খবর দিলে কোন রকম ভাবান্তর দেখা যায় না, সব সময়ে কি চিন্তা করছে ও? চিন্তা কিছু করছে কি? ও লোকটিও একদিন সহজ লোক ছিল। সমাজে চলাফেরা কাজকর্ম করত, কিন্তু ক্রমশ ক্রমশ যেন বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল, নিজের মধ্যে নিজেকে যেন গুটিয়ে নিতে লাগল। প্রথম প্রথম বাইরের ডাকে মনটা তার মাঝে মাঝে সাড়া দিত। এখন তো একেবারে অসাড়। নিজের কল্পিত পৃথিবীতে সে বাস করছে, বাইরের পৃথিবীর কোন অস্তিত্বই তার কাছে আর নেই। ওকেও তো উন্মাদই বলতে হবে, কিন্তু কেন, কি ক'রে এ অবস্থায় ও এসে পড়ল?

আবার ওই যে ও-লোকটি একদণ্ড স্থিরভাবে নেই, অনর্গল কি সব আবোল-তাবোল ব'কে যাচ্ছে, হাসছে, চেঁচাচ্ছে, রেগে যাচ্ছে, হাত-পা ছুঁড়ছে, নাচছে, ও কি, ও-ও তো উন্মাদ? একটি কথা ওকে জিজ্ঞেস করুন, ও দশটি অসম্বদ্ধ প্রলাপ আপনাকে শুনিয়ে দেবে। আবার দু দিন বাদে ওকে দেখুন, অত্যন্ত বিমর্ষভাবে ঘরের কোণে চুপ ক'রে ব'সে আছে, মাঝে মাঝে বিড়বিড় ক'রে কি বলছে, কি যেন ঘোরতর অন্যায় কাজ করেছে এই ভাব। কখন কখন অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থা, আবার কোন কোন সময়ে গভীর হতাশার চিহ্ন।

আরও অনেক বিভিন্ন রকমের উন্মাদ আপনারা দেখেছেন। গণনায় দেখা যায়, আমাদের দেশে উন্মাদের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অবস্থার কোন প্রতিকারের বা উন্মাদদের আটক ক'রে রেখে তাদের চিকিৎসার কোন বিশেষ চেষ্টা কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বেহারে রাঁচির মেণ্টাল হস্পিটালের মত বাংলা দেশে কটা হাসপাতাল আছে? অসঙ্গত না হ'লেও এ বিষয়ে এখন আর কিছু বলব না; শুধু সমাজ-নেতাদের একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এ কথাটা ভেবে দেখবার সময় হয়েছে।

আজ উন্মত্ততাকে মানসিক ব্যাধি ব'লে বিজ্ঞান বর্ণনা করে। কিন্তু এ ধারণা বেশি দিনের নয়। কিছু দিন আগেও লোকে মনে করত, পাগল যারা তাদের ওপর হয় কোন দেবতা বা অপদেবতা, বেশির ভাগ শেষোক্তটিই, ভর করেছেন। তাই তাদের ব্যবহার এমন অলৌকিক। আমাদের দেশে পাড়াগাঁয়ে এই বিশ্বাস এখনও অনেকেরই আছে। ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, এই কলকাতা শহরেই পাশের বাড়ির একটি বউয়ের হিষ্টিরিয়া রোগ সারাবার জন্যে "রোজা" ডাকা হয়েছিল, এবং সে এসে নানা রকম প্রক্রিয়া করেছিল, সে কথা এখনও

আমার মনে পড়ে। প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রধান ছিল ঝাঁটার দ্বারা প্রহার। ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও 'ডাকিনীদের' যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করতে হ'ত। কোন কোন বৃদ্ধার "কুদৃষ্টি" (evil eye) আছে ব'লে লোকে মনে করত, তাদের ডাইনী (witches) বলত। ডাইনীরা তাদের সেই দৃষ্টির বলে অন্য লোকের, বিশেষত ছোট ছেলেমেয়েদের, অসুখ-বিসুখ প্রভৃতি নানা রকম ক্ষতি করে—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে লোকেরা সে সময়ে তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করত। উন্মাদদের ডাইনী-জাতীয় জীব ব'লেই বিবেচনা করত এবং তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থাও ওই একই রকমের ছিল। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে যখন দেখা গেল যে, মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে তার বুদ্ধির বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তখন চিকিৎসকেরা মনে করলেন, উন্মত্ততা মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের বিকার মাত্র। সুতরাং উন্মাদদের শারীরিক নিগ্রহের পরিবর্তে তাদের মস্তিষ্কের চিকিৎসারই প্রয়োজন। এই তত্ত্ব সাধারণত আমরা সকলেই স্বীকার ক'রে নিই, তাইজন্যে পাগলামির মানে 'মাথা-খারাপ হওয়া' বলি। এই তত্ত্ব যদিও সম্পূর্ণ সত্য নয়, প্রচারের ফলে একটা সুফল হ'ল এই যে, পাগলামি রোগটা বৈজ্ঞানিক আলোচনার বস্তু হয়ে পড়ল এবং পাগলদের আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা, ধরন-ধারণ বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে চিকিৎসকেরা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। লক্ষণ হিসাবে পাগলামির নানা রকম শ্রেণী বিভাগ হ'ল এবং বিভিন্ন রকমের পাগলের ভিন্ন ভিন্ন রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে লাগল।

সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের সময় এই তথ্যই শিখলেন এবং এই তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে যে চিকিৎসাপন্থা, ব্যবসায় আরম্ভ করবার সময় সেই পন্থাই অনুসরণ করলেন। অভিজ্ঞতার ফলে শীঘ্রই কিন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এই পন্থা ভ্রমাত্মক এবং কার্যকরী আদৌ নয়। পাগলামির সংজ্ঞা, শ্রেণীবিভাগ, চিকিৎসাব্যবস্থা, এমন কি মূল তথ্যের ভেতর কোথাও না কোথাও গলদ আছে, যার জন্যে প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় রোগ সারে না। তিনি এও লক্ষ্য করেছিলেন যে, এ সম্বন্ধে অন্য অনেক অভিজ্ঞ মানসিক-রোগ-চিকিৎসকের মতও তাঁর মতেরই অনুযায়ী। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, তাঁরা এ বিষয়ে গবেষণা করার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না এবং চিরাচরিতভাবে চিকিৎসা ক'রে যাওয়াই পছন্দ করতেন। ফ্রয়েড কিন্তু এ অবস্থা মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন সত্যকে নিষ্পেষিত ক'রে জেনে শুনে মিথ্যার

গতানুগতিক পথে চলতে রাজী হ'ল না। উন্মাদ সম্বন্ধে সত্য কি, তা জানবার জন্যে তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল জেগে উঠল, তিনি এ বিষয়ে গভীর গবেষণা আরম্ভ করলেন। আজ পাগলদের সম্বন্ধে মানসিক-ব্যাধি-চিকিৎসকগণ যা কিছু নতুন জ্ঞান অর্জন করেছেন, তার অধিকাংশই সেই গবেষণার ফল, ফ্রয়েডের অমূল্য দান।

কি সে নতুন জ্ঞান? সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। প্রথম কথা, উন্মত্ততা মানসিক রোগ বটে, কিন্তু মানুষের মন শুধু বুদ্ধির ভেতর দিয়েই তো আত্মপ্রকাশ করে না। বাসনা, কল্পনা, প্রক্ষোভ (emotions), চলা-ফেরা, কথা কওয়ার ধরন-ধারণ, অন্য লোকের প্রতি ব্যবহার, পছন্দ-অপছন্দ, ভালবাসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি সব তো মনেরই কাজ, এ সবের ভেতর দিয়েও তো ব্যক্তিবিশেষের মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং এগুলির কোন একটির বিকার হ'লে তাকে মানসিক বিকার ব'লেই বর্ণনা করতে হবে। এক সময়ে অবশ্য ধারণা ছিল যে, এ সবগুলিই আসলে বুদ্ধির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত—বুদ্ধিই হ'ল মানুষের বিশেষ গুণ, যার বলে সে নিজেকে জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে তফাত করে এবং নিজেকে চালিত করে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। বুদ্ধি যাকে বলি, তা জন্তু-জানোয়ারদেরও আছে, এবং মানুষ বুদ্ধির চেয়ে অন্য প্রবৃত্তির বশেই চলে বেশি। শেষের কথাটা অপ্রিয় হ'লেও সত্য। নিজেকে নিজে প্রতারণা করবার চেষ্টা না ক'রে, নিজের কাজকর্ম যদি একটু বিশ্লেষণ ক'রে দেখেন, কথাটা যে সত্য, তা সহজেই উপলব্ধি করবেন। লোকটা সব সময়েই একটা না একটা অপকর্ম করছে, অতি বদমায়েশ, সেইজন্যেই তো আপনি তাকে দেখতে পারেন না। আচ্ছা, ঠিক তাই কি? না, আপনি ওকে দেখতে পারেন না (যে কোন কারণেই হউক), সেইজন্যেই ওর দোষ-ত্রুটি এত আপনার চোখে পড়ে? কথায় বলে না—'যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা'।

একটু আগে যে সব মনের প্রবৃত্তির কথা বললুম, তার অল্পস্বল্প বিকার প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে। কেউ কাঁঠাল একেবারেই খেতে পারেন না, কারুর মতে কাঁঠালের মত সুস্বাদু ফল পৃথিবীতে আর নেই। আমি একজনকে জানি, তিনি মনে করেন, কেরোসিন এবং পেট্রোলের মত মিষ্ট গন্ধ কোন ফরাসী সেন্টেও নেই। এ তো হ'ল রুচির বিকার। একজন ইতিহাসে বিখ্যাত বীরপুরুষ মাকড়সা দেখলে ভয়ে আঁতকে উঠতেন। কোন একটি লোক হাঁড়িকাঠে জন্তু-জানোয়ারের বলি দেওয়া দেখবার সুযোগ পেলে আনন্দে

আনবে! ভাঙবে না তো কি হবে? দেখ আবার, রাতে চুরি ক'রে পালায় কি না!

এ কথায় কেউ প্রতিবাদ করলে না।

কানু রইল মাথা নীচু ক'রে আর ছিনাথ উঠল দাঁড়িয়ে; তার বয়েস কম, তাই চোখ দুটোয় ঘনাল হিংসা, রূপকে বলা চলে—জ্ব'লে উঠল। কাস্তে আর লাঙল-ধরা হাতে শক্ত হয়েই রইল মুঠো। একটু পরে ছিনাথ আপন মনেই বললে, দেখে লোব কেমন ক'রে ধান আদায় করে! গতর খাটিয়ে ফসল ফলাব আর বছরে একবার পদার্পন ক'রে ফসলের আদ্দেক নিয়ে আসবেন! তার ওপর আবার চোর! দেখে লোব এবার!

কানু। ক্যানে বকছিস ছিনাথ? এসব কতা কানে গেলে অন্ ভাগীদারকে জমি বিলি ক'রে দেবে, তখন?

দেয় যেন তাই একবার। চোর, অ্যাঁ, চোর!

চোর না হ'লেও চাষা তো আমরা বটি।

যে চাষ করে, সেই চাষা। বলি চোরই যদি হব, তা হ'লে বাবুদের পেট চলছে কেমন ক'রে? ধান তো সব ইচ্ছে করলেই মেরে দিতে পারি। চাষা! চাষা না হ'লে তো চলে না!

ওরে, খেটে খেলেই লোকে হেনস্থা করে।

নরুবাবুর ছেলে একেন্দ্র, ডাক-নাম এঁদো, ঘরে ঢুকেই চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে এদের দিকে তাকিয়ে বললে, কানাই আর শ্রীনাথ, তোমাদের গ্রামে সাম্প্রদায়িক মনোভাব কি রকম?

সাম্প্রদায়িক মনোভাব কথাটা এরা বোঝে না; অত বড় কথার প্রয়োজন এদের জীবনে কখনও হয় না।

এঁদো ব্যাপারটা আন্দাজ ক'রে ব'লে উঠল, আরে, তোমরা নীচে ব'সে কেন? এস এস, এই তো এতগুলো চেয়ার রয়েছে। কাছাকাছি না বসলে কথা বলার সুবিধে হয় না।

একটু আগেই ঘনিষ্ঠ হতে যাবার ফলে যে অপমান সইতে হয়েছে, তার পরে আবার এই ঘনিষ্ঠতার বাবু-সুলভ প্রচেষ্টায় এরা শঙ্কিত হয়ে উঠল; চেয়ারে এসে বসবার কোনও লক্ষণই দেখালে না কেউ।

তা হ'লে আমাকেই নীচে নেমে বসতে হয়।—ব'লে এঁদো নামতে যেতেই

আত্মহারা হতেন, আর সেইজন্যেই দিবারাত্র কসাইখানার আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতেন। এ হ'ল প্রক্ষোভের বিকার। কিন্তু যে বুদ্ধির আমরা বড়াই করি, তার বিকার কি আমাদের কাজকর্মের ভেতর পাওয়া যায় না? বাইরের দৃষ্টান্ত দিই। সাহেবেরা মইয়ের তলা দিয়ে ঘুরু না কেন, তেরো জন একসঙ্গে খেতে বসে না কেন? আমাদের হাঁচি, টিকটিকি, পেছু ডাকার কথা বললে আপনাদের বোধ হয় ইচ্ছে হবে তাদের সমর্থনের জন্যে অনেক যুক্তি-তর্ক তোলবার। রাজনীতিতে কোন একটি বিশেষ মত ও পথে আপনি দৃঢ় বিশ্বাসী, আপনার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অন্য পক্ষের লোকেরা, এমন কি গণ্যমান্য নেতারাও, কি ক'রে তাদের বুদ্ধিসুদ্ধি এমনভাবে হারিয়ে ফেলে যে, রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর যে একমাত্র যুক্তিযুক্ত সমাধান আপনার পথেই হতে পারে, তারা সেটা বুঝতে পারে না! আপনার বিপক্ষমতাবলম্বীদের আবার আপনার সম্বন্ধে ওই একই ধারণা। মনোবিদ্‌রা দু পক্ষের যুক্তি-তর্কের পেছনে একই রকমের মানসিক ক্রিয়াকলাপ দেখতে পান।

যাই হোক, পরস্পরের ভেতর এই ধরনের একটু-আধটু তফাতকে মানসিক রোগ বলা যায় না। যখন একজনের কোন একটি অযৌক্তিক বিশ্বাস ক্রমশ অন্য লোকের অসুবিধা করতে আরম্ভ করে, নিজের অন্যান্য কর্তব্যের ক্ষতি করতে আরম্ভ করে, তখনই সেটা রোগের দিকে যায়। খাওয়া হয়ে গেলে একবার ভাল ক'রে হাত-মুখ ধুলে হাত-মুখ পরিষ্কার হয়—এটা সাধারণ বুদ্ধিতে সকলেই বোঝে। কিন্তু যখন কেউ অন্য সবাইকার অসুবিধা ক'রে আধ ঘণ্টা ধ'রে পঁচিশবার হাত-মুখ ধুতে থাকে, তখন সেটা মানসিক রোগই বলতে হবে। যাঁদের বাড়িতে শুচিবাইগ্রস্ত বা গ্রস্তা কেউ থাকেন, এ ব্যাধির অত্যাচার তাঁদের যথেষ্ট ভোগ করতে হয়। এ রোগটা সংক্রামক কি না, সেটাও চিকিৎসকদের লক্ষ্য করা উচিত।

এই ধরনের লোককে আমরা বাই বা বায়ুগ্রস্ত বলি, উন্মাদ বলি না। কারণ এরা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগ রাখতে সমর্থ হয়। কিন্তু যখন এই সামর্থ্য নষ্ট হয়ে যায়, যখন সাপে কামড়াবার ভয়ে কোন লোক কলকাতার রাস্তায় চলতে পারেন না, বাড়িতেই নিজেকে আবদ্ধ ক'রে রাখেন; যখন বায়ুগ্রস্ত লোক জলের কল থেকে আর নড়তে পারেন না, জলে হাত-পা পচিয়ে ফেলেন, তখনই হন উন্মাদ।

উন্মাদদের মানসিক বৃত্তিগুলি সাধারণ মানুষের মানসিক বৃত্তি থেকে

ভিন্ন-জাতীয় নয়। তাদের কোন একটা বৃত্তি হয়তো অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে কাজ করে কিংবা হয়তো অত্যন্ত ক্ষীণবল। পরিমাণের তফাত গুণের তফাত নয়। যুক্তিবিরুদ্ধ বিশ্বাস আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু আছে, কিন্তু যতক্ষণ সেগুলো পাঁচজনের বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে নেওয়া যায়, ততক্ষণ তারা সমাজের কোন ক্ষতি করে না। সমাজও সেগুলো মেনে নেয়। আবার সে বিশ্বাসগুলো যদি যুক্তির ঘোরতর বিরোধী হয়, তা হ'লে আস্তে আস্তে তার পরিবর্তন হয়ে যায়। পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য ঘুরছে—এ কথা এখন আর কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু উন্মাদরা যে সব যুক্তিবিরোধী বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে চলে, সেগুলো প্রথমত কিছুতেই বদলায় না এবং দ্বিতীয়ত সমাজ যে সব বিশ্বাস মেনে নিয়েছে তার সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না, এবং তৃতীয়ত অনেক সময়ে সমাজের ক্ষতিকর। একজন উন্মাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, পাশের গ্রামের একজন তার ঘোরতর ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে, তাইজন্যে সে শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা ক'রে বসল। বলা বাহুল্য, পাশের গ্রামের সে লোকটি তাকে আদৌ চিনত না। উন্মাদের আর একটি লক্ষণ যে, তারা প্রায়ই নানা রকমের অলৌকিক দৃশ্য দেখে, বাণী শোনে। সে স্পষ্ট শুনতে পায় যে, আকাশ থেকে কে একজন আদেশ করছেন—এই কর, ওই কর। আর সে তাই করে।

স্নায়বিক দুর্বলতা কয়েক রকমের উন্মত্ততার কারণ। অত্যধিক মদ্যপানে কিংবা গাঁজা চণ্ডু চরস প্রভৃতি সেবনে স্নায়ুর ব্যাধি হতে পারে। কিন্তু যে সব উন্মত্ততার শারীরিক কোন ভিত্তি নেই, তাদের কারণ খুঁজতে হবে মানসিক ক্রিয়াকলাপের ভেতর। রুদ্ধ বাসনা, অবদমিত গূঢ়ৈষণা (repressed complexes) থেকেই তাদের উৎপত্তি। বিবেক এবং গূঢ়ৈষণার দ্বন্দ্বই এদের মূল। লেডী ম্যাক্‌বেথ পুনঃ পুনঃ হাত ধুতেন পরিষ্কার রাখবার জন্যে। কিন্তু ময়লা তো তাঁর হাতে ছিল না, ছিল মনে। তাঁর প্ররোচনাতেই ম্যাক্‌বেথ অতিথি ডান্‌কানকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেছিলেন। হাসপাতালে একজন রোগিণী ছিল, যে বলত যে, রাণী এলিজাবেথের বংশে তার জন্ম এবং ইংলণ্ডের রাণী হবার অধিকার একমাত্র তারই আছে। তার অনেক সৈন্য-সামন্ত আছে এবং অনবরত সে তাদের হুকুম দিচ্ছে—ফ্রান্স আক্রমণ কর, জার্মানি আক্রমণ কর, ইউরোপের সমস্ত দেশ ছেয়ে ফেল। কিন্তু তার একজন ভয়ানক শত্রু তাকে এই সব ঐশ্বর্য, ক্ষমতা প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত করতে চায়, সে-ই চক্রান্ত ক'রে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই। উন্মাদ হবার আগে

সে দাসীর কাজ করত, বেশ কঠিন পরিশ্রম তাকে করতে হ'ত এবং অনেক কষ্টও পেয়েছিল। প্রথম প্রথম সে দিবাস্বপ্ন দেখত যে, এ সব কষ্টের তার অবসান হয়েছে এবং সে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। ক্রমে সে এই স্বপ্নে নিজেকে হারিয়ে ফেললে। বাস্তব জগৎ থেকে এই বিচ্ছেদ যখন হ'ল, তখনই হ'ল সে উন্মাদ। প্রথমেই যে যুবকটির কথা বলেছিলুম, তাঁরও জীবনে ভালবাসা সংক্রান্ত একটা ঘটনা ঘটেছিল, যার স্মৃতি তিনি মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সফলকাম হন নি। প্রত্যেক উন্মাদের লক্ষণ-গুলি বিশ্লেষণ করলে অনেক সময়েই নানা রকমের অবরুদ্ধ গূঢ়ৈষণার সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ লক্ষণগুলি হয় অবরুদ্ধ বাসনার প্রতীকের সাহায্যে অভিব্যক্তি (symbolic expression), না হয় তার প্রেরণা থেকে নিজেকে বাঁচাবার কৌশল (defence reactions)। মোটের ওপর ভিত্তি হচ্ছে সংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান মনের দ্বন্দ্ব। কখনও কখনও কোন লোকের রুদ্ধ ইচ্ছা সব বাধা অতিক্রম ক'রে সোজাসুজি সংজ্ঞানে এসে উপস্থিত হয়, তখন সে লোকটি করতে পারে না এমন কাজ নেই। কারণ হিতাহিতজ্ঞান তখন তার আর থাকে না। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, সামাজিক জীবনেও এ রকম দুর্ঘটনা ঘটে। তখন সভ্যতার সংস্কৃতির সব বাঁধ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, মনের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলো নগ্নভাবে নিজেদের আত্মপ্রকাশ করে, তখন আমরা অ্যাটম বমের সাহায্যে যুদ্ধ করি, নির্মমভাবে পরস্পরের গলা কাটি, মহোল্লাসে লুঠতরাজ করি, পরমানন্দে পরের ঘর-বাড়ি জ্বালাই।

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র

পদচিহ্ন

ছাব্বিশ

মেয়েদের আসর বসেছিল পবিত্রবাবুর স্ত্রী ধরিত্রীরাণীর ঘরের সামনে দোতলার প্রশস্ত খোলা বারান্দায়। মেয়েরা অবশ্য সকলেই গ্রামের অভিজাত-ঘরের। বর্ত্তমানে অভিজাত বলতে নবগ্রামে ব্রাহ্মণ-বাড়িগুলিকেই গণনা করা হয়। কায়স্থ গ্রামে নাই, পাশের গ্রামে ননী দত্তরা আছেন—দত্ত উপাধির চেয়ে কবিরাজ উপাধিটাই এ অঞ্চলে সমধিক প্রচারিত। দত্তদের এ সমাজে খানিকটা স্বীকার করা হয়, খানিকটা হয় না। গন্ধবণিকেরা আছে, তাদের আদৌ স্বীকার করা হয় না। অন্য যারা আছে, তাদের কথা উঠেই না। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও সকলের স্থান এ সমাজে নাই। প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ জমিদার-বংশের সেই সমাজই আছে, পরিবর্তনের মধ্যে নেতৃত্বের পরিবর্তন

হয়েছে ; স্বর্ণবাবু বা রাধাকান্তবাবু বা বংশলোচনবাবুর বাড়ির মেয়েদের স্থানে নেত্রী হয়েছেন গোপীচন্দ্রবাবুর বাড়ির মেয়েরা। আর পরিবর্তন হয়েছে পুরাতনের স্থলে নূতনের, অর্থাৎ প্রবীণাদের স্থানে নবীনারা স্থান গ্রহণ করেছেন। পোশাকে পরিচ্ছদে পরিবর্তন হয়েছে, প্রসাধনে পরিবর্তন হয়েছে। আগেকার কালে রজনী ঠাকরুণ, অভয়া, অমূল্যের মা পরিষ্কার শাড়ি প'রে বেনে-খোঁপা বেঁধে সিঁদুরের টিপ প'রে এসে বসতেন, গহনার বাহুল্য খুব থাকত না ; একালে ধরিত্রীরাণী ও তাঁর ননদদের নেত্রীত্বে যেসব নবীনা এসে বসেছেন, তাঁদের সকলেই শেমিজের উপরে বাহারে-পাড় শাড়ি পরেছেন, সর্বাধিক আধুনিকারা পাতা কেটে চুল বেঁধেছেন, অন্য সকলে চুল বেঁধেছেন অ্যাল্‌বার্ট ফ্যাশনে ; গোপীচন্দ্রের বাড়ির এবং সম্পন্ন অবস্থার মেয়েদের গায়ে সোনার অলঙ্কারের প্রাচুর্য রয়েছে ; সাধারণ অবস্থার বাড়ির মেয়েদেরও আজকাল উঠেছে সোনার গহনা, তার মধ্যে শাঁখাবাঁধাটা প্রত্যেকের হাতেই রয়েছে, আর রয়েছে কড়ি-নেকলেস এবং কানে পার্সী মাকড়ি। কপালে সিঁদুরের টিপের পরিবর্তে কাচপোকার টিপ। সিঁথিতে সিঁদুর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। পান-জর্দার রেওয়াজ একালে ক'মে এসেছে।

জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ডাটের স্ত্রী আসবেন, আজকের আসরটা সাধারণ আসর নয়, সভা ব'লেই অভিহিত করা হয়েছে। নবগ্রামে 'মুক্তির আলো'-মহিলা-সমিতি গঠিত হবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী কমলা দত্ত বারো বৎসর বয়সে বিলেতে গিয়েছিলেন বাপমায়ের সঙ্গে, সেখানে দশ বৎসর ছিলেন, আই. সি. এস. দত্ত সাহেবের গৃহিণী হয়ে দেশে ফিরে অবধি এ দেশে একটি নারী-আন্দোলন আরম্ভ করবার চেষ্টা ক'রে আসছেন। কলকাতায় তাঁর প্রচেষ্টা খুব কার্যকরী হয় নাই, কারণ সেখানে এ আন্দোলন অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে এবং চলছে, তার নেত্রীত্বের আসনগুলির প্রত্যেকটিই অধিকৃত হয়ে রয়েছে। এই জেলায় এসে দত্তগৃহিণী তাঁর ক্ষেত্র পেয়েছেন। পশ্চাৎপদ সমাজে, ততোধিক পশ্চাৎপদ নারীসমাজে, জেলার রাজপ্রতিনিধির পত্নী হিসাবে স্বাভাবিকভাবে অবিসম্বাদী নেত্রী হয়ে তিনি মুক্তির আলোর বার্তা নিয়ে এসেছেন।

কমলা দত্তের সঙ্গে আসছেন কাদম্বিনী দেবী ; কাদম্বিনী দেবী এই গ্রামেরই কন্যা—শ্রীযুক্ত অমরবাবুর পত্নী। অমরবাবু বর্তমানে অধ্যাপনাবৃত্তি ছেড়ে কয়লার ব্যবসায়ে প্রচুর সম্পদ উপার্জনের ভূমিকা রচনা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে

জেলার মধ্যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন। তিনি নিজে দত্ত সাহেবের প্রতিটি কর্মে এবং কর্মপরিকল্পনায় সবল দক্ষিণ হস্তের মত পাশে থেকে কাজ ক'রে থাকেন। শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিতা না হ'লেও দীক্ষায় স্ত্রী কাদম্বিনীকে অমরবাবু নিজের যোগ্য সহধর্মিণীরূপে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন, এবং সে চেষ্টায় কৃতকার্যও হয়েছেন অনেকখানি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভূমিষ্ঠা পল্লীগ্রামের রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যাটিকে লেখাপড়ার দিকে বোধোদয়ের পর চারুপাঠ ও ফার্স্ট বুক শেষ করাতে তিনি পারেন নি; কিন্তু অধ্যাপক অমরবাবু অনেক ইংরেজী শব্দ তাঁকে শিখিয়েছেন এবং বিদেশে বন্ধু-বান্ধবদের সম্মুখে অসংকোচে বার হয়ে আলাপ ও আপ্যায়ন করবার মত উদারতার দীক্ষায় দীক্ষিতা করতে পেরেছেন। বর্তমানে ব্যবসায়ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে কাদম্বিনী কলকাতায় এসে প্রগতিশীল সমাজে মেলামেশার সুযোগ পেয়ে এদিক দিয়ে নিজের স্নায়ুগুলিকে সুদৃঢ় করতে পেরেছেন। জুতা অভ্যাস করেছেন, শেমিজের বদলে বডিজ ব্যবহার শিখেছেন, শাড়িও পরেন আধুনিক ধরনে, হাতে রিস্ট-ওআচ এবং কাঁধে ব্রোচও ব্যবহার করেন। অবশ্য এসবের ব্যবহার এতদিন কলকাতায় ঘরের বাইরে সমাজে সমিতিতে পোশাকী ব্যবস্থাই ছিল, স্বামীর গ্রামে অথবা পিত্রালয় নবগ্রামে যখন আসতেন, তখন ধরিত্রীরাণীরা যে ফ্যাশন যে রুচির নূতন তন্ত্র এখানে আমদানি করেছেন, সেই তন্ত্রমতেই চলতেন। বর্তমানে দত্ত সাহেব এ জেলায় আসা অবধি, স্বামীর গতির সঙ্গে গতির সমতা রেখে কাদম্বিনী দেবী, দত্তগৃহিণী কমলা দেবীর সকল কর্মপ্রচেষ্টায় তাঁর সহকারিণী হয়ে দেশেও নূতন পোশাকে নূতন ভঙ্গীতে অসংকোচেই চলাফেরা করছেন। দত্তগৃহিণী সর্বত্র তাঁকেই এ জেলায় নারী-সমাজের আদর্শরূপে নিজের পাশে সম্ভ্রমের আসন দিয়ে থাকেন। আজকের এই মহিলা-সমিতির প্রথম সভায় দত্তগৃহিণী সভানেত্রী এবং কাদম্বিনী দেবী হবেন প্রধান অতিথি। তাঁদের আনবার জন্য পবিত্রবাবু নতুন জুড়িগাড়ি নিয়ে সদরে গেছেন। যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন। সময় প্রায় হয়ে গেছে।

চারু এসে মজলিসের এক পাশে বসল। চারুর সমবয়সীরা সেই দিকটায় ব'সে ছিল। সমবয়সীর সংখ্যা অনেক। বউদের কথা বাদ দিয়ে গ্রামের ঝিউড়ি মেয়েই অনেক। এখনও এখানে কৌলিন্য প্রথার গৌরব এবং রেওয়াজ অটুট

আছে। কুলীনের ঘরের অধিকাংশ মেয়েকেই কৌলিন্য-মর্যাদা বজায় রাখার জন্ম দেশান্তর থেকে কুলীন সন্তান খুঁজে এনে সমর্পণ করা হয়, তাঁরা আগের মত কালে কস্মিনে এসে দু-চার দিন থেকেই সম্মানি নিয়ে চ'লে যান না, দু বছর তিন বছর অন্তর এসে ছ মাস আট মাস ধ'রে বাস করেন, তারপর একদা কাজের অজুহাতে স্থানান্তরে চ'লে যান। একালে জামাইদের মর্যাদাজ্ঞান সেকালের জামাইদের চেয়ে নিশ্চিতরূপে বেড়েছে; সেকালে জামাইরা অধিকাংশই অকপটভাবে উড়ে-কুলীন ছিলেন, একালে এঁরা উড়ে-কুলীন নন। রীতিমত বিংশ শতাব্দীর শার্ট-পরা, ছ-আনা-দশ-আনা-চুল-ছাঁটা, পাম্পশু-পরা ভদ্রলোক। ইংরিজীও জানেন। তবে নেহাত দেশের কুলগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে কুলীন কন্যাদায়গ্রস্তদের কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবার জন্য দুটো তিনটে চারটে পর্যন্ত বিবাহ করতে বাধ্য হন। এখানে এসে মাছ ধরেন, উপন্যাস পড়েন, গান-বাজনার আসরে যোগদান করেন। তবে গ্রামের অভিজাত যুবক-মণ্ডলীর মধ্যে স্থান পান না। নবগ্রামের যুবক শ্রেণীর অনেকেই কুলীন, তবুও তারা দুই বিবাহ করে না। কলকাতার হাওয়া নবগ্রামে সরাসরি এসে পৌঁছায়।

চারু বাপ-মায়ের এক সন্তান, সেই হেতু তার বাপ-মা অনেক চেষ্টা এবং খরচ ক'রে এই জেলার মধ্যেই সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়ি দেখে নিজেদের পালটি ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। পাত্রটির বয়স একটু হয়েছে—পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। প্রথমা স্ত্রী মারা যাবার খবর পেয়েই চারুর বাপ ছুটে গিয়ে সেখানে গিয়ে পড়েছিলেন এবং সেইখানেই কন্যাদানের জন্য সর্বস্ব পণ করেছিলেন। হোক বয়সের পার্থক্য উনিশ কুড়ি বছর, সতীন-কণ্টকে নিষ্কণ্টক ঘরের গৃহিণীত্ব-লাভ একাধারে আভিজাত্য এবং যুগোচিত সংস্কৃতিসম্পন্নতার পরিচায়ক, নারীর পক্ষে চিরন্তনকালের অপার সৌভাগ্যে ভাগ্যবতীত্বের লক্ষণ তো বটেই। এই সব কারণে চারু এ গ্রামে অনেক মেয়েরই ঈর্ষার পাত্রী, অপর দিকে রীতিমত সম্পদশালী অভিজাত-ঘরের মেয়েদের সঙ্গে সমান আসনের অধিকারিণী ব'লে তাঁদের বাড়ির মেয়েদের কাছেও বিরক্তির পাত্রী। সেখানে চারুর অবস্থা অনেকটা আজকালকার ইংরেজী ইস্কুলে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের ছেলেদের মধ্যে মন্দ-নয়-গোছের অস্পৃশ্য জাতির ছেলের মত।

চারু যেখানে গিয়ে বসল, সেখানে ব'সে ছিল সেকালের মহিলাদের নেত্রী এবং সে যুগের প্রগতিশীলা, স্বর্ণবাবুর জাতিভগ্নী রজনী ঠাকরুণের কন্যা বিশ্বেশ্বরী এবং আরও কয়েকজন। বিশ্বেশ্বরী তার মায়ের প্রতিভা অনেকটা

পেয়েছে। লেখাপড়ায় গ্রামের কন্যাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পারদর্শিনী। সুচের কাজ, কাঁটার কাজেও তাহার হাত খুব ভাল। মায়ের কাছে আরও একটা জিনিস সে পেয়েছে, সেটা হ'ল—বেঁকিয়ে কথা বলার পারদর্শিতা। চারু ঠিক ওর বিপরীত। লেখাপড়ায়, সুচের কাজে পারদর্শিতাও নাই, রুচিও নাই, বেঁকিয়ে কথা বলতেও পারে না, পারে উল্লাসে উচ্ছ্বাসে হেসে ভেঙে পড়তে, *দুমদাম ক'রে কাজ করতে এবং উচ্চ চীৎকার ক'রে সোজাসুজি বাপ-ভাইয়ের মাথা খেয়ে কলহ করতে; আর পারে সামান্য প্রীতি ও সমাদরের বিনিময়ে বিগলিত হয়ে প্রাণ ঢেলে ভালবাসতে।

বিশ্বেশ্বরীও সঙ্গিনীদের দিকে সরস হাসিমুখে এগিয়ে এল। বিশ্বেশ্বরী ঈষৎ ভ্রূ টেনে দৃষ্টি তুলে তার দিকে তাকিয়ে প্রায় নিক্তিতে ওজন করা অতি ক্ষীণ একটি টুকরো হাসি হাসলে—ওজনে সে যত কম, রেখার টানেও সে তত ক্ষীণ। কিন্তু সে হাসির মধ্যে রহস্য গভীর, তার অর্থ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, সে ব্যঙ্গ অথবা অন্তরঙ্গতার অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে সমৃদ্ধ, তা বুঝতে পারলে না চারু। তবু সে বিশ্বেশ্বরীর কাছেই প্রায় গা ঘেঁষে বসল। বিশ্বেশ্বরী একটু স'রে বসল নীরবে। বিশ্বেশ্বরীর পাশেই ব'সে ছিল বিশ্বেশ্বরীর মামাতো বোন দুর্গা। দুর্গার সঙ্গে চারুর সখীত্ব প্রগাঢ়। প্রকৃতিতেও দুজনে অনেকটা এক। যত সে হাসতে পারে, তত সে কলহ করতে পারে। দুর্গা ভুরু নাচিয়ে অনাবশ্যক ইঙ্গিত ক'রে বললে, ছিলি কোথায়? বাড়িতে গেলাম, দেখতে পেলাম না।

চারু বললে, রাঙা মার ওখানে ছিলাম।

চারুর রাঙা মা হলেন কাশীর বউ।

দুর্গা মুচকি হেসে বললে, মঙ্গলদার চায়ের মজলিস আজ জমলই না। যদুপতি তো এক কাপের বেশি চা-ই খেলে না, একটা গানও গাইলে না। বললে, অম্বল হয়েছে, শরীর ভাল নাই।

মঙ্গল পবিত্রর বন্ধু, থিয়েটারের পাণ্ডা, চারুর জাঠতুতো ভাই। চারুর জেঠার বাড়ির চায়ের আসর প্রসিদ্ধ। রাধাকান্তের চায়ের আসরের প্রধান সভ্য ছিলেন তিনি, রাধাকান্তের মৃত্যুর পর তিনি নিজের বাড়িতে চায়ের আসর বসিয়েছেন। মঙ্গল দিনে আট-দশবার চা খায়। চা খাওয়াটা এ যুগে একটা প্রচণ্ড প্রগতিশীলতার লক্ষণও বটে এবং নেশাও বটে। যদুপতি পবিত্রর থিয়েটারে নায়িকা সাজে, তাকে বহু প্রলোভন দেখিয়ে কাশিমবাজারের মহারাজার থিয়েটার থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে। রঙ কালো হ'লেও যদুপতি

লাবণ্যময় তরুণ, তার সে তারুণ্যের সহায়ক হয়েছে তার শ্মশ্রুগুম্ফহীনতা। সুকণ্ঠ গায়ক। মঙ্গল তার প্রেমে পড়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। মঙ্গলের বাড়িতেই চা-জলখাবারের বাঁধা বরাদ্দ। চারুও তার মুগ্ধ ভক্ত। সে-ই চায়ের আসরে চা ক'রে সকলকে পরিবেশন করে। নিত্যই চায়ের আসরে যদুপতিকে গান করতে হয়। কোন কারণেই নিষ্কৃতি নাই; না বললেও চারু ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে ওঠে, নাই বা গাইলেন। ভারি তো!—ব'লেই সে হয় মুখ ঘুরিয়ে বসে, নয়তো উঠে চ'লে যায়।

যদুপতি অপ্রস্তুত হয়ে বলে, আরে, শোন শোন।

না। আমার অনেক কাজ আছে।

চারু, যেও না, শোন।

মঙ্গলও ডাকে, এই চারু, যাস না। শোন্।

কেন, এত গুমর কিসের? গান গাইতে জানলেই বুঝি গুমর করতে হয়!

কোন কোন দিন যদুপতিকে উল্টো রাগ ক'রে ওঠবার উদ্যোগ করতে হয়, তবে চারু ফিরে আসে।

এই সব কারণে আশেপাশে পাঁচজনে ফিসফাস ক'রে পাঁচ কথা বলতে শুরু করেছে। দুর্গা নিজের চোখেই এসব দেখেছে, নিত্য না হ'লেও সেও প্রায়ই এই চায়ের মজলিসে যোগ দিয়ে থাকে। তারও খুব ভাল লাগে যদুপতিকে। কথাটা ক্রমে ক্রমে পাঁচজনের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে দশজনের মধ্যে আলোচিত হতে শুরু করেছে। ধরিত্রীরাণীর কানেও এটা এসেছে। সেদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে এর আভাস দিয়েও এসেছেন কাশীর বউকে।

দুর্গার কথাটা শুনে চারুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, ভুরু কুঁচকে বললে, কেন, তুই তো ছিলি, অম্বল হয়েছে তো একটু সোডার গুঁড়ো দিলেই তো পারতিস।

বিশ্বেশ্বরী ব'লে উঠল, সোডার চেয়ে আদা-নুন ভাল। তার সঙ্গে জল।

কি বললি?—চারু মৃদুস্বরেই ফোঁস ক'রে উঠল।

মুখ ফিরিয়ে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বিশ্বেশ্বরী বললে, কি বললাম? বললাম, সোডার চেয়ে আদা নুন ভাল। তার সঙ্গে ঢকঢক ক'রে এক গেলাস জল। এমন অম্বলের ওষুধ আর হয় না।

এ কথায় সর্বাঙ্গ জ'লে গেলেও চারু রূঢ় উত্তর দেবার কোন হেতু খুঁজে পেলে না। চুপ ক'রে সে ব'সে রইল। দুর্গা বললে, রাঙা মা এল না যে?

কি জানি? রাঙা মাই জানে। আমি কেমন ক'রে বলব?

গৌরীকান্ত আছে কেমন রে?

ভাল। উঠে বসেছে এইবার।

বিশ্বেশ্বরী হঠাৎ প্রশ্ন করলে, অসুখ তো দিনরাত এত পড়ে কেন না। আমাদের কোঠা থেকে ওদের ঘরটার সব দেখা যায়। যখনই দেখি, দেখি, বইখাতা নিয়ে পড়ছে।

পড়ে না তো। লেখে। পদ্য লেখে।

গৌরীকান্তের কবিতা রচনা করার কথা সকলেই জানে। পাড়ায় সম্ভ্রান্ত-ঘরের বিবাহে সে প্রীতি-উপহার লিখে দেয়। পূজার সময় হাতে লিখে আঠা দিয়ে পূজার দালানে আগমনী-কবিতা সেঁটে দেয়। তবু লোকে এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। অন্তত যারা প্রাচীনপন্থী এবং যারা অর্ধশিক্ষিত, তারা বিশ্বাস করতে চায় না যে, কবিতাগুলি গৌরীকান্তের স্বাধীন রচনা। আর বিশ্বাস করতে চায় না তারাই, যারা গৌরীকান্তের নিকট-প্রতিবেশী।

বিশ্বেশ্বরী এবার ঘুরে বসল, একটু স'রে এসে বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে ব'সে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল্ তো চারু, গৌরীকান্ত পদ্য লেখে বই দেখে, না নিজেই লেখে।

নিজেই লেখে। বই দেখে লিখবে কি! খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে, ভাবে, আর খসখস ক'রে লিখে যায়।

বিশ্বেশ্বরী চুপ ক'রে রইল, একটি আকস্মিক উদাসীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে ব'লে মনে হ'ল।

চারু ব'কে যেতে লাগল, অসুখ থেকে উঠে এবার গৌরীকান্ত পদ্যতে একখানা বইই লিখতে শুরু করেছে। রীতিমত একখানা বই। পালার মত। নাদিরশা ব'লে একজন রাজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিল্লীর বাদশাকে হারিয়ে দিল্লী লুটতরাজ করেছিল, লোকজন মেয়ে ছেলে কেটে কুটে ঘরে দোরে আগুন লাগিয়ে দিল্লীকে ছারখারে দিচ্ছিল। তখন বাদশা এসে হাতজোড় ক'রে নাদিরশায়ের কাছে হার মানলে। কোহিনুর-মণি-বসানো মুকুট নামিয়ে দিলে তার পায়ের কাছে। নাদিরশা সেই মুকুট নিজের মাথায় পরলে। ময়ূর-সিংহাসন কেড়ে নিলে—

চারু!—চারু কথায় বাধা দিয়ে ওদিক থেকে ডাকলেন ধরিত্রীরাণী। তিনি চারুকে দেখতে পেয়েছেন এতক্ষণে। চারু চমকে উঠে ঘুরে বসল।

ধরিত্রীরাণী বললেন, কাশীর বউকে তো তুমি 'রাঙা মা' বল ?

হ্যাঁ।

তোমার রাঙা মা কই ? তিনি এলেন না ?

একটু ইতস্তত ক'রে চারু বললে, আমি জানি না।

দুর্গা ব'লে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, ওই, এই যে তুই বললি, গৌরীকান্তদের বাড়ি থেকে আসছিস ?

চারু এবার বললে, ওদের বাড়ি থেকে এলাম, তা আসবার সময় রাঙা মাকে তো ডাকি নি আমি। আমি চ'লে এলাম নিজে।

যাও তুমি একবার। আমার নাম ক'রে বল, তাঁকে ডাকছি আমরা।

ঠিক এই মুহূর্তেই এসে প্রবেশ করলেন রজনী-ঠাকরুণ।

কই ! কি সব হচ্ছে গো তোমাদের ? শুনলাম নাকি, মেয়েরাই এবার আইন করবে—বেটাছেলেরা একটার বেশি বিয়ে করতে পারবে না। মেয়েরা জুতো পরবে। পান জর্দা খাবে না। তা বেশ, তা বেশ। আমাদের তো দশটা বিশটা সতীনের সঙ্গে ভাগের স্বামী নিয়ে জীবন গেল, স্বামীকে কালে কস্মিনে চোখে দেখলেও স্বামীর ঘর কখনও দেখি নাই। বাপেদের কুল বাঁচাতে আমরা অকূলে ভেসেছি। তা, এ ভাল, এ ভাল।

ধরিত্রীরাণী তাঁকে সমাদর ক'রে নিয়ে এসে মাঝখানে বসবার স্থান ক'রে দিলেন। রজনী-ঠাকরুণ বললেন, তোমরা পান দোক্তা ছাড় মা, আমরা পারব না। আমাকে পান দোক্তা দাও।

ধরিত্রীরাণী ব্যস্ত হয়ে—সামনেই দাঁড়িয়েছিল চারু—তাকেই বললে, চারু, তুই নীচে গিয়ে মঞ্জরীকে পান দিতে বল্। ব'লে, চট ক'রে তোর রাঙা মার কাছে চ'লে যা। মেম-সাহেবের আসবার সময় হয়ে গেল। চট ক'রে, বুঝলি ?

চারু চ'লে যেতেই রজনী-ঠাকরুণ বললেন, কাকে ডাকতে গেল ?

কাশীর বউকে।

অ। কাশীর বউকে বুঝি রাঙা মা বলে ! অবিশ্যি ডাকতে সকলকেই হয়। ডাকা উচিত। কিন্তু— খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন, কিন্তু ওসব মেয়েদের না ডাকাই কর্তব্য। গোয়ালপাড়ার সেই বেশ্যা মেয়েটাকে ঘরে ঠাঁই দেয়। পুলিস এসে এজাহার নেয়। আজই সকালে, সেই যে দুকড়িবালা ব'লে যে মেয়েটার কাছ থেকে বন্দুক পিস্তল বেরিয়েছে, তারই কথা বলছিলাম আমরা। সে যে কি গান গাইতে গাইতে জেল থেকে আদালতে যায়। ঘেন্নার কথা—

ছিনাথ ব'লে উঠল, আমরা, বাবু, চাষাভুষো মানুষ। আপনাদের সঙ্গে একখানে বসি নাই কোনদিন। আমাদের নীচেই ভাল।

গম্ভীর স্বরে এঁদো বললে, সব মানুষই সমান শ্রীনাথ, কেউ ছোট বড় নয়। তোমরা নিজেদের ছোট মনে করছ, কিন্তু তোমরা চাষ না করলে আমরা খেতাম কি?

ছিনাথ চমকে উঠল, এ কেমন কথা! কানু উত্তর দিলে, তা হ'লেও বাবু, আপনারা আর আমরা কি সমান? আপনি ওইখানেই বসুন।

আমি নেমেই বসতাম, কিন্তু অভ্যাস নেই, গায়ে লাগবে, তাই বাধ্য হয়ে এইখানেই রইলাম। তবু জেনে রেখো কানু, এই উঁচু-নীচু, জাত-বেজাত, এই সবই দেশের যত অনিষ্টের গোড়া। এই যে আজ মুসলমান হিন্দুকে মারছে আর হিন্দুরাও সুবিধেমত প্রতিশোধ নিচ্ছে, এর মূলেও ওই ছোঁয়াছুঁয়ি, আর—

ছিনাথ। ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে তো আপনারাই বাবু বাড়াবাড়ি করেন। আমরা মুসলমানের সঙ্গে একসঙ্গে ভুঁয়ে ধান কাটি, কিন্তু আপনারা আমাদের স্বজাত হ'লেও হাতে জল খান না, নমঃশূদ্দুর ব'লে এড়িয়ে চলেন।

তবেই বোঝ। ওই কথাই তো বলছি আমি। আমাদের সব এক হয়ে যেতে হবে, কৃষক-মজদুর-রাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কানু তাকিয়ে ছিল জানলা দিয়ে বাইরের দিকে; আস্তে আস্তে বললে, দেবতা আবার বর্ষালেই তো হয়েছে!

এঁদো। হ্যাঁ, ধানের ক্ষতি হবে।

ছিনাথ হেসে উঠে বললে, ধান তো পেকে গিয়েছে, তার আর কি হবে? নষ্ট হবে আলু।

এঁদো। কেন, নতুন আলু তো উঠে গিয়েছে।

কানু। একবার ফেললেই তো সারা সন চলে না। প্রথম ক্ষেপের ফসল উঠে গেলে আবার তো রুইতে হয়েছে।

এঁদো। এই যে জমি তোমরা চাষ কর, এ জমির মালিক কারা জান?

ছিনাথ। আপনারা।

এঁদো। না, তোমরা। তোমাদের শ্রমে যে শস্য উৎপন্ন—

চপলা লীলাভরে ঘরে ঢুকেই ব'লে উঠল, এই রে, তুমি আবার এদের নিয়ে

লজ্জার কথা। ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের বউ, ছি ছি! আমরা-ছি-ছিই করছিলাম। হঠাৎ দুর্গাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন—মহারাণী। আমাদের কথা শুনে হেসে চ'লে গেলেন। সে হাসি কি! আমি ছাড়বার পাত্রী নই। আমি বললাম, হেসে চ'লে গেলে যে বউ? উত্তর দিলে, তুকড়িবালার ভাগ্য ভাল, সেই কথা ভেবে হাসলাম ঠাকুরঝি। বললাম, কথাটার মানে কি হ'ল? বললে, ভাগ্যিস সরকার জেলখানায় তাকে আগলে রেখেছে, না হ'লে বেচারার ঝাঁটা খেয়ে প্রাণটা যেত। প্রাণ বাঁচাতে হ'লে দেশ ঘর ছেড়ে পালাতে হ'ত, পেটের জ্বালায় হয়তো ষোড়শীর কাছেই আশ্রয় নিতে হ'ত।

সমস্ত মজলিসটা স্তব্ধ হয়ে গেল।

রজনী ঠাকরুণ বললেন, আর ওই চারু মেয়েটা, ওকে কেন ডেকেছ বাপু? ছি ছি ছি! পাড়ায় ঘরে জানতে আর কারও বাকি নাই। তাও তোমাকেও বলি বউমা, পবিত্রকে তুমি একটু ব'লো, ওই যে থিয়েটারের ছোকরা যদুপতি, ও তো তোমাদেরই মাইনে করা লোক, ওকেও একটু সাবধান করা উচিত। ছি ছি ছি!

হঠাৎ উপরে ছুটে এল মঙ্গল। গলার সাড়া দিয়ে সিঁড়ি থেকেই ডেকে বললে, আসছেন, আসছেন—মেম-সাহেব এসে পড়েছেন।

ধরিত্রীরাণী ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন, দরজার মুখে তিনিই সাদর সম্ভাষণ জানাবেন। রজনী-ঠাকরুণও উঠলেন, তিনি প্রাচীনা হ'লেও পিছিয়ে থাকতে চান না। আর তিনিও তো কেউ-কেটা নন, স্বর্ণবাবুর জ্ঞাতি-ভগ্নী, এখানকার শ্রেষ্ঠা নারী ছিলেন তিনি এককালে, এবং যোগ্যতাও ছিল তাঁর। পিছনে থাকলেও ধরিত্রীরাণীর চেয়ে অনেকটা লম্বা ব'লে মাথাটা তাঁর পিছনে থেকেও ধরিত্রীরাণীর মাথার উপরে উঠেছিল। সিঁড়িতে দেখা হ'ল চারুর সঙ্গে। চারু বললে, রাঙা মা আসবেন না।

কেন?

তিনি—। চুপ ক'রে গেল চারু।

কি? তিনি কি?

বললেন, আমি যাব না। চারুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। রাঙা মা যে দৃপ্ত উদ্ধত উত্তর দিয়েছেন, তার সম্যক অর্থ না বুঝলেও, আভাসে সে তার অর্থটা বুঝেছে। সে উচ্চারণ করতে তার ভয় হচ্ছিল। ক্রমশ

তারাশঙ্কর

পনেরো আগস্টের পর

আনন্দ সম্পূর্ণ নহে, হইয়াছে হরিষে বিষাদ,
দীর্ঘ সাধনার অন্তে কাম্য যা তা পাই নি এখনো।
ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব পরিণামে ঘটায়েছে বিষম বিভেদ
নিরর্থক রক্তপাতে রাজপথ হয়েছে রঞ্জিত
অগ্নিদাহে জনপদ হয়েছে শ্মশান—
শান্তি নাই কোনোখানে, নিভৃত পল্লীর প্রান্তভাগে
কোলাহল-মুখরিত জনাকীর্ণ সমৃদ্ধ নগরে
ভীষণ অকালমৃত্যু দিকে দিকে দিয়াছে যে হানা
আত্মকলহের রক্ত পথে
কুরুপাণ্ডু-যুদ্ধ শেষে হস্তিনার রাজসভাতলে
জ্বলে নি আনন্দদীপ, ওড়ে নাই বিজয়-নিশান।
মহাপ্রস্থানের পথে আত্মাহুতি শেষ পরিণাম
সমস্ত ভারত জুড়ে রূঢ় সত্যরূপে
জাগিছে প্রাচীনকথা মহাভারতের।
তবু তুলি জয়ধ্বনি, নহে আত্মজয়ধ্বনি আজ
জয় গান গাহি জননীর
জয় গান গাহি ভারতের
জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ নিখিল-জগতে।

দীর্ঘ সাধনার পরে আজ সত্য বঙ্কিমের "বন্দে মাতরম্"
মাতার বন্দনা গাহি
মাতৃজয়-মন্ত্র গাহি বিচ্ছেদের অতলবিপাকে
মুক্তিলোকে প্রবেশের প্রথম আনন্দে গাহি গান।
জয়তু ভারতমাতা মোরা সবে বন্দি মাতরম্।

আজ ধন্য জয়োদ্ধত ত্রিবর্ণ পতাকা—
চক্রচিহ্ন-শোভিত পতাকা
ত্যাগের গৈরিক আর যৌবনের সবুজের মাঝে
শুভ্র শ্বেত মাঝে নীলচক্র অশোকের
ত্যাগ মহিমার মাঝে চিরন্তন গতির স্পন্দন

তার সাথে চিরজয়ী প্রাণ
পতাকা উড়াই ঊর্ধ্বে মনে মনে জানি
রাজপথে খণ্ডিতের এখনো চলিবে অভিযান
যতদিন আসমুদ্র ভারতের এই পুণ্য ভূমি
এক সূত্রে নাহি হয় গাঁথা—
সেই সূত্র দেশভক্তি, সেই সূত্র মা'র আশীর্বাদ।

স্বাধীনতার জন্ম

ডিমের ভিতরে ভ্রূণ একদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিল। স্বাধীনতার স্বপ্ন। আকাশে উড়িবে। আকাশ কি জানা ছিল না, কিন্তু আকাশের স্বপ্নটা ছিল। আকুলতা ছিল, আগ্রহ ছিল, একটা দুর্দম প্রেরণা সমস্ত বাধা অপসারণ করিয়া ছুটিয়া যাইতে চাহিয়াছিল অসীম শূন্যে। কিন্তু বাধা দুস্তর। একটা লালার সমুদ্রে সে হাবুডুবু খাইতেছে। সে সমুদ্রও সীমাবদ্ধ। ঊর্ধ্বে নিম্নে দক্ষিণে বামে কঠিন অস্বচ্ছ প্রাচীরের পরিবেষ্টনী। প্রাচীর অতিক্রম করিয়াও স্বাধীনতা নাই। আছে পালকের জঙ্গল। পক্ষীমাতার কুক্ষিগত সে। স্বাধীনতা কোথায়?

সহসা বাহিরের বাতাস যেন তাহাকে স্পর্শ করিল। সহসা যেন সে অনুভব করিল, পক্ষপুটের আবরণ নাই। স্বপ্নের ঘোরেই সে প্রশ্ন করিল, আমি কোথায় আছি?

স্বপ্নের ঘোরেই শুনিল, আমার হাতের উপর।

কে তুমি?

মানুষ।

কোথায় লইয়া চলিয়াছ?

এখনই বুঝিতে পারিবে।

তুমি কি আমাকে স্বাধীনতা দিবে?

নিশ্চয়।

যে খোলা আমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ভাঙিয়া দিবে?

অচলায়তন ভাঙিয়া ফেলাই তো আমার কাজ।

ঠক ঠক ঠক ঠক……

ভ্রূণের অন্তরে শিহরণ জাগিল। প্রাচীর ভাঙিতেছে।

এ কি—এ কি—কি করিতেছ তুমি?

ফ্যানাইতেছি।

গেলাম—গেলাম—বাঁচাও—বাঁচাও—কি যন্ত্রণা!—তপ্ত কটাহের ফুটন্ত তৈলে ভ্রূণের আর্তনাদ থামিয়া গেল।

ভ্রূণ মরিল, কিন্তু স্বপ্ন মরিল না।

সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল, এ কি করিলে?

ওম্‌লেট।

স্বপ্ন স্তম্ভিত হইয়া রহিল খানিকক্ষণ।

তাহার পর নীত হইল ভ্রূণান্তরে। আবার স্বাধীনতা-স্বর্গ রচনা করিতে লাগিল রূপকথালোকে।

আবার মানুষ আসিল।

কে তুমি?

মানুষ।

আবার স্বাধীনতা দিতে আসিয়াছ?

হাঁ।

তাহার ইচ্ছা হইল, বলে—যাইব না। কিন্তু প্রতিরোধ করিবার শক্তি তো নাই। পক্ষীমাতা সভয়ে সরিয়া গিয়াছে।

মানুষ অবলীলাক্রমে তাহাকে তুলিয়া লইল।

ক্ষীণকণ্ঠে একবার শুধু সে আবেদন জানাইল, এবার আমাকে আর ওমলেট বানাইও না।

যদি ঘি দিয়া ভাজি?

না।

বেশ, ওমলেট বানাইব না।

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল। ওমলেট না বানাইয়া তরকারি বানাইল।

এইভাবে চলিতে লাগিল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

যুগের পর যুগ কাটিল, শতাব্দীর পর শতাব্দী।

ডিমের স্বাধীনতাপ্রয়াস মূর্ত হইল নানারূপে নানা মানুষের প্রতিভায়। বিবিধ পাচক, বিবিধ মসলা, বিবিধ ফোড়ন।

কারি, পোচ, ডেভিল, চপ, দোলমার বিচিত্র সম্ভারে সুসজ্জিত হইল বহুবিধ মহার্ঘ প্লেট দেশে দেশান্তরে।

এ দেশের লোকেরা সুর তুলিল, স্বদেশের ডিমে স্বদেশী খাবার বানাইতে হইবে। তাহাই হইল। ভাতে সিদ্ধ করিয়া, ব্যাসন দিয়া বড়া ভাজিয়া, দেশী ডালনার মসলা দিয়া প্রস্তুত হইল বহুবিধ স্বদেশী ব্যঞ্জন। কচুসহযোগে একজন রাঁধুনী এমন ডিমের ঘন্ট করিলেন যে, সকলের তাক লাগিয়া গেল।

তর্ক বাধিয়া গেল। কোন্‌টা ভাল, দেশী না বিদেশী?

তর্ক পরিণত হইল যুদ্ধে।

একটি ঘটনা কিন্তু ঘটিয়া গেল ইতিমধ্যে।

সু-উচ্চ শাখায় ক্ষুদ্র একটি নীড়ে পক্ষীমাতার চঞ্চু-আঘাতে ডিমের খোলা ফাটিয়া গেল একদিন। পক্ষীশাবক বাহির হইয়া আসিল। কুৎসিত কদাকার। পালক নাই, রঙ নাই, সুর নাই, গান নাই। ধনীর প্রাসাদে নয়, অলঙ্কৃত টেবিলে নয়, মহার্ঘ প্লেটের উপরে নয়, অতি-তুচ্ছ খড়-কুটার শয্যায় শুইয়া আছে। আশেপাশে দুলিতেছে কয়েকটা সবুজ ডাল, মাথার উপরে অনন্ত নীলাকাশ। নিতান্ত অসহায়। সর্প, শ্যেন, শিকারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দৃশ্য অদৃশ্য অসংখ্য শত্রু চতুর্দিকে। ও বাঁচিবে কি?

মৃত্যুহীন স্বপ্নের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি, নিশ্চয় বাঁচিবে। ওই একদিন আকাশে উড়িবে। উহার মধ্যেই নিহিত আছে গরুড়ের শৌর্য, রাজহংসের মহিমা। উহারই পালকে জাগিবে ইন্দ্রধনুর বর্ণসম্ভার, উহারই কণ্ঠে ফুটিবে অনবদ্য সঙ্গীত-মাধুরী। এখন কিন্তু কিছুই নাই। আছে কেবল অসংখ্য অভাব, অসহ্য ক্ষুধা, ব্যাদিত আনন। ক্ষুধার তাড়নায় ক্রমাগত হাঁ করিতেছে। পক্ষীমাতা, কোথায় তুমি, খাবার আন, খাবার আন, খাবার—খাবার—খাবার—

"বনফুল"

আসল সত্য

মাটি-আকাশের ধাপ্পা—
কবিরা দিয়েছে চিরদিন।
সংসারে আসল সত্য—
পৈতৃক সম্পত্তি আর ঋণ।

ধর্মঘট

১ম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

গণেশবাবুর বাড়ি। সকাল নয়টা। ঘরের মেঝেতে একখানা আসন পাতা ও এক গেলাস জল চাপা দেওয়া। এক হাতে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে, আর এক হাতে জামার বোতাম দিতে দিতে গণেশবাবুর বেগে প্রবেশ

গণেশ। কই গো, শিগ্‌গির ভাত নিয়ে এস, বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

কাত্যায়নী প্রবেশ করলেন, আঁচলটা কোমরে জড়ানো, ডান হাতে খুন্তি

কাত্যায়নী। এই যে এক্ষুনি এনে দিচ্ছি, দু মিনিট সবুর কর।

গণেশ। দু মিনিট সবুর কর! এ কি ছেলেখেলা পেয়েছ? আপিসটা কি আমার শ্বশুরবাড়ি?

কাত্যায়নী। না গো না, রাগ ক'রো না; ভাতটা হয়ে গেছে, চট ক'রে ফ্যান গেলে দু মিনিটের মধ্যেই এনে দিচ্ছি।

গণেশ। দু মিনিটের মধ্যে আনবে'তো এক থালা আগুন, আর আমার হাত-মুখ পোড়াবে; বলি, দু মিনিট আগেই বা হয় নি কেন?

কাত্যায়নী। কেন হয় নি, তা তো জান; খোকাটা সারারাত জ্বরে ছটফট করেছে, নিজেও একটু ঘুমোয় নি, আমাকেও একটু ঘুমুতে দেয় নি; সারারাত জেগে ভোরবেলায় আর উঠতে পারি নি, তাই একটু দেরি হয়ে গেছে। আজকের দিনটা মাফ কর, কাল থেকে ঠিক হবে।

গণেশ। আজ প্রায় পঁচিশ বছর তুমি আমার ভাত রাঁধছ, এর মধ্যে অন্তত পঁচিশ শো বার তোমায় 'আজকের মত' মাফ করেছি। এই বুড়ো বয়সে ভাতের জন্যে সাহেবের কাছে গালাগাল খাওয়া আমার আর সহ্য হয় না। আমি চললুম, ভগবান আজ অন্ন মাপায় নি।

কাত্যায়নী। ওগো, যেও না, তোমার পায়ে পড়ি, আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।

গণেশ। আর এনে কাজ নেই, ঢের হয়েছে। সারারাত জেগে খুব কষ্ট হয়েছে, সকাল থেকে অনেক খেটেখুটে রান্না করেছ, আমার ভাগের ভাতটাও তুমি খেও, তা না হ'লে তোমার পেট ভরবে না। আমি চললুম। (ঘরের কোণ থেকে ছাতিটা তুলে নিলেন)

কাত্যায়নী। (বাঁ হাতে গণেশবাবুর হাত ধ'রে) চান ক'রে অমনই যেতে নেই, একটু মিষ্টি খেয়ে এক গেলাস জল খেয়ে যাও।

গণেশ। (হাত ছিনিয়ে নিয়ে) দরকার নেই, আমাদের আপিসে খাবার জল পাওয়া যায়। [প্রস্থান

কাত্যায়নী। (খুন্তিটা ফেলে দিয়ে) হা ভগবান! এত ক'রে খেটে মলুম, আর এই তার পুরস্কার?

ব'সে পড়লেন ; বড় ছেলে সুশীল—বয়েস প্রায় ১৮ বছর, প্রবেশ করলে

সুশীল। কি হ'ল মা? বাবা খেয়ে গেলেন না?

কাত্যায়নী। না বাবা, কই আর খেলেন! খাবার সময় হ'ল না।

সুশীল। এ ভারি অন্যাই ; খোকার অসুখ, একটু আর সবুর সইল না! তা তুমি হাত গুটিয়ে ব'সে পড়লে কেন? রান্না সব হয়ে গেছে?

কাত্যায়নী। সব আর হ'ল কোথায়? আর রাঁধবই বা কার জন্যে? তুই বাবা উনুন থেকে ভাতের হাঁড়িটা নাবিয়ে ফেলে রাখ্‌গে যা, আমি আর পারি না।

সুশীল। বা রে! আমরা বুঝি খাব না? বাবা খেলেন না ব'লে আমাদেরও ক্ষিদে-তেষ্টা চ'লে গেল? সে হবে না, তুমি ওঠ, আমি টিফিনের সময় বাবাকে ডেকে আনব।

কাত্যায়নী। তখন কি আর আসবে?

সুশীল। নিশ্চয়ই আসবেন, তা না হ'লে আপিসের পাঁচজনের কাছে ব'লে দেব। তুমি ভেবো না, আমি ঠিক ধ'রে আনব। বাবার সবই ভাল, শুধু ভাত পেতে একটু দেরি হ'লে কেন যে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় জানি না। আমি এখন ডাক্তারখানায় চললুম, তুমি রান্না দেখগে যাও। [প্রস্থান

সুজাতার প্রবেশ

সুজাতা। কি হ'ল দিদি, বটঠাকুর এত চেঁচামেচি করছিলেন কেন?

কাত্যায়নী। কারণ কি আর বলব ভাই! ভাত দিতে দু মিনিট দেরি হয়েছে, রাগ ক'রে না খেয়ে আপিস চ'লে গেলেন।

সুজাতা। দু মিনিট দেরিতেই লঙ্কাকাণ্ড?

কাত্যায়নী। দু মিনিট কেন? ইচ্ছে করলে দেরি না হ'লেও লঙ্কাকাণ্ড বাধানো যায়। ছোট খোকাটা ভাই কাল সারারাত জ্বরে ছটফট করেছে, ঠায় ব'সে ব'সে মাথায় জলপটি দিয়ে বাতাস করেছি ; ভোরের দিকে বেচারী একটু ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমুল, আমিও একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই উঠতে

একটু দেরি হ'ল। তাড়াতাড়ি ক'রে দুটো উনুন জেলে এক হাতে কুটনো বাটনার যোগাড় ক'রে রান্না করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, তবুও শেষ পর্যন্ত দু মিনিট দেরি হয়ে গেল। বাস্, আর যায় কোথা! কেন যে দেরি হ'ল, তার খবরও নিলে না, ছেলেটা কি রকম আছে জিজ্ঞাসাও করলে না; উপোস ক'রে সটাং চ'লে গেল। বয়েস তো হচ্ছে, আর কত পারব বল দেখি?

সুজাতা। কি আর বলব বল দিদি? আপিস যাবার সময় হ'লে কর্তাদের যেন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। আমারও কাল ওই অবস্থা গেছে; উনি না খেয়ে বেরিয়ে গেলেন, আমি ছেলেমেয়েদের খাইয়ে সারাদিন উপোস ক'রে রইলুম। সারাদিনটা যে আমার উপোসে কেটে গেল, রাত্তিরে একবার তার খোঁজও নিলেন না।

কাত্যায়নী। আজ আমার কপালেও হয়তো উপোস আছে, তবে সুশীল বলেছে, দুপুরে আপিস থেকে ধ'রে আনবে। আমার কপালে এলে হয়। যার ভাত, তাকে না খাইয়ে তো আর মুখে ভাত তুলতে পারি না।

সুজাতা। আচ্ছা, কত্তারা ভাতের ওপরেই বা এত রাগ দেখায় কেন? ভাতের একটু দেরি হ'লে না হয় আপিস যেতে একটু দেরি হবে, তাতে কি এমন ক্ষতি হয়? সাহেবেরা তো আর রাক্ষস নয় যে, বাবুদের একটু দেরি হ'লে গিলে ফেলবে; তা ছাড়া তারা তো শুনেছি, স্ত্রীর নাম করলে বাবুদের মহাপাতক অপরাধও মাপ করে।

কাত্যায়নী। ধরলুম না হয়, দেরি হ'লে সাহেবেরা রাগ করে, একটু বেশিক্ষণ থেকে কাজটা পুষিয়ে দিয়ে এলেই হয়; তা তো হবে না, কর্তারা সব ঘরমুখো কিনা, বাড়ি ফেরার জন্যে ছটফট করে, তাই সাহেবরা চ'টে যায়।

সুজাতা। রান্না তো আর যন্তরে হয় না, মন্তরেও হয় না; শরীরের অসুখ-বিসুখ আছে, সব দিন যে ঠিক ঘড়ি-ধরা সময়ে ভাত-তরকারি হবে, তা বলা যায় না। আর একটু এদিক-ওদিক হ'লেই যে রাগারাগি গালাগালি, এও আর সহ্য হয় না।

কাত্যায়নী। তোরা যা হয় একটা বিহিত কর্ ভাই। কত্তাদের বিষ নেই, কুলোপানা চক্কোর আছে; ভাতের দেরি হ'লে যদি অসুবিধা হয়, রাখুক

না একটা ক'রে রাঁধুনী-বামুন, সে মুরোদ তো নেই, তাই মিনি-পয়সায় রাঁধুনীদের ওপর জুলুম করছে।

সুজাতা। আর একটা সুবিধে কি জান দিদি? মাইনে-করা বামুন একদিন বকুনি খেলেই কাজ ফেলে পালাবে; আমরা তো আর মাইনে-করা নয়, তাই রোজ বকুনি খেয়েও কাজ ছেড়ে পালাতে পারি না, ওরাও যা খুশি অত্যাচার করবার সুযোগ পায়।

কাত্যায়নী। বিয়ের সময়ও ওরা আমাদের ভাত-কাপড়ের ভার নেয়। এমন কি মন্তর কিছু আছে, যার জন্যে সেই ভাত আমাদেরই দৈনিক রাঁধতে হবে?

সুজাতা। মন্তরের কথা কি ক'রে আর জানব বল দিদি? আমি তো আর ভাটপাড়ার ভটচাজ্জি নই; যদিই বা থাকে, সে মন্তরও ওদের তৈরি, কাজেই বলবার কিছু নেই।

কাত্যায়নী। যাক, আর দেরি করব না ভাই; সুশীলের কথামত রান্না সব ঠিক ক'রে রাখি; যদি কত্তা দুপুরে আসেন, তবেই মঙ্গল।

সুজাতা। আজ দুপুরে সমিতির আপিসে যাবে না?

কাত্যায়নী। যাব তো ভাই, তবে একটু দেরি হবে।

সুজাতা। দেরি হোক ক্ষতি নেই, যাবার সময় আমায় ডাকতে ভুলো না; আজ আমাদের সভাপত্নীর সঙ্গে এ বিষয়ে একটা পরামর্শ করতেই হবে।

কাত্যায়নী। হ্যাঁ ভাই, রোজ রোজ আর এত অত্যাচার সহ্য হয় না। গতরে খেটেও মরব, আবার পান থেকে চুন খসলেই গালাগাল বকুনি খাব, এ আর চলবে না। লোকে অকর্মণ্য হ'লে তো পেনশন পায়, আমরাই বা পাব না কেন?

২য় দৃশ্য

'নিখিল-বঙ্গ-গৃহিণী-রক্ষা-সমিতি'র ঘরোয়া বৈঠক। সভাপত্নীর আসনে আসীনা কমরেড সবিতা সেনগুপ্তা। কাত্যায়নী, সুজাতা, অনীতা, গীতা, নীলিমা প্রভৃতি সভ্যারা উপবিষ্টা; এঁরা সকলেই বিবাহিতা

সুজাতা। দেখুন সবিতা দেবী, আপনার সঙ্গে খুব একটা দরকারী কথা আছে। আজকাল আমাদের কত্তাদের ভাতের ওপর রাগটা যেন খুব বেড়েছে; দু মিনিট দেরি হ'লে রাগারাগি বকাবকির অন্ত থাকে না,

আর প্রায়ই তাঁরা ভাত ফেলে রেখে কর্মস্থলে চ'লে যান। কাত্যায়নীদির বাড়ি আজ এই ব্যাপার ঘটেছিল, কাল ঘটেছিল আমার বাড়ি।

গীতা। আমার বাড়ি মাসে পনেরো দিন এই ব্যাপার ঘটে।

অনীতা। আমার বাড়ি হপ্তায় পাঁচ দিন।

নীলিমা। আমার বাড়ি মাসে অন্তত পঁচিশ দিন।

সুজাতা। তা হ'লেই দেখুন, রোগটা কি রকম ছড়িয়েছে। কেন এমন হয়, আর এর প্রতিকার কি, আমরা সকলেই জানতে চাই। ভাতের ঝগড়া আমাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

সভাপত্নী। এর কারণ আপনারাই, আর প্রতিকারও আপনাদেরই হাতে।

কাত্যায়নী। হ্যাঁ, আমরা স্বীকার করছি, আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়। তা ব'লে লঘুপাপে গুরুদণ্ড কেন?

সভাপত্নী। আসল কারণটা আপনারা জানেন না ব'লেই অপরাধী সেজে ব'সে আছেন। ত্রুটি-বিচ্যুতিটা আপনাদের অপরাধ নয়, আসল অপরাধ হ'ল আপনাদের দুর্বলতা।

অনীতা। এটা আমাদের দুর্বলতা? কেন, আমরা কি স্বামীর সঙ্গে মারামারি করতে যাব নাকি?

সভপত্নী। না না, তা নয়; দুর্বলতার অপবাদ কাটাতে গিয়ে ঝগড়াটে অপবাদ নিতে বলছি না। আমি বলছি, আপনাদের সকলকে নিজেদের শক্তির বিষয় সচেতন হতে।

কাত্যায়নী। না সবিতা দেবী, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না; যে স্বামী আমাকে বিয়ে করেছে, যার খাচ্ছি-পরছি, তাকে যে আমি কোন্ শক্তি দেখাব, তা জানি না।

নীলিমা। পুরুষের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা—এটা কি হাসির কথা নয়?

সভাপত্নী। নতুন কথা শুনলে সকলেরই হাসি পায়; কথাটা শুনতে শুনতে যখন আর নতুন থাকে না, তখন আমরা নিজেরাই লজ্জিত হই এই ভেবে যে, কথাটা অবিশ্বাস করার মত নির্বুদ্ধিতা একদিন আমাদের ছিল।

গীতা। কথাটা আর একটু খুলে বলুন সবিতা দেবী, আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না।

সভাপত্নী। আবহমান কাল থেকেই আপনারা মেনে আসছেন—পতি পরম

পড়েছ! বাবা একবার রেডিও বোঝাতে গিয়ে সেটা ভাঙিয়েছে, আবার তুমি এদের কমিউনিস্ট ক'রে তোল।

কানু লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল, আর ছিনাথের মুঠো আবার হয়ে উঠল শক্ত।

এঁদো। কে ভাঙলে রেডিও?

চপলা। ওই ওরাই— তোমরা কৃষক-রাজারা।

এঁদো একান্ত বিরক্তিতে ব'লে উঠল, যত সব! আজকে মীরা সেনের গান ছিল স-আটটায়। তারপর চেয়ার থেকে উঠে বললে, যাই, আজকের এই অ্যাটেম্প্‌ট্‌টার একটা স্টেট্‌মেণ্ট পার্টি-অফিসে পাঠিয়ে দিই গে। ওহে, তোমাদের পুরো নাম দুটো কি?

কানু। আজ্ঞে, শ্রীকানাইচরণ মণ্ডল আর শ্রীছিনাথ মণ্ডল।

এক টুকরো কাগজে নাম দুটো লিখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, গ্রাম, পোস্ট-অফিস, জেলা সব ব'লে যাও।

দুই ভাই-ই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল এঁদোর দিকে; ধান কেড়ে নেবার সময় সরকার বাহাদুরও ওই রকম নাম-ধাম আগে থাকতে লিখে নিয়েছিল কিনা। আজকালও আবার পুলিসের লোক এসে জোয়ান ছেলেদের নাড়ী-নক্ষত্র জেনে নিয়ে যাচ্ছে। ছিনাথের বয়েস এই মোটে পঁয়ত্রিশ, জেলে যাবার উপযুক্ত। স্বাস্থ্য ভাল হওয়া আজকাল দণ্ডনীয় অপরাধ কিনা।

তাই দুজনেই রইল চুপ ক'রে।

এঁদো কাগজে কি সব লিখছিল; এদের দীর্ঘ নীরবতায় মুখ তুলে তাকিয়ে, কিছু বিশেষ না বুঝে, প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে।

কানু। বড়বাবু তো সকলই জানেন; তেনাকেই শুধিয়ে লেবেন।

এঁদো। নিজেদের গ্রামের পোস্ট-অফিসের নামটাও জান না বুঝি! হুঁ!

বুকের মধ্যে থেকে উৎস-কলম বের ক'রে টেবিলে ব'সে কি একটা লিখছিল চপলা; হেসে উঠে বললে, তাই যদি জানবে, তা হ'লে ওদের এই অবস্থা হয়!

অবস্থা যে খারাপ তা তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে; কৃষক এবং শ্রমিক-কর্মীর তো তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকলে চলবে না। তাই এঁদো আবার কোমর বেঁধে লাগল, বলি, পোস্ট-কার্ড কেনো যে জায়গা থেকে, তার নামটা জান তো?

গুরু; শাস্ত্রে-পুরাণে দিদিমা-ঠাকুরমার মুখে এই একই কথা নানা ভাবে শুনে আসছেন; তারই জন্যে সাবিত্রী-বেহুলার সৃষ্টি। পতি-দেবতার সেবাদাসী হয়ে আপনারা তাঁদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদে পেট ভরিয়েছেন, হাসিতে গলেছেন, ভয়ে কেঁপেছেন। স্বামী দেবতা হ'লে আপনারাও যে দেবী—এ জ্ঞান আপনাদের কেউ দেয় নি। তাই আজ দু মিনিট দেরিতেই দেবতা ভোগ ফেলে মন্দির ছেড়ে চ'লে যান, আর আপনারা উপোস ক'রে কেঁদে সেধে পায়ে ধ'রে ক্রুদ্ধ দেবতাকে মন্দিরে ফিরিয়ে এনে সামনে ভোগের থালা সাজিয়ে দেন। এখন বলুন তো, এই অদ্ভুত আচরণ আপনাদের দুর্বলতাই প্রকাশ করে কি না?

অনীতা। এটাকে আপনি দুর্বলতা বলুন আর যাই বলুন, আমরা স্বামী-সেবা ব'লেই মনে করি; আর সেবাটাও তো একটা মহান ধর্ম।

সভাপত্নী। সেবা যে মহান ধর্ম, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই; দুজনে যদি পরস্পরের সেবক হয়, তবেই সেটা মহান; একজন শুধু সেবা করবে, আর একজন সেবা ভোগ করবে, এটা মহান সেবা নয়, এটা অতি জঘন্য দাসত্ব।

কাত্যায়নী। আপনার কথাগুলো আজ কি রকম যেন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। স্বামী আমাদের ভাত-কাপড় দিচ্ছেন, অবস্থা অনুযায়ী দু-একখানা গয়নাও পাচ্ছি; তা ছাড়া আবার কি সেবা চাই, তা তো বুঝতে পারি না।

সভাপত্নী। ঝি-রাঁধুনীরাও তো খোরাক-পোশাক পায়, মাসকাবারী মাইনে পায়। আপনার সঙ্গে তাদের কোনও পার্থক্য নেই? আপনি জানেন না, আপনার শক্তি কতখানি, সংসারে আপনার স্থান কত উঁচুতে। শুধু আপনি কেন, বাংলার সব ঘরে ঘরেই এই অজ্ঞতা বিরাজ করছে।

গীতা। আপনিই বলুন তো সবিতা দেবী, স্বামীদের কাছ থেকে ভাত-কাপড়-গয়না ছাড়া আর কি সেবা আদায় করা যায়? তাঁদের দিয়ে কি বাসন মাজাব, না রান্না করাব?

সভাপত্নী। মনে রাখবেন, সংসার গড়ার পরিকল্পনা নিয়েই আমাদের বিয়ে হয়; বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মিলিত চেষ্টায় সংসার গ'ড়ে ওঠে। স্ত্রীর কর্তব্য স্ত্রী করবে, স্বামীর কর্তব্য স্বামী করবে, তবেই সেটা হবে সংসার-সেবা; তা না হ'লেই সেটা হোটেল-জীবন হয়ে দাঁড়াবে। যৌথ কারবারের সমস্ত দায়িত্ব মাত্র একজনের ওপর থাকা মোটেই উচিত নয়।

সুজাতা। আপনার সব কথা শুনে কিছু কিছু বুঝলুম। কিন্তু আমাদের এতদিনের দুর্বলতা কাটাই কি ক'রে? আমাদের পাওনা আদায় করতে গেলে যে শক্তির দরকার, সে শক্তি পাই কি ক'রে?

সভাপত্নী। তার জন্যে চাই—ঐক্য আর সংগঠন। আমরা একা একা সকলেই দুর্বল; কিন্তু সম্মিলিত হ'লে আমাদের শক্তি এত বাড়ে যে, অতিবড় শত্রুকেও আমরা অনায়াসে পরাজিত করতে পারি। (ঘড়ি দেখে) আমার একটা জরুরী কাজ আছে, আমি চললুম; আজকের কথাগুলো আপনারা খুব ভাল ক'রে ভেবে বিচার ক'রে দেখবেন, আর কি কি করা উচিত সেটাও ঠিক করবেন। হ্যাঁ, রমা দেবী তো এখনও এলেন না, এলে তাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। [প্রস্থান

কাত্যায়নী। বেলা প'ড়ে এল, চল্ ভাই, আমরাও সব চলি।

সুজাতা। না দিদি, আর একটু ব'স; আমাদের সম্পাদিকার সঙ্গে দেখা না ক'রে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

নীলিমা। তিনি কোথায়? আজ এখনও এলেন না যে?

সুজাতা। তিনি এলেন ব'লে। আজ তিনি গ্রাম-সফরে যাচ্ছেন কিনা, তাই একেবারে তৈরি হয়ে আসছেন। এই যে তিনি এসে গেছেন।

সম্পাদিকা কমরেড রমা রায় প্রবেশ করলেন, সফরে যাবার উপযুক্ত পোশাক পরা; মুটে তিনটে বড় সুটকেস নিয়ে প্রবেশ করলে আর এক ধারে রেখে চ'লে গেল

রমা। আজ গ্রাম-সফরে যাচ্ছি, আপনাদের সকলকে নমস্কার জানাতে এলুম। সবিতা দেবী কোথায়? আজ তিনি আসেন নি?

সুজাতা। হ্যাঁ, তিনি এসেছিলেন; একটা জরুরী কাজ আছে ব'লে একটু আগেই চ'লে গেছেন; যাবার সময় ব'লে গেছেন, আপনাকে তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাতে।

রমা। হ্যাঁ, ওটাই আমার খুব বেশি দরকার; যে দুর্গম পথে আজ আমি প্রথম পা বাড়াচ্ছি, সেই পথের একমাত্র পাথেয় আপনাদের শুভেচ্ছা।

কাত্যায়নী। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে জয়ী করুন।

রমা। ধন্যবাদ। দেখুন সুজাতা দেবী, পাশের ঘরে আলমারিতে যত ছাপানো ইস্তাহার আছে, সেগুলো সব আমার এই খালি সুটকেস তিনটেতে ভ'রে

দিন। আর যে কি নেব, তা জানি না; নতুন পথে কি কি জিনিস লাগে আমি জানি না; সবিতাদি থাকলে খুব ভাল হ'ত।

সুজাতা। ইস্তাহারগুলো আমি ভ'রে দিচ্ছি; এ ছাড়া আর যা লাগবে, সে আছে আপনার কণ্ঠে। আপনার বক্তৃতা শুনলে আর কিছুরই দরকার হয় না।

রমা। ট্রেনের সময় হ'য়ে এল, আমিও এবার চলি। সুজাতা দেবী, আপনি তা হ'লে ইস্তাহারগুলো ভ'রে ফেলুন।

একটা খালি সুটকেস নিয়ে সুজাতার প্রস্থান

গীতা। (রমার প্রতি) আপনি কোথায় যাচ্ছেন বলুন তো? মাফ করবেন, আমি খবরটা ঠিক জানি না।

রমা। যাচ্ছি যে কোন্ অজানা অচেনা পথে, তা আমিও জানি না; সমিতি-সংগঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি পথে নামছি; বাংলার গ্রামে গ্রামে শাখা-প্রশাখার প্রতিষ্ঠা ক'রে সমিতিকে রীতিমত "নিখিল-বঙ্গ" ক'রে তুলতে চাই; তবেই আসবে আমাদের শক্তি, দূর হবে দুর্বলতা।

কাত্যায়নী। আপনি ফিরবেন কবে?

রমা। তা ঠিক জানি না, তবে দরকার হ'লেই ফিরতে হবে। যাক, এখন চলি, নমস্কার। [প্রস্থান

কাত্যায়নী। চল ভাই, আমরাও এবার চলি।

৩য় দৃশ্য

সুজাতার বাড়ি, দুপুরবেলা, ছোট মেয়েকে সে ঘুম পাড়াচ্ছে। পাশের বাড়ির কাত্যায়নী এলেন

সুজাতা। এস এস দিদি, ব'স।

কাত্যায়নী। এই যে ভাই, বসি। খেয়ে-দেয়ে শুলুম, ছেলেদের দৌরাত্মির চোটে চোখ বুজতে পারলুম না। তাই চ'লে এলুম তোর কাছে। আচ্ছা, কালকের মীটিঙে সবিতা দেবীর কথাগুলো তোর কি রকম লাগল বল্ দেখি? আমি তো ভাই অনেক কথাই বুঝতে পারলুম না।

সুজাতা। আমারও অবস্থা তাই। উনি লেখাপড়া শিখেছেন, বিদেশ ঘুরেছেন, দেখেছেন অনেক কিছু, জানেন কত জিনিস; তাই সব কথা বুঝতে না পারলেও অবিশ্বাস করতে তো পারি না দিদি।

কাত্যায়নী। যাই বলিস ভাই, আমাদের যেন দিন দিন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে; কথায় কথায় রাগ, অভিমান, গালাগালি, অপমান আর যেন সহ্য হয় না।

সুজাতা। সত্যি, আমরা যেন জন্তু-জানোয়ার; খাটি, খাই, ঘুমোই, না পাই পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে, না পাই দুখানা বই পড়তে, না পাই পাঁচ জায়গায় ঘুরে বেড়াতে। সংসারের ঘানিতে বেঁধে দিয়েছে, আমরণ সেই ঘানি টেনে যেতেই হবে; থামলে চলবে না, শরীরে না কুলোলেও ঘানি বন্ধ যাবে না।

কাত্যায়নী। এত ক'রেও কি ছাই কর্তাদের মন পাওয়া যায়?

সুজাতা। আর মন পেয়ে কাজ নেই দিদি, তার চেয়ে বরং মরণ পেলে বাঁচা যায়। এই সেদিন গীতাদি কত দুঃখু করছিল।

কাত্যায়নী। কেন, তার কি হ'ল?

সুজাতা। হবে আর কি, প্রতি বছরেই তার একটি ক'রে ছেলে-মেয়ে হচ্ছে; শত্রুমুখে ছাই দিয়ে তার আটটি হয়েছে; শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে; তার ওপর সংসারের খাটুনি; ছেলে-মেয়ে আর সংসার নিয়ে বেচারী একেবারে পাগল হয়ে যাবার মত হয়েছে; অনেক দুঃখে সে আজ মরণ চাইছে।

কাত্যায়নী। আহা বেচারী! প্রাণে কত দুঃখু এলে তবে লোকে মরণ-কামনা করে! আচ্ছা, ওর স্বামী তো শুনেছি মন্দ লোক নয়, কিছু বিহিত করে না?

সুজাতা। ভাল লোক, না, ছাই! একটি ঝি পর্যন্ত রাখে নি, নিজের সুখ-সুবিধে নিয়েই আছে। আর ও বেচারী যে ভাল-মন্দ পেট ভ'রে খেতে পাচ্ছে না, শরীর দিন দিন কঙ্কালসার হচ্ছে, সেদিকে খেয়ালই নেই।

কাত্যায়নী। আচ্ছা, সবিতা দেবী তো কাল বললেন—সবই আমাদের দুর্বলতা আর অজ্ঞতার ফল। কিন্তু এর প্রতিকার কি ক'রে হবে বল্ দেখি?

সুজাতা। আমি কি ক'রে বলি বল দিদি? পরের মীটিঙে না হয় তাঁকেই জিজ্ঞেস করব।

কাত্যায়নী। আর এই দেখ্ না, অনীতা—সোনা-রূপো বেচারীর গায়ে উঠলই না; শাঁখা-নোয়া হাতে দিয়েই তার জীবন কেটে এল। তার স্বামী শুনেছি, টাকা রোজগার করে মন্দ নয়; যথাসর্বস্ব ঘোড়ার ল্যাজে বেঁধে উড়িয়ে দিচ্ছে, তবু স্ত্রীর গায়ে একখানা গয়না দেবে না। পয়সা না থাকলে

অবশ্য দুঃখু ছিল না; ঘোড়ার পুজো হবে ষোড়শোপচারে আর স্ত্রীর কপালে পাঁচ পয়সাও জুটবে না, এটা অন্যায় নয়?

সুজাতা। কি আর বলব দিদি! আমাদের অবস্থা হয়েছে—

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
ভাবে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে।

কাত্যায়নী। না ভাই, এ ভাবে আর চলতে দেওয়া হবে না। সবিতা দেবীর উপদেশমত আমাদের চলতেই হবে, তা না হ'লে আর নিস্তার নেই। স্বামীরা মনে করে, তারা খেটে এনে আমাদের খাওয়ায়; খাটুনি যে কি রকম, তা আর জানতে বাকি নেই। দশজনে এক জায়গায় ব'সে গল্প ক'রে আড্ডা মেরে তো চাকরি করা; সাহেবরা নেহাৎ বোকা, তাই আড্ডা দেবার জন্যেও বাবুদের মাইনে দেয়। সেই কাজেরই বড়াই ক'রে ওরা আমাদের কাছে বাঘ-ভাল্লুক মারে আর চায় যে, আমরা গোলামের গোলাম হয়ে থাকি। সারাদিন আমরা ঘরে বন্দী থেকে কি খাটুনিটা যে খাটি, তা আর কি ক'রে বুঝবে বল?

সুজাতা। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক দিদি; স্বামীর জিম্মায় হাঁড়ি-হেঁসেল ছেলে-মেয়ে রেখে এস আমরা দিনকতক আপিসে যাই চাকরি করতে, দিনকতক ট্রাম-বাস চ'ড়ে ঘুরে বেড়িয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

কাত্যায়নী। না ভাই, ও আমি পারব না। বুড়ো-বয়েসে হাতব্যাগ ঝুলিয়ে ছুঁড়ী সাজা আমার দ্বারায় আর হবে না। আর কদিনই বা বাঁচব? সারা জীবনটাই যখন লাথি-ঝাঁটা স'য়ে স্বামীর ভাত খেলুম, শেষ বয়েসে আর লড়াই ক'রে পাপ বাড়াব না। তোর বরং বয়েস আছে, আপিসের সাজ-পোশাকে মানাবে মন্দ নয়।

সুজাতা। এসব কাজ তো আর একার কর্ম নয় দিদি। সকলে যোগ না দিলে আমি একলা কি লোক হাসাতে যাব?

কাত্যায়নী। মেয়েদের চাকরি করা আজকাল তো আর লোক হাসানোর ব্যাপার নেই; লোকের চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে, কেউ হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখে না।

সুজাতা। আচ্ছা, আমি এ বিষয়েও সবিতা দেবীর সঙ্গে পরামর্শ করব।

কাত্যায়নী। কিন্তু দেখ্ ভাই, সেও তো দাসত্ব হবে। আমি না হয় ঘরে চাকরি করব, আর তুই না হয় বাইরে করবি ; পরিবর্তন খালি জায়গার, অবস্থার নয়।

সুজাতা। ঘরে-বাইরে চাকরি না ক'রে আমরা ভালভাবে জীবন কাটাতে পারি কি না, সে কথা সবিতা দেবীই বলতে পারেন। আমাদের কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে, পতির পরম-গুরুত্ব যাতে কিছু কমে।

কাত্যায়নী। এতদিনের গুরুত্ব কি আর কমবে ভাই ?

সুজাতা। কেন কমবে না ? সবিতা দেবী বলেন, বহু দেশে নাকি ইতিমধ্যেই কমেছে। আমাদের দেশেই বা হবে না কেন ?

কাত্যায়নী। যদিও বা হয়, সেটা তো আর একদিনের কর্ম নয় ; সোনার খাঁচা গড়া হতে হতে তোতা এদিকে অক্কা পাবে।

সুজাতা। তাতে কি হয়েছে ? একজন গাছ বসায় আর তার বংশধররা ফল ভোগ করে। আমাদের না হয় দুঃখ-কষ্টে কাটবে, আমাদের মেয়েরা তো সুখী হবে। ভাগ্যি ভাল যে, সবিতা দেবীর মত সভাপত্নী আর কমরেড রমা রায়ের মত সম্পাদিকা পেয়েছি ; এঁদের কথামত চললে আমাদের জোর নিশ্চয়ই বাড়বে।

কাত্যায়নী। তখন আমরা যে কি হব, তা বুঝতে পারছি না। যাই হোক, এখন চলি ভাই, ছেলেদের ইস্কুল থেকে ফেরার সময় হ'ল। সমিতির মীটিং কবে আবার হবে জানাস।

সুজাতা। হ্যাঁ দিদি, নিশ্চয়ই জানাব।

কাত্যায়নী চ'লে গেলেন আর সুজাতা বসল সেলাই নিয়ে

৪র্থ দৃশ্য

রবিবার সকালবেলা, গণেশবাবুর বৈঠকখানা ; গণেশবাবু ব'সে ব'সে 'আনন্দবাজার' সহযোগে চা খাচ্ছেন। পর্দা উঠলে দেখা যাবে, তিনি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে 'আনন্দবাজারে'র একটা জায়গা পড়ছেন, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে

গণেশ। নেতা ! কংগ্রেস ! কৃষক-মজদুর-প্রজা-রাজ ! ননসেন্স ! খালি বড় বড় বুকনি আওড়ায়। (টেবিলের ওপর জোরে একটা ঘুষি মেরে) সব ক্যাপিটালিস্ট ! সব ময়ূরের পালক-গোঁজা কাক !

এক দিক দিয়ে কাত্যায়নী, অন্য দিক দিয়ে সুশীলের বেগে প্রবেশ

কাত্যায়নী। কি হ'ল গো? টেবিল-চেয়ার ভাঙছ কেন?

সুশীল। বাবা, কি হয়েছে? রাগারাগি করছেন কেন? আজ তো রবিবার।

গণেশ। (লজ্জিত হয়ে) না, কিছু হয় নি, আর এক কাপ চা দাও আমায়। তোমরা ভেতরে যাও, সোমনাথরা সব এক্ষুনি আসবে। (আবার 'আনন্দবাজারে' মন দিলেন; কাত্যায়নী ও সুশীল কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে চ'লে গেল।)

ভেতর থেকে সোমনাথ ডেকে অসীম ও হরিচরণকে নিয়ে প্রবেশ করলে

গণেশ। এস হে এস, ব'স সব। ওরে সুশীল, আরও তিন কাপ চা নিয়ে আয়। এই দেখ হে সোমনাথ, পণ্ডিতজী কি বলছেন। এত বড় ডাক-ধর্মঘটটা একা পণ্ডিতজীই মাটি ক'রে দিলেন। বিবৃতিটা একবার প'ড়ে দেখ।

সোমনাথ। ('আনন্দবাজার' থেকে) "শ্রমিকের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার করিতে মালিক অবশ্যই চেষ্টা করিবেন; মালিক যদি তাঁহার কর্তব্য পালন না করেন, তাহা হইলে শ্রমিক ধর্মঘট করিতে পারিবে। কিন্তু চরম অস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্বে তাহাকে গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে গিয়া সে জনসাধারণ বা বৃহত্তর সমাজকে দুর্দশাগ্রস্ত করিতেছে কি না। জনসাধারণের নিত্য-প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে যাহারা কাজ করে, তাহাদের ধর্মঘট করা উচিত নয়, যেহেতু তাহাতে পাঁচ শত লোকের সুবিধার অজুহাতে পাঁচ কোটি লোকের ক্ষতি করা হয়।"

অসীম। (হাতে তার 'স্বাধীনতা') চমৎকার! এরই নাম কংগ্রেস-ঘটিত কমিউনিজ্‌ম। বৃহত্তর সমাজের বড় বুলি না আউড়ে সোজা কথায় বললেই হ'ত—তোমরা ধর্মঘট ক'রো না, তাতে আমেদাবাদ, বম্বে, ক্লাইভ-স্ট্রীটের কর্তাদের অসুবিধা হবে।

হরিচরণ। কালই আমাদের আপিসের বড়সাহেব এই বিবৃতিটা সব বাবুকে ডেকে ডেকে পড়াবে আর বলবে, এই দেখ, তোমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ নেতা কি বলছেন! এর পরেও যদি তোমরা ইউনিয়ন-ধর্মঘট নিয়ে মেতে থাক, তা হ'লে তোমাদের খুবই ক্ষতি হবে।

গণেশ। দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকের দল হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে পেট ভ'রে খেতে

পায় না। তারা যখন তাদের দুঃখ জানায়, কেউ তাদের দিকে ফিরে তাকায় না। পণ্ডিতজীর মত লোকও আজ মরার ওপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছেন। জন-জাগরণ গণ-আন্দোলন নিয়ে কংগ্রেস এতদিন ধ'রে যে গলাবাজি করছে, আসলে সেটা ধনতন্ত্রেরই উপাসনা—সাদা-দেবতা কালো-দেবতার পুজো।

সোমনাথ। ঠিক বলেছ দাদা। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন সফল হয় নি কেন? 'মাস' তখন জাগে নি। কিন্তু ১৯৪৬ সালে জন-জাগরণ যখন বাস্তবে পরিণত হ'ল, অসহযোগের মহাযোগী তখন বদলে গেলেন।

হরিচরণ। সত্যি, আমাদের মত নপুংসক কেরানীর দল যে ক্ষেপব আর কথায় কথায় ধর্ম্মঘট করব, পঁচিশ বছর আগে এটা কেউ ধারণাই করতে পারে নি।

সোমনাথ। তুমি মনে করছ, কেরানী ক্ষেপলেই দেশ স্বাধীন হবে, যেমন কাঠবিড়ালী মনে করত—তারই জন্যে সেতুবন্ধ সম্ভব হয়েছিল?

হরিচরণ। সেতুবন্ধ একা রামেতেও সম্ভব হয় নি। তাই দেশের স্বাধীনতা আনতে হ'লে একজন গান্ধী, একজন সর্দার বা একজন পণ্ডিতের কর্ম্ম নয়; তার জন্যে চাই মাস-ডিস্‌কন্‌টেন্‌ট। সমাজের প্রতি স্তরে যদি অসন্তোষ না জাগে, দেশের প্রতি লোক যদি মনে-প্রাণে বিদ্রোহী হয়ে না ওঠে, তা হ'লে নেতা যত বড়ই হন না কেন, দেশ স্বাধীন হয় না। সেই অতি-প্রয়োজনীয় মাস-ডিস্‌কন্‌টেন্‌ট আজ এসেছে, কিন্তু নেতারা আবার ঘুমপাড়ানো গান শোনাতে আরম্ভ করেছেন।

অসীম। মজাটা দেখেছ? যে সাহেব-সম্প্রদায় ছিল কংগ্রেসের মহাশত্রু, আজ তারাই হয়েছে কংগ্রেসের মহামিত্র। পয়সা তারা লুটবেই, তা সে কংগ্রেসকে গাল দিয়েই হোক, আর প্রশংসা ক'রেই হোক।

গণেশ। সেদিকে নেতাদের চোখ পড়ে না, যত জুলুম আমাদের ওপর। আমাদের ওপর হুকুম না চালিয়ে নেতারা যদি মালিকদের ওপর একটু চাপ দেন, তা হ'লেই আমাদের কত উপকার হয়; তাঁরা কিন্তু শক্তিশালী অপরাধীকে ছেড়ে দিয়ে দুর্বল নির্দোষকেই ধমকাচ্ছেন। পেটের দায়ে যারা আজ ক্ষেপতে আরম্ভ করেছে, কংগ্রেস তাদের আর সামলাতে পারছে না; তারা সব আস্তে আস্তে কমিউনিস্টদের খপ্পরে গিয়ে পড়ছে।

হরিচরণ। বাইরের কথা ছেড়ে দিন; আপনার আপিসের ইউনিয়নের খবর কি? আপনি নাকি সেক্রেটারি হয়েছেন?

গণেশ। হ্যাঁ ভাই, পাঁচজন যখন বিশ্বাস ক'রে করেছে, তখন তো আর 'না' বলতে পারি না।

সোমনাথ। চাকরির ওপর তোমার আর একটু মায়া হচ্ছে না দাদা? এই বয়েসে চাকরি গেলে করবে কি?

গণেশ। চাকরির মায়া তোমরা করবে; প্রায় পঁচিশ বছর চাকরি করেছি, আমাদের তো এখন বেপরোয়া অবস্থা। বুড়ো কেরানীরা ভয়ে ভয়ে থাকে ব'লেই তো সাহেবরা সুযোগ পায়, আর তাদের দিয়ে যত কিছু জঘন্য কাজ করিয়ে নেয়। আমি আর ভয় করি না ভাই। কাল আমাদের ইউনিয়ন রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে, দাবির তালিকা তৈরি ক'রে ধর্মঘটের নোটিস দিতে পারলেই হয়।

অসীম। কত টাকা চাইছেন আপনারা?

গণেশ। কেরানীদের জন্যে অন্তত একশো টাকা আর চাপরাসীদের জন্যে চল্লিশ টাকা।

সোমনাথ। আমাদের আপিসেও তাই হচ্ছে।

গণেশ। ও রাস্তায় কখনও পা দিই নি, কি বিপদ-আপদ আছে জানি না। আর আমরা তো ম'রেই আছি; যতটুকু বাকি আছে, ততটুকু এবার না-হয় সকলে একসঙ্গে শেষ করব।

অসীম। না দাদা, মরব কেন? লোক ধর্মঘট করে বাঁচবার জন্যে, মরবার জন্যে নয়।

সোমনাথ। সত্যদ্রষ্টা কবির কথা ভুলে যেও না দাদা—

"মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনই জাগিবে তুমি তখনই সে পলাইবে ধেয়ে।"

মানুষের পৃথিবীতে মানুষের মত বেঁচে থাকার দাবি নিয়ে আমরা দাঁড়িয়েছি। মরবে তারাই, যারা আমাদের বঞ্চিত করেছে।

সুশীল। (প্রবেশ ক'রে) বাবা, আপনি আজ বাজার যাবেন, না আমি যাব?

গণেশ। তুই যা, আমি আর পারি না। চায়ের কি হ'ল?

সুশীল। চিনি ফুরিয়ে গেছে; গুড়ের চা আপনারা খাবেন?

অসীম। না বাবা, ও অমৃত খেয়ে আর দেবত্বলাভ ক'রে কাজ নেই।

সোমনাথ। দেখ দাদা, চায়ে সামান্য একটু চিনি খাব, তাতেও আমরা বঞ্চিত।

হরিচরণ। বেলা হ'ল, আমরাও এবার চলি; বাজার না গেলে খেতে পাওয়া যাবে না। [গণেশবাবু ছাড়া সকলের প্রস্থান

কাত্যায়নীর প্রবেশ

কাত্যায়নী। হ্যাগো, তোমরা আজকাল কি সব কথা কও বল দেখি? খালি কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট—তারা আবার কারা?

গণেশ। কংগ্রেস-কমিউনিস্ট বুঝতে চাও? আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। নুন-তৈরি, গান্ধীটুপি, চরকা-কাটা, চুরি না ক'রে জেলে যাওয়া, এই সব জান তো?

কাত্যায়নী। হ্যাঁ, তাকে তো স্বদেশী-করা বলা।

গণেশ। তারই নাম কংগ্রেস। আর যারা মুটে-মজুর-চাষা ক্ষেপায়, কল-কারখানা বন্ধ করায়, তারা হ'ল কমিউনিস্ট।

কাত্যায়নী। ও হরি, ছোটলোক ক্ষেপানোকে তোমরা বল কমিউনিস্ট?

গণেশ। ছোটলোক-ক্ষেপানো ব'লো না; কমিউনিস্টরা আজকাল আমাদেরও ক্ষেপাতে আরম্ভ করেছে।

কাত্যায়নী। তোমরাও তা হ'লে আজকাল ছোটলোক হচ্ছ? তাদের তো শুনেছি সব সময় চাকরি থাকে না; তাই বুঝি তুমি বলছিলে, তোমার চাকরি থাকবে না? না বাপু, ছোটলোক হয়ে চাকরি খুইয়ে কাজ নেই, ভদ্দরলোক থেকে চাকরি বজায় কর। চাকরি না থাকলে ছেলেপুলে নিয়ে কি রাস্তায় দাঁড়াব?

গণেশ। না না গিন্নী, তুমি ঘরেই থাকবে।

কাত্যায়নী। ধর্মঘট কি জিনিস গা? ধর্মের তো ঢাক হয় শুনেছি, আজকাল কি ঘটও হচ্ছে?

গণেশ। ধর্মঘট মানে ধর্মের ঘট নয়; কাজ না করাকে বলে—ধর্মঘট। এই যে সেদিন পাঁচীর মা জানালে, সাত টাকায় সে বাসন মাজবে না, দশ টাকা

মেয়েটার এই নিকুণ্ঠ বেহায়াপনায় এবং এঁদোর সন্দেহজনক দরদে ছিনাথ বিরক্ত হয়ে ব'লে উঠল, অত খবরে আপনার হবেটা কি বাবু? তারপর কানুর দিকে ফিরে বললে, চল দাদা, বেরিয়ে দোকান হতে কিছু খেয়ে আসা যাক। কথার শেষে সে উঠে দাঁড়াতেই কানুকেও উঠতে দেখে চপলা আর এঁদো একসঙ্গে ব'লে উঠল, আরে, যাচ্ছ কোথায়? সন্ধ্যা সাতটা থেকে কার্ফিউ; এখন বেরোলেই পুলিসে ধরবে।

ছিনাথ। পুলিসে ধরবে ক্যানে? আমরা কি চোর-ছ্যাচোড়?

এঁদো। আরে, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হচ্ছে, তাই সাতটার পর রাস্তায় আর কারও বেরুনো নিষেধ।

কানু। আমরা ত বাবু দাঙ্গা করি নাই। আমাদের ধরবে কিসের লেগে?

এঁদোর ধৈর্য-চ্যুতি হ'ল; 'কিসের লেগে' ব'লে কানুকে প্রায় ভেঙিয়েই ব'লে উঠল, একেবারে অজ। বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

চপলা ঘরে একা।

প্রিয়তম সেন হঠাৎ ঘরে ঢুকেই চপলাকে একমনে লিপি-লেখন-ব্যাপৃতা দেখে অতি সন্তর্পণে পিছনে এসে দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে তার দুই চোখ চেপে ধরতেই সে 'ও মা' ব'লে তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে উঠে দাঁড়াল। প্রিয়তম হাত খুলে নিয়ে হাসতে লাগল। চপলা হেসে হেসে বলতে লাগল, দেখ তো, লেখাটা নষ্ট ক'রে দিলে।

ঘরের এক কোণে কানু আর ছিনাথ যে ব'সে আছে, তা যেন এদের শুধু লক্ষ্য নয়, চেতনারও বাইরে। কানু জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় আকাশের অবস্থাই পর্যবেক্ষণ করছে আর ছিনাথ ভাবছে, এরা স্বামী-স্ত্রী ব'লেও বোধ হয় না, আবার না হ'লেই বা এমন মাখামাখি রসিকতা করে কেমন ক'রে!

তারপর, আজ কোথায় কটা খুন হ'ল বল।—ব'লে চপলা প্রিয়তমকে হাত ধ'রে চেয়ারে বসাতে গিয়ে ঘরের কোণে এদের ওপর চোখ পড়ায় বললে, চল, ও ঘরে যাই; এখনই আবার বাবা এসে জমিদারির কথা পাড়বে।

প্রিয়। ও ঘরে মানে?

অর্থলিপ্স, বহুশ্রমে-ফেঁপে-ওঠা, ছটি ছ ঘায়ে চলা মধ্যবিত্ত-ঘরে বাড়তি বাইরের ঘর থাকে না, এ বাড়িতেও নেই। নরহরিবাবু চিরকালই গোঁফে

চাই, আর তারপরেই তিন দিন গ্যাঁট হয়ে ঘরে ব'সে রইল, তাকে বলে—ধর্ম্মঘট।

কাত্যায়নী। ও, মাইনে বাড়াবার জন্যে গোঁ ধ'রে ব'সে থাকার নাম ধর্ম্মঘট?

গণেশ। হ্যাঁ, শুধু মাইনে কেন? শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি করতে হ'লে ধর্ম্মঘট করতেই হয়। সোজা আঙুলে যেমন ঘি ওঠে না, তেমনই ধর্ম্মঘট না করলে মালিকদের কাছ থেকে কিছু আদায় করা যায় না।

কাত্যায়নী। সাহেবরা তো শুনেছি ভাল লোক; মাইনে বাড়াবার যদি দরকারই হয়, তা হ'লে তাদের হাতে-পায়ে ধরলেই হয়, তা না ক'রে ঝগড়া-ঝাঁটি বাধাচ্ছ কেন?

গণেশ। না গিন্নী, সাহেবরা আজকাল আর ভাল লোক নেই; আমাদের বড়বাবুরা তাদের রীতিমত চালাক ক'রে দিয়েছে, তারা খালি আমাদের ঠকাতে চেষ্টা করছে। তাই ধর্ম্মঘট ছাড়া আমাদের কোন পথ নেই।

কাত্যায়নী। আজ তোমার কাছে একটা নতুন জিনিস শিখলুম, নিজের অবস্থার উন্নতি করতে হ'লে ধর্ম্মঘটই সোজা উপায়।

গণেশ। তোমায় নতুন জিনিস শেখালুম, আমায় কিছু খাইয়ে দাও।

কাত্যায়নী। আচ্ছা ব'স, আমি আনছি চট ক'রে। [প্রস্থান

ক্রমশ

প্রবোধকুমার

মহাজয়

এতদিন পরে মেলেছে নয়ন অমৃতের পুত্রেরা।
রুদ্র হে, তব দাও দাও বরাভয়
ভেঙেছে নিদ্রা ছুটেছে স্বপন
পদ্মের মত এ কি জাগরণ!
তিমিরের পারে তারা যে দেখেছে
জ্যোতির্ম্ময়—মহাজয় মহাজয় ভারতের গাহ জয়॥

এ কি কারাগার তামসিকতার ভেদ করি এল তারা
বন্ধন ক্রুর নিঃশেষে করি ক্ষয়
বাহির হয়েছে আলোকের পথে

প্রেমমন্দ্রিত পুষ্পিত রথে
প্রেমের প্রলয়ে অক্ষয় করি জগৎজয়—
মহাজয় মহাজয় ভারতের গাহ জয় ॥

ধ্বংসে প'ড়ে গেছে হিংসাপ্রাচীর লোভের সিংহাসনে
পরাধীনতার লজ্জিত পরিচয়
সন্তান সবে ভুলে গেছে আজ
রক্তের শোধ দানবের বাজ
দু হাতে মেলিয়া বিশ্বনিখিলে
বক্ষে লয়—মহাজয় মহাজয় ভারতের গাহ জয় ॥
হৈমী অচল রত্নসাগর তুলিছে তাদের হাতে
গগন পবন ঘন সঙ্গীতময়
চক্র-শাসন উড়িছে পতাকা
গৈরিক শ্যাম শুভ্রতা আঁকা
বিপুল পুলকে দ্যুলোকে ভূলোকে
গর্জি কয়—মহাজয় মহাজয় ভারতের গাহ জয় ॥

এসেছি আমরা বিশ্বেরে দিতে দীক্ষা অমরমন্ত্রে
হে জগৎবাসী নাহি ভয় নাহি ভয়
বজ্র আমরা মোরা পারিজাত
শক্তি আমরা প্রেমসঞ্জাত
চির পুরাতন আমরা নূতন
সূর্যোদয়—মহাজয় মহাজয় ভারতের গাহ জয় ॥

মৈত্রীর রথে আমরা সারথি চল চল উৎসবে
হে সখা হে ভ্রাত, নর নারী সঞ্চয়
বিশ্বযজ্ঞে জলে হোমানল
আনন্দরূপ ভাতিছে কেবল
প্রণাম কর হে প্রণাম কর হে
বিহীনক্ষয়—মহাজয় মহাজয় ভারতের গাহ জয় ॥

শ্রীপ্রবোধেন্দু

মুসাফিরের ডায়েরি

কাল-বৈশাখী

মাঝমাঠে মাঠের মাঝে এসে দাঁড়ালুম, ঘুমন্ত পুরী, সামনে পতাকার গগনচুম্বী দণ্ডটি। আজ স্নানযাত্রা, পূর্ণিমা তিথি। ঝিঙেক্ষেতে অসংখ্য ফিকে বাসন্তী রঙের ফুল ফুটে রয়েছে, বাতাসে তার কারুজ অম্ল-গন্ধ ভেসে আসছে। এমন সুষমাময় এই ফুলগুলি। সাহিত্যে মৌরিফুল স্থান পেয়েছে, কিন্তু এ কাব্যের উপেক্ষিতা। মনে জাগল, ড্যাফোডিলস্, আনিমনি আর এই আমার কল্পিত সন্ধ্যামণি। সন্ধ্যায় এরা দল মেলে। আজও তার ব্যতিক্রম হয় নি, যদিও আজ দারুণ বিপ্লব হয়ে গেছে। অনন্যসাধারণ প্রলয়ঙ্করী ঝড় ব'য়ে গেছে কয়েক ঘণ্টা আগে। এখনকার এই শান্ত পরিবেশে তার কিছুমাত্র স্বীকৃতি নেই প্রকৃতির জগতে। মানুষের, মমতাময় মানুষের, ক্ষতির ক্ষত অদূরে বিরাজমান—পূবের মস্ত বড় চৌচালা অতিথিশালাটা ভূমিসাৎ হয়ে গেছে।

মধ্যাহ্নে অসহ্য গরম ছিল। রুটিনমত পড়ার ক্লাস করতে একটুও ভাল লাগছিল না, সঙ্গিনীদের দিকে চেয়ে দেখি, সব স্বেদাপ্লুত দেহ, যেন ধারাস্নান সেরে এসেছে। কদাচিৎ দমকা আগুনে-হাওয়া এক ঝলক তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছিল। রোদ প্রখর নয়, কিন্তু যতখানি দেখা যায়, পৃথিবীর ততখানি যেন চিকের আড়ালে বসা অসূর্যম্পশ্যা নারীর মত রুদ্ধশ্বাস তপ্তদেহ। নিষ্ফল আক্রোশ নিয়ে এই মেঘলোকের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে শীতল বায়ুর স্পর্শ পাবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছি? বেলা বেড়ে চলল, অপরাহ্নে কিয়ৎকাল রৌদ্র-ছায়ার খেলা, তারপর ঝড়ের আভাস পাওয়া গেল। পশ্চিম আকাশটা ঘোলা হয় এল, পাঁশুটে রঙের মেঘ জমতে লাগল দিগ্বলয়ের সীমায় সীমায়, দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য বাতাসের মাতামাতি।

আমরা সাঙ্কেতিক বাঁশী বাজিয়ে পতাকা অবতরণ করতে ছুটলুম। "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিসহ অভিবাদন শেষ হ'ল, কিন্তু পতাকা নামায় কার সাধ্য? বাতাসের প্রশ্রয় পেয়ে সে গগনবিহারী হবার সঙ্কল্প নিয়েছে, এই মাটির পৃথিবীতে আর পা দেবে না। (আজ ২রা জুন, জাতির ভাগ্য নিয়ে খেলা চলছে, তাই কি এ বিপর্যয়!)

বাংলা দেশে আঁধির মত এ ধূলির ঝড় বিরল। কোনমতে চোখ-মুখ ঢেকে বারান্দায় এসে উঠলুম। চোখ খুলে দেখি, ধূলো ও নদীর শুকনো বালি পাক

দিয়ে স্তম্ভের মত ওপরে উঠে ফেটে ছড়িয়ে পড়ছে। সব বড় গাছগুলো, বিশেষ পুকুরপাড়ে অশত্থ-বটে মেশামেশি যমজ গাছটা নাজেহাল হয়ে গেছে, ঊর্ধ্বশাখার আন্দোলনে সে কি রমঝম ঝমঝম শব্দ! দূরে ইটের পাঁজাটায় যেন আগুন লেগে গেছে, লাল-সুরকি-রঙের ধুলোর ধোঁয়া ওদিকের আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে। হঠাৎ বাঁ পাশে ছোট খড়ের চালাটায় নজর পড়ল। বাঁশের খুঁটিগুলো যেন কে নাড়িয়ে নাড়িয়ে উপড়ে দিচ্ছে, হালকা বাঁধুনির দরজাগুলো সব ভেঙে গেল, বেড়ার শরের কাঠিগুলো চারিপাশে খোলা বাক্সের দেশলাই-কাঠির মত ছিটিয়ে দিল পাগলা হাওয়ায়। আবছা আলোয় ঘরটি যখন দুলে দুলে উঠতে লাগল, তখন আমার মনে হ'ল, এ যেন সেই 'সেকালের কথা'র যুগের ম্যামথ। তছনছ-করা খড়ের বঙ্কিম চালাটা তার রোমশ তামাটে দেহ, চারপাশের খুঁটিগুলো ওর পা। সে যেন জানু পেতে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল, হঠাৎ চেতনা পেয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। মনের কি যে হ'ল, অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠলুম। যেন ওই বর্বরযুগের মত্তমাতঙ্গ ধীর নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে; ওর সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাবার জন্য শুঁড় দিয়ে আমাদের জড়িয়ে আছড়ে ফেলে চূর্ণবিচূর্ণ করবে। চীৎকার ক'রে উঠলুম, গেল, গেল, সর্বনাশ হ'ল! সে তার কান দুলিয়ে লেজ ঝাপটে দাঁড়িয়েই রইল।

নদীর পশ্চিম পারের ঘরটা ঝড় জলের অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্ত আছে, আবার সেই ঘরেই এক ভয়ত্রাসে মেয়ে আছে, তখনই ছুটলুম সেদিকে। আন্দাজ একশো হাত দূরে ঘরটা, এটুকু পথ বুঝি আর যেতে পারি না। আমার হালকা দেহটাকে এমন দোলা দিচ্ছে যে, দাঁড়াতে পারছি না, প্রতি পদক্ষেপ অনিশ্চিত হয়ে এসেছে, সত্যি কি ঝড়ে উড়িয়ে নেবে? পথের পাশে গাছের ডাল, বাঁশের খোঁটা, যা পাই তাই ধ'রে এগিয়ে চলি, শেষে আর একটি মেয়েকে অবলম্বন ক'রে চললুম। মাটির জলপাত্রগুলোয় যে কঞ্চির ঝাঁপ ঢাকা ছিল, সেগুলো পাতলা টিনের চাকতির মত শাঁ শাঁ ক'রে উড়ে গেল, জানলা-দরজার ঝাঁপ ছিঁড়ে উড়ে একেবারে নদীর ওপারে ভিনগ্রামে গিয়ে থামল। হঠাৎ ঝনঝন ঠনঠন শব্দ, বিস্ময়ে বোধহীন হয়ে যাচ্ছি। কি ব্যাপার, এ কিসের শব্দ, এ তো বজ্রপাত নয়, আমাদের তো কাঁচের শার্সি নেই, তবে এ কি? সবলের মধ্যে একটি পাকা দেওয়াল ও মেজেওলা খড়ের চালের ঘর, আমাদের বইগুলোর নিরাপদ আশ্রয়। তার বারান্দায় সারি সারি বালতি বসানো ছিল, আচমকা

ঝড়ের ঠেলায় সব ঢুং-ঠাং করতে করতে গড়িয়ে চলেছে। অবিশ্বাস্য কাণ্ড, আমাদের জল-রাখা খালি বিরাট ড্রামটা অব্যর্থলক্ষ্য রেসের ঘোড়ার মত তীরবেগে ছুটে চলেছে ; লম্বা মাঠ পার হয়ে, শাকের ক্ষেত মাড়িয়ে, প্রায় পাঁচ হাত উঁচু বাঁশের বেড়া ডিঙিয়ে, নদীর পাড় বেয়ে নেমে সেই খেয়া-নৌকার পারঘাটায় গিয়ে আটকাল। পাছে নদীতে ডুবে যায়, তাই ওকে বৃথা থামাবার চেষ্টা করতে গিয়েই স'রে দাঁড়ালুম। ওর সামনে পড়লে পিষে ফেলবে। গায়ে তীরের মত বৃষ্টির ফোঁটা বিঁধছে ; খুব অল্প জলধারা, কিন্তু বাতাসের বেগে অস্ত্রের মত তীক্ষ্ণ ; তপ্তশলাকা ফুটছে মুখে পিঠে বাহুতে।

উত্তরের উঠোনের দুটো ধানের মরাই ছিটকে চ'লে গেল। একটির টিনের টাপর ছুটে এসে গোলার মত পাশের ঘরের চালে বিঁধল, নিমেষে মড়মড় শব্দে সে অংশটা বেঁকে দুমড়ে প'ড়ে গেল। এ কি সর্বনাশের পালা শুরু হয়েছে আমাদের! কতদিনের খাদ্যসঞ্চয় যে ওই মরাইয়ে, এই দুঃসময়ে ওর মূল্য যে বহু!

আমাদের সাধের অতিথির বিশ্রামাগার সামনে। ওটা আমাদের সবচেয়ে ভাল দামী ঘর। ওর মাথায় ঘরামীদের শিল্পচিহ্ন—কয়েকটি মোহনচূড়া, ভাল কাপিলাগাছের খুঁটি, চার পাশে মেটে বারান্দা, ছাদ ও দেওয়ালের সন্ধিস্থলে বাঁশের সূক্ষ্ম জাফরি—এরা বলে, ভেলকি। মনে হ'ল, ও ঘরটাও নড়ছে। এ পাশের অশক্ত ঘরটার পশ্চিমের বারান্দার চাল প'ড়ে গেছে, দক্ষিণেরটা দোদুল্যমান। চতুর্দিক থেকে মুর্গী, কুকুর, ছাগল, ভেড়ার আর্তস্বর বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। ভয়-বিকৃত কণ্ঠে হুকুম জারি করলুম, তোমরা ভেতরে কেউ থেকো না, শীঘ্র বেরিয়ে মাঠে বা পাকাঘরে এস, শীঘ্র, ঘরচাপা পড়বে, দোহাই বের হও। সব দিশেহারা হয়ে ছুট দিলে, ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ঘরে জটলা করছিল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে বারান্দাটা ভেঙে প'ড়ে ঘরের প্রবেশপথ আটক করলে। আর আমার চোখের সামনে সেই প্রিয় ঘর, কত মান্যগণ্য অতিথির স্মৃতি-বিজড়িত ঘর, মাটিতে এলিয়ে পড়ল। ভেলকিগুলো গুঁড়িয়ে গেছে, চালটা ঈষৎ তরঙ্গায়িত ভঙ্গীতে লুটিয়ে প'ড়ে আছে। প্রবল বাতাসের ফুৎকারে তার এলোমেলো চালের ছাউনি ঠিক পরিশ্রান্ত বৃদ্ধের অবিন্যস্ত পক্ককেশের মত লাগছে।

প্রকৃতির চকিত খেয়ালে আমাদের কতদিনের গ'ড়ে তোলা সাজানো ঘর

চুরমার হয়ে গেল। দুঃখের চেয়ে ক্রোধ ও লজ্জা হচ্ছিল বেশি। এ কি পরাজয়! নিঃসহায়ের মত দাঁড়িয়ে এ তাণ্ডব দেখলুম, কিছু বাধা দিতে পারলুম না,—অপরাজেয় শক্তির কাছে সেই চিরন্তনী পরাভব।

নদীতে একটা বাঁধন-ছেঁড়া নৌকা কোন্ অজানায় ভেসে গেল, হয়তো অকূলে কূল পাবে, হয়তো অনাত্মীয় কঠিন পাড়ে ধাক্কা খেয়ে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে। ঘরটা যদি অমনই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত ভাল হ'ত, এমন আসা-যাওয়ার পথের পাশে ওর স্তূপীকৃত বিকৃত মৃতদেহ আমার সয় না।

রাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলুম ওর কাছে। সামনের প্রবেশপথ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকা যায়, ভিতরটি ঘোর অন্ধকার, কোন্ বৌদ্ধযুগের গুহা। ওই ঘরের পাশে পাশে লাগানো বেল, চামেলী ও রজনীগন্ধা গাছগুলো মৃদুমন্দ বাতাসে দুলে দুলে আমাকে ডাকছিল তাদের ফুলসজ্জা ও গন্ধ-সম্ভারের ঐশ্বর্য দেখাবার জন্য। তাদের ভিতরে বাইরে কোনও আঘাত লাগে নি, তাদের অন্তর তখনও মধুবিন্দুভারে টলমল। ক্ষোভে ও অপমানে আমার চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

"মুসাফির"

নির্বাপিত

গালার-কাজ-করা কাঠের বাক্স থেকে ক্রোচেটের সুতো আর কুরুশকাঠি বের হ'ল। ভদ্রমহিলা বললেন, এইটা আমার দশম হবে।

ড্রেসিং-টেবল-রানার বুনেছেন তিনি সাদা সুতোর কল্কা-কাজ দিয়ে। তাঁর ঘরের এমন কোন আসবাব নেই, যাতে হাতে বোনা লেস পড়ে নি। তাঁর বাড়িতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যাঁরা পরিচ্ছদের কোন অংশ লেস-সুশোভিত করে নি। বর্তমানে মেয়েদের লেস বোনার শখ প্রায় ব্যারামে পরিগণিত হয়েছে। আমাদের ভদ্রমহিলা সর্বাপেক্ষা শোচনীয় রোগী।

আমাদের উদ্দেশ্য জেনে তিনি একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপরে ধীরে ধীরে ব'লে বসলেন, আমি তো কথা দিতে পারছি না।

মনীষা অনুনয়ের স্বরে বললে, সামান্য সময়। সবাই না গেলে চলবে কেন? ভদ্রমহিলা সাবধানে ঘর তুলতে তুলতে উত্তর দিলেন, শরীরটা আমার ভাল নয়। ওসব গোলমালের মধ্যে গেলেই মাথা ধরে।

আর মাথামুড় গুঁজে লেস বুনলে কিছুই হয় না, না?—মনীষা আমার কানে কানে জানালে। প্রকাশ্যে ভদ্রভাবে বললে, দেখুন, পাড়ার মেয়েদের সভা। এতবড় অত্যাচারের তো কিছু প্রতিকার চাই।...হ্যারিসন রোডের নারী-নির্যাতন আমাদের পাড়ার আকস্মিক মহিলা-সভার হেতু।

নির্লিপ্ত উদাসীন কণ্ঠে ভদ্রমহিলা বললেন, প্রতিকার তো আমাদের হাতে নয়।

তা হ'লেও তো চেষ্টা করতে হবে। চুপ ক'রে সহ্য করলে আরও প্রতিকারের আশা নেই।

মনীষার গরম-গরম কথা মাঠেই মারা গেল। ভদ্রমহিলার ঘোলা চোখে, একঘেয়ে গলার স্বরে বিন্দুমাত্র জীবনীশক্তি দেখা দিলে না। মাথা নীচু ক'রে একমনে তিনি লেস বুনে চললেন। ভাবলাম, যাঁর আঙুল এত সক্রিয়, তিনি মনের দিক থেকে এত অলস কেন?

মনীষা বললে, বলুন, তা হ'লে আমরা যাই। নারীনির্যাতন দেখেও আপনার সহানুভূতি হ'ল না, এটাই দুঃখের বিষয়। মনীষা উঠে দাঁড়াল, আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে উঠলাম।

মনে হ'ল, হঠাৎ ভদ্রমহিলার চোখে যেন একটা কিছু জ্ব'লে উঠল। এক মুহূর্তের জন্য যেন তিনি অন্য একটা রূপ নিতে নিতে থেমে গেলেন। আবার তিনি মাথা নামালেন, অঙ্গুলির গতি তাঁর দ্রুততর হয়ে উঠল।

বহুদিন আগের কথা হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল। আশ্চর্য! এঁর সম্বন্ধে এতবড় ঘটনাটি আমি ভুলে গিয়েছিলাম!

* * *

স্কুলের গণ্ডি সবে পার হয়েছি। একদিন বেলা তিনটার সময় দুইজন ভদ্রমহিলা আমাদের বাড়ি এসে আমার মায়ের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। একজন কালো ও মোটা, মহার্ঘ বেশভূষায় সজ্জিতা। অন্যজন পাতলা ও ফর্সা, লালপেড়ে-তাঁতের-শাড়ি-পরিহিতা।

আমরা বালিগঞ্জী পাড়ায় নূতন এসেছি। সুতরাং আমার মায়ের কাছে তাঁদের পরিচয় দাখিল করতে হ'ল সর্বপ্রথম।

স্থূলাঙ্গী হাতের বেঁটে ছাতা দুলিয়ে গর্বের সঙ্গে নিজের পরিচয় দিলেন। তাঁর স্বামী প্রসিদ্ধ লোক, নামমাত্রেই আমরা চিনলাম।

শীর্ণাঙ্গী তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। পাড়ায় একটি বড় গোছের পার্ক আছে, সেখানে সন্ধ্যার পরে পাড়ার মেয়েরা মুক্ত বায়ুতে বিচরণ প্লাস আলাপ ও পরচর্চা করতে যান। সেই পার্কে সম্প্রতি পাড়ার পুরুষেরা একটা পাকা ঘর তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন মধ্যখানে। উদ্দেশ্য—বর্ষার হাত থেকে, রৌদ্রের কবল থেকে আত্মরক্ষা। সহসা ক্ষেপে উঠেছেন মহিলারা। তাঁরা বলছেন, ওখানে ওই প্যাভিলিয়ন গড়া হ'লে ক্ষতি হবে। মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ওই পার্কে বেড়াতে পারবেন না। কারণ, অবাঞ্ছিত ব্যক্তিবৃন্দ একটা আশ্রয়ের সুযোগ পেয়ে জঘন্য ব্যবহার দেখাতে পারে। তাই কর্পোরেশনের মেয়র থেকে আরম্ভ ক'রে কাউন্সিলর, এমন কি ছোটখাট ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত তাঁদের ধর-পাকড়ে অস্থির হয়ে উঠেছেন। উপযুক্ত অনুপযুক্ত বিচার নেই, একটু বড়-দরের লোক হ'লেই এঁরা তার কাছে গিয়ে আবেদন জানাচ্ছেন ঘর তোলা বন্ধ করতে। স্থূলাঙ্গীর প্রসিদ্ধ স্বামী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কার্যকলাপে একটি প্রতিবাদও করতে পারছেন না। লাভের মধ্যে তিনি ক্লাবে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন। শুধু লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরলেই হবে না, জনসভা ক'রে রীতিমত প্রতিবাদ জানানোও চাই। তাই এ পাড়ার মহিলাদের ডাকা হচ্ছে সভা ক'রে সেই প্রতিবাদ জানাতে।

আমার মায়ের সঙ্গে এঁরা কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। আমি দরজার পর্দা ধ'রে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এত তোড়জোড়ের আবশ্যকতা কি? আজ কয়েকজন মহিলা সন্ধ্যার সময়ে পার্কে বেড়াতে যাচ্ছেন। কাল তাঁদের এ খেয়াল থাকবে না। বর্ষা এলেই শখ ঘুচে যাবে। অন্য দিকে মন চ'লে যেতে বাধা। অথচ বিশাল পার্কে একটা ছাউনি থাকলে কত লোক হঠাৎ-আসা ঝড়-ঝাপটায় আশ্রয় পেতে পারে। বাচ্চা ছেলেমেয়েও তো বেড়াতে আসে। আর একটা ন্যাড়া চালার এমন কি আকর্ষণ, যে যত অবাঞ্ছিত পুরুষ সদা-সর্বদা সমস্ত কাজ ফেলে সেখানে জমায়েৎ হয়ে বিগতযৌবনা মহিলাদের মনোকষ্টের কারণ ঘটাবে?

বিকাল পাঁচটায় স্থূলাঙ্গীর বাড়িতে সভায় আমি ও মা উপস্থিত হলাম। অনেক মেয়েই এসেছেন। ছাদে শতরঞ্চ পড়েছে, সভানেত্রীর জলচৌকি

বসেছে। এক হার্মোনিয়ম সামনে নিয়ে একদল কিশোরী প্রতীক্ষা করছে সভারম্ভের। নির্দেশ পাওয়ামাত্র উচ্চৈঃস্বরে গান ধরলে—

"আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও,
জননী এসেছে দ্বারে—

এ ক্ষেত্রে এই দেশাত্মপ্রেমবোধক গানের কোন সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করা গেল না।

সবথেকে সকরুণ ব্যাপার এই যে, শীর্ণাঙ্গী সর্ব দিকে তাল দিয়ে কোনমতে গোটা সভার কাজ নির্বাহ করছেন—কোরাস গান পর্যন্ত তাঁকে গাইতে হ'ল। সভায় যাঁরা উপস্থিত, তাঁরা অনেকেই জীবনে কোন সভায় পা হয়তো দেন নি। স্থূলাঙ্গী নেহাৎই পিপে, কেউ ধাক্কা দিলে তবে অতি কষ্টে গড়ান একটু। শীর্ণাঙ্গী আগাগোড়া তাঁকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে সভাটি চালালেন। প্রধান বক্তাও হলেন শীর্ণাঙ্গী। অগ্নিগর্ভ ভাষায় বক্তৃতা দিলেন তিনি—এই প্যাভিলিয়ন যদি হয়, তা হ'লে পাড়ার মেয়েদের একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাঁরা সারাদিন ঘরে বন্দী হয়ে থেকে বিকালবেলায় একটু খোলা বাতাসে বেড়ানো থেকে বঞ্চিত হবেন। ওইখানে পুরুষেরা সব সময়ে ব'সে থাকবে, গান গাইবে, সিগারেট টানবে। ভদ্রভাবে কোন মহিলা নিজের সম্মান বজায় রেখে ওই পার্কে চলাফেরা করতে পারবেন না। পার্ক আমাদেরও যতটা, পুরুষেরও ততটা। আমাদের জব্দ করবার জন্যেই এই ছাউনি তোলবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা, মেয়েরা, প্রতিজ্ঞা করছি, কিছুতেই আমরা প্যাভিলিয়ান তুলতে দেব না। তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল, রক্তের উত্তাপ দূরে ব'সেও বোঝা গেল অনুভবে। মনে হ'ল, এই প্যাভিলিয়ন রচনার ওপরে তাঁর জীবন-মরণ এবং আমাদেরও জীবন-মরণ নির্ভর করছে। ছোট ঘরের সীমানা থেকে তিনি যেন বহুদূরে স'রে গেছেন। তাঁর জ্বলন্ত উৎসাহ আমাদেরও অনুপ্রাণিত ক'রে তুলেছে। অজ্ঞাতসারেই আমিও করতালিতে যোগ দিলাম।

* * *

আজ সে শীর্ণাঙ্গী ভদ্রমহিলার এই পরিণতি। মধ্যে দশ বছর পথেঘাটে দেখাশোনা হয়েছে। আমি কলকাতার বাইরে গেছি, তিনি বাইরে থেকেছেন। এই দশ বছরে তিনি তিন মেয়ে ও দুই ছেলের বিয়ে দেওয়া ভিন্ন উল্লেখযোগ্য কাজ কিছু করেন নি। পথে নেমে মনীষা বিরক্তভাবে বলতে

লাগল, ভুল লোকের কাছে আসার এই ফল। একবার সভায় গিয়ে ব'সে কিছু চাঁদা দিয়ে একেবারে কৃতার্থ ক'রে দেবেন যেন। তাতেই আপত্তি। এবারে যার-তার কাছে যাব না।

মনীষার কথার উত্তর দিলাম না। 'ভুল লোক' কেমন ক'রে বলি? একদিন যে বহ্নিতে ওঁকে উদ্দীপ্ত দেখেছিলাম, আজ সে বহ্নি নির্বাপিত হয়ে গেছে। কিন্তু অগ্নির মৃত্যু নেই। কোথায় সে লুকিয়ে আছে নূতন রূপে? মনে প'ড়ে গেল, ভদ্রমহিলার দ্রুত অঙ্গুলির অবিশ্রান্ত সঞ্চরণ। সারা বাড়ির লেস বুনে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের দিয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত। এক মুহূর্ত'ও তিনি নিষ্ক্রিয় থাকতে পারছেন না। যে অশান্ত জীবনীশক্তি সেদিন প্যাভিলিয়নে বাধা দেবার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, সেই শক্তি আজ ফল্গুর মত অঙ্গুলির প্রান্তে ব'য়ে যাচ্ছে, তুচ্ছ লেস-বোনার তুচ্ছতর প্রচেষ্টায়। এই দশ বছর সে শক্তি হয়তো ব্যয়িত হয়েছে পাঁচটি সন্তানের যোগ্য সাথী জুটিয়ে দেবার আয়োজনে।

অসমাপ্তভাবে ব'লে উঠলাম, কত লেস-বোনা দেখছ না? মনীষা আমার কথা বুঝতে পারলে না, সম্ভবও নয়। সে তাচ্ছিল্যে বললে, কি যে বাজে কাজে সময় নষ্ট! মেয়েরা এমনই ক'রেই গেল!

বাজে কাজেই মেয়েদের সমস্ত শক্তি নির্বাপিত হয়ে যায়। কিন্তু তারা সেটা বোঝে না—এইখানেই গলদ। মনে মনে বললাম, মনীষা, তুমিও কি গঠনমূলক কাজ করছ? আজ হ্যারিসন রোডের ঘটনায় তুমি প্রতিবাদ-সভার উদ্যোগে আহার-নিদ্রা ভুলে গেছ। মনে করছ, এটি বোধ হয় বিরাট একটি মিশন। কিন্তু মনীষা, যতদিন নারীকে পুরুষ উপভোগের সামগ্রী মনে করবে, যতদিন নারী আত্মরক্ষাশীল না হবে, ততদিন বাংলা দেশের মাঠঘাট এই কাহিনী প্লাবিত ক'রে দেবে। তখন তুমি কি করবে মনীষা? সেই অসংখ্য অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ে নারীর জন্য তুমি কি করবে? তুমি তখন তোমার ভবিষ্যৎ কন্যার জন্মদিনে গহনা-নির্মাণে অথবা ভবিষ্যৎ স্বামীর ওপরওলার মনস্তুষ্টি-বিধানে পার্টি দিতে ব্যস্ত থাকবে। আজ এই দিন, এই সভা তোমার জীবনে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া কোন স্থানই পাবে না।

কোন কথাই মুখে না ব'লে বাড়ি ফেরবার রাস্তা ধরলাম নিরুত্তরে। সেই স্মরণীয় পার্কের পাশ দিয়েই যাবার রাস্তা। সেদিন প্যাভিলিয়ন তৈরি হয় নি

বই লাগিয়ে থাকেন। তাই এতদিন পরে অন্য ঘরের কথায় প্রিয়তমের বিস্ময়। কিন্তু ব'লে ফেলে এবং ছিনাথের সরল সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সামনে আর দাঁড়ানো চলে না। তাই 'এস না' ব'লে তার হাত ধ'রে চপলা বেরিয়ে গেল। আবার অন্য ঘরে ক্যানে?— ভাবলে ছিনাথ। কানু সেই বাইরের দিকেই তাকিয়ে ছিল; এইবার ফিরে তাকাল ভাইয়ের দিকে। দীর্ঘদিনের দাসবৃত্তিতে প্রকাশ-পরাঙ্মুখ তার মুখে চোখে যে কি ভাব ফুটে উঠেছিল, তা বলা শক্ত। সব-কিছু মেনে নিয়ে নিয়ে আজকে আর রাগ বা ব্যঙ্গ করবার জোরটুকু সে খুঁজে পায় না।

ছিনাথ ব'লে উঠল, আমরা যেন মনিষ্যিই লই, অ্যাঁ!

রাগ জল ক'রে নরু বাঁড়ুজ্জে ঘরে এসে ঢুকলেন আবার। খামকা রাগ ক'রে তিনি শক্তি এবং কাজ নষ্ট করেন না। তিনি এসে বসতেই ছিনাথ জিজ্ঞাসা করলে, বাবু, কাছে কোথাও দোকান-টোকান—

নরু মাঝখানেই বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন, সেসব ঠিক হবে; তোমাদের ভাবতে হবে না। এখন বল দেখি, লঘু-ধান কেমন হ'ল?

কানু। যেমন হয় তেমনিই হয়েছে বাবু।

নরু। অর্থাৎ এবারেও কিছু দিতে চাও না?

ছিনাথ বারে বারে কারণে-অকারণে এই চুরির অপবাদ সইতে না পেরে একেবারে তেলে-বেগুনে জ'লে উঠল। ধান অবশ্য ভাগে নরুবাবুর যা ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য, তা তারা তাঁকে দিতে পারে না। সারা বছর গতর খাটিয়ে সোনার ধান কখনও আর একজনকে প্রাণে ধ'রে হাতে তুলে দেওয়া যায়! আর দিলে খাবেই বা কি সারা বছর? তাই দু-চার মণ কম দেয়। তাতে নরু বাঁড়ুজ্জের এমন কি আসে যায়? তিনি তো ধান বিক্রি ক'রে টাকা এনে ঘরে তোলেন। জমির ধান থেকে তাঁর খাওয়া-পরা যদি চলত, তা হ'লেও না হয় কথা ছিল। দু-দশটা টাকা কম পাওয়ায় তাদের চোর অপবাদ দেওয়া! তারা যদি জমি চাষ না করে, পারেন উনি নিজে চাষ ক'রে ফসল ফলাতে? ছেলে বেড়াচ্ছেন টেরি বাগিয়ে, মেয়ে বেড়াচ্ছেন চুল ফাঁপিয়ে— বলি, এসব হ'ত কোথা থেকে?

এতগুলো ভাবনা চকিতে খেলে গেল তার মনে। কানু প্রত্যুত্তর দেবার আগেই সে ব'লে বসল, অত যদি সন্দ, জমি ত্যান গিয়ে মনিরুদ্দির ছেলেদের। কত ধান পান তা একবার দেখে লোব।

বটে, কিন্তু পরে প্যাভিলিয়ন গঠনে কোন বাধা হয় নি। বিরাট ছাউনির নীচে শিশু-বৃদ্ধ জমা হয়েছেন। যে মহিলাদের যাবার দরকার, তাঁরা পাশ দিয়েই চ'লে যাচ্ছেন। কোন ক্ষতি হচ্ছে না। শুধু মনে হ'ল, এই তুচ্ছাদপি তুচ্ছ ব্যাপারে বাধা সৃষ্টির প্রয়াসেই আমাদের ভদ্রমহিলার সমস্ত শক্তি কেন অযথা নষ্ট হয়ে গেল? কেন সেই শক্তি মহত্তর উদ্যমে উজ্জীবিত হয়ে উঠল না।

মেয়েরা জীবনে একবার জ্ব'লে ওঠে, সে প্রেমে—দেশের প্রতি, পুরুষের প্রতি অথবা আদর্শের প্রতি প্রেমে। সেই আগুন তারা জ্বালিয়ে রাখতে পারে না। শত তুচ্ছ প্রচেষ্টায় সেই অনল ক্ষয় হয়ে হয়ে নির্বাপিত হয়ে যায়। তাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে, মনীষার দল, সমষ্টিগতভাবে তোমরা দিলে কি? পুরুষ নির্মাণ করলে স্বাধীনতার দুর্গ, তোমরা ইট-মাল-মসলা হাতে হাতে যুগিয়ে দিলে মাত্র। মজুরের কাজ থেকে তোমরা কেউ কেউ অবশ্যই রাজমিস্ত্রীর পদে উন্নীত হয়েছ। কিন্তু ওই শেষ। সেও পুরুষের চলা পথে, তারই নির্দেশে। স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন ভারতে তোমাদের নিজস্ব অবদান কোথায়?

শ্রীমতী বাণী

গর-ঠিকানা

প্লেনখানা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় নীপার নদীর কিনারায়। যাত্রীদের যে সব জিনিসপত্র সরকারী দপ্তরে জমা হয়েছিল, তা থেকে ঠিকানা উদ্ধার ক'রে সে সব যথাস্থানে পাঠানো হয়। পুলিসের তরফ থেকে বহ্নি সেনের জিনিসের তহিবে এ চিঠিটা পাই। চিঠি যার উদ্দেশ্যে লেখা তার নাম আছে, ঠিকানা নেই। চিঠির শেষে বহ্নি সেনের স্বাক্ষর ছিল। চিঠিটা এই—

শোন জয়ন্ত,

রোদ-খাঁখাঁ-করা দুপুরে বেরিয়ে পড়লাম। পথে জনপ্রাণী নেই। একটা কানা ভিখিরী ব'সে ছিল হাত না পেতে; ইচ্ছে হ'ল, কিছু দিই। দাক্ষিণ্যের দায়ে একটা আধুলিই দিলাম। ট্রাম আসতে দেরি হচ্ছিল, লাইন বিগড়েছে কোথায়। একটা বাস এল, সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম ওপরের ডেকে। গাছের অজস্র সবুজ পাতায় রোদ প'ড়ে ঝিকমিকিয়ে উঠছিল। কণ্ডাক্টার

এল না টিকিট চাইতে—নির্বাধ চলিষ্ণু অবসর। দূর থেকে হঠাৎ দেখলাম, অচেনা তোমাকে, তুমি হাত তুললে, প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে বাসটা থেমে গেল। উঠে এলে ওপরে ; বসলে ও-পাশের সুমুখের সীটে। হঠাৎ চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি নি ; আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলাম। অবহিত হয়েও তুমি ফিরে চাইলে না, কারণ নিঃসন্দেহেই তুমি জানতে যে, তোমার দিকে চাইলে সহজে চোখ ফিরিয়ে নেয় না কেউ। রূপ হয়তো দেখেছি, রূপের এত ঔদ্ধত্য আর দেখি নি।

একটা মিলিটারি কন্‌ভয় ট্র্যাফিক আটকে উদ্দাম কলরোলে এগিয়ে চলেছিল। অশ্রান্ত চক্রনির্ঘোষের প্রচ্ছদপটে তোমার আশ্চর্য কপাল আর এলোমেলো চুলের ছবিটা নিবিষ্ট ক'রে তুলল। আচমকা চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলে ; সুস্পষ্ট বিরক্তি ছিল তোমার চোখের ঘন কালো ধারালো দৃষ্টিতে। বাসের ইঞ্জিনটা বিগড়ে গেল মাঝপথে। যাদের তাড়া ছিল নেমে গেল, তুমিও। ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলে ডান দিকের ফুটপাথে। এক ঝলক হাওয়ায় পাশের গাছ থেকে কয়েকটা বকুল ঝ'রে পড়ল।

শীতের হাওয়ায় বিলিয়ে-দেওয়া ঝরা-পাতার মত কলেজ স্ট্রীটে আনমনা ঘুরে সেদিন বাড়ি ফিরলাম একটু রাতে। ড্রাইভার বকুনি খাচ্ছিল সেজকাকার কাছে। ড্রাইভারের মাইনে আর কত, ও মাইনেয় অকারণ কটূক্তি শোনা চলে।

সন্ধ্যেবেলায় সবে কালো ঘেরাটোপের মাঝ থেকে আলোর রেখা ঝিকমিকিয়ে উঠেছে ল্যাম্পপোস্টের সারে ; দাদু ডেকে পাঠালেন, বললেন, সারাদিন কোথায় ঘুরে বেড়াস ? কাল আদিত্য আসছে, তার পেলাম।... খবরের কাগজে দৃষ্টি রেখে হয়তো দাদু আরও কিছু বলেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ বুঝতে পেরেছিলেন যার উদ্দেশ্যে বলা সে নিঃশব্দে স'রে পড়েছে।

নিজের ঘরে এসে নিজের মনে আর একবার উচ্চারণ করলাম, আদিত্য আসছে। এ বাড়িতে কে কবে ইংলিশ চ্যানেলের ওপারের হাওয়া কৌটোয় পুরে এনেছিল, তাই বিয়ের আগে পরিচয় অথবা অভিভাবকের সমর্থনে প্রেমের একটা মহড়াও দেওয়া হয় ভাবী বরবধূর পক্ষ থেকে। আদিত্যকে দেখেছি, ভেবেও ছি কখনও ; কিন্তু তখন তোমাকে দেখি নি তো! নিরালা ঘরের আঁধারে হঠাৎ দেখা তোমার ভাবনাই চেতনা আচ্ছন্ন করলে। আদিত্য

সুপুরুষ আর শান্ত, সুখী করতে পারে ও, আর সে বিদ্যেটা ওর স্বভাবজ। দুঃখের যে অজস্র ধারায় তুমি আমাকে অতলে ডুবিয়ে দিয়েছ, তার একবিন্দুও আমাকে দিতে পারত না প্রাণান্তেও; অনেক পরে তা জেনেছি অবশ্য।

জয়ন্ত, আমি যে কালের সে কাল পরখ ক'রে, যাচাই ক'রে নেয়, চোখ বুজে হাত বাড়িয়ে দেবার বিপক্ষে সে। তবু শুধু তোমার বেলায়ই কষ্টিপাথর ব্যর্থতা দেখেছে।

ভোরবেলা ফোন বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে নিলাম, সুষীর রিনরিনে সুর, যেতে হবে পার্টি-আফিসে, ঠিক নটায় জরুরী মীটিং। জয়ন্ত, তুমি সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের মত আমার পরিবেশের চতুর্দিকে ভেঙে পড়লে কেন যে! পার্টির সবার প্রত্যাশা আমার 'পরে। ওরা কানাকানি করেছে, বলেছে, এই তো সেই মেয়ে, যে সমস্ত সংস্কারের শেকড়ে আগুন জ্বালিয়ে নির্মূল করবে তাদের; বৈক্লব্যের পঞ্চশর তো এর কাছেই ব্যর্থ হবে, দগ্ধ হবে। শঙ্করদাকে তুমি কি চেন? শঙ্কর মুখার্জি? বার্ধক্যের অনুশাসন নেমে এসেছে, তবু অশ্রান্ত খেটে চলেছেন। পার্টির সম্পর্ক যখন নিঃশেষে চুকিয়ে দিলাম, একদিন বলেছিলেন, তুইও চললি? জবাব ছিল না এর।

আদিত্য এসেছিল নির্দিষ্ট দিনেই, কিন্তু দেখা হয় নি; ও-কদিন বাড়ি ছিলাম না। ছিলাম সুষীদের বাড়িতে। বাড়ি থেকে ডাকের পর ডাক এল, তবু জিদ ক'রে রইলাম সুষীদের ওই পুরোনো ভেঙে-পড়া বাড়িতেই। সেজকাকা চটলেন চূড়ান্ত; দাদু নিষ্ফল রোষে গুম হয়ে ছিলেন; আদিত্য আহত হ'ল, ভাবল, বিমুখতা; কিন্তু সে তো মিথ্যে। দুনিয়ায় কারুর 'পরে বিমুখ হবার মত সময় কি তখন?

সুষীর সঙ্গে ঠিক ছিল, ওর জন্যে অপেক্ষা করব ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সুমুখে। ওর ক্লাস শেষ হ'লেই ও চ'লে আসবে। একটু আগেই পৌঁছেছি, একটা অ্যাম্বুলেন্স-কার এসে থামল। পায়ের নীচে মাটিটা দুলে উঠল। স্ট্রেচারে ক'রে যাকে নামাল, সে তুমি। তারপরে মনে নেই। কি ক'রে তোমার বেডের পাশে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের প্রশ্নের জবাব দিলাম যে, আমি তোমার আত্মীয়া, সে আজও ভেবে পাই না। ডাক্তারের নির্দেশে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। অনেকক্ষণ কেটে গেল; কতক্ষণ কে জানে! সুষী হয়তো ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সামনে আমাকে খুঁজে ফিরে গেল। দেওয়ালের এপাশে

আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম যে, নিজেকে হারিয়ে ফেলছি। তোমার জ্ঞান ফিরে আসতে ডাক্তার এসে ডেকে দিয়েছিল। মাথায় চোট লেগেছিল বেশি আর ডান হাতের কব্জিতে। আমার দিকে চেয়ে চিনতে চেষ্টা করলে, কিন্তু ক্লান্তিতে চোখের পাতা বুজে এল। তোমাকে দেখতে যেতাম রোজ। তোমার প্রথম প্রশ্ন ছিল, কেন আসেন আপনি? এর জবাব অদৃষ্ট হয়তো কোনদিন পাবে, কিন্তু তা তোমাকে দেবার নয়।

বাড়ি ফিরে এলাম কদিন পরে। আদিত্য চ'লে গেছে। লাইব্রেরি-ঘরের এক কোণে আদিত্যর বাজনাটা প'ড়ে ছিল—জাপানী জলতরঙ্গ, ভুলে ফেলে গেছে। আদিত্যর হাতে যন্ত্রটা সুরে উচ্ছল হ'য়ে উঠত, একদিন শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সবাই হেসেছিল, কিন্তু আত্মবিস্মৃতির মত ঘুম এনে দেওয়া তো শুধু সুরের কারুশিল্পেই সম্ভব। অনভ্যস্ত হাতে যন্ত্রটায় সুরের আভাস খোঁজবার চেষ্টা করলাম, এক সময় মনোযোগ নিবিড় হয়ে এল, হঠাৎ চমকে থেমে গেলাম। কেন আসেন আপনি?—হাসপাতালে তোমার প্রথম প্রশ্ন। মানুষের কণ্ঠস্বর যে কণ্ঠরোধ করতেও পারে, সে কথা জানলাম সেদিন। নিজের ঘরে ফিরে এলাম। অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ, প্রতিধ্বনি বেজে উঠল সেই প্রশ্নের, কেন আসেন আপনি? আকাশে চেয়ে মনে হ'ল, সুমুখের প্রশ্নচিহ্নের মত তারার সারেও সেই প্রশ্ন। আকাশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

তোমার ঠিকানা জানা ছিল না; কোথায় থাকতে কে জানে! তোমার মুখের কঠিন রেখা যে প্রশ্নের সাহসের পথ রোধ করেছিল। তবু সন্ধানী দৃষ্টি এড়ানো কঠিন; নিঃশব্দে ব্যুইক চালিয়ে একদিন চিনে নিলাম সেই বাড়ি আর সেই ফুলের টবে ঘেরা ছাতের সেই ছোট ঘর। তুমি তখন নেই, বাড়ির কর্ত্রী মিসেস স্মিথ মুখর হয়ে উঠলেন তোমার সম্পর্কে, তুমি ওঁর 'পেয়িং গেস্ট', তুমি শিল্পী—একটা ঝড়ের ছবি ঠিক সুমুখেই ছিল। একজন শিল্পী সম্বন্ধে কল্পলোকের ইন্দ্রজাল যতদূর বিস্তৃত হতে পারে, তারও ওপারে তোমায়-ঘেরা ভাবনা পাখা মেলেছিল। তুমি শিল্পী তাই অনিবার্যভাবে দরদী, অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিল। একটা দোলনচাঁপা ফুটেছিল কোন টবে, স্মিথিনী বললেন তোমার যত্নের কথা। কখন ফিরবে ঠিক নেই, অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না শুধু এইজন্যেই যে, ওর জন্যে সমস্ত ভবিষ্যৎকে দেওয়া রইল। ফিরে এলাম।

আদিত্যের চিঠি টেবিলে পাথর চাপা দেওয়া। চিঠিটা তুলে নিলাম; কাঁচের ফুলদানিতে একগুচ্ছ সাদা ফুল—নার্সিসাস। মনে হ'ল, সেই দোলন চাঁপা…তুমি। জয়ন্ত, সমস্ত দৃশ্য-অদৃশ্যকে আড়াল ক'রে যে তুমি দৃষ্টিরোধ ক'রে দাঁড়ালে, সে কি তুমি, না আমার মৃত্যু?

আদিত্য লিখেছে, অনিবার্যভাবে যুদ্ধে যেতে হচ্ছে। বার্মা ফ্রণ্টের জন্য আরও ডাক্তার চাই। সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, তাই অস্বীকারের পথ নেই। ঠিকানা রইল, প্রয়োজনে লিখো। শুভাকাঙ্ক্ষা জেনো।

নিঃসংশয়ে বুঝলাম, আদিত্য জেনেছে যে, ওর ভাগ্যের পাথরে চিড় খেয়েছে কোথায়…কিন্তু…

বসুধার প্রতিটি ধূলিকণায় থরথর কম্পন সংহত হ'ল। প্রত্যাশায় স্তব্ধ দিন মেঘের ছায়া স্পর্শ ক'রে থেমে রইল। ট্রাম থেকে নেমে একটু একটু ক'রে পায়ে পায়ে সুদুরূহ পথ এড়িয়ে সুমুখের দিকে চলেছিলাম। দোলনচাঁপার কুঁড়ি একটু ফুটে আশঙ্কায় থেমে ছিল; মনে হ'ল, পৃথিবীও থেমে গেছে গভীর শঙ্কায় আর সুনিবিড় প্রত্যাশায়। তুমি এলে, আধভেজানো দুয়োরের সামনে দাঁড়িয়ে সপ্রশ্নে চাইলে। কিছু বলতে চেষ্টা করলাম, স্বর ফুটল না। একটু হাসলে; সে হাসির ধারে দ্বিখণ্ডিত হ'ল মন। চেয়ে রইলাম নিজের হাত-ঘড়িটার দিকে—ছটা বেজে কুড়ি মিনিট। মিনিটের কাঁটা ধীরে ধীরে স'রে যাচ্ছে, সেকেণ্ডের কাঁটার সময় নেই বিন্দুমাত্রও; অধীর অস্থির দ্রুত পদক্ষেপ তার। বসুন।—তুমিই বললে। আপ্যায়িত হই নি সে অভ্যর্থনায়, আত্মমর্যাদা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে তো এক মুহূর্ত; সমস্ত অনুভূতিকে অতিক্রম ক'রে তোমার দিকে চাইলাম, এক হাতে তুলিটা রয়েছে; মাঝপথে আঁকা ফেলে উঠে এসেছ। সমস্ত চেতনা বিকল হয়ে এল। আত্মরক্ষাপ্রবণ মন সবলে আচ্ছন্নতা কাটিয়ে কথা ফোটাল, মিসেস স্মিথ? উত্তরে আর একবার হাসলে।

একটু একটু ক'রে দিনবিলোপী আঁধার ছড়িয়ে পড়ল তোমার ও আমার মাঝখানে। আলো জ্বলল না, যেন অনন্ত কালের ব্যর্থতার অন্ধ স্তব্ধতা নেমে এল। নিঃশব্দে দুঃখের ধারা ঝ'রে পড়ল নির্বাধে, হয়তো তুমি জানলে, হয়তো জানলে না, তবু সেই মুহূর্তে নিরর্থকতার স্পষ্ট ছবি তুমি দেখেছিলে, তাই বিদ্রূপ অথবা সান্ত্বনার কোন ভাষাই তোমার মুখে ফোটে নি। রাত্রির

আকাশে যে নিঃশব্দ বৈরাগ্য, সেদিন অধিকার পেয়েছিলাম তারই এক কণার।

জয়ন্ত, সূর্যস্পর্শী যে প্রাণবন্যায় ধরিত্রী সিক্ত হয়, তার অকস্মাৎ ঢেউ কখনও দোলা দিয়েছে আমার সত্তার গভীরে; তার আয়ুষ্কাল ক্ষণিকমাত্র। হঠাৎ ছুটি নিয়ে এল আদিত্য, এল কঠিন পরীক্ষার দিন। বললে, আত্মহত্যায় তোমার অধিকার নেই। উত্তরে হাসলাম। আশ্চর্য, সে হাসিতে আদিত্যের মুখটা যন্ত্রণায় কালো হয়ে উঠল। অনেক নিঃশব্দ মুহূর্ত পার হয়ে ও ডাকলে, বহ্নি! এই স্বর, এই ফিরিয়ে নেবার ডাক আমি সইতে পারি নে, যেন আমি বিভ্রান্ত। জয়ন্ত, আমি যদি ভ্রান্তই, তবে এ ব্যর্থতা কেন? ভোরবেলা আদিত্যের সঙ্গে বেড়াতে বের হলাম। শীতের সকাল। কুয়াশার পালক ছড়িয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন পথঘাট। ঘুমভাঙা চোখে কোন তরুণী, কোন শিশু পথ দেখছে আনমনা। শিশির-ভেজা ঘাসে পায়ের চিহ্ন ফেলে আদিত্য চলেছে। সূর্যের আলো লক্ষ লক্ষ মাইল অতিক্রম ক'রে জলস্থলের ঘুম ভাঙিয়ে হেসে উঠল। আদিত্য জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে ডাক দিলে। বাড়িতে আমার নির্বাসনদণ্ড চলছিল, ও যেন সহসা মুক্তি দিলে; রণক্লান্ত সৈনিকের মঞ্জুর-হওয়া ছুটির মত এ মুক্তি। আদিত্য ব'লে গেল দেশদেশান্তরের কথা· সমরায়িত পৃথিবী···জাপান, চীন, রাশিয়া, ব্রিটেন,—চঞ্চল সমুদ্রস্পর্শী ধরিত্রী আবরণ সরিয়ে নিলে; সে মুহূর্তে তোমাকে হয়তো ভুলেছিলাম।

দোলনচাঁপার বৃন্ত নুয়ে এসেছে নিষ্প্রভ, বিবর্ণ নিষ্প্রাণ ওর পাতা। মিসেস স্মিথ একটু থেমে বললেন, জয়ন্ত নেই, চ'লে গেছে।

কোথায়?

কেপ কমোরিন যাবে দক্ষিণ-ভারতের নানা অঞ্চল ঘুরে।

সন্ধ্যেবেলা নিজের ঘরে ব'সে ছিলাম, সুধী এল। কতকাল পরে সুধী। একটানা ধিক্কার দিয়ে গেল, চুপ ক'রে শুনলাম। ও বললে, দেশের এই দুর্দিনে একটু ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নেই তোর, শেষটা নিজেকে সুদ্ধ ভুলে গেলি! চুপ ক'রে রইলাম। অস্থির হয়ে জবাব চাইল সুধী, কেন? কিসের জন্যে? কি এমন সে! তবু নিরুত্তর দেখে নিরুপায়ে ওর কান্না এল বোধ হয়। বহ্নি, তুই কি— ব'লে হঠাৎ থেমে গেল। বুঝলাম, এরা সহজে রেহাই দেবে না। বললাম, তিন

তিল ক'রে রূপ নিংড়ে তিলোত্তমা যদি সম্ভব হয়, তবে জয়ন্তকে দেখে তার অহঙ্কার ধুলো হয়ে মাটিতে মিশিয়েই যেত।

রূপের মোহ।—অবজ্ঞা আর দার্শনিক বিজ্ঞতা নিয়ে জবাব দিলে সুষী। একটু হাসি দিয়ে কথাটাকে মুছে ফেলে বললাম, মোহই হোক আর তার সৃষ্টি রূপ থেকে হোক, কিছু যায় আসে না, বল্ আর কি কথা আছে তোর?

কাকে বলব?—কঠিন সুরে জবাব দিয়ে সুষী চ'লে গেল। পাশের ঘরে কথা কইছিল অনেকে, দাদুর গলা শুনলাম, উচ্ছন্নে গেছে।

তাই কি?

কন্যা কুমারিকার পথে জয়ন্ত গেছে, উর্মিমুখর মুহূর্তপাত।

জয়ন্ত, তুমি যে কবে আসবে? কুয়াশার উত্তরী উড়িয়ে শীত চ'লে গেল, নিষ্পত্র শাখায় এল বর্ণসম্ভাবী শ্যামশ্রী। একদিন বিচ্ছেদ মেনেছিলাম, আজ বিরহ মানি। মানসের প্রত্যন্তে তোমার পদধ্বনি বেজে ওঠে; আকাশে ফুটে ওঠে অসংখ্য স্বর্ণাভ আর দু-চারটে নীলাভ তারা। তোমার দোলনচাঁপার বৃন্তে আবার কুঁড়ি এল কি না কে জানে! তোমার বিমুখতা আহ্বান হয়ে সাড়া জাগিয়ে তোলে। অজানতে কে সতর্ক করে, এ আকাঙ্ক্ষা মৃত্যুস্পর্শী। যদি তাই হয়, তবে তাই হোক। শঙ্খধ্বনিমুখর বাসররাত্রির উচ্ছলতায় নয়, স্তব্ধ মৃত্যুর কঠিন তুহিন-স্পর্শে তোমার প্রতিকূল দুর্বার বিদ্বেষ নেমে আসুক। আমার প্রচণ্ড তৃষ্ণায় পূর্ণপাত্র নেমে আসুক—হোক সে বিদ্বেষের, হোক সে বিতৃষ্ণার। উন্মনা রাত গভীর হয়ে আসছে, মুখর দিনের আত্মসমাহিতি রাত্রির নিবিড় নীরবতায় সম্পূর্ণ। প্রহরের মালায় একের পর এক অঙ্ক স'রে এল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ভোরের তীর্যক আলোকরেখায় জানলাম, তুমি এসেছ। নিঃসংশয়ে আমার মন ব'লে উঠল, তুমি এসেছ।

সেই ভোরেই বেরিয়ে পড়লাম, তখন বাড়ির সকলের ঘুম ভাঙে নি, গাড়ি-বারান্দা পার হয়ে লনে পা দিয়েছি, দাদু ডাকলেন, এই ভোরে কোথায় যাচ্ছিস? জবাব দিলাম না। কথা বলা ভুলে গেছি, দরকারও হয় না। এদের জগতে আমি অবান্তর, অনর্থক। তাই প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজন এক পক্ষেই মিটে যায়। থাকি নিরালা ঘরে, কৌতূহলী দৃষ্টির উঁকিঝুঁকি, আমায় ঘিরে

নানা সমস্যা, নানা মন্তব্য। করাচীতে বাবা-মাকে লেখা হয়েছে, তাঁরা এসে এসে পড়বেন হয়তো শীগগিরই। এমনই নানা তথ্য কিছুদিন থেকে কানে এসে পড়ছে, হাওয়ায় যেমন কার্পাসের রোঁয়া অনেক দূরে উড়ে আসে। দাদু ধমকের সুরেই ব'লে উঠলেন, কোথাও যাওয়া হবে না। মুখ তুলে চাইতে স্পষ্ট দেখলাম, আশঙ্কা আর উদ্বেগের ছায়া পড়েছে তাঁর মুখে, মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেলেন। নিঃশব্দে গেট খুলে বেরিয়ে পড়লাম, সে গেট আর পার হই নি। ট্রামে উঠে বসলাম, এল্‌গিন রোডের মোড়ে চমকে দেখলাম, একটা ট্যাক্সিতে ব'সে আছেন মা আর বাবা, আমাকে দেখতে পান নি।

পথে দুটো কুকুরের বাচ্চাকে খেলতে দেখেছিলাম; একটা আফগান ফলওয়ালা ফল সাজাচ্ছিল; একটা দেবদারুর পাতা ট্রামের জানলা-পথে উড়ে এসে পড়েছিল আমার সামনে; যে কণ্ডাক্টার টিকিট চাইতে এল, তার কপালে মস্ত একটা কাটা দাগ।

ট্রাম থেকে নেমে জনবিরল চৌরঙ্গী প্লেস দিয়ে চলছিলাম, তার পরে আর মনে আসে না।

•

প্রথম চোখ মেলে দেখলাম, এক বৃদ্ধ নিবিষ্ট চিত্তে চেয়ে রয়েছেন, ইংরিজীতে বললেন, ভাল হয়ে গেছ তুমি! হ্যাঁ, ভাল হয়ে গেছি। মোটর অ্যাক্সিডেণ্টে আহত হয়েছিলাম।

হাঁটু অবধি বাঁ পাটা বাদ দিতেই হ'ল, নইলে আর কোন উপায়ে দ্রুত পচন নিবারণ করা যেত না। অপারেশন শেষ হয়ে গেছে। এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হই নি। নার্স চার্ট লিখছে একমনে, চুপ ক'রে শুয়ে আছি।

হোয়াইট রাশিয়ান জোসেফ ডিমিট্রভ; প্রাক্-সোভিয়েট যুগে ব্যবসাসূত্রে এসেছিলেন ভারতে, যুদ্ধবিরতির অপেক্ষায় রয়েছেন, যুদ্ধ শেষ হ'লেই ফিরবেন স্বদেশে। যে মোটর আমাকে চাপা দিয়েছিল, তার মালিক অদৃশ্য হয়েছিলেন, ডিমিট্রভ তিন তলার ব্যাল্‌কনি থেকে সমস্ত প্রত্যক্ষ ক'রে আমাকে তুলে নিয়ে যান রাস্তা থেকে।

চূড়ান্ত সাধ্যসাধনায়ও বাড়ির ঠিকানা দিই নি। পত্রিকার মারফৎ আমাকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা চলছে ওদিকে, কিন্তু যে ফিরবে, সে কোথায়? সে তো আমি নই।

আকাশে জ্যোৎস্নার তীব্র ফলক মহানগরীর পথ বিদ্ধ করেছে, কাল ক্রাচ আসবে। অয়স্ত, হয়তো তোমার কথাই ভাবি। পলুক্ষণযাপনের মধ্যে হয়তো বা তোমার ফিরিয়ে নেওয়া মুখের সান্ত্বনা খুঁজে ফিরি। সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর আরও একবার পরিক্রমণ শেষ হ'ল। সূর্যের অনুকম্পা নিষ্ঠুর, অগ্নিবর্ষণ তার দাক্ষিণ্যের দান।

বৃদ্ধ ডিমিট্রভের ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, অপুত্রক বিপত্নীক সুদূর-দেশীয় বৃদ্ধ, জোসেফ ডিমিট্রভ। ছাড়পত্র এসেছে; দূর রাশিয়ার প্রতিটি ধূলিকণার জন্য পর্যন্ত উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। বুধবার সকালে প্লেন ছাড়বে।

শ্রীমতী আরতি

সাহিত্য ও রসতত্ত্ব

২

"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ"—ভরত : নাট্যশাস্ত্র।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অনেক প্রাচীন ব্যাখ্যাতা ছিলেন।(১) আজ শুধু অভিনবগুপ্তাচার্যের 'অভিনবভারতী'ই বর্তমান। 'বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ'—এইটি ভরতাচার্যের রসসূত্র। বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্নভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে চারি-জনের মত সাহিত্যমীমাংসকগণ কর্তৃক বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত—এই চারিজনই ভারতীয় রসসূত্রের প্রধান ভাষ্যকার। আমরা যথাক্রমে তাঁহাদেরই মত আলোচনা করিব। মম্মটাচার্যও তাঁহার 'কাব্যপ্রকাশে' এই ক্রমই অনুসরণ করিয়াছেন।

ভারতীয় রসসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য পর্যালোচনার পূর্বে আমাদের কয়েকটি সাধারণ বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। প্রথমত, উপরি-উদ্ধৃত রসসূত্রে কেবলমাত্র বিভাব, অনুভাব, এবং সঞ্চারিভাব—যথাক্রমে এই তিনটি পদার্থেরই উল্লেখ আছে; স্থায়িভাবের কোনও উল্লেখ মহর্ষি করেন নাই। দ্বিতীয়ত, 'সংযোগ' শব্দটির অর্থ মহর্ষির কিরূপ অভিপ্রেত ছিল তাহা অতিশয় সন্দিগ্ধ। তৃতীয়ত, 'নিষ্পত্তি'-শব্দের অর্থও স্পষ্ট করিয়া মহর্ষি নির্দেশ করেন নাই। ভরতাচার্যের

(১) "ব্যাখ্যাতারো ভারতীয়ে লোল্লটোদ্ভটশঙ্কুকাঃ।
ভট্টাভিনবগুপ্তশ্চ শ্রীমান্ কীর্তিধরোঽপরঃ।"

রসসূত্রের ব্যাখ্যানভেদের এই তিনটি মুখ্য কারণ। ভট্টলোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক, অভিনবগুপ্ত, প্রত্যেকেই বিভিন্ন উপায়ে সন্দিগ্ধ স্থলের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। আমরা প্রথমত ভট্টলোল্লটের মতেরই পর্যালোচনা করিব।

[ভট্টলোল্লট : উৎপত্তিবাদ]

ভট্টলোল্লট বলেন : 'কাব্য' বা 'নাট্য' হইতে যে 'রস'বোধ হয়, উহা পাঠক বা প্রেক্ষক সমাজের পক্ষে গৌণ। পাঠক অথবা প্রেক্ষক, সাধারণভাবে কোনও সহৃদয়ের চিত্তেই মুখ্যভাবে 'রসে'র উৎপত্তি হয় না। তবে রসের মুখ্য বা প্রকৃত আশ্রয় কে?—কবি, সহৃদয়, অনুকর্তা নট, অথবা অনুকার্য দুষ্মন্ত-শকুন্তলা প্রভৃতি নায়কনায়িকা? ঐতিহাসিক (অথবা কাল্পনিক বা পৌরাণিক যাহাই বলা হউক না কেন) দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার চরিত্র অবলম্বন করিয়া যেখানে নাট্যের অভিনয় হইতেছে, সেখানে দুষ্মন্ত-শকুন্তলা প্রভৃতি ঐতিহাসিক পাত্রপাত্রী-গণ, ইংরেজীতে যাহাদের (*dramatis personæ*) ড্রামাটিস্ পার্সনি বলা হইয়া থাকে, তাঁহারা অনুকার্য, এবং যে সকল অভিনেতা তাঁহাদের 'রূপ' গ্রহণ করেন, ঐ সকল ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহের 'অনুকরণ' করিয়া প্রেক্ষকগোষ্ঠীর মনোরঞ্জন করেন, তাঁহারা 'অনুকর্তা'। কেন না, নাট্য লোকবৃত্তেরই অনুকরণ মাত্র। ভরতাচার্য নিজেই বলিয়াছেন: 'লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি'। সুতরাং দুষ্মন্ত, শকুন্তলা প্রভৃতি ঐতিহাসিক পাত্রপাত্রী নাট্যে 'অনুকার্য', এবং কুশীলবগণ সেই সকল ঐতিহাসিক অথবা পৌরাণিক চরিত্রেরই 'অনুকর্তা'। এক্ষণে, কবি, সহৃদয়, অনুকার্য এবং অনুকর্তা, এই চারিজনের মধ্যে রসের মুখ্য আশ্রয় কে? ভট্টলোল্লট বলেন : 'অনুকার্য'ই প্রকৃতপক্ষে রসের আশ্রয়, তিনিই যথার্থ রস অনুভব করিয়া থাকেন। শকুন্তলা-বিষয়ক যে শৃঙ্গাররস উহা মুখ্যত ঐতিহাসিক (অথবা পৌরাণিক) দুষ্মন্তের পক্ষেই সম্ভবপর। এবং ঐ 'রস' বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবের পরস্পর 'সংযোগে' সেই ঐতিহাসিক দুষ্মন্তের হৃদয়ে 'উৎপন্ন' হইয়াছিল। লোল্লটাচার্যের মতে—রসসূত্রের অন্তর্গত 'নিষ্পত্তি' পদটির অর্থ উৎপত্তি অথবা প্রোডাকশন। 'উৎপত্তি' বলিতে আমরা 'অভূত-প্রাদুর্ভাব' বুঝিয়া থাকি। 'যাহা ছিল না তাহাই হওয়া'—ইহার নাম 'অভূত-প্রাদুর্ভাব', ইহারই নাম উৎপত্তি। মৃত্তিকা হইতে ঘটের 'উৎপত্তি' হয়, কেন না, ঘট পূর্বে ছিল না, ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ। মৃত্তিকা ইহার

নরু তার দিকে সোজা তাকিয়ে উত্তর দিলেন, তাই দিতে হবে দেখছি।... তা আমন কি রকম ফলন হ'ল এবার?

কানু। নামো জমিটা তো বানে ডুবে—

নরু চ'টে উঠে বললেন, প্রত্যেক বারই বানে ডোবে, না?

কানু। আজ্ঞে, সব বারেই কি আর—

ছিনাথ। আপনার একার তো ডোবে নাই, আরও অনেকের ডুবেছে। তেনাদের শুধোলেই তো পারবেন।

নরু। বলি, ছিনাথের এত চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হ'ল কবে থেকে রে?

কানু তাড়াতাড়ি সামলে নেবার চেষ্টায় অনুতপ্ত কণ্ঠে ব'লে উঠল, ওর কথাই ওই রকম, কাকে কি বলতে হয় তা কোনদিন যদি শিখবে!

হুঁ।—ব'লে হরির নাম ধ'রে ডাকতে ডাকতে নরু বাঁড়ুজ্জে আবার বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই কানু ভাইয়ের অবিমৃষ্যকারিতায় আকুল হয়ে কি ক'রে বাবুকে সন্তুষ্ট করবে ভেবে না পেয়ে ব'লে ফেললে, বাবুর জামাইটি খাসা হয়েছে।

নরু। জামাই!

কানু বুঝতে না পেরে নিজের কথাটা আরও বুঝিয়ে বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে দিদিমণির সঙ্গে আপনি আসার একটু আগেই ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন।

নরু একটু বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সমস্ত ঘটনাটা আন্দাজ ক'রে নিয়ে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কানু ব'সে রইল বিহ্বল হয়ে। ছিনাথ তখন বললে, ও জামাই ক্যানে হবে? ও হ'ল দিদিমণির স্যাঙাৎ।

কানু। তুই থাম্ দিকি।

ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে, এদিকে উনি বলছেন থামতে!—ব'লে ছিনাথ জানলা ধ'রে দাঁড়িয়ে বললে, বাড়ির বার হ'লেই আবার পুলিসে ধরবে। শালার যত ঝ্যাটা!

সামনে দিয়েই প্রিয়তম বেরিয়ে গেল। ছিনাথ বললে, উনি যে গেলেন? ওনাকে বুঝি ধরবে না?

কানু। ওনারা বাবু লোক, ওনাদের ধরবে কিসের লেগে?

ছিনাথ। দেখ দাদা, তোমার এই 'বাবু বাবু' আমার গায়ে যেন ঝাঁটা মারে।

উৎপাদক কারণ। সেইরূপ 'রস'ও একটি অপূর্ব বস্তু, ঐতিহাসিক দুষ্মন্তের চিত্তে যে রসের প্রাদুর্ভাব, উহা 'অভূতপ্রাদুর্ভাব', পূর্বে উহার অস্তিত্ব ছিল না, সেই জন্য উহা অপূর্ব। অতএব 'রসনিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ 'রসোৎপত্তি'। সেই জন্য ভট্টলোল্লট সাহিত্য-মীমাংসকগণের মধ্যে 'উৎপত্তি-বাদী' বলিয়া পরিচিত।

ভাল কথা, ঐতিহাসিক দুষ্মন্তের হৃদয়ে যে 'রস' উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া গেল। কিন্তু এই 'উৎপত্তি'র প্রতি কারণ কোন্‌টি? "বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবের 'সংযোগ'বশত রসের উৎপত্তি হয়"—ইহাই তো ভরতাচার্যের রসসূত্রের আপাতদৃষ্টিতে সরল অর্থ। কিন্তু 'সংযোগ' শব্দটির অর্থ কি? রসোৎপত্তির প্রতি উহাদের পরস্পর উপযোগিতাই বা কতটুকু? উত্তরে লোল্লটাচার্য বলেন: 'সংযোগ'-শব্দের সাধারণ অর্থ 'সম্বন্ধ'। কিন্তু সম্বন্ধ তো নানাপ্রকার হইতে পারে। কার্যকারণভাব হইতে পারে, জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাব হইতে পারে, উৎপাদ্য-উৎপাদকভাব হইতে পারে, আশ্রয়াশ্রয়িভাব হইতে পারে। আরও কত প্রকার যে হইতে পারে, তাহার কোনও ইয়ত্তা নাই। তবে, রসসূত্রে সম্বন্ধবাচক 'সংযোগ'শব্দের বিশিষ্ট অর্থ কি? কোন্ বিশেষ সম্বন্ধটি ইহার দ্বারা বোধিত হইতেছে, কাহার সহিতই বা এই সম্বন্ধ? ভট্টলোল্লট বলেন—রসসূত্রে 'সংযোগ'-শব্দটি তিনটি বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধকে বুঝাইতেছে। কেন না, বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবের সহিত রসাত্মক চিত্তবৃত্তির সম্বন্ধ তিন প্রকার। বিভাবের সহিত রসের উৎপাদ্য-উৎপাদকভাব সম্বন্ধ, অনুভাবের সহিত গম্যগম্যকভাব সম্বন্ধ, এবং ব্যভিচারিভাবের সহিত রসের সম্বন্ধ পোষ্য-পোষকভাব। একই 'সংযোগ'পদ বিভিন্ন পদের সহিত অন্বয়বশে তিনটি বিভিন্ন সম্বন্ধবিশেষের বোধক। (১) লোল্লটাচার্যের মতে রতি প্রভৃতি আটটি স্থায়ী ভাবই 'রস'—স্থায়িভাব ও রসাত্মকচিত্তবৃত্তির মধ্যে কোনও স্বরূপগত বৈষম্য নাই। উহারা পরস্পর অভিন্ন। ঐতিহাসিক মহারাজ দুষ্মন্তের হৃদয়ে শকুন্তলা-বিষয়ক রতিভাবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল—যাহাকে সাহিত্য-মীমাংসায় পারিভাষিক 'শৃঙ্গার'-শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়,

---

(১) এতদ্বিবৃণ্বতে ভট্টলোল্লটপ্রভৃতয়ঃ—"স্থায়িনাং বিভাবেন উৎপাদ্যোৎপাদকভাবরূপাৎ, অনুভাবেন গম্যগমকভাবরূপাৎ, ব্যভিচারিণা পোষ্যপোষকভাবরূপাৎ সম্বন্ধাৎ রসস্য নিষ্পত্তিরুৎপত্তিঃ অভিব্যক্তিঃ পুষ্টিশ্চেত্যর্থঃ"।—গোবিন্দঠক্কুরকৃত কাব্যপ্রদীপ পৃ. ৬৩ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)।

উহার পূর্বে কোনও অস্তিত্ব ছিল না। শকুন্তলাই ঐ রতিরূপ স্থায়িভাবের আলম্বনবিভাব, উহার 'উৎপত্তি'র প্রতি কারণ। অতএব, 'রস' অথবা স্থায়িভাবের সহিত বিভাবের সম্বন্ধ উৎপাদ্য-উৎপাদকভাব। কিন্তু মহারাজ দুষ্মন্তের হৃদয়ে শৃঙ্গাররসের 'উৎপত্তি' হইয়াছে, ইহা লোকে বুঝিবে কিসে? পরচিত্ত তো সর্বদাই পরোক্ষ। একজনের আন্তর চিন্তাধারা আর একজনের নিকট অজ্ঞাত—ইহা তো সর্ববাদিসম্মত সত্য। তবুও বাহ্য শারীরচেষ্টাসমূহ দুইটি অপরিচিত মনোজগতের মধ্যে পরিচয়ের সেতু স্থাপনা করে। নতুবা, লৌকিক সমস্ত ব্যবহার অচল হইয়া পড়িত। আমরা ভ্রূভঙ্গ, আকার, ইঙ্গিত, চেষ্টা, ভাষণ প্রভৃতির দ্বারা পরচিত্তের অন্তর্গূঢ় চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতে পারি। মনোজগৎ পরোক্ষ বটে, কিন্তু আকার ইঙ্গিত প্রভৃতি সমস্তই বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ধূম যেমন অদৃশ্য বহ্নির জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, সেইরূপ শারীরবিকৃতিসমূহও, যাহাদিগকে সাহিত্য-মীমাংসাশাস্ত্রে পারিভাষিক 'অনুভাব' সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত করা হইয়া থাকে, পরোক্ষ আন্তর বৃত্তিসমূহের গমক। সুতরাং 'রস' ও 'অনুভাবে'র মধ্যে গম্য-গমকভাবসম্বন্ধ ধূম ও বহ্নির মত। 'রস' গম্য বা অনুমেয়; আকার, ইঙ্গিত, চেষ্টা প্রভৃতি 'অনুভাব' গমক বা অনুমাপক।(১) এক্ষণে ব্যভিচারিভাবের রসোদ্বোধের প্রতি উপযোগিতা কতটুকু?

---

(১) এখানে সাধারণ দর্শক বা সামাজিকের পক্ষ হইতেই 'অনুভাব'সমূহের নায়কগত রসানুভূতির প্রতি 'গম্য-গমক ভাব' প্রতিপাদন করা হইয়াছে। টীকাকারগণও লোল্লটাচার্যের মতের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু নায়কগত রসানুভূতির পূর্ণতাও অনেকটা তাঁহার স্বকীয় অনুভাবের উপরই নির্ভর করে। অনুভাবসমূহ শুধু যে সাধারণের নিকটেই নায়কগত রসাত্মক চিত্তবৃত্তির গমক, তাহা নহে,—নায়কের স্বকীয় রসও অনুভাবসমূহের দ্বারাই তাঁহার নিকট উদ্বোধিত হইয়া থাকে। এমন কি, অনেক আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্ (যেমন James, Lange প্রভৃতি) শারীর বিকৃতি বা অনুভাব সমূহকে রসানুভূতি হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। রস বা emotion কেবলমাত্র জায়মান অনুভাবসমূহেরই সমষ্টি মাত্র,—কোনও পৃথক পদার্থ নহে। শারীরবিকৃতি হইতে আমাদের রসবোধের কোনও পৃথক সত্তা নাই। আমার 'ক্রোধ' বা 'রৌদ্ররস' আর কিছুই নহে,—উহা কেবল আমার নয়নের রক্তিমা, ভ্রূভঙ্গ, করাস্ফালন, পরুষভাষণ প্রভৃতি শারীরবিকার বা অনুভাবেরই সমষ্টি বা aggregate মাত্র। এই দিক দিয়া বিচার করিলে অনুকার্যগত মুখ্য রসানুভূতির প্রতি অনুভাবসমূহও বিভাবের মতই উৎপাদক কারণ,—যদিও দর্শকের দৃষ্টিতে উহারা অনুকার্যগত রসের বা স্থায়িভাবের 'অনুমাপক' হইতে পারে বটে।

সত্য বটে, 'বিভাব' রস অথবা স্থায়িভাবের উৎপত্তির প্রতি কারণ (efficient cause), এবং 'অনুভাব'সমূহ সেই উৎপন্ন স্থায়িভাবের গমক। কিন্তু,

দ্রষ্টব্য : "James says, 'Bodily changes follow directly the perception of the exciting fact, and our feeling of the same changes as they occur *is* the emotion.'...Certainly, in my opinion, no case can be made out against its main contention, namely, that the experiences, feelings or states of mind which we call '*emotions*' *are caused by, and are absolutely dependent upon, bodily changes*. If there were no bodily changes, if, consequently, the field of consciousness were to contain no sensations of endosomatic origin, there could be no emotion.

"Nor do I see any great weight in the criticisms which have been brought against the use of the word *is* in the passage cited above. It has been pointed out that to say "our feeling of the [bodily] changes as they occur (i. e. the sum total of the endosomatic sensations) *is* the emotion", is to assert an identity between the emotion and the sensation, and that although there may be *a causal connexion between the sensation and the state of mind we call emotion*, this is not logically equivalent to identity. But, as against this, I would contend that the connexion between the endosomatic sensations, and the affective component of the total mental state (i. e. the 'emotion') is precisely the same as that between any other sensation and the change in consciousness produced thereby. So far as my *mind* is concerned, sensations emanating from my own body are just external, just as much 'given *ab extra*' as those emanating from what I describe as 'objects' outside my body, and should be treated in the same way as the latter. If we say that the change in consciousness produced by an ordinary visual sensation *is* 'perception,' I do not see that we have any right to deny that the change in consciousness produced by a different kind of sensation (i. e. a visual or other endosomatic sensation) *is* 'emotion.'..."
—W. Whately Smith : *The Measurement of Emotion.* পৃ. ১৮—১৯ (London Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd. 1922.)

লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, উদ্ধৃত মন্তব্য 'লৌকিক' রসের সম্বন্ধেই প্রধানভাবে প্রযোজ্য। ভট্টলোল্লটের মতেও যাহা 'মুখ্য রস', অর্থাৎ যাহা অনুকার্য দুষ্মন্তপ্রমুখনায়কনিষ্ঠ স্থায়িভাব, তাহাও 'লৌকিক' রসমাত্র,—সাহিত্যিক 'রস' নহে। সাহিত্যিক রস 'অলৌকিক',—কেন না, সে স্থলে দেশ, কাল, অবস্থা, অহংতা, মমতা প্রভৃতি আমার বা বিজ্ঞানধারার যতকিছু কাল্পনিক ও অবাস্তব পরিচ্ছেদ বা limitation, সে সমস্তই তখনকার মত অবলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু লৌকিক রসানুভূতির ক্ষেত্রে আমাদের বিজ্ঞানসন্ততির এই সকল পরিচ্ছেদই বজায় থাকে। পরে এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

স্থায়িভাবের উৎপত্তিকেই কেবলমাত্র রস বলা যায় না,—উহা যতক্ষণ না অন্যান্য সহকারিগণের দ্বারা উপচিত হয়, ততক্ষণ পূর্ণ আস্বাদময় পরিণতি লাভ করিতে পারে না। 'বিভাব' রসবীজের উৎপত্তির প্রতি কারণ হইতে পারে বটে, এবং অনুভাব উহার সত্তা সাধারণ্যে ঘোষণা করিয়া দিতে পারে বটে, তথাপি ঐ বীজের মধ্যে যে পূর্ণ ফলপুষ্পবিশোভিত বনস্পতির সম্ভাবনা নিহিত আছে, তাহা তখনই সফলতা লাভ করিতে পারে, যখন 'ব্যভিচারিভাব'-রূপ সহকারিকারণের দ্বারা ঐ রসাঙ্কুরের পরিপুষ্টি সাধিত হয়। শঙ্কা, অসূয়া, বিতর্ক, নির্বেদ, গ্লানি প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব শৃঙ্গাররসকে পরিপূর্ণ আস্বাদ্যতা দান করে। শকুন্তলার প্রতি মহারাজ দুষ্যন্তের রতিভাব কত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আপন পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে! কণ্বের তপোবনে রূপমুগ্ধ মহারাজ দুষ্যন্তের হৃদয়ে শকুন্তলার জন্মবিষয়ে 'বিতর্ক', রাজসভায় উপনীতা শকুন্তলাকে দেখিয়া দুর্বাসার শাপপ্রভাবে দুষ্যন্তের আকস্মিক 'মোহভাব', অতঃপর শকুন্তলার অন্তর্ধানের পর ক্রমশ মহারাজের পূর্ববৃত্তান্ত 'স্মরণ', এবং তজ্জনিত আত্মধিক্কার বা 'নির্বেদ',—এইরূপ কত বিচিত্র ব্যভিচারিভাবের সমাবেশের দ্বারা মহারাজ দুষ্যন্তের শকুন্তলাবিষয়ক 'রতি' শবলিত হইয়া উঠিয়াছে, পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, 'বিষমশিলাসঙ্কটস্খলিতবেগ' নদীপ্রবাহের মত গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও মন্দ হইয়া যায় নাই। এখন বুঝা গেল, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের রসোৎপত্তির প্রতি উপযোগিতা কতটুকু। শুদ্ধ বিভাব, শুদ্ধ অনুভাব, অথবা শুদ্ধ সঞ্চারিভাবের দ্বারা প্রকৃত রসবোধ সম্ভবপর নহে। ইহাদের পরস্পর সংহতির দ্বারাই চরম পরিপূর্ণতা ও সুনিশ্চিত বৈশিষ্ট্য সম্ভবপর।(১)

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে,—নাট্যের অভিনয়দর্শনাবসরে সত্যসত্যই কি প্রেক্ষকসমাজের হৃদয়ে অনুকার্য দুষ্যন্তাদিনায়কগত রসেরই কেবলমাত্র বোধ জন্মে? তাহাদের কি এইরূপ জ্ঞান হয় যে, "ঐতিহাসিক মহারাজ দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রতি রতিমান্"? অনুভব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইবে। সত্য বটে, ঐতিহাসিক দুষ্যন্তেই শকুন্তলাবিষয়ক রতিভাব বাস্তব। কিন্তু ঐরূপ জ্ঞান তো সামাজিকগণের চিত্তে উদ্ভূত

(১) "এবং চ বিভাবৈরীষদ্ অভিব্যক্তি, অনুভাবৈঃ স্ফুটা, ব্যভিচারিভিঃ স্ফুটতরা—ইতি সমুদায়জন্যাভিব্যক্তিরেব রসত্বাপাদিকেতি।"—কাব্যপ্রদীপটীকা : বৈদ্যনাথবিরচিত : পৃ. ৩২।

হয় না? সামাজিকগণ দুষ্মন্ত-শকুন্তলাদি নায়কনায়িকার অনুকরণশীল নট বা অভিনেতাদিগকেই ঐতিহাসিক দুষ্মন্ত শকুন্তলা প্রভৃতি রূপে মনে করিয়া থাকেন। নাট্যদর্শনের সময় অভিনয়নিপুণ দুষ্মন্তরূপী নটকে দেখিয়া,—"এই ব্যক্তি দুষ্মন্ত নহেন, কিন্তু নট মাত্র'—সামাজিকগণের এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ ভেদ-প্রতীতি হয় না। 'এই ব্যক্তিই মহারাজ দুষ্মন্ত, ইনিই শকুন্তলার প্রতি রতিমান্'—নটকে দেখিয়া এইরূপ অভেদবোধই বরং সামাজিকগণের পক্ষে অধিকতর সমীচীন। কিন্তু, সত্য সত্যই তো অনুকর্তা নট, এবং অনুকার্য ঐতিহাসিক দুষ্মন্ত প্রভৃতি পাত্রপাত্রী অভিন্ন নহে, সত্য সত্যই তো নটের চিত্তে শকুন্তলাবিষয়ক শৃঙ্গাররস বাস্তব নহে। এমন কি, নট যতই অভিনয়নিপুণ হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে কোনও 'রস' অনুভব করিয়া থাকে কি না, তাহাই সন্দেহের বিষয়। সুতরাং প্রেক্ষকগণের এইরূপ প্রতীতি কিরূপে সমর্থন করা যায়? ভট্টলোল্লট ইহার উত্তরে বলেন: সত্য বটে, অনুকর্তা নট অনুকার্য দুষ্মন্তাদি পাত্রপাত্রী হইতে অভিন্ন, এবং সে কখনও অনুকার্যনিষ্ঠ মুখ্যরসের বাস্তব আশ্রয় হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া সামাজিকগণের যে নট ও অনুকার্য নায়কের মধ্যে অভেদবোধ হইয়া থাকে, এবং তাঁহারা যে নটকেই বাস্তবিকভাবে মুখ্যরসের আধার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, ইহাও যে একেবারেই যুক্তিবর্জিত ও আকস্মিক, তাহাও নহে। নটকে তাঁহারা অনুকার্য নায়কের সহিত অভিন্ন বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন, এবং এই অভেদবোধ 'আরোপমূলক'। আমরা সুন্দর শিশুমুখকে চন্দ্রের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করি—মুখে চন্দ্রত্বের 'আরোপ' করিয়া থাকি। ইহার মূলে আছে মুখ ও চন্দ্রের মধ্যে সৌন্দর্য বিষয়ে সাধর্ম্য। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও দুষ্মন্ত ও নটের মধ্যে যে অভেদবোধ, তাহারও মূলে আছে উভয়ের সাধর্ম্য। । এই সাধর্ম্যই নটে 'দুষ্মন্তত্ব'রূপ ধর্মের আরোপের (সুপার্-ইম্‌পোজিশন্) মূলে। কি সেই সাধর্ম্য? উত্তরে ভট্টলোল্লট বলেন: ঐতিহাসিক দুষ্মন্ত ব্যক্তির অনুভাব, বেশ-ভূষা প্রভৃতির সহিত অভিনয়কোবিদ নটের সেই সেই বিষয়ে সাম্য। ঐতিহাসিক দুষ্মন্তের শকুন্তলা-সন্দর্শনে যেমন যেমন শারীরচেষ্টাসমূহ দৃষ্ট হইয়াছিল, মহারাজ দুষ্মন্ত যেমনভাবে রাজোচিত বসনাভরণে সজ্জিত হইয়া থাকিতেন, শকুন্তলা-বিরহে মহারাজ দুষ্মন্তের যেরূপ বিরহদশা দেখা গিয়াছিল, অভিনয়নৈপুণ্যবশে এই সমস্ত অবস্থারই নিছক প্রতিফলনের দ্বারা নটকে

দুষ্যন্তাভিন্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মে।" এবং ঐতিহাসিক দুষ্যন্তে যে শৃঙ্গাররস মুখ্যভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহাও সহৃদয় সামাজিকগণ কর্তৃক দুষ্যন্তরূপী নটব্যক্তিতে 'আরোপিত' হইয়া থাকে। সেই জন্য ভট্টলোল্লট বলিয়াছেন, "তদ্রূপতানুসন্ধান" বা নট কর্তৃক অনুকার্য নায়কের রূপের 'অনুসন্ধান' বা 'অনুকৃতি'ই নটে ঐতিহাসিক নায়কনিষ্ঠ স্থায়িভাবের আরোপের মূলে। বস্তুত নটে কোনও রসের বাস্তব সত্তা নাই, উহা কেবল উপচরিত মাত্র, অতএব অমুখ্য। এই আরোপের ফলেই "ইনি দুষ্যন্ত, ইনি শকুন্তলা বিষয়ক রতিমান্", সহৃদয়ের চিত্তে এইরূপ প্রতীতির উদ্ভব হইয়া থাকে। নটকে 'দুষ্যন্ত' বলিয়া এই যে জ্ঞান, ইহা 'অনুমান' নহে, ইহা সাক্ষাৎকার বা পারসেপ্শন। কিন্তু ইহা লৌকিক সাক্ষাৎকার নহে, ইহা অলৌকিক (ট্রান্সেন্ডেন্টাল)। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগবশে যে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকেই সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষজ্ঞান (পারসেপ্শন, ইমিডিয়েট নলেজ) বলা হয়। এই প্রত্যক্ষের আবার দুইটি বিভাগ—লৌকিক এবং অলৌকিক। লৌকিক প্রত্যক্ষ সেইখানেই সম্ভবপর, যেখানে জ্ঞায়মান বিষয়টি (অবজেক্ট অফ নলেজ) বস্তুত জ্ঞানকালে বর্তমান এবং যাহার সহিত চক্ষুঃ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। যখন আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঘটজ্ঞান হয়, তখন আমাদের ঘটের লৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে,—কেন না, ঘটটি সত্য সত্যই বর্তমান এবং তাহার সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ সত্য সত্যই স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে শুক্তিকায় রজতবুদ্ধি জন্মে, সেখানে রজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু উহা অলৌকিক। কেন না, সত্য সত্যই রজতখণ্ড সেখানে বর্তমান নাই, এবং ফলে উহার সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কোনও সম্বন্ধই স্থাপিত হইতে পারে না। সুতরাং উহা অলৌকিক। এখানে নটে যে দুষ্যন্তবুদ্ধি এবং 'নট যে দুষ্যন্তনিষ্ঠ রতিভাবের আশ্রয়' এই বোধ, এই দুইটিই অলৌকিক প্রত্যক্ষ। কেন না, ঐতিহাসিক দুষ্যন্ত ব্যক্তি অথবা তন্নিষ্ঠ মুখ্য রতিভাব,—ইহাদের কোনটিরই অভিনয়ক্ষেত্রে বাস্তব সত্তা নাই। সুতরাং উহাদের সহিত আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোনও বাস্তব সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ স্থাপিত হইতে পারে না। অথচ ঐরূপ সাক্ষাৎকারও সামাজিকগণের অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, অভিনয়স্থলে সামাজিকগণের নটব্যক্তিতে যে 'ইনিই দুষ্যন্ত, ইনিই শকুন্তলাবিষয়ক রতিমান্'—এইরূপ বোধ

জন্মিয়া থাকে, উহা সর্বথা আরোপমূলক সাক্ষাৎকার, উহা অলৌকিক প্রত্যক্ষেরই অন্তর্ভূত। এবং সামাজিকগণের চিত্তে অভিনয়দর্শনজনিত যে আনন্দের উদ্রেক হইয়া থাকে, যাহাকে সাহিত্যমীমাংসায় 'রসাস্বাদ' বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহা এই আরোপমূলক অলৌকিক সাক্ষাৎকারেরই অপর নামমাত্র, আর কিছুই নহে। নটে যেমন রসের বাস্তব সত্তা নাই, উহা যেমন সাধর্ম্ম্যদর্শন-জনিত আরোপ বা উপচারমাত্র, সেইরূপ সহৃদয় প্রেক্ষকের চিত্তে যে আনন্দময় রসানুভূতি, উহারও কোনও বাস্তব সত্তা নাই, উহা শুধু উপরিবর্ণিত নটগত উপচরিত রতির অলৌকিক সাক্ষাৎকারেরই নামান্তর মাত্র।—ইহাই আচার্য ভট্টলোল্লটের স্বকীয় সিদ্ধান্ত।(১)

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদিগণ বলিবেন : ভট্টলোল্লট যে বলেন, প্রকৃত 'রস' বাস্তবসম্বন্ধে অনুকার্য দুষ্যন্তাদি নায়কেই আশ্রিত থাকে,—ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। শকুন্তলার প্রতি দুষ্যন্তের যে রতি উহা তো নিতান্তই পৃথকজনোচিত (laymanlike)। তোমার আমার রতির সহিত মহা-রাজ দুষ্যন্তের রতির তো কোনই পার্থক্য নাই। উহা তো নিতান্ত লৌকিক। ব্যাবহারিক জগতে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের দ্বারা আমরা যেরূপভাবে প্রভাবিত হই, মহারাজ দুষ্যন্তও ঠিক সেরূপভাবেই প্রভাবিত হইয়াছিলেন—ইহাতে কোনও সন্দেহই নাই। লৌকিক রসের অনুভূতির ক্ষেত্রে অহংতা, মমতা, তুমি, আমি, দেশ, কাল প্রভৃতির জ্ঞান যেমন প্রবল থাকে,—মহারাজ দুষ্যন্তের রতি স্থায়িভাবের আস্বাদ বা অনুভূতিও সমানভাবে এই সকল বিশেষণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ছিল, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তাহাই যদি হয়,—তবে লৌকিক রসের সহিত মহারাজ দুষ্যন্তের শৃঙ্গারানুভূতির তফাত রহিল কোথায়? সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে মহারাজ দুষ্যন্তের রসানুভূতি নিতান্তই লৌকিক রসানুভূতি। কিন্তু সাহিত্যপাঠ বা নাট্যাভিনয়দর্শনজনিত যে রসবোধ উহা তো অলৌকিক। উহা তো উপরিবর্ণিত সমস্ত পরিচ্ছেদের অতীত। কাব্যপাঠজনিত আনন্দময় রসচর্বণার ক্ষেত্রে তো 'আমার এই রস,' 'আমার এই

(১) "মুখ্যতয়া দুষ্যন্তাদিগত এব রসো রত্যাদিঃ কমনীয়বিভাবাদ্যভিনয়প্রদর্শনকোবিদে দুষ্যন্তাদ্যনুকর্ত্তরি নটে সমারোপ্য সাক্ষাৎক্রিয়তে ইত্যেকে। মতেঽস্মিন্ সাক্ষাৎকারো দুষ্যন্তোঽয়ং শকুন্তলাদিবিষয়করতিমান্ ইত্যাদি প্রাগ্‌বদ্ ধর্ম্যংশে লৌকিক আরোপ্যাংশে ত্বলৌকিকঃ।"
—রসগঙ্গাধর : পৃ. ৩০।

নায়িকা,' 'আমি এই দেশের অধিবাসী,' 'আমি এই কালে বর্তমান'—এইরূপ জ্ঞানধারার যতকিছু সঙ্কীর্ণতা সমস্তই মুছিয়া যায়। এই অনুভূতির সহিত লৌকিক রসানুভূতির সমীকরণ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সেই জন্যই তো সাহিত্যমীমাংসকগণ সাহিত্যপাঠ অথবা নাট্যাভিনয় দর্শনজনিত রসবোধকে, ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয় aesthetic experience, অলৌকিক বলিয়া থাকেন, এই অনুভূতি আর সমস্ত অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহার সহিত তুলনা দিবার মত কোনও বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নাই,—ইহা সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী—*Sui Ieneris*। আলঙ্কারিকগণ উহাকে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' বলিয়াছেন,—কিন্তু উহা যে ব্রহ্মাস্বাদের সহিত একান্তভাবে অভিন্ন নহে, ইহা তাঁহারাও স্বীকার করেন। কবির কাব্যরচনা অথবা নাট্যকারের প্রযোজনার উদ্দেশ্য তো এইরূপ চিত্তবৃত্তির উদ্রেক,—ইহাই তো তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। কাব্য অথবা নাট্যের তাৎপর্য শুধু এই অলৌকিক চিত্তবৃত্তির উন্মেষসাধনেই—আর কিছুই তো তাহার লক্ষ্য হইতে পারে না। 'কাব্যস্যাতৎপরত্বতঃ'। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে 'লৌকিক' রস মুখ্য রস নহে, প্রকৃত রস হইতেছে 'অলৌকিক সাহিত্যিক রস'। সুতরাং ঐতিহাসিক নায়ক-নায়িকাতে এইরূপ চিত্তবৃত্তি কখনই সম্ভব নহে। এই সাহিত্য ও রসের মুখ্য আশ্রয় সহৃদয় পাঠক অথবা প্রেক্ষক সমাজ—অনুকার্য নায়কনায়িকা নহে। সুতরাং ভট্টলোল্লটের মত ভ্রান্ত। দ্বিতীয়ত ভট্টলোল্লট বলিয়াছেন,—সহৃদয়ের আনন্দানুভূতি,—যাহাকে পারিভাষিকভাবে 'রস' এই সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত করা হয়,—উহা অনুকার্য নায়কনিষ্ঠ মুখ্য রসের অনুকর্তৃ-নটব্যক্তিতে আরোপিত সত্তার অলৌকিক সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আরোপিত রতির সাক্ষাৎকারের ফলে কি কখনও এই জাতীয় ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর আনন্দানুভূতি সম্ভবপর? চন্দনানুলেপনে সুখানুভূতি হয়, ইহা অনুভবসাক্ষিক, কিন্তু একজনের গাত্রে চন্দনানুলেপন দর্শনমাত্র করিয়া কোনও উদাসীন দ্রষ্টা কি কখনও সেই সুখ অনুভব করিতে পারে? ভট্টলোল্লট বলেন—সহৃদয় প্রেক্ষক অথবা পাঠকের হৃদয়ে কোনও স্থায়িভাবের উদ্রেক হয় না—তাঁহারা কেবল উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত তো উপরিবর্ণিত দৃষ্টান্তের সাহায্যে সহজেই ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। (১) সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে,

(১) চন্দনসুখাদৌ বৈপরীত্যদর্শনাৎ—কাব্যপ্রদীপঃ পৃ. ৬৩।—"ন হি চন্দনারোপস্তদৎ-

সহৃদয় পাঠক এবং প্রেক্ষকসমাজই কেবলমাত্র অলৌকিক রসের মুখ্য আধার, অনুকার্য নায়ক নহে। অনুকার্য নায়কনায়িকা শুধু সহৃদয়ের সেই অলৌকিক অনুভূতির উন্মেষের প্রতি কবিকল্পিত উপকরণমাত্র, আর কিছুই নহে।

পরিশেষে একটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচনীয়: আমরা দেখিলাম, সাহিত্যিক রসের অনুভবিতা একমাত্র সহৃদয়—নায়কও নহে, নটও নহে। কিন্তু অভিনেতা কি কখনও এই অলৌকিক রসের আস্বাদ লাভ করিবার অধিকারী হইতে পারে না? সে কি শুধু সহৃদয় প্রেক্ষকের মনোবিনোদনের উপকরণমাত্রই হইয়া থাকিবে? ইহার উত্তরে সাহিত্যবিচারকগণ বলেন: যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে নট সাহিত্যরসের আশ্রয় হইতে পারে না, তথাপি সে যে নিয়মিতভাবেই রসানুভূতির সীমারেখার বাহ্য হইয়া থাকিবে, ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে। নটও কখনও কখনও অভিনয়কালে আত্মবিস্মৃত হইয়া দেশকালাবস্থাতীত রসানুভূতির পরিচয় লাভ করিয়া থাকে,—তন্ময়ীভূত হইয়া আপন পরিমিত সত্তা বিস্মৃত হয়। তখন তাহার অশ্রু, স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, অঙ্গসঞ্চালন প্রভৃতি অনুভাব সত্য সত্যই রসের গমক হইয়া দাঁড়ায়, কেবলমাত্র পরচেষ্টার প্রযত্নকল্পিত রসসম্পর্কবিহীন অনুকরণমাত্রে পর্যবসিত হয় না। তখন সে সহৃদয় গোষ্ঠীর একজন সভ্য হইয়া পড়ে,—বাহ্য দৃষ্টিতে অনুকর্তা হইয়াও, তত্ত্বদৃষ্টিতে সে তখন সহৃদয়স্থানাপন্ন। 'নাট্যদর্পণকা'র একটি সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে অভিনেতৃ নটকর্তৃক রসানুভূতির সম্ভাব্যতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: পণ্যস্ত্রীগণও,—অনুরাগের মিথ্যা অভিনয়ই যাহাদের একমাত্র জীবিকা, তাহারাও কোনও কোনও সময়ে প্রকৃত প্রেমের বশীভূত হয়; সঙ্গীত-কুশল গায়ক গীতিলহরীর সাহায্যে শ্রোতার রসসৃষ্টি করিতে যাইয়া আপনার অজ্ঞাতসারে রাগপরবশ হইয়া উঠে। সেইরূপ অনুকর্তা নটও রামাদিগত বিপ্রলম্ভের অনুকরণাবসরে স্বয়ং তন্ময় হইয়া সেই রস অনুভব করিয়া থাকে।(১) কাব্য-স্রষ্টা

কৃতিহেতুঃ, অপিতু বস্তুতশ্চন্দনসদৃশ এব। তথা সুখমপি নারোপ্যমাণং তথা, কিন্তু বস্তুতো বিদ্যমানমেব।" বৈদ্যনাথতৎসৎ: ঐ টীকা।

(১) ন চ নটস্য রসো ন ভবতীত্যেকান্তঃ। পণ্যস্ত্রিয়ো হি ধনলোভেন পররত্যর্থং রত্যাদি বিপকয়ন্ত্যঃ কদাচিৎ স্বয়মপি পরাং রতিমনুভবন্তি। গায়কাশ্চ পরং রঞ্জয়ন্তঃ কদাচিৎ স্বয়মপি রজ্যন্তে। এবং নটোঽপি রামাদিগতং বিপ্রলম্ভমনুকুর্বাণঃ কদাচিৎ স্বয়মপি তন্ময়ীভাবমুপযাত্যেবেতি তদ্গতা অপি রোমাঞ্চাদয়স্তত্র রসং গময়েয়ুরেব।—নাট্যদর্পণ: পৃ. ১৬০। আধুনিক কোনও কোনও পাশ্চাত্য সমালোচকের মতে নটের রসাস্বাদ ও তন্ময়ীভবন সম্ভবপর

কবির রসানুভূতিও তাঁহার সহৃদয়তারই ফল। তাঁহাতে কবি ও সহৃদয়ের পরস্পর সমাবেশ ঘটিয়াছে। কবি হিসাবে তিনি তাঁহার কাব্যজগতের একমাত্র নিয়ন্তা প্রজাপতি, কাব্যের ও নাট্যের পাত্রপাত্রীগণের সৃষ্টিকর্তা। আবার সহৃদয় হিসাবে তিনি স্বকীয় প্রতিভাসৃষ্ট চরিত্রসমূহের সুখ দুঃখ, তাহাদের বিচিত্র অনুভূতির সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন। তাঁহারই চিত্তমুকুরে নাটকীয় বিভিন্ন রসের

হইলেও, দর্শকের রসাস্বাদের পক্ষে উহা বিঘ্নস্বরূপ। নট রসবোধ করে করুক, কিন্তু অভিনয়-কালে তাহার নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া অনুকার্য নায়কের চিত্তবৃত্তি, অনুভাব প্রভৃতির যথাযথ অনুকরণ করাই তাহার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত,—তবেই তাহার অভিনয়নৈপুণ্য সার্থক। সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতভাবে অনুকার্যনায়কের সহিত নিজে অভিন্ন হইয়া যাওয়া,—প্রেক্ষকের হৃদয়ে রসসৃষ্টির দিক দিয়া বাঞ্ছনীয় নহে। দ্রষ্টব্য: "It has often been supposed—it has often been said, that an actor should think himself into his part, and in order to act most convincingly should forget for the time being that he is not the man he impersonates. That, however, is no more than a popular delusion. It has been effectively dispelled by the great French actor Coquelin, in his book on the art of acting. In that book Coquelin tells the following anecdote.

"Another great actor, Edwin Booth, was once taking the chief part in the play *Le Roi S'amuse*....The part was one in which Booth was conscious of having won great success. One evening he satisfied himself that he was acting even better than usual. The power of the situation, the pathos of his lines, worked on him so strongly that he completely identified himself with the character he was representing. Real tears flowed from his eyes, his voice broke with emotion, real sobs choked him. Altogether, it seemed to him that he never acted so well. The performance over, he saw his daughter hastening towards him. She, his most sincere and truest worthy critic, had been watching the stage from a box, and she was now anxious to inquire what was the matter and how it happened that that night he had acted so badly.

"Coquelin does not tell this little story for its own sake. His object is to point a moral. In his own words, the moral is that in order to call forth feeling in others we ourselves must not experience it. He does not say that we must never have known it, but only that we must not be undergoing it while we are in the act of trying to arouse it in others. "In all circumstances, the actor," he says, "must retain complete self-control."—Montgomery Belgion · *Reading for Profit*, pp. 28—29.

কানু। তুই একটা মুখ্যু। যদি ভাগীদার বদলে দেয়?

দিলেই হ'ল। দেখে লোব একবার।—ব'লে ছিনাথ মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

ভেতর থেকে এঁটো বাসন নামানোর শব্দ এল। প্রলুব্ধ হয়ে উঠল ছিনাথ, কানু বসল দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে।

নারীকণ্ঠ এল, ওই ওরা যে খাবে, তা আজ কলাপাতা তো আনানো হয় নি।

তা হ'লে থালাতেই—

চাকরটি হয়েছেন ফুলবাবু। তিনি ওদের এঁটো বাসন মাজবেন না।

ছিনাথ। আমরা কি মানুষ লই, অ্যাঁ?

কানু। আমরা নীচ জাত তো বটি।

ছিনাথ। ছোটবাবুটি যে আমাদের চেয়ারে বসাতে চেয়েলেন!

কানু। বাবুরা ও রকম ব'লে ফ্যালান; তাই ব'লে কি আর সত্যিই আমরা বসিছি?

ছিনাথ। দেখ দাদা, কতদিন তোমাকে বলিছি, চাষ-বাস ছেড়ে শহরে এসে চাকরি কর; তা নইলে এই চাষা নাম ঘুচবে না। যেথায় যাও, যা কর, সমুচু নোকের মুখে ওই একই কথা—ওরা চাষা। করুক গিয়ে বাবুরা চাষ-আবাদ, যত পারে ধান ফলাক।

কানু। কত জলে কত মুসুরি ভেজে তা জানলে আর—

বাইরের দরজায় দমাদম ধাক্কার সঙ্গে বাইরে থেকে এল বহু লোকের আক্রমণাত্মক চীৎকার।

বাইরে প্রিয়তমের গলা—দরজা খোল, দরজা খোল শিগগির। তার আকুল কণ্ঠস্বরে চপলা ছুটে এসে দরজা খুলে দিতেই শুধু প্রিয়তম নয়, আরও অনেকে ঢুকে পড়ল ঘরে হুড়মুড় ক'রে। সর্বশেষ ব্যক্তিটি ঢুকে দরজা দিলে বন্ধ ক'রে। বাইরে গণ্ডগোল হয়েই চলেছে। নরু, তাঁর স্ত্রী, এঁদো প্রভৃতি সকলেই ঘরে দলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে। এদের এক পাশে একক দাঁড়িয়ে কানু আর ছিনাথ; ছিনাথ মালকোঁচা মারছে, চোখের দৃষ্টি বিহ্বল। গায়ের কাপড়টা কোমরে বাঁধছে কানু।

এতক্ষণে নরুর কথা ফুটল, বললেন, কি, হ'ল কি? কার্ফিউ সত্ত্বেও আবার বাধল?

প্রাথমিক প্রতিবিম্ব উদ্‌গৃহীত হয়, সুতরাং তিনিই মূর্ধাভিষিক্ত সহৃদয়।(১) তিনি একাধারে স্রষ্টা ও রসয়িতা। কবির কবিত্ব ও সহৃদয়ত্ব, দুইটি বিভিন্ন তত্ত্ব, কবিপ্রতিভার দুইটি বিভিন্ন দিক—যদিও সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে এই উভয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহরণীয়।(২) অতএব রসানুভূতির দিক দিয়া বিচার করিলে কবির সাহিত্যসৃষ্টির কেন্দ্রস্থানীয় ব্যক্তি 'সহৃদয়'। কাব্যসৃষ্টির মূলে যেমন রসানুভূতিপ্রবণ সহৃদয় কবিচিত্ত, পর্যবসানেও সেইরূপ পাঠক ও প্রেক্ষকের আদর্শের মত নির্মল, কাব্যবর্ণিত বস্তুর প্রতিবিম্বগ্রহণক্ষম সহৃদয়চিত্ত। এই উভয়ের মধ্যে আছে—নায়কস্থানীয় সহৃদয় অভিনেতার রসোজ্জীবিত অভিনয়। আচার্য ভট্টতৌত সত্যই বলিয়াছেন: "নায়কস্য কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোঽনুভবস্ততঃ।"

শ্রীবিষ্ণুপদ

মহাত্মা

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী
চেয়ে রয়েছে দুটি শান্ত চোখের দিকে।
দু হাজার বছর পরে
ক্রুশকাষ্ঠবিলগ্ন যীশু কি আজ চোখ মেলে চাইল?
—জনতা প্রশ্ন করে।
হিন্দু মুস্লিম-খ্রীষ্টান তারা নয়—
শুধু জাগ্রত জনতা।

নানা ভাষা, নানা মত আজ নিশ্চিহ্ন
পরম সম্ভাবনার তরঙ্গশীর্ষে।
হিংসার রক্তচক্ষু থেকে
গড়িয়ে পড়ে প্রীতির অশ্রুকণা;
ধরিত্রীর বুকে আকাশের ছায়া ভাসে।
দুটি শান্ত চোখে
ফুটে ওঠে
সার্থকতার মধুরতম হাসি।

শ্রীপ্রভাত বসু

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭

রজনী হয়েছে ভোর ওই যে উষার আলো,
ক্রমে ক্রমে স'রে যায় নিবিড় আঁধার কালো।
আলো এস, আশা এস, এস শান্তি, এস হর্ষ,
জয়যাত্রা কর শুরু, আমার ভারতবর্ষ।

"ভাস্কর"

---

(১) "কবির্হি সামাজিকতুল্য এব। অত এবোক্তং—'শৃঙ্গারী চেৎ কবি' ইত্যানন্দবর্ধনাচার্যেণ"—অভিনবভারতী: পৃ. ২৯৫: প্রথম ভাগ। অপি চ—"কবেরনুভবশ্চেৎ সহৃদয়স্যৈব বস্তু কবিত্বেন।"—নাগোজীভট্ট: রসগঙ্গাধরটীকা, পৃ. ৪।

(২) সহৃদয়শিরোমণি আনন্দবর্ধনাচার্য একটি শ্লোকে কবিপ্রতিভার এই দ্বৈতরূপ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন:

"যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।"

—ধ্বন্যালোক: তৃতীয় উদ্যোত।

ঊনত্রিংশে শ্রাবণ, ১৩৫৪

(১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭)

বহু শতাব্দীর শাসন-শোষণ-পেষণ অতিক্রম করিয়া বহু-প্রতীক্ষিত সেই দিনটি আজ আমাদের দ্বারে সমুপস্থিত। যে রাজনৈতিক পরাধীনতা এতদিন আমাদের মনুষ্যত্বকে খর্ব করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহার অবসান ঘটিল। পথের বাধা ঘুচিয়া গেল, এইবার আমাদের চলিবার পালা। বহু দিনের আলস্যে পঙ্গু, অজ্ঞতায় অন্ধ, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, আত্মকলহে নিমগ্ন, রোগে জীর্ণ, আমাদের এইবার পথ চলিতে হইবে। পথের কণ্টক-কর্দম-কঙ্করকে তুচ্ছ করিয়া আজ আমাদের যাত্রা শুরু হইল আদর্শলোকের উদ্দেশে। তাই আজ আমাদের প্রার্থনা—হে ভগবান, আমাদের মানুষের মত চলিবার শক্তি দাও। যে স্বাধীনতার জন্য আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ নর-নারী অনাহারে অনিদ্রায় অবিচারে নির্যাতনে অবিচলিত থাকিয়া কারাগারে নির্বাসনে ফাঁসির মঞ্চে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন—কবির শাশ্বত স্বপ্নে, তপস্বীর একাগ্র তপস্যায়, কর্মীর অক্লান্ত কর্মে যে স্বাধীনতার আদর্শ নিষ্কলুষ শুভ্ররুচি, আমরা যেন সে স্বাধীনতাকে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ মর্যাদায় বহন করিবার শক্তি অর্জন করি।

বর্বরতাকে বীরত্ব বলিয়া, ভীরুতাকে আধ্যাত্মিকতা আখ্যা দিয়া, আলস্যকে বৈরাগ্য ভাবিয়া আমরা যেন পথভ্রান্ত না হই।

আত্মপ্রশংসায় মুখর না হইয়া আত্মানুসন্ধানে আমরা যেন ব্যাপৃত থাকি; আমরা যেন উপলব্ধি করিতে পারি, শক্তি আমাদের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে, বাহিরে কোথাও নাই, সেই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার আয়োজনেই আমাদের সর্ববিধ সাধনা যেন একাগ্র হয়।

আমাদের কর্মে প্রেরণায় চিন্তায় ভারতবর্ষের উত্তরাধিকারের চিহ্ন যেন দেদীপ্যমান থাকে।

আমরা যেন মনে রাখি যে, আমরাই ইতিহাসের স্রষ্টা, মহাকালের নিয়ন্তা ভবিষ্যতের অগ্রদূত—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উদাত্ত ঋষি কণ্ঠে যে মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা আমাদেরই উদ্দেশ্যে, তাহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই—

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ
উত্তিষ্ঠং স্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

—নিদ্রাই কলিকাল, জাগরণেই দ্বাপর, দণ্ডায়মান হইলেই ত্রেতা এবং চলিতে আরম্ভ করিলেই সত্যযুগ। অতএব আগাইয়া চল, আগাইয়া চল।

শুদ্ধ শান্ত সংযত চিত্তে অকম্পিত দৃঢ় পদে উদার আদর্শে প্রবুদ্ধ এবং আত্মশক্তিতে সমৃদ্ধ হইয়া আমরা যেন আগাইয়া যাইতে পারি।

বহুবর্ণসমাবিষ্ট বিভিন্ন সভ্যতা-সমন্বিত প্রকৃতির বিচিত্র লীলানিকেতন আমাদের দেশকে সেই ঐশ্বর্যশালিনী মহিমায় আমরা যেন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, যাহার স্বপ্নমূর্তি একদা মূর্ত হইয়াছিল কবি-ঋষির ধ্যানলোকে—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী—নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্—বন্দে মাতরম্।

আসুন আজ আমরা দেশমাতৃকাকে বন্দনা করি
দেশবাসীকে বন্দনা করি
দেশের ইতিহাসকে বন্দনা করি
অতীতকে বন্দনা করি
ভবিষ্যৎকে বন্দনা করি
বন্দনা করি সত্যকে, বন্দনা করি শিবকে, বন্দনা করি সুন্দরকে
এবং বন্দনা করি এই ত্রিগুণের আধার পরমেশ্বরকে।

"বনফুল"

হে বন্ধু!

[শচীন্দ্র-স্মরণে]

আমরা ছিলাম ঘুমে নিশান্তের অন্তিম প্রহরে,
ধ্বংসের দুঃস্বপ্ন মাঝে বিভীষিকা দেখে মুহ্যমান,
হে বন্ধু, মশাল হাতে ডাক দিয়ে গেলে ঘরে ঘরে—
জাগরণী গান গেয়ে উজ্জীবিত ক'রে গেলে প্রাণ।
ত্রিবর্ণপতাকা-তলে ভারতের শিখা অনির্বাণ,
হে বন্ধু, সেখানে তুমি খেয়ালীকে নিলে হাত ধ'রে,
স্বপ্নীকে দেখালে পথ, পথিকের কণ্ঠে দিলে গান,
কর্ম আর কল্পনার রাখী বেঁধে দিলে পরস্পরে।

সেদিন আকাশ লাল ভ্রাতৃঘাতী হিংসার অনলে,
তোমরা কজন মিলে বক্ষ রক্তে নেবালে আগুন;
যারা মোহাচ্ছন্ন ছিল তারা ছুটে এল দলে দলে,
তোমাদের শেষ আশা লক্ষ প্রাণে হ'ল লক্ষগুণ।
হে বন্ধু, জীবন ঢেলে দিয়ে গেলে পথের সন্ধান—
আহিতাগ্নি বহুপ্রাণ এখনো যে চাই বলিদান।

শ্রীজগদীশ

সততার অপমৃত্যু

রবীন্দ্রনাথের শেষবাণী—'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের উপসংহারে এই কয়টি কথা আছে,—"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে? কি লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিবহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে!"

আজ এই ঋষিবাক্যের নিষ্ঠুর সত্য মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। ইংরেজ চলিয়া যাইতেছেন, কিন্তু কি ভারতবর্ষকে ফেলিয়া যাইতেছেন! দিকে দিকে যে বিষ, যে আগুন ছড়াইয়া যাইতেছেন, সেই বিষে জর্জরিত, সেই তাপে আমরা দগ্ধ হইতে থাকিব। ইংরেজ যে খুব উদারতা সহৃদয়তা দেখাইয়া চলিয়া

যাইতেছেন, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। এ কয় বৎসর যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা আর এখানে থাকিয়া সুবিধা করিতে পারিবেন না বলিয়াই চলিয়া যাইতেছেন। যাইবার পূর্বে, পশ্চাৎ-অপসরণকারী সৈন্য-বাহিনী যেমন দগ্ধ-মৃত্তিকার নীতি অনুসরণ করিয়া সরিয়া পড়ে, ঠিক তেমনই ইংরেজ আজ ভারতবর্ষকে দগ্ধ করিয়া পঙ্গু ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

ইংরেজ যদি সহস্র সহস্র কোটি টাকা মূল্যের অর্থসম্পদ লইয়া চলিয়া যাইতেন অথবা শহর বাড়ি ঘর রাস্তা কারখানা ধূলিসাৎ করিয়া যাইতেন, তাহাতে যে ক্ষতি হইত, তাহা হইতে শতগুণ বেশি ক্ষতি করিয়া গেলেন—আমাদের মনুষ্যত্বের, আমাদের সততার অপমৃত্যু ঘটাইয়া।

আজ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দেশে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিল, হয়তো তাহা কিছু দিন পরে বন্ধ হইবে; কিন্তু নিরপরাধিনী নির্যাতিতা নারীর দীর্ঘশ্বাস আকাশে বাতাসে যে অভিশাপের বাষ্প সঞ্চিত করিয়া রাখিল, তাহাতে অনিশ্চিত কালের জন্য আমাদের মন বিষাক্ত হইয়া থাকিবে।

তারপর এদিকে মানুষের সততাবোধ আর নাই। আজ সমাজের মধ্যে প্রতি দ্বিতীয় ব্যক্তিকেই অসৎ বলিয়া জানিতেছি। আজ অনাহারে লোক মরিয়া যাইতেছে, অথচ সরকারী ভাণ্ডারে খাদ্যদ্রব্য পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আমি না খাইয়া মরিয়া যাইতেছি দেখিয়াও আমার প্রতিবেশী খাদ্য সঞ্চয় করিতেছেন—বহুমূল্যে আমাকে ক্রয় করিতে বাধ্য করিবার জন্য।

সরকারী কর্মচারীদের উচ্চ নীচ সর্বস্তরে অর্থবিষয়ের অসততা আজ আর গোপন থাকিতেছে না। উৎকোচগ্রহণ নির্লজ্জভাবে চলিতেছে। ইহার প্রতিকার যাহাদের দিয়া হইবার কথা, তাহারাও যে অসৎ দেখিতে পাই। শুধু মাত্র অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জন নহে, রাজকর্মচারীদের কর্তব্যকর্মে শিথিলতা অবহেলা এতদূর বাড়িয়া গিয়াছে যে, প্রতিবাদ করিতে গেলে উদ্ধত বাক্য শুনিয়া অপমানিত হইয়া আসিতে হয়। সাধারণের প্রতি সৌজন্য-প্রকাশ অন্তর্ধান করিয়াছে। রেলওয়ে ডাকবিভাগের কর্মচারীদের অধঃপতন আরও শোচনীয় রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

প্রাদেশিক কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যেও এই দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। মনে হয়, তাঁহারা যেন ভাবিতেছেন, ভারতমাতা মাথায় থাকুন, জীবনে এখন

সুবর্ণসুযোগ আর নাও আসিতে পারে, সুতরাং এখন দুই পয়সা কামাইয়া লই। ইহাদের দ্বারা সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি দূর হইতে পারিবে না।

ব্যবসায়ীগণ, এমন কি সামান্য দোকানদারগণও, প্রকাশ্যেই চোরা-বাজারে বিস্তর অর্থ উপার্জন করিয়া লইতেছেন।

এইসব দেখিয়া শুনিয়া সমাজে নিরীহ ভদ্রসন্তানের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, সৎপথে চলাই এখন নির্বুদ্ধিতা। It is foolish to be honest—এই বাক্য বহু লোকের মুখে শুনিতেছি।

শ্রমিক-আন্দোলনে যাঁহারা লিপ্ত, তাঁহারা স্ট্রাইক করাইয়া শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করাইয়া লইতেছেন ; কিন্তু তদনুরূপ কর্মকুশলতা কর্তব্যপরায়ণতা তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। তাহাদের স্বভাব উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে। ন্যূনতম পরিশ্রম দ্বারা উচ্চতম পারিশ্রমিক পাইবার জন্যই তাহারা ব্যগ্র।

আমাদের ভবিষ্যতের ভরসা ছাত্রগণ। তাহাদের মধ্যেও যে দুর্নীতি চলিতেছে, তাহা দেখিলে আতঙ্ক হয়। একদিন বাঙালী ছাত্ররা চরিত্রের দৃঢ়তায়, হৃদয়ের সদ্‌গুণে আদর্শ-ছাত্র ছিল। বরিশালের অশ্বিনীকুমার গর্ব করিয়া বলিতেন যে, তিনি তাঁহার স্কুল-কলেজের পরীক্ষা-কক্ষে গার্ড রাখিবেন না। বস্তুত তখন একটি ছাত্রও প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিতে অবৈধ উপায় অবলম্বন করিত না। কিন্তু আজ কি দেখিতেছি! পরীক্ষাকেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বন করিতে অনেক ছাত্রের লজ্জাও নাই। বরং এই দুষ্কর্ম করিয়া নিজ নিজ দলের মধ্যে বাহাদুরি লাভ করিয়া থাকেন। ধরা পড়িলে দলবদ্ধভাবে গুণ্ডামি করিয়া দাঙ্গা করিতেও প্রস্তুত। দুর্দান্ত ছাত্রদের ভয়ে শিক্ষক সন্ত্রস্ত। শিক্ষকরা ছাত্রদের মন যোগাইয়া চলিতে বাধ্য হইতেছে। নহিলে স্ট্রাইক। ডিসিপ্লিন চুলায় গিয়াছে।

আজ বাংলা দেশের পশ্চিম প্রান্তে এক নূতন রাজ্য গঠিত হইল। এগারোটি কংগ্রেসকর্মী এই রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্যই এই কয়টি কথা লিখিলাম। আজ নীতিবাক্য বলিয়া সমাজের এই পাপ দূর করা যাইবে না। লক্ষ গান্ধী লক্ষ-কোটিবার প্রার্থনা সভায় সদুপদেশ দান করিয়া দুষ্কৃতকারীদের মন ভিজাইতে পারিবেন না কেন না, তস্কররা ধর্মকাহিনী শোনে না। সুতরাং ধর্মকথায় কাজ হইবে না ডিমক্রাসি খুব উত্তম জিনিস, কিন্তু ডিমক্রাসি চালাইতে হইলে চা-

নিয়মানুবর্তিতা, তাহা আমাদের লোপ পাইয়াছে। এখন প্রয়োজন একজন ডিক্টেটরের মত সর্বক্ষমতাসম্পন্ন শাসকের। আমরা ভয় ছাড়া সৎবৃত্তির অনুগমন করিতে চাই না। আমরা ভয়কেই ভয় করি। দেশের পক্ষে যাহা শুভ, যাহা কল্যাণকর, তাহা সকলকে করিতে বাধ্য করিতে হইবে,—এইরূপ কড়া হুকুম কড়া শাসনের দ্বারা মান্য করাইতে হইবে।

কংগ্রেস-মন্ত্রীগণ যদি ইহার পরও খাতির চাহেন বা খাতির দেখাইতে চাহেন, আর যদি Nationalisation-এর পরিবর্তে Personalisation তাঁহাদের প্রাণের গোপন আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলে বিদ্যাসাগরের কথায় বলিব, বঙ্গোপসাগরের জলের প্লাবন আসিয়া বাংলা দেশ ধুইয়া মুছিয়া ফেলুক, তারপর নূতন মানুষ নূতন কর্মপন্থা লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ

সংবাদ-সাহিত্য

পনরোই আগস্টে মুক্তি-মহোৎসবমত্ত কলিকাতায় হঠাৎ প্রেমের বান ডাকিল, ভাসমান খড়কুটার মত আমরা, হিন্দু-মুসলমানেরা, পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া সেই হঠাতের হুল্লোড়ে মাতিলাম, তারপর পয়লা সেপ্টেম্বরে এক রূঢ় ধাক্কায় চকিত হইয়া দেখিলাম, যাহা আমাদের ভাসাইয়া এক করিয়াছিল, সেই বন্যা সরিয়া গিয়াছে; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আমরা তপ্ত বালুশয্যায় দগ্ধ হইতেছি—সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বালুশয্যা। মহাত্মা গান্ধী অনশন করিলেন; শচীন্দ্রনাথ মিত্র, স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল গুপ্ত ও বীরেশ্বর ঘোষ প্রমুখ আদর্শবাদী যুবকেরা আত্মাহুতি দিলেন এবং আরও অজ্ঞাত বহু স্ত্রীপুরুষ হঠাৎ-বাসা প্রেমে আস্থা স্থাপন করিয়া নির্মমভাবে হত বা আহত হইলেন। সকলের সমবেত চেষ্টায় প্রত্যক্ষ হানাহানি থামিল, মহাত্মা গান্ধী অনশনভঙ্গ করিয়া দিল্লী গেলেন, শহরের কাজকর্ম আবার ধীরে ধীরে চালু হইল; কিন্তু সকলের মনে সংশয় ও অবিশ্বাস স্থায়ী আসন গাড়িয়া বসিল। বৈষ্ণবী প্রেমে যাহারা কলসির কাণা মাটিতে ফেলিয়া ঊর্ধ্ববাহু হইয়া আগাইয়া আসিয়াছিল, তাহারা পরিত্যক্ত কলসির কাণার দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। এই হইল ইতিহাস।

• • •

ভরসা এবং সুখের বিষয় এই যে, এই ভয় এইবারে ততখানি রাষ্ট্রিক নয়, যতখানি সামাজিক। যাঁহারা এতদিন অর্থ ও উৎসাহ দিয়া প্রশ্রয় দিতেছিলেন, তাঁহারাই সহসা সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া বিপরীত সুরে গাহিতেছেন, আর নয়, এই ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব এইবার বন্ধ করিতে হইবে। শুধু রাষ্ট্রীয় নেতারা নয়, পল্লীনেতারা এবং বিশেষ করিয়া তরুণ সম্প্রদায় মিলনের পতাকা তুলিয়া ধরিয়াছেন, বিরোধ-নিবারণে তাঁহারা প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা সহায়তা করিয়াছেন সংবাদপত্র ও সাংবাদিকেরা—তাঁহারা ধীরতা ও তৎপরতা প্রদর্শন না করিলে গান্ধীজীর অনশন আজ (১৫. ৯. ৪৭) তৃতীয় সপ্তাহে পড়িত, হয়তো বাংলা দেশেও বাঙালীর এতদিনে মুখ দেখাইবার পথ থাকিত না। বাঙালীকে সেই কলঙ্কের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্যই সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিয়া এত দ্রুত আমরা নিরস্ত্র হইয়াছি, এবং সেই মহাভয় আমাদের মধ্যে ঢুকিয়াছে বলিয়াই আশা হয়, ভয়হীন মিলনের মধ্যে একদিন ইহার পরিণতি ঘটিবে। সেই শুভদিন বিলম্বে আসিলেও ক্ষতি নাই।

* * *

আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি, বাংলা দেশের যাবতীয় শিল্পী ও সাহিত্যিক সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক ও দলগত ভেদবুদ্ধিকে নিরঙ্কুশভাবে বিনাশ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছেন। রাজনৈতিক কর্মী ও নেতারা প্রত্যক্ষ-ভাবে দেশের কল্যাণ বা সর্বনাশ সাধন করেন বটে, কিন্তু সাহিত্যিক ও শিল্পীদের চেষ্টা পরোক্ষভাবে সর্বত্রই জমি প্রস্তুত করে। তাঁহারা সংযত ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন হইলে ভয়ের কারণ অনেকখানি কমিয়া যায়। তাঁহাদিগকে এইটুকু শুধু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের অধিকাংশই কল্যাণপথে প্রবৃত্ত হইলেই সমস্যার মীমাংসা হইবে না, যাঁহারা এতদ্‌সত্ত্বেও বিপরীতমার্গী হইয়া প্রকাশ্যে গোপনে অথবা কূটকৌশলে বিরোধ ও অকল্যাণের বীজ বপন করিবেন, তাঁহাদের সহিত সর্ববিধ অসহযোগ করিয়া তাঁহাদিগকে বিধিমত দমন, অথবা কল্যাণের পথে পরিচালিত করার দায়িত্বও শিল্পী ও সাহিত্যিক সমাজের। এই দুর্দিনে সেই দায়িত্ব তাঁহারা গ্রহণ করুন।

* * *

আর একটি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের মনে সংশয় জাগিতেছে। কলিকাতাই বাংলা দেশের হৃৎকেন্দ্র। কলিকাতায় আজ যাহা ঘটে, শুধু বাংলা দেশে নয়,

ভারতের সর্বত্র কাল তাহা অনুসৃত হয়। এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি, কিছু দিন হইতে কোন কোন ব্যাপারে যুবসম্প্রদায় নিজেরাই দুষ্কৃতদের শুধু মৌখিক শাসন করিতেছেন না, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়া বসিতেছেন। বিগত কয়েক বৎসর দেশে যে অক্ষম ও পক্ষপাতদুষ্ট শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, জানি, তাহার জন্যই অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা অনেক রাজকীয় অধিকারই স্বহস্তে লইতে বাধ্য হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট হইতে ইহা করা ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না। নিতান্ত আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যে সংঘশক্তি অর্জিত হইয়াছিল, বৎসরকালের প্রয়োগে ও অভ্যাসে তাহা একদিকে যেমন তাঁহাদের আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই তাহা তাঁহাদিগকে শক্তিমদমত্ত ও অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছে। আজ যখন দেশের শাসনভার দেশবাসীর হস্তেই বর্তিয়াছে, তখন অর্জিত সংঘশক্তি সংহৃত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। যাঁহারা দেশবাসীর নির্বাচনে শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণের অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহাদের হাতেই দুষ্কৃতদমনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিলে তাঁহাদের প্রতি সুবিচার হইত। তাঁহাদিগকে সে সময় ও সুযোগ না দিয়াই, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখিতে পাইতেছি, যুবকেরা শাসন, শাসানি ও ব্যক্তিগত বলপ্রয়োগের দ্বারা তাঁহাদের বিচারে যাহারা ব্যবসায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্যায় করিতেছে তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইতেছেন; বয়োধর্মে তাঁহারা যে বিচারে ভুল করিতে পারেন, অথবা তাঁহাদের হস্তক্ষেপের দ্বারা নগরের শাসন-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হইতে পারে—এ কথা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিতেছেন না। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাহারা অপরাধী, তাহাদের শাসনের দায়িত্ব রাষ্ট্রশক্তির উপরেই ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য। তাহারা অক্ষম ও অপারগ হইলে বিপ্লব ও আন্দোলনের সাহায্যে ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে হয়। ১৫ আগস্ট হইতে ১৫ সেপ্টেম্বর মাত্র একমাসকালের মধ্যে বর্তমান শাসনব্যবস্থার চূড়ান্ত পরীক্ষা হইয়া যায় নাই। এমত অবস্থায় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে অথবা মাছের বাজারে মুনাফালোভীদের শাস্তির ব্যবস্থা স্বহস্তে করিতে থাকিলে অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাই প্রশ্রয় পাইবে; কল্যাণ করিতে গিয়া তাঁহারা অকল্যাণই ডাকিয়া আনিবেন। দুষ্কৃতদের সঙ্গে অসহযোগ তাঁহারা সর্বদাই করিতে পারেন।

* * *

বৈদেশিক শাসনের বিপত্ত অপসারণ করিবার কালে তাহার সাধনাই পরম

সাধনা ছিল। সে সাধনায় আমরা অংশত সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। এখন গড়িবার কাল আসিয়াছে। জীবনের সর্ববিভাগে আমাদের দুঃখদুর্দশার অন্ত নাই। মানুষের প্রধান প্রধান প্রয়োজন—অন্ন বস্ত্র ও শিক্ষার অভাবই আমাদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। এখন একান্ত প্রয়োজন শাসনব্যবস্থার সহিত সহযোগিতা করিয়া এই দুর্দশাপঙ্ক হইতে জাতির উদ্ধারসাধন। ইহা না করিয়া যদি প্রারম্ভেই আত্মপ্রতিষ্ঠার হীন চক্রান্ত চতুর্দিকে চলিতে থাকে, এবং দেশ ও জাতির স্বার্থের উপরে দল ও উপদলগত স্বার্থ মাথা চাড়া দিয়া উঠে, তাহা হইলে আমাদের সর্বনাশ ঘটিতে দুইদিনও বিলম্ব হইবে না। এই এক মাসের মধ্যেই এই আত্মঘাতী নীতি কোথাও কোথাও অনুসৃত হইতে দেখিতেছি। যে সকল যুবক সংঘবদ্ধ হইয়া আত্মশক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হইয়াছেন, তাঁহাদের এখন প্রথম ও প্রধান কর্তব্য সাম্প্রদায়িক প্রাদেশিক অথবা দলীয় চক্রান্তের কবল হইতে স্বদেশকে রক্ষা করা এবং সর্বভাবে বর্তমান শাসন-কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা করিয়া সমাজে রাষ্ট্রে শিক্ষাপদ্ধতিতে যে সকল আবর্জনা এতদিন সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার অপসারণে সহায়তা করা। এমনিতেই তাঁহাদের কর্তব্য ও দায়িত্বের অবধি নাই। স্বাধীনতার তোরণদ্বারে উপস্থিত হইয়া রবিনহুড্ অথবা ভবানীপাঠকের ভূমিকা তাঁহারা নাই লইলেন।

—

জননী জন্মভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করিবার সংকল্প লইয়া যে সকল বীর গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিব, দেশের জন্য তাঁহাদের আত্মনিবেদনের আদর্শ আমরা গ্রহণ করিব, তাঁহাদের জীবনী হইতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সংগ্রহ করিব। কিন্তু বর্তমানকে উপেক্ষা করিয়া শুধু অতীতকেই আঁকড়াইয়া ধরিবার প্রবৃত্তি আমরা সমর্থন করিব না। তিন শত পঁয়ষট্টি দিনে তিন শত পঁয়ষট্টি জন শহীদকে লইয়া মাতামাতি করিলে যে উদ্দেশ্যে তাঁহারা জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্যই আমাদের ব্যর্থ হইবে। যুবকেরা দৈনন্দিন কর্তব্য ভুলিয়া প্রত্যহ হাসান-হোসেন করিতে থাকিলে সমস্ত দেশ কারবালায় পরিণত হইবে। ভিন্ন ভিন্ন শহীদের স্বতন্ত্র ভক্তমণ্ডলী সংবাদপত্রে এবং সভায় সভায় মৃত ও অতীতকে লইয়া এমনই সোরগোল তুলিতেছেন যে, মনে হইতেছে, দেশভক্তির পরিবর্তে তাঁহারা গুরুবাদকেই অধিক প্রাধান্য দিতেছেন। যে আদর্শের কাজ ফুরাইয়াছে,

বাধল কি, বেধে তো রয়েইছে, আবার তাড়া করেছে মিলিটারিতে।—ব'লে প্রিয় ঝুপ ক'রে ব'সে পড়ল একটা চেয়ারে।

নরু। দল বেঁধে অ্যাটাক করলে নাকি?

চপলা। পাড়ার ছেলেরা যে বিপদের সময় শাঁখ বাজাতে বলেছিল!

নরু একেবারে খিঁচিয়ে উঠলেন, বাজাতে বললেই বাজাতে হবে! শাঁক শুনে মিলিটারি ঢুকে পড়ুক আর কি! তারপর, যত সব—। ব'লে কিসে একটা হেলান দিতে সেটা ঢুম ক'রে পড়ল এঁদোর গায়ে। দেখা গেল, সেই ইতিমধ্যেই ভগ্ন বেতার-যন্ত্রটি আবার মাটিতে লোটাচ্ছে, ওপরকার কাঠে ধরেছে বড় রকমের ফাট। এঁদো চেঁচিয়ে উঠল, কি ঢুমদাম ক'রে সব ফেলছ? একটু ব'স না চুপ ক'রে। ফায়ার করছে দেখছ না। যেন গলির মধ্যেই হ'ল একটা গুলির শব্দ। চপলা গিয়ে চেপে ধরল প্রিয়তমের হাত, আর এঁদোর মা এঁদো আর নরুর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। খবরের কাগজে পড়া নোয়াখালির খবর শিরশিরিয়ে উঠল চপলার শিরায়। সমাগত ভয়ার্তেরা একেবারে দেয়ালের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। বাড়ির ছাদের ওপরে কাদের যেন হেঁটে চলার শব্দ। গুড়ুম। দুয়োরের কাছে যে লোকগুলো ছিল, তারা চকিতে স'রে আসতেই ঘাড়ে পড়ল ছিনাথ আর কানুর। তারা একটু হেলতেই পড়ল চপলার ঘাড়ে। রক্তহীন চপলার মুখে তবু দেখা গেল অপমানের রক্তিমা। টেবিল ধ'রে ফেলে সমস্ত ঝোঁকটা সামলে নিলে প্রিয়তম। নরু ছিনাথের এই ধৃষ্টতায় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার চোখের দিকে নজর পড়ায় আর সাহস পেলেন না। সে চোখ ঈষৎ রক্তবর্ণ, কিন্তু ভীতিপ্রদ, উজ্জ্বল। পড়ার টাল সামলাতে গিয়ে আলমারির কোণে কি একটা দেখে হাত বাড়িয়ে সেটা তখনই বার ক'রে নিয়ে এল ছিনাথ—মোটা লাঠি একগাছা।

খটাখট খটাখট—ভারী বুটের শব্দের সঙ্গে দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা, সারা ঘরটা যেন কেঁপে উঠল। ছিনাথের হাতে লাঠি যেন কেঁপে ব'সে গেল। চরম অপমান আর সর্বনাশের শঙ্কায় চপলা এত জোরে চেপে ধরলে প্রিয়ের হাত যে, প্রিয়তম 'উঃ' ক'রে উঠল, তবু ব'সেই রইল চেয়ারে। এঁদোর মা কেঁদে ফেললেন, ওগো, কি হবে? আবার এক ধাক্কায় দরজার বল্টু ছিটকে বেরিয়ে গেল; সকলে ছুটল বাড়ির ভিতর দিকে।

বর্তমান আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য সেই পুরাতন আদর্শকেই নানা মনোহারী কথায় তাঁহারা জয়যুক্ত করিতেছেন। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাবশত জীবিতের যাঁহারা অসম্মান করেন, জনপদবাহী নদীকে উপেক্ষা করিয়া পার্বত্যনির্ঝরিণীর গুণগানে পঞ্চমুখ হন, তাঁহারা ভক্ত হইতে পারেন, কিন্তু সত্যসন্ধী নন।

* * *

এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার কারণ এই যে, গত কয়দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত ক্ষুদিরাম, যতীন মুখুজ্জে, যতীন দাস, সন্তোষ মিত্র, তারকেশ্বর সেন প্রভৃতি শহীদদের স্মৃতিসভায় কয়েকজন বজ্রগর্ভ দেশনায়ককে বলিতে শুনিলাম, আমরা কিছুই পাই নাই, আমরা অমুকের আদর্শে বিপ্লব চাই; এস বিপ্লবী তরুণগণ, যাহারা দেশের শাসন-পরিচালন-ক্ষমতা পাইয়াছে, তাহাদিগকে সিংহাসন হইতে টানিয়া নামাইয়া দিই। আমরা শান্তি চাই না, বিপ্লব চাই—ইত্যাদি। পৃথিবীতে মানুষকে লইয়া মতবাদ বা 'কাল্ট্' গড়িয়া উঠিয়াছে এবং 'কাল্টে' 'কাল্টে' বহু সংঘর্ষও হইয়াছে। যাঁহাদের শুধু আদর্শ ও লক্ষ্য ছাড়া পদ্ধতি বা পন্থা কিছুই আজ স্মরণীয় বা কার্যকরী নয়, তাঁহাদের নিকট সমবেতভাবে আমরা প্রণাম নিবেদন করিব এই বলিয়া—

যাহারা শোণিতসিক্ত পদচিহ্নে পথ রচি বিক্ষুব্ধ ধূলায়
উত্তপ্ত বুকের রক্তে মৃতপ্রায়া জননীর করিল তর্পণ,
মানুষের মহালোভ—বাঁচিবার লোভ যারা ত্যজিল হেলায়
নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা অমারাত্রি সার করি কৈল বিসর্জন।
স্বাধীনতা সঁপি দিতে বহু লক্ষ পরাধীন আশাহীন জনে
পথ-কুক্কুরের মত পথে পথে তাড়া খেয়ে ফিরি দীর্ঘদীন,
কেহ বা বরিল কারা—কেহ মৃত্যু, মহোল্লাসে প্রেমআলিঙ্গনে—
জীবনের সর্ব আশা স্বেচ্ছাবৃত অপঘাতে করিল বিলীন।
ক্লেদপঙ্ক সমাকীর্ণ এ তিমিরে তাহারা আলোকবার্তাবহ—
তাহারা জানিয়াছিল দিশাহীন অন্তহীন নহে পারাবার।
ওরে হতভাগ্য দেশ, তাদেরে স্মরণ করি মৃত্যুদীক্ষা লহ,
নবাগত হে সাধক, বিগত সাধকদলে কর নমস্কার॥

কিন্তু তাঁহাদের অবিরত জয়গানে বর্তমানকে আমরা উপেক্ষা বা ক্ষুণ্ণ করিব না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা দেশে কখনও আত্মত্যাগী বীরের

অভাব হয় নাই—প্রয়োজনের সময়ে কখনও অভাব হইবেও না। ১৯৪৬-৪৭-এ যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদের কীর্তিও উপেক্ষণীয় নয়।

* * *

শচীন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ যে কয়জন শেষ আত্মাহুতি দিয়াছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা ও ভিন্ন আদর্শের অনুগামী হইলেও বীরত্বে কাহারও অপেক্ষা কম যান না। তাঁহাদের বীরত্বের সহিতও মহত্ত্ব জড়িত আছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বলিদান দেওয়া বীরের কাজ, তাহার মধ্যে মাদকতা আছে; কিন্তু আত্মবিস্মৃত মানুষের মনুষ্যত্ব পুনঃসংস্থাপনে জীবনদান, মনে হয়, কঠিনতর কাজ। শচীন্দ্র, স্মৃতীশ, সুশীল, বীরেশ্বরেরা মানুষকে হিংসা ও ধর্মোন্মত্ততা হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া প্রাণ দিয়াছেন। যুগ ও যুগনেতার মর্যাদা তাঁহারা পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াছেন।

—

কলিকাতার সাহিত্যিকমহলে দিল্লীতে হায়দারাবাদ প্রেমচাঁদ সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য ভারতীয়-সাহিত্য-সম্মেলন লইয়া বিশেষ সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। আমরাও আমন্ত্রণলিপি পাইয়াছি এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে দেখিতেছি, একটি স্থায়ী নিখিল-ভারতীয়-সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলাই উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদস্যদের আহ্বান করা হইয়াছে, তাঁহারা হিন্দী উর্দু অথবা ইংরেজীতে তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিবেন। বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যিকেরা সমবেত হইবেন, পরস্পর মনের ভাব আদানপ্রদান করিবেন, সকল প্রাদেশিক সাহিত্য সম্বন্ধে সকলে জ্ঞান অর্জন করিবেন, নিখিল-ভারতের ভিত্তিতে ভারতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই; সম্মেলন, মেলামেশা, পরস্পরের অজ্ঞতা নিবারণ নিশ্চয়ই হওয়া চাই; কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ইহাতে সাধিত হইবার নহে। বিভিন্ন ভাষার ভিত্তিতে কখনও এক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান গড়া যায় না; ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য লইয়াও আজ পর্যন্ত এক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি পরস্পরকে পুষ্ট করিতে পারে এবং এই পারস্পরিক পুষ্টি প্রয়োজনও বটে। কিন্তু কাজের বেলায় দেখিতেছি, এক বাংলা সাহিত্যকে ভাঙাইয়া ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি বিপুল পুষ্টিলাভ করিতেছে, ঋণ স্বীকার করিয়া এবং না করিয়া বাংলা সাহিত্যের বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল শরৎচন্দ্র

হইতে মোহন সিরিজের শশধর দত্তকে পর্যন্ত ভাষান্তরিত করা হইয়েছে ; কিন্তু পরিবর্তে বাংলা সাহিত্য সামান্তই লাভবান হইতেছে। বাঙালী সাহিত্যিকেরা এই সম্মেলনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইহার পাল্টা জবাব দিতে পারেন। কিন্তু ইহার জন্ম এক দল বাঙালীকে উর্দু হিন্দী গুজরাটী তামিল তেলেগু ও মারাঠী ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলেই বাঙালীর পক্ষেও এই সম্মেলন সার্থক হইবে।

* * *

অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, সম্মেলনের উদ্যোক্তারা নিমন্ত্রণ-ব্যাপারে শুভ-বুদ্ধির পরিচয় দেন নাই ; অনেক রুই-কাৎলা বাদ পড়িয়াছেন, কিন্তু সফরীরা আহূত হইয়াছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধানতম প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকেও বাদ দেওয়া হইয়াছে। সম্মেলনকে সফল করিতে হইলে এই সকল ভ্রান্তির নিরসন প্রয়োজন। বাংলা দেশ হইতে কাহারা ও কতজন যাইবেন এবং কে কি বলিবেন, তাহা নির্ধারণের ভার বাঙালী সাহিত্যিকদের দ্বারা নির্বাচিত কোনও সমিতির হাতে ছাড়িয়া দিলে ভাল হইত। সম্মেলনের দিন দুইবার পিছাইয়া গিয়াছে, দিল্লীর অবস্থা শান্ত হইবার পর বার বার তিন বারের বার ইহা অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে বাংলা দেশের সাহিত্যিকেরা একযোগে কার্য করিলে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় তাঁহারা ভারতীয় সমাজে সঠিক দিতে পারিবেন, ইতিমধ্যে বাংলা ভাষার দাবিও তাঁহারা স্বীকার করাইয়া লইতে পারিবেন।

ইংরেজের সহিত আমাদের সংগ্রাম সমাপ্ত হইয়াছে, এখন সংগঠন ও জাতি-গঠনের কাজে আমাদিগকে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এই কার্যে সাহিত্যিক ও শিল্পী সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয় শক্তি যদি যথাযথ নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে গঠনের কাজ অনেকটা সহজসাধ্য হইবে। পূর্বে যাত্রা কথকতা পাঁচালী ইত্যাদির সহায়তায় লোকশিক্ষার ব্যবস্থা বাংলা দেশের সর্বত্র প্রচলিত ছিল ; বর্তমানে চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চ সেগুলির স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করিতেছে। সুতরাং দেশ ও জাতি গঠনের কাজে এই দুই প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপকভাবে নিয়োগ করিতে পারিলে জনগণের মনকে সহজেই অধিকার করিতে পারা যাইবে। রঙ্গমঞ্চে ও পরদায় যে সকল নাটক ও চিত্র প্রদর্শিত

হইয়া থাকে, দেশের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেগুলির গঠন ও নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে দশ বৎসরের কাজ এক বৎসরে সম্পন্ন করা সম্ভব। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের কোনও জাতীয় নাট্যশালা নাই। রুশিয়ার জনগণের জাগরণ এত অল্পকালের মধ্যে সম্ভব হইয়াছে জাতীয় রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে। বর্তমান গবর্মেণ্টকে এ বিষয়ে অবিলম্বে তৎপর হইতে হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশের চিন্তানায়কেরা জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণে ও পরিচালনায় যে আশ্চর্য তৎপরতা দেখাইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাসও আমাদের স্মরণীয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয়-নাট্যশালার ইতিহাসে'র সদ্য-প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে) বাংলা দেশের জনসাধারণকে জাতীয়তা-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কি ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার চমৎকার পরিচয় আছে। মধুসূদন, দীনবন্ধু, মনোমোহন, রাজকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকদের সমবেত চেষ্টায় এবং বিশিষ্ট অভিনেতাদের সহযোগিতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালীরা রঙ্গমঞ্চের মধ্যস্থতায় যে ভাবে আত্ম-সচেতনতা লাভ করিয়াছিল, আজ স্বাধীন বাংলা দেশে তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। পূর্বে গবর্মেণ্টের সাহায্য পাওয়া যায় নাই, এখন দেশের গবর্মেণ্টই এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া জনশিক্ষা ও জনকল্যাণের কাজে রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির সহিত জড়াইয়া অবিলম্বে একটি জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব আমরা করিতেছি।

ভবিষ্যতে জাতিভেদপ্রথার সম্পূর্ণ বিলোপসাধনের উদ্দেশ্য লইয়া বর্তমানে উপাধিবর্জনের প্রস্তাবে আমরা সায় দিয়াছিলাম এবং তাহা কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টাও সাধ্যমত করিতেছিলাম। কিন্তু নানা দিক হইতে নানা যুক্তি প্রয়োগ করিয়া উপাধিবর্জনে আপত্তি জানাইয়া পত্রাঘাত আসিতেছিল দেখিয়া আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য এক কমিশন বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এ বিষয়ে আমাদের বিজ্ঞপ্তি গত আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পরেও অনেক পত্র আসিয়াছে, তন্মধ্যে ভাগলপুরের অমূল্যকৃষ্ণ রায়ের পত্রটি উল্লেখযোগ্য। তিনি উপাধির স্থলে পিতৃনাম দিয়া

পরিচয় সম্পূর্ণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যাহা হউক, পাঁচজন চিন্তাশীল বাঙালী মনীষীকে লইয়া গত ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে কমিশন বসিয়াছিল। তাঁহারা নাম প্রকাশে আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহারা উপাধি-বর্জনের বিরুদ্ধে রায় দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, যুক্তপ্রদেশে ও মান্দ্রাজে আইন প্রণয়ন করিয়া যখন জাতিভেদপ্রথা তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে, বাংলা-দেশেও অচিরাৎ অনুরূপ ব্যবস্থা হইবে; ব্যক্তিগতভাবে কাহারও উপাধি-বর্জনের আর প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং যে সকল পত্র আসিয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি বাছিয়া আমরা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিব। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আশ্বিন সংখ্যা হইতে আমরা নামের শেষে আবার উপাধি ব্যবহার করিব।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরিবার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কলিকাতায় আসেন। বাংলার বিপ্লবী-সম্প্রদায়ের সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত তখনই তাঁহাকে দেখিয়া "People's man—জনসাধারণের আপনার লোক" বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। ওই বৎসরের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১৩২২) 'গৃহস্থ' পত্রিকায় তিনি গান্ধীজী সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা আজ আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করিবে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে "মহাত্মা" আখ্যা কে দিয়াছেন, ইহা লইয়া গবেষণা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে "ভারতভাগ্যবিধাতা" হিসাবে প্রথম চিনিয়াছিলেন একজন বাঙালী বিপ্লবী, সে বিষয়ে সংশয় নাই। সতীশবাবুর লেখাটি আমরা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিব।

'শনিবারের চিঠি' আশ্বিন সংখ্যা শারদীয় সংখ্যা-রূপে অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকেই বাহির হইবে। পূজার পর আমাদের কার্তিক সংখ্যা বাহির হইবে।

শনিবারের চিঠি
১৯শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৪

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও গান্ধীজী

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখে মুসলিম-লীগ পাকিস্তান কায়েম করিবার জন্য 'ডিরেক্ট অ্যাকশন' অর্থাৎ যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কায়েদে আজম জিন্নার মতে মুসলমান সমাজ শুধু নৈতিক বলপ্রয়োগের দ্বারা, নিয়মতান্ত্রিক ভাবেই পাকিস্তান লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে কোথাও তাহারা আক্রমণাত্মক কার্য করে নাই, যতটুকু ঘটিয়াছে তাহা শুধু আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে করিতে বাধ্য হইয়াছে। জিন্না সাহেবের উপরোক্ত মতের সত্যাসত্য বিচার করা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল, গান্ধীজী পাকিস্তান সম্পর্কে কি মত পোষণ করিতেন এবং লীগের যুদ্ধঘোষণার দিবস হইতে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্য কি কি কর্মধারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারই বিচার করা। গান্ধীজীর জীবন বা কর্মের দুই দিক হইতে বিচার চলে, এক—নৈতিক, অপর—রাজনৈতিক। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার বিষয়ে তাঁহার প্রস্তাবিত পথের শুধু রাজনৈতিক বিশ্লেষণই করিব।

তোষণনীতি

১৯২১ সালে যখন কংগ্রেস ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন-নিবেদনের পথ ছাড়িয়া সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখনই গান্ধীজীর দৃষ্টি আমাদের জাতীয় রণ-সজ্জার দিকে নিবদ্ধ হইল। সমাজদেহের কোন্ কোন্ স্থানে দুর্বলতা আছে, জাতীয়তাবাদের ঐক্যশৃঙ্খল কোথায় কমজোর থাকার ফলে সংগ্রামের ঘনঘটার সময়ে ছিন্ন হইতে পারে, সেই বিষয়ে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি অনুভব করিলেন যে, হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে যে অনৈক্য রহিয়াছে, হিন্দুসমাজের মধ্যে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের মধ্যে যে সামাজিক ভেদভাব রহিয়াছে, সেই পথে আমাদের বিপদ আসিতে পারে। তাহা ছাড়া অবশ্য আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের চাবিকাঠি রাজশক্তির সম্পূর্ণ করায়ত্ত থাকার ফলে যে কোন সময়ে তাহারা সমগ্র জাতির উপরে অন্নবস্ত্রের অভাবের চাপ দিয়া জাতীয় আন্দোলনকে বিপর্যস্ত করিতে পারে।

জাতীয়তার বর্মে এই সকল সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতার কথা ভাবিয়াই গান্ধীজী অসহযোগ-আন্দোলনের মৌলিক কর্মপন্থার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-স্থাপন এবং অস্পৃশ্যতা-নিবারণকে স্থান দিয়াছিলেন।

মুসলমান-সমাজের প্রতি সহানুভূতি প্রমাণের জন্য তিনি খিলাফৎ-আন্দোলনে যোগদান করেন। ফলে অবশ্য মুসলিম-সমাজও অসহযোগ আন্দোলনে সহযোগিতা করেন। কিন্তু তুর্কিতে মুস্তাফা কমালপাশার অভ্যুদয়ের ফলে যখন খিলাফতের অবসান ঘটিল, তখন ভারতীয় মুসলমান-সমাজও জাতীয় আন্দোলন হইতে ক্রমে পিছাইয়া পড়িলেন।

গান্ধীজীর কল্পিত সহযোগিতালাভ ঘটিল না। উপরন্তু অল্পদিনের মধ্যে দেখা গেল, মুসলমান-সমাজ স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় আর্থিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের চেষ্টা করিতেছে। সমগ্রভারতের মধ্যে দরিদ্র, শোষিত জনগণের নেতৃত্ব করা এক বস্তু, আর স্বীয় সম্প্রদায়কে, প্রয়োজন হইলে অপরের সহিত সহযোগিতা বর্জন করিয়া, উন্নত করা অপর জিনিস। এই প্রচেষ্টার পিছনে ইংরেজ-রাজশক্তির অনুমোদন বা সমর্থন ছিল বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করিতে লাগিলেন। যাহাই হউক, মুসলমান-সমাজের স্বতন্ত্র পদক্ষেপের ফলে জাতীয় অগ্রগতির তাল কাটিয়া যাইতে লাগিল। এমনও আশঙ্কা দেখা দিল যে, সাম্প্রদায়িকতার প্রসারের ফলে জাতির মুক্তি-আন্দোলন হয়তো বা পঙ্গু অথবা নিষ্ফল হইতে পারে।

কংগ্রেস-কর্মীগণ ১৯২১ সাল হইতে মুসলমান এবং দরিদ্র অবহেলিত অস্পৃশ্য সমাজের মধ্যে মিশিয়া জাতীয় ঐক্যের ভাবকে দৃঢ় করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলে ভয়ের কিছু থাকিত না। কিন্তু সে চেষ্টা কর্মীগণের পক্ষে মনের বাধার জন্য সম্ভব হয় নাই। তথাকথিত সমাজসংস্কার অপেক্ষা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকেই অধিকাংশ কর্মী প্রাধান্য দিয়াছিলেন। গান্ধীজীকে সেইজন্য মুসলমান-সমাজের নিকট জাতীয় আন্দোলনে সহযোগিতা লাভের আশা ছাড়িয়া অন্তত তাহাদের বিরোধিতা নিবারণের জন্য বার বার চেষ্টা করিতে হইয়াছে। ফলে তিনি বার বার মুসলিম-লীগের দাবির নিকটে নতি স্বীকার করিয়াছেন। ইহাকে তোষণনীতিও বলা চলে।

কেহ কেহ মনে করেন, মুসলমান যখন আসিল না, তখন ইংরেজের সঙ্গে তাহাকেও জাতির শত্রু ভাবিয়া সংগ্রামের পথে অগ্রসর হওয়াই তো উচিত ছিল। কিন্তু গান্ধীজী ভারতবর্ষের জনশক্তির সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া দুই বিভিন্ন রণাঙ্গনে একই কালে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা তিনি সমীচীন মনে করেন নাই। সেইজন্য মুসলিম-লীগকে

অন্তত বিরুদ্ধভাবাপন্ন না রাখিয়া নিষ্ক্রিয় করিবার চেষ্টায় তিনি অনেক দাবিই ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন সন্দেহ নাই। সকল ক্ষেত্রেই তিনি একটি শর্ত রাখিতেন। অধিকারলাভের পরিবর্তে মুসলমান-সমাজ কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে না হইলেও অন্তত নৈতিক সমর্থন দান করুক। এই মৌলিক দাবি তিনি তোষণনীতির মধ্যেও একবারও কখনও ভুলিয়া যান নাই।

গান্ধীজী চিরদিনের মত আজও ভারতের ঐক্যে বিশ্বাস করেন, অথচ গণতন্ত্রের উপরেও তাঁহার অবিচল বিশ্বাস আছে। গান্ধীজীর কাছে নাই পাইয়া শেষ পর্যন্ত যখন লীগের দাবি পাকিস্তান অর্থাৎ মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি পর্যন্ত পৌঁছিল, তখনই গান্ধীজীর সম্মুখে ঘোর সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। গণতন্ত্রের দৃষ্টি লইয়া গান্ধীজী বলিলেন, ভারতবর্ষের কোনও অংশের অধিবাসী যদি ভারতরাষ্ট্রে থাকিতে অনিচ্ছুক হয়, তবে জোর করিয়া তিনি তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে প্রস্তুত নয়। ভারতের ব্যবচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটে ঘটুক, কিন্তু কয়েকটি শর্তের অধীনে সেই ব্যবচ্ছেদ সংঘটিত হইবে।

গান্ধীজী পাকিস্তানের দাবি স্বীকার করিবার পথে কতদূর পর্যন্ত যাইতে প্রস্তুত ছিলেন, তাহা রাজাজীর উদ্ভাবিত প্রস্তাবে দেখা যায়। সেই প্রস্তাবেও কয়েকটি মৌলিক নীতি বিসর্জন দেওয়া হয় নাই। রাজাজীর প্রস্তাবে বলা হয়, ইংরেজ যখন সম্পূর্ণ শাসনভার ভারতবাসীর অধিকারে ছাড়িয়া দিবে, তখনই ভারতব্যবচ্ছেদের সম্পর্কে বিবেচনা করার সময় আসিবে। দ্বিতীয়, কোন্ কোন্ অংশ বিচ্ছিন্ন করা হইবে, তাহা পূর্বে এক কমিশনের দ্বারা আপাতত নির্ণয় করিয়া পরে সেই স্থানের সকল অধিবাসীর ভোটগ্রহণের দ্বারা শেষনিষ্পন্ন হইবে। ভারতের বিভক্ত দুই রাষ্ট্রের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে সহযোগিতার বন্ধন কখনও ছিন্ন করা হইবে না। কিন্তু ইহার মূল্যস্বরূপ আজ, যখন ইংরেজ যায় নাই, তখন মুসলিম-লীগকে কংগ্রেসের সহিত স্বাধীনতার দাবিকে সমভাবে সমর্থন করিতে হইবে। রাজাজীর প্রস্তাবটি সমগ্রভাবে পাঠ করিলে পাঠক বিচার করিয়া বুঝিতে পারিবেন, পাকিস্তানের দাবিকে গান্ধীজী ঠিক কতদূর পর্যন্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন।

(1) Subject to the terms set out below as regards the constitution of Free India, the Muslim League endorses the Indian demand for Independence and will co-operate with the Congress in the formation of a Provisional Interim Government for the transitional period.

(2) After the termination of the war, a commission shall be appointe for demarcating contiguous districts in the North-West and East of Indi wherein the Muslim population is in absolute majority. In the areas thu demarcated, a plebiscite of all the inhabitants held on the basis of adu suffrage or other practicable franchise shall ultimately decide the issue (separation from Hindustan. If the majority decide in favour of forming sovereign State separate from Hindustan, such decision shall be given effe to, without prejudice to the right of districts on the border to choose to joi either State.

(3) It will be open to all parties to advocate their points of view befor the plebiscite is held.

(4) In the event of separation, mutual agreements shall be entered int for safeguarding Defence, and Commerce and Communications and for othe essential purposes.

(5) Any transfer of population shall only be on an absolutely voluntar basis.

(6) These terms shall be binding only in case of transfer by Britain o full power and responsibility for the governance of Indfa.

কংগ্রেস রাজাজীর প্রস্তাব গ্রহণ না করিলেও গান্ধীজী ইহাকে সমর্থন করেন। ইংরেজরাজশক্তি যতক্ষণ ভারতে আছে, ততক্ষণ হিন্দু-মুসলমানের যে সম্পর্ক, ভারতশাসনের ভার সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীর করায়ত্ত হইলে সেই সম্পর্ক রূপান্তরিত হইবার ষোল আনা সম্ভাবনা। এইজন্যই গান্ধীজী ইংরেজের সহিত সংগ্রামের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আপোসে ভারতব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হন নাই। রাজাজীর প্রস্তাবে শেষ দফায় স্পষ্ট বলা হইয়াছিল. সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা ভারতীয়গণের নিকট হস্তান্তরিত হওয়ার পরই ভারতবিভাগ সম্পর্কিত শর্তগুলি কার্যকরী হইবে।

যাহাই হউক, জিন্না সাহেব উপরোক্ত প্রস্তাব স্বীকার করিতে পারিলেন না। গান্ধীজীর পক্ষ হইতেও তোষণনীতি ঊর্ধ্বতম ধাপে আসিয়া থামিয়া গেল।

নোয়াখালি

১৯৪৬-এর আগস্ট মাসে মুসলিম-লীগের 'ডিরেক্ট অ্যাকশন' শুরু হইয়া গেল। প্রথমে কলিকাতা, তাহার পর নোয়াখালি এবং উভয়ের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিহারে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। গান্ধীজী যখন নোয়াখালিযাত্রার জন্য কলিকাতায় পৌঁছিলেন, তখনই বিহারের সংবাদ তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ

রিয়াছে। তিনি কিন্তু পূর্বব্যবস্থা ভঙ্গ না করিয়া ৭ই নভেম্বর ১৯৪৬ নোয়াখালি জেলায় উপস্থিত হইলেন।

রাজনীতির দৃষ্টিতে গান্ধীজী পূর্ববঙ্গের হিন্দু এবং মুসলমানকে যে উপদেশ দিলেন, এইবার তাহার বিশ্লেষণ করা যাক। নোয়াখালি জেলায় হিন্দুর প্রাণ অপেক্ষা সম্পত্তি এবং মানমর্যাদা ও ধর্মের উপরেই বেশি আঘাত লাগিয়াছিল। মুসলমান-জনতার মধ্যে এই ভাব প্রবলভাবে দেখা গিয়াছিল যে, পাকিস্তানে হিন্দুর ধর্মের বা আচার-ব্যবহারের কোনও স্থান থাকিবে না, এখানে ইসলাম এবং মুসলিম সংস্কৃতিরই একচ্ছত্র আধিপত্য থাকিবে। এই অবস্থান্তর ঘটাইবার জন্য মুসলমান-সম্প্রদায় যে আক্রমণ করে, তাহার ফলে ধনী অথবা দরিদ্র হিন্দু কেহই নিস্তার পায় নাই। প্রাণের ভয়ে গ্রামের পর গ্রাম হিন্দু ধর্মান্তরগ্রহণ করিয়াছিল।

গান্ধীজী উপদ্রুত অঞ্চলে গ্রামগুলি পরিভ্রমণের সময়ে পরামর্শ দিলেন, উপরোক্ত অবস্থা না হিন্দুর না মুসলমানের পক্ষে ভাব। কিন্তু মুক্তির উপায় কি? গান্ধীজীর মতে হিন্দুর পক্ষে এই সংকল্প গ্রহণ করা উচিত যে, শত অত্যাচারেও তাহারা নোয়াখালি হইতে পলাইয়া যাইবে না, নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি পরিত্যাগ করিবে না। মৃত্যুপণ করিয়াও মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে, তবু পশুবলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে না।

অবশ্য প্রশ্ন উঠিতে পারে, যাহাদের পক্ষে স্ত্রীপুত্র লইয়া এরূপ বীরত্ব সম্ভব নয়, যাহারা মরিতে চায় না, অথবা যাহারা অন্তত মারিয়া মরিতে চায়, তাহাদের বেলাতেও কি গান্ধীজী একই উপদেশ দিবেন? দীর্ঘদিন নোয়াখালি পরিভ্রমণের মধ্যে অসংখ্য বক্তৃতায় ও বহুজনের সঙ্গে আলোচনাকালে গান্ধীজী যাহা বলিলেন, তাহা এই। তিনি বলিলেন, যাহারা টিঁকিয়া থাকা সম্ভব মনে করে না, তাহারা নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাক। যদি সকলে শেষ পর্যন্ত চলিয়া যাওয়াই স্থির করে, বা গবর্মেণ্টের চাপে বাধ্য হয়, তবু তিনি একা হিন্দু সংস্কৃতির প্রতিনিধি হইয়াও নোয়াখালিতে থাকিয়া যাইবেন। আর মারিয়া মরিবার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইহার ফলে যে অস্ত্রহীন তাহার হৃদয়ে তো সাহস সঞ্চারিত হইবে না। উপরন্তু যে বহ্নি আজ বিহার নোয়াখালি অথবা কলিকাতায় সীমাবদ্ধ হইয়া আছে, ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে তাহা ক্রমে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে হৃতবল এবং পঙ্গু করিয়া

কোনও ভয় নেই, মিলিটারি।—ব'লেই এঁদো হঠাৎ কাঠের খিল ভাঙবার আগেই দুয়োর দিল খুলে। জনকয়েক সৈন্য উদগ্র বেয়নেট নিয়ে ঢুকে 'হে আর অল কংগ্রেস-মেন। ডাউন উইথ দেম' ব'লে জমাট ভয়ার্তদের দিকে এগিয়ে গেল সোজা।

এঁদো বুক ফুলিয়ে ব'লে উঠল, উই আর কম্যুনিস্ট্‌স্‌, নো কংগ্রেস-মেন।

কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই বন্দুকের কুঁদোর এক ধাক্কায় সে পড়ল নরুর কাঁধে। আর চেয়ার উলটে নরু গড়িয়ে গেলেন ছিনাথের পায়ের কাছে, যেন তাকেই মিনতি করছেন বাঁচাবার জন্যে। নরুর আড়াল স'রে যেতেই সৈন্যদলের প্রলুব্ধ দৃষ্টি পড়ল গিয়ে চপলার ওপর। হিয়ার'স এ পাখ।—ব'লে জন দুই তার দিকে হাত বাড়াতেই এঁদোর মা 'ও মা!' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠে মেয়েকে গিয়ে ধরলেন জড়িয়ে। চপলার চোখ নিষ্পলক। নরু উঠে এসে 'হাউ ডেয়ার ইউ—' ব'লে আরম্ভ করতেই আবার আঘাতে প'ড়ে গেলেন। ধাক্কা মেরে চপলার মাকে ফেলে দিতেই ঘরের ভয়ার্তেরা খোলা দরজা দিয়ে ছুটে পালাল যে যেদিকে পারলে। এঁদোর মাথার রক্ত আর সৈন্যদের আলিঙ্গনব্যগ্র বাহু দেখে প্রিয়তমকে প্রাণপণ আলিঙ্গনে চেপে ধরলে চপলা। একজন সৈনিকের এক চড়ে প্রিয়তমের ঘোর কেটে যেতেই সে নিজেকে চপলার আকুল বাহুবেষ্টন থেকে মুক্ত করার চেষ্টায় এলোপাথাড়ি হাত পা ছুঁড়তে লাগল। আর চপলার হাত ধ'রে দিলে টান রাজার সৈনিক। এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল ছিনাথ আর কানু। ছিনাথের হাতের মোটা লাঠি এসে পড়ল লোলুপ সৈনিকের ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ-রক্ষিত মাথার ওপর, আর কানুর ক্ষীণ মুঠির এক প্রহারে আর একজনও পড়ল ব'সে। ছুটল গুলি রিভলভারের। আর সইতে না পেরে নরু চেতনা হারালেন। ছিনাথের হাত ক্ষণেকেই রক্তে ভেসে গেল।

হি ইজ এ হিন্দু গুণ্ডা।—ব'লে সব সৈনিক তখন ছিনাথের আহত দেহখানাকে নিয়ে গেল গ্রেপ্তার ক'রে। কানুকে পেছনে আসতে দেখে তাকেও তারা সাদরে সঙ্গে নিলে।

অনাহত চপলা আর ঈষদাহত প্রিয়তম। বাকি সকলের আঘাত গুরুতর। প্রিয়তম গিয়ে দরজায় লাগিয়ে দিয়ে এল খিল।

উঃ!—ব'লে চপলা নিজেকে ঝাড়া দিয়ে নিয়ে বাড়ির মধ্যে থেকে কুঁজো-ভরতি জল নিয়ে এসে সকলের চোখে মুখে ছিটিয়ে দিয়ে বৈদ্যুত পাখা

দিবে। অতএব রাজনৈতিক দূরদর্শিতাবশতই তিনি বলিলেন, হিন্দুসমাজকে ধর্ম-সংস্কৃতির স্বাধীনতারক্ষার জন্য অহিংস বীর্যের দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে হইবে। যদি অহিংসবীর্যসমন্বিত মানুষ অল্পসংখ্যায়ও মৃত্যুবরণ করে, তাহাদের ত্যাগের মহিমায় সমগ্র সমাজে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইবে।

গান্ধীজীর দৃঢ় পণ ছিল, ইংরেজ যখন শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা স্থির করিয়াছে, তখন ওই তারিখের মধ্যে, অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতের মাটিতে থাকাকালীন, আমরা কিছুতেই ভারত-ব্যবচ্ছেদে রাজি হইব না। দুর্ভাগ্যবশত পাকিস্তান এবং অখণ্ড ভারতরক্ষার সংগ্রাম সম্মুখসমরের রূপ না লইয়া হীন গুপ্তহত্যা এবং ততোধিক ঘৃণ্য পদবীতে অবরোহণ করিল। তখন কংগ্রেস অসহিষ্ণু হইয়া ভারতব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবে স্বীকৃতি জানাইলেন। কেবল তাঁহারা বলিলেন, ব্যবচ্ছেদ যদি ঘটেই, তবে পঞ্জাব এবং বঙ্গদেশের মধ্যেও হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পৃথক করিয়া হিন্দু অঞ্চলকে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হউক।

পাকিস্তান

কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, জিন্না সাহেব খণ্ডিত পাকিস্তানের প্রস্তাবে রাজি হইবেন না। কিন্তু সকলের আশা ভঙ্গ করিয়া জিন্না সাহেবের নেতৃত্বে মুসলিম-লীগ সর্বসম্মতিক্রমে খণ্ডিত পাকিস্থানের ভিত্তিতে ভারতব্যবচ্ছেদ মানিয়া লইলেন।

কংগ্রেসের পক্ষে পরাজয় ঘটিল। সংগ্রামশক্তির ক্ষীণতার জন্য তাঁহারা একই কালে ইংরেজ এবং সম্প্রদায়িক বিরোধরূপ দুই রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতে পারিবেন না বলিয়া যে তোষণনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহারই চরম পরিণতিস্বরূপ ইংরেজ থাকিতে থাকিতেই ভারতব্যবচ্ছেদ স্বীকার করিয়া লইতে হইল। মুসলিম-লীগের পক্ষে পরাজয় হইল, তাঁহারা খণ্ডিত পাকিস্তান লাভ করিলেন। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের যুদ্ধঘোষণার কারণস্বরূপ যে বলা হইয়াছিল, হিন্দু এবং মুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি হওয়ায় এক রাষ্ট্রে থাকিতে পারে না, আজ নূতন রাষ্ট্ররচনার ফলে সেই মতবাদকেও একদিক দিয়া পরিহার করিতে হইল। স্বয়ং জিন্না সাহেবই ঘোষণা করিলেন, পাকিস্তানে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রজা সমান স্বাধীনতার অধিকারী হইবে। অবশ্য ভারতবর্ষ তো চিরদিনই এই অধিকার সর্বজনের জন্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান, উভয় রাষ্ট্রই একটি ব্যাপারে জয়লাভ করিল। ইংরেজের শাসনশৃঙ্খল হইতে উভয় রাষ্ট্রই মুক্তিলাভ করিল।

কলিকাতা

স্বাধীনতার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী স্থির করিলেন, ১৫ই আগস্ট, অর্থাৎ যে দিন ইংরেজের শাসনভার আইনত মোচন হইবে, সেই দিন তাঁহার পক্ষে নোয়াখালিতে থাকাই প্রয়োজন। ইতিমধ্যে তিনি সাম্প্রদায়িক দুর্যোগ শান্ত করিবার চেষ্টায় বিহার, দিল্লী এবং পাঞ্জাবে ভ্রমণ করিয়া দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি অনুভব করিলেন, পূর্ববঙ্গকে অর্থাৎ পাকিস্তানকে যদি সত্যসত্যই মানবস্বাধীনতার ক্রীড়াভূমিতে পরিণত করিতে হয়, তবে আবার তাঁহাকে নোয়াখালিতে গিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুর নিকট মৃত্যুঞ্জয়ী অহিংসবীর্যের বাণী প্রচার করিতে হইবে। সেই সংকল্প লইয়াই তিনি ৯ই আগস্ট ১৯৪৭ কলিকাতায় পুনরায় পদার্পণ করেন।

কলিকাতা শহরে তখন পাকিস্তান সংগ্রাম ও তাহার প্রতিক্রিয়ার জের চলিতেছে। শহরের মধ্যে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান দুইটি বিভাগ স্পষ্ট দেখা দিয়াছে। এক অঞ্চলের অধিবাসী অপর অঞ্চলে যায় না, একদিকের মোটর-বাস অপর দিক দিয়া চলাফেরা করে না। সমগ্র শহরবাসীর ব্যবসায় বা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গতি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

গান্ধীজী অনুভব করিলেন, যে-সাম্প্রদায়িক বিষ লীগের 'ডিরেক্ট অ্যাক্শনে'র ফলে সারা ভারতবর্ষকে এক বৎসর জর্জরিত করিয়াছে, যাহা হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য কংগ্রেস, লীগ এবং শিখ প্রতিনিধিগণ ব্যবচ্ছেদ পর্যন্ত মানিয়া লইয়াছেন, তাহা যদি আরও অপ্রতিহতভাবে চলিতে থাকে, তবে শুধু একটি হিন্দুস্থান ও দুই খণ্ড পাকিস্তানের পরিবর্তে ক্রমে ক্রমে প্রতি প্রদেশে, প্রতি নগরে এবং প্রতি গ্রামে কলিকাতা শহরের খণ্ডনফলের মত অবশেষে অসংখ্য হিন্দুস্থান এবং অসংখ্য পাকিস্তান ছড়াইয়া পড়িবে। যে কুষ্ঠব্যাধি আজ দেহের শুধু দুই প্রান্তকে আক্রমণ করিয়াছে, সেই মনের বিষকে যদি ক্রতচিকিৎসার দ্বারা আমরা স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রে আবদ্ধ করিতে না পারি, তবে দেহের প্রতি অঙ্গে, প্রতি লোমকূপকে পর্যন্ত আক্রমণ করিয়া তাহা আমাদের পঙ্গু করিয়া ফেলিবে। ফলে আমাদের স্বাধীনতা ভোজবাজির মত চক্ষের নিমিষে বিলীন হইয়া যাইবে।

এইজন্য কলিকাতায় একমাসব্যাপী বক্তৃতায় গান্ধীজী বারংবার এই কথাই বলিয়াছেন, আজ যখন আমরা ভারত-ব্যবচ্ছেদ মানিয়া দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে সমর্থ হইয়াছি, তখন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, উভয়ের সহযোগিতার দ্বারা কত দ্রুত আমরা দুইটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে পারি। সে রাষ্ট্র এমন হইবে, যেখানে হিন্দু বা মুসলমান নিজেকে হিন্দু অথবা মুসলমান বলিয়া ভাবিবে না। নিজের ঘরে, মন্দিরে, মসজিদে তাহারা হিন্দু বা মুসলমান থাকুক; কিন্তু রাষ্ট্রের সম্মুখে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, অর্থনীতির জগতে কোনও ভেদাভেদ থাকিবে না; সকলে সমান আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত নাগরিকের সম্মান লাভ করিবে।

এই আদর্শের অভিমুখে আমাদের সকল দৃষ্টি, সর্ববিধ প্রচেষ্টা পর্যবসিত হউক —ইহাই গান্ধীজীর প্রার্থনা। আজ তাই গান্ধীজী রাষ্ট্রশক্তিকে এবং রাষ্ট্রের প্রজার মনকে এই আদর্শে পরিচালিত করিবার চেষ্টা মরণপণ করিয়াও করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস, যদি ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র এই নূতন সুরে বাঁধা হয়, উভয় দেশের হিন্দু-মুসলমান যদি নবজীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, যদি উভয় দেশ শত্রুতার ভাব মোচন করিয়া বন্ধুত্বের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সহযোগিতার বন্ধনে উভয়ের পক্ষে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হইতে পারে। যদি দুই দেহ এক নাও হয়, তবু একমন একপ্রাণ হইয়া জগৎসমাজে চলিতে থাকিলে ভারত-ব্যবচ্ছেদের দরুণ যে ক্ষতি আমাদের ঘটিয়াছে, তাহার দোষ অনেকাংশে নিরাকরণ করা সম্ভব হইবে।

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

পাঠক বলিবেন, বেশ, রাজনীতিক দূরদর্শিতা লইয়া আমরা না হয় চলিলাম, কিন্তু পাকিস্তানও যে সুপথে চলিবে, ইহার স্থিরতা কোথায়? উত্তরে গান্ধীজী বলিবেন, অপরের পায়ের ছন্দ দেখিয়া আমার ছন্দ স্থির করিতে হইবে কেন? যদি মনে করি, এই পথ মানবের পক্ষে কল্যাণের পথ, তাহা হইলে আমার সাধ্য এবং শক্তি অনুযায়ী আমাকে সে পথে চলিতেই হইবে। আমার পক্ষে অপর পথ, অথবা চলার জন্য স্বতন্ত্র ছন্দ তো কখনও হইতে পারে না।

ভবিষ্যৎভারত-গঠনের যে স্বপ্ন গান্ধীজী দেখেন, তাহার জন্য একটি কর্ম-ধারাও তাঁহার কল্পনায় আছে। গত এক বৎসরের সাম্প্রদায়িক বিষে সকলের মন জর্জরিত হইয়া আছে। শুধু 'ভুলিয়া যাও' বলিলেই মানুষ ভুলিতে পারে না।

আজ ভারতবর্ষে অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব। এই অভাব মিটাইবার দুইটি উপায় আছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের যে রাষ্ট্র গঠিত হইতেছে, সেই রাষ্ট্র দেশের যথাযোগ্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করিয়া বড় বড় কলকারখানার সাহায্যে অভাব মোচন করিতে পারে। কিন্তু যদি এই কাজে গবর্মেণ্টের বিলম্ব হয়, তবে কি সাধারণ প্রজা হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে? অপর দেশের কাছে ক্রয়-করা কলকারখানার অভাবে নগ্নদেহে দিনযাপন করিবে? অপরের দানের অপেক্ষায় থাকিবে, খাদ্য আমদানি না হইলে অনাহারে দেহত্যাগ করিবে?

গান্ধীজী মনে করেন, মানুষ স্বীয় চেষ্টার দ্বারা আজও ভারতবর্ষে বাঁচিয়া থাকিবার মত অন্ন এবং বস্ত্র উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে। যদি চরকা-খদ্দর এবং গ্রামে শাকপাতা, ফলমূলের নূতন ধরনের চাষের ফলে আমরা পয়সার ক্ষুধা না মিটাইয়া, দেহের ক্ষুধা মেটানোর চেষ্টা করি এবং সেই চেষ্টা যদি সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তবে অন্ন এবং বস্ত্রযজ্ঞের সাধনায় ভারতবর্ষের মানুষের চরিত্র সম্পূর্ণ নূতন রূপ ধারণ করিবে। ধনতান্ত্রিক প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবন, গ্রামের সংঘশক্তি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়াছিল। আজ নবজীবনগঠনের চেষ্টায়, অর্থাৎ জনসাধারণ যখন স্বীয় বাহুবল এবং বুদ্ধিবলকে সুপথে পরিচালিত করিয়া, রাষ্ট্রের অপেক্ষা না রাখিয়া, অর্থনৈতিক মুক্তির আশায় কর্মময় ব্রত অবলম্বন করিবে, তখন সাম্প্রদায়িকতার ফলে যে বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে, অপরকে বঞ্চিত করিয়া স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির দিকে যে ঝোঁক মানুষের মনকে ছাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা আর্থিক সমসমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টার ফলে মুছিয়া যাইবে, সমাজ নূতন দেহ নূতন স্বাস্থ্য নূতন জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

অথচ মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক বিষের উদ্গীরণ ক্ষেত্রবিশেষে ঘটিতেও তো পারে, তাহা নিরাকরণের উপায় কি? গান্ধীজী সেজন্য গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী, শচীন্দ্রনাথ মিত্র, স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা বীরেশ্বর ঘোষের মত সত্যাগ্রহীর উপরে নির্ভর করেন। মানুষ যেখানে উন্মত্ত, যেখানে সে নিজের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ, সাম্প্রদায়িক আত্মরক্ষাকেই একমাত্র পথ বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছে, সেখানে যদি প্রকৃত সত্যাগ্রহী তাহার সম্মুখে যায়, সত্য কথা বলে, 'মানুষের মনুষ্যত্ব বাঁচিলে তবে সকলে বাঁচিব'—এই কথা যদি শোনায়, তবেই

শুধু সমাজের শুভশক্তি জাগ্রত, উদ্দীপিত হইয়া অশুভ শক্তিকে কোণঠাসা অর্থাৎ সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইবে।

ইতিমধ্যে যদি অন্নবস্ত্রের উৎপাদন এবং বণ্টনের আয়োজন বুদ্ধিযুক্ত, দৃঢ় এবং ব্যাপক প্রচেষ্টার দ্বারা আয়ত্তে আনা যায়, তাহা হইলে সুস্থ পথে মানুষের কর্ম প্রবাহিত হওয়ার ফলে, হয়তো আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা প্রকৃত স্ব-রাজে পরিণত হইবে; যে অবস্থায় মানুষ শুধু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নয়, অর্থ ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও সমান মর্যাদার অধিকারী হয়; যখন বাধ্যতা বা দণ্ডমূলক রাষ্ট্রের শাসনে জীবনের সকল নিয়ন্ত্রণভার না থাকিয়া স্বেচ্ছামূলক, লোকায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই সমাজের সকল কাজ সুস্থভাবে চলিতে থাকে।

গান্ধীজীর মতে ইহাই পথ, কল্যাণের অপর কোনও পথ নাই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪০—১৯২৬

জন্ম: বংশ-পরিচয়

কলিকাতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জন্ম-তারিখ—২৯ ফাল্গুন ১৭৬১ শক (১১ মার্চ ১৮৪০)। এই তারিখ তাঁহার জন্ম-পত্রিকা হইতে গৃহীত।

বাল্যশিক্ষা

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে স্মৃতিকথায় যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"ইস্কুল-কলেজের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব অল্প। লেখাপড়া বাড়ীতেই করিতাম। কিছু দিন বাঙ্গালা পড়িয়া একেবারে সংস্কৃত মুগ্ধবোধ আরম্ভ করিয়া দিলাম। তখন ছোট ছোট ছেলেদের পড়িবার উপযোগী বাঙ্গলা বই বড় বেশী ছিল না। একখানা বইয়ের নাম আমার মনে আছে, 'নীতিকথা'। বাড়ীতে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়িতাম। ক্রমশঃ মুগ্ধবোধ পার হইয়া রঘুবংশ, কুমারসম্ভব শেষ করিলাম। আর বাড়ীতে বেশী দূর

অগ্রসর হওয়া গেল না। স্কলার্শিপ পরীক্ষা দিবার জন্য লেখা-পড়া করা, ইহা আমার কখনই ভাল লাগিত না। দুই বছর সেণ্ট্ পল্স্ ইস্কুলে পড়া হইল। স্কলার্শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজের তখন কি নাম ছিল* মনে নাই; যাহা হৌক সেই কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ হইল। পাস করিবার জন্য পড়িতে হইবে, এ আমি কিছুতেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ইতিহাসের পুস্তকখানা এত নীরস ছিল, সেই বইখানার একটি পাতাও উল্টাইয়া দেখিলাম না। অঙ্ক আমার ভাল লাগিত; কিন্তু ক্লাসের বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে অঙ্ক কসা ও গণিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার ভাল লাগিত Trigonometry ও Mensuration; বাড়ীতে ইচ্ছামত আমি তাহাই আলোচনা করিতাম। মেটকাফ্ হল্ হইতে যত ইচ্ছা বই লইতে পারিতাম; কারণ ঐ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার সময় আমাদের বাড়ী হইতে অনেক টাকা দেওয়া হইয়াছিল।... আমার যাহা ভাল লাগিত, আমি তাহা বাড়ীতে বসিয়া পড়িতাম; হয়ত কোন-কোনও দিন স্কুল কামাই করিতাম।...কিন্তু কলেজের পড়া একেবারে না করিয়া পরীক্ষা দিয়া উপরের ক্লাসে উঠা দুষ্কর। বাঙ্গালার অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র আমাকে বাঙ্গালায় বেশী নম্বর দিয়া সে যাত্রা উদ্ধার করিলেন।... কিন্তু পুনরায় বাৎসরিক পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে কলেজ পরিত্যাগ করিলাম। উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় কলেজে আমার সতীর্থ ছিলেন। আর একজন আমার সহপাঠী ছিলেন,—রমেশচন্দ্র মিত্র। সিপাহী বিদ্রোহের বছর দুই পূর্ব্বে আমি কলেজ ত্যাগ করিলাম।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্য্যায়)

বিবাহ

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮ বৎসর বয়সে, দ্বিজেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। পাত্রী—যশোহর নরেন্দ্রপুর-নিবাসী তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর কন্যা সর্বসুন্দরী দেবী। পরবর্তী ১৩ই ফেব্রুয়ারি 'সংবাদ প্রভাকর' এই বিবাহ প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন:—

"মহামান্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সিমুলা হইতে লাহোরে

---

* হিন্দুকলেজ। ১৫ জুন ১৮৫৫ তারিখে হিন্দুকলেজ উঠিয়া গিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুল—এই দুইটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। হিন্দু-স্কুল প্রেসিডেন্সী কলেজের অধীন থাকে।

আসিয়াছেন। আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, তিনি তথা হইতে অবিলম্বে এতন্নগরে প্রত্যাগমন করিবেন।

গত শনিবার [৬ ফেব্রুয়ারি] রাত্রিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের এবং রবিবার রাত্রিতে ভ্রাতৃপুত্রের [গণেন্দ্রনাথের] শুভবিবাহকার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সুনির্ব্বাহ হইয়াছে। সুবিখ্যাত সর্ব্বগুণজ্ঞ ধাম্মিকবর শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর মহাশয় তথা বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই মাঙ্গলিক কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ বাবু এতৎকর্ম্মে স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে আরো অধিক সুখের বিষয় হইত।"

প্রাথমিক রচনা

বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষার প্রতি দ্বিজেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। তিনি কবিতা রচনা করিতে ভালবাসিতেন; চিত্রাঙ্কনেও তাঁহার বিলক্ষণ ঝোঁক ছিল। তাঁহার স্মৃতিকথায় প্রকাশ :—

"আগে বরাবর আমি বাঙ্গালা কবিতা লিখিতাম। কবিতা রচনার দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল; তার মধ্যে হয়ত হাল্‌কা রকমের রঙ্গরসের কবিতাও ছিল। বাল্যকাল হইতে ছবি আঁকার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম; আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল আমি painter চিত্রকর হইব; কিন্তু ভাল করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করার অভাবে আমার সাধ পূর্ণ হইল না।"

সত্যেন্দ্রনাথ 'আমার বাল্যকথা...' গ্রন্থে অগ্রজের প্রাথমিক রচনার কিছু কিছু নিদর্শন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন :—

"আমি যে পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করতুম বড়দাদা তার কাছে পড়তেন না,—তাঁর সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন রামনারায়ণ পণ্ডিত, 'বহুবিবাহ' নাটক রচয়িতা। তাঁর শিক্ষাগুণে বড়দাদা সংস্কৃতকাব্যে শীঘ্রই ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত পদ্যে একটি কলিকাতা বর্ণনা আছে সে তাঁর সেই সময়কার রচনা।...বড়দাদা সংস্কৃত ছন্দে অনেক বাঙলা কবিতা রচনা করেছেন, তার কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি :—

প্রভাত বর্ণনা।

বৃক্ষগণ হেলিত সুশীতল সমীরণে,
পুষ্প যত প্রস্ফুটিত পুষ্পময় কাননে।

মত্ত মধুপায়িদল আইল ত্বরা করি,
জাগিল বিহঙ্গকুল ভাগিল বিভাবরী।
ইঙ্গবঙ্গের বিলাত যাত্রা।
বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে,
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন বশে কিছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি পিরহনে মান রয় না।১
পিতা মাতা ভ্রাতা নব শিশু অনাথা ছুট করি,
বিরাজে জাহাজে বসি মলিন কুর্তা বুট পরি,
সিগারে উদ্গারে মুহুর মুহু ধূমলহরী
সুখ স্বপ্নে আপ্নে মুলুকপতি মানে হরি হরি।২
বিহারে নীহারে বিবিজন সনে স্কেটিঙ করি,
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।
ফিমেলে ফিমেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে,
কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেব গিরিতে।৩
ফিরে এসে দেশে গল কলর বেশে হটহটে,
গৃহে ঢোকে রোখে উলগতনু দেখে বড় চটে,
মহা আড়ী সাড়ী শিরখি চুলদাড়ী সব ছিঁড়ে
দুটা লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে।৪—শিখরিণী।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স যখন উনিশ বৎসর, সেই সময়ে (ইং ১৮৫৯) তাঁহার রচিত মেঘদূতের পদ্যানুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পুস্তকে অনুবাদকের নাম ছিল না। স্মৃতিকথায় দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—

"সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পরে আমার 'মেঘদূত' প্রকাশিত হইল।… মেঘদূতে আমার নাম ছিল না।…আমি যখন মেঘদূত লিখি, তখন ও-ধরণের বাঙ্গালা কবিতা কেহ লিখিতেন না ; ঈশ্বর গুপ্তের ধরণটাই তখন প্রচলিত ছিল। মাইকেল তখন ইংরাজিতে কবিতা লিখিতেন। একদিন হাইকোর্টে আমার ভগিনীপতি সারদাকে তিনি বলিলেন, 'আমার ধারণা ছিল, বাঙ্গালায় ভাল কবিতা রচিত হতে পারে না ; 'মেঘদূত' প'ড়ে দেখ্‌ছি, সে ধারণা ভুল'।"

দ্বিজেন্দ্রনাথই যে মেঘদূতের পদ্যানুবাদক, এ কথা মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র

কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অনুবাদের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৭৮১ শকের আষাঢ় (ইং ১৮৫৯) সংখ্যা 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' "নূতন গ্রন্থের সমালোচন" স্তম্ভে মুদ্রিত তাঁহার সমালোচনাটি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"মেঘদূত। সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত"।—আপন প্রশংস্য নম্রতা ও শালীনতার অনুরোধে অনুবাদক এই পুস্তকে আপন নাম প্রকটিত করেন নাই এই প্রযুক্ত আমরা তাঁহাকে বিশিষ্ট জ্ঞাত থাকিয়াও পাঠকদিগের নিকট তাঁহার পরিচয় দিতে পারিলাম না। পরন্তু তাঁহার সত্রপতার কোন বিশেষ কারণ নাই। যদিচ কালীদাসের অদ্বিতীয় কাব্যরস বঙ্গভাষায় রক্ষা করা প্রাগল্‌ভ্যের কর্ম বটে; তথাপি তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমে যেরূপ সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বন্ধুরা অবশ্য ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে পারেন। ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে বঙ্গভাষায় কালীদাসের কাব্যের যে সকল অনুবাদ প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রস্তাবিত মেঘদূত কোনমতে কনিষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবেক না। আমরা ভরসা করি আমাদিগের প্রিয় গ্রন্থকার তাঁহার শৈশবোৎপন্ন কবিত্বের দূতস্বরূপ মেঘদূতের সাফল্যে এতদ্দেশীয় যুবকগণের নিকৃষ্টামোদ পরিহরণপূর্বক বীণাপাণির অনুধ্যানে সর্বদা প্রবৃত্ত থাকিবেন।..."

দ্বিজেন্দ্রনাথ-কৃত মেঘদূতের পদ্যানুবাদ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে তাঁহার রচনার প্রসাদগুণ উপলব্ধ হইবে:—

কুবের-আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ী,
গিয়া তুমি দেখিবে সেথায়—
সম্মুখে বাহির দ্বার, বাহার কে দেখে তার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।
পার্শ্বে এক সরোবর, দেখা যায় মনোহর,
পদ্ম সনে অলি করে ঠাট।
তাহার একটি ধারে, অপরূপ দেখিবারে
মরকতে মণি-বাঁধা ঘাট।
... ...
মাধবী মণ্ডপ পরে, কুরুবক শোভা করে,
ফুলগন্ধে ছুটি অলিকুল
লতায় পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা,
দুটি গাছ অশোক বকুল।

অশোক ভাবিছে মনে, পাব আমি কতক্ষণে
বধূটির চরণ-আঘাত।
কবে আমি পাব মিঠা মুখ-মদিরার ছিটা
বকুল ভাবয়ে দিবারাত।
তাহার মাঝেতে আর ময়ূরের বসিবার
সোণার একটি আছে দাঁড়।
শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়।
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
রণ রণ বাজে তায় বালা।
স্মরিতে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্য বা চিত্রকলার চর্চা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই; তিনি ক্রমশ নানা দুরূহ ও জটিল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি যখন তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় বিভোর, সেই সময়ে (ইং ১৮৭৩) 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' নামে আর একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; এই রূপক কাব্য বাংলা-সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিতেন, "আমার যথার্থ কবিতার mood যখন ছিল—অর্থাৎ সেই বাল্যকালে আমি এ কাব্য লিখি নাই বলিয়া ইহা আমার মনোমত হয় নাই; সে সময়ে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মসগুল ছিলুম তাই জন্য উহাতে metaphysics ঢুকিয়াছে।"

স্বদেশী মেলা

দ্বিজেন্দ্রনাথ খাঁটি স্বদেশী ছিলেন। স্বদেশপ্রীতির বশবর্তী হইয়াই তিনি জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অগ্রদূত—চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলাতে মাতিয়াছিলেন। তাঁহার একখানি পত্রে (ইং ১৮৭৫) আছে, "আমার কবিতার স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহার বিশেষ কারণ মেলার হাঙ্গামা।" হিন্দুমেলা সম্বন্ধে তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

"আমি চিরকাল স্বদেশী। বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ ভাব-ভাষা আমার দু-চক্ষের বালাই। এই জন্য অনেক সময়ে আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার মতের বিরোধ হইয়াছে। স্ত্রী-স্বাধীনতা আমি অপছন্দ করি না; কিন্তু

খুলে দিলে জোরে। প্রিয়তম যেমন তেমন ক'রে একটা ব্যাণ্ডেজ এঁদোর আঘাতে বেঁধে দিলে।

খানিক পরে নরুবাবু চেতনা ফিরে পেয়ে ব'লে উঠলেন, ওই বেটা ছিনাথ, ওই শালাই তো লাঠি মেরে দিলে ওদের চটিয়ে। এখন মেয়েটা—। শেষ করার আগেই চপলার মুখ দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ভূপতিত গিন্নীর দিকে ফিরে তাকিয়ে হাতপাখা নিয়ে তাঁকে বাতাস করতে বসলেন। এঁদোর দিকে তাকিয়ে ব্যাণ্ডেজ দেখে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন, একজন ডাক্তার—

প্রিয়তম বললে, কার্ফিউ যে!

চুপচাপ।

নরু খানিক পরে জিজ্ঞাসা করলেন, এরা গেল কোথায়, অ্যাঁ?

চপলা। মিলিটারি অ্যারেস্ট ক'রে নিয়ে গেছে।

নরু। যেমন কর্ম তেমনই ফল! বন্দুকের কাছে উনি গিয়েছেন লাঠি ঘোরাতে! এখন নে।

তারপর ভেবে বললেন, কিন্তু জড়াবে তো আমাকেও। মহা ফ্যাসাদ বাধালে দেখছি।

গিন্নী শুয়ে শুয়েই মাথায় ঘোমটা টেনে দিলেন; তারপর উঠে বসলেন গিয়ে এঁদোর পাশে। তার মাথার পাশেই প'ড়ে-থাকা চাপ চাপ রক্তে মায়ের মুখ বেদনায়, শঙ্কায়, ক্ষোভে বিবর্ণ হয়ে গেল; বললেন, ফ্যাসাদের কথা পরে হবে, এখন ছেলেটাকে দেখ।

ওর হাতে লাঠি দেখেই মিলিটারিগুলোর সন্দেহ বেড়ে গেল। তা না হ'লে হয়তো বিশেষ কিছু বলত না। উঃ, চপলার আজ খুব ফাঁড়া উতরে গেল! তারপরে চপলার দিকে ফিরে প্রিয়তম বললে, তুমি যে আমার হাতখানা ছাড়লে না। তা না হ'লে একবার দেখতুম—

চপলার মা এ সব দিকে মোটেই কান দিচ্ছিলেন না। তিনি করুণ চোখে নরুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওগো, এখনও যে রক্ত গড়াচ্ছে!

রক্তের কথায় নরু লাফিয়ে উঠে নীচের দিকে তাকিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন, অ্যাঁ, এত রক্ত! একজন ডাক্তার—

চপলা। কার্ফিউ যে।

আমার বরাবর ভয় হয়, পাছে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া যায়। আমি গোড়া থেকে সেই স্বদেশী culture ধরিয়া বসিয়া আছি; ঘরের মধ্যেই বসিয়া আছি …কখনও আমি বাড়ীর বাহিরে কোনও একটা বড় কাজ করিতে পারিলাম না। বক্তৃতা দিলাম, কিন্তু কাহারও মন ভিজিল না।…দেখ, এক রকম স্বদেশী আমাদের দেশের ফ্যাশান হইয়াছিল; কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিলাতি গন্ধ ছিল। রঙ্গলালই বল, আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের patriotism-এর বার-আনা বিলাতি, চার-আনা দেশী। ইংরেজ যেমন patriot, আমিও সেই রকম patriot হব—এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব ছিল। বল দেখি, আমি তোমার মত patriot হইব কেন? আমি আমার মত patriot হইতে না পারিলে কি হইল! নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল; আমি আগাগোড়া তা'র মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত; কুস্তি জিম্‌ন্যাষ্টিক প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তার খুব ছিল; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত, সে সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের পরামর্শে, নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে এবং গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্য ও উৎসাহে এই স্বদেশী মেলার প্রতিষ্ঠা হয়। "স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন করা"ই ইহার উদ্দেশ্য। মেলার প্রথম অনুষ্ঠান হয় কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগাছিয়ায় ডন্‌কিন্ সাহেবের বাগানে—১২৭৩ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির দিন (১২ এপ্রিল ১৮৬৭)। প্রথম তিন বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা চৈত্রমেলা নামে পরিচিত ছিল। জনচিত্তে দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিবার মানসে মেলায় জাতীয় শিল্পপ্রদর্শনী, দেশীয় ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যায়াম, এবং জাতীয় সঙ্গীত, কবিতা পাঠ ও বক্তৃতাদির আয়োজন থাকিত। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম তিন বৎসর মেলার সম্পাদক এবং নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক ছিলেন। গণেন্দ্রনাথের মৃত্যু (১৬ মে ১৮৬৯) হইলে দ্বিজেন্দ্রনাথ চারি বৎসর—৪র্থ হইতে ৭ম সাম্বৎসরিক অধিবেশন পর্যন্ত (ইং ১৮৭০-৭৩) হিন্দুমেলার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ১৩শ অধিবেশনের (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯) কার্য্যবিবরণেও তাঁহার নাম সম্পাদকরূপে পাওয়া যাইতেছে।

হিন্দুমেলা বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত হইত। ইহার সাফল্যে উৎসাহান্বিত হইয়া উদ্যোক্তাগণ ১৮৭০ সন হইতে তাঁহাদের কার্য-পরিধি আরও একটু

খাড়াইয়াছিলেন। স্বজাতীয় হিতকর বিষয়ের আলোচনার জন্ম তাঁহারা 'ন্যাশনাল সোসাইটি' (জাতীয় সভা) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় প্রতি মাসেই এই জাতীয়-সভার অধিবেশন হইত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ইহার অধ্যক্ষ-সভায় সদস্য ছিলেন; ১৮৭৪ সনে সহ-সভাপতিও হইয়াছিলেন। জাতীয় সভার একটি অধিবেশনে (২১ নবেম্বর ১৮৭২) তিনি "পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন; ১২৮২-৮৩ সালের 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতপক্ষে যাঁহাদের নিকট প্রেরণা, সুপরামর্শ ও সাহায্য লাভ করিয়া এই স্বদেশী মেলা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের নাম অগ্রে স্মরণীয়। মেলার অন্যতম কর্মী, কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসু সত্যই লিখিয়াছেন:—

"কিন্তু জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠানের বিষয় একা তাঁহার [নবগোপাল মিত্রের] গুণানুবাদ করিলেই পর্য্যাপ্ত হয় না। সদ্বিদ্যাবিশারদ নিয়ত-স্বদেশ-হিতৈষী প্রসিদ্ধনামা বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামও সর্ব্বাগ্রে গণনীয়। রোমনগরের এক সেনাপতিকে তরবার, অন্যকে ঢাল বলিয়া যেমন উপমা দেওয়া হইত, আমাদিগের বর্ত্তমান জাতীয় অনুষ্ঠানপক্ষে ঐ উভয় মহাশয়ই সেইরূপ সমহিতকারী হইয়েছেন।" ('মধ্যস্থ', ফাল্গুন ১২৮০, পৃ. ৭৩০)

এই স্বদেশী মেলার সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে দেশানুরাগের গান রীতিমত রচিত হইতে আরম্ভ হয়। "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি" নামে যে জাতীয় সঙ্গীতটির সহিত আমরা সুপরিচিত, তাহা দ্বিজেন্দ্রনাথেরই রচনা, মেলার জন্ম লিখিত হইয়াছিল। সমগ্র গানটি এইরূপ:—

নট বেহাগ—পোস্তা

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি।
দিবা রাত্রি ঝরিছে লোচন-বারি॥
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি॥

সঙ্গীত ও স্বরলিপি রচনা

দ্বিজেন্দ্রনাথের রচিত সঙ্গীতের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এগুলি তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্ম রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত একটি ব্রহ্মসঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি:—

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য, পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকরভূমি, মঙ্গলের তুমি মূলাধার॥
নানা-রস যুত ভব, গভীর রচনা তব, উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়।
মহাকবি! আদিকবি! ছন্দে উঠে শশী রবি, ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়॥
তারকা-কনক কুচি, জলদ-অক্ষর-রুচি, গীত-লেখা নীলাম্বর-পাতে।
ছয় ঋতু সম্বৎসরে, মহিমা কীর্ত্তন করে, সুখপূর্ণ চরাচর সাথে।
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি, বজ্র-রবে রুদ্র তুমি ভীম॥
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি, ধ্যায় যুগ-যুগান্ত অসীম।
আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে, কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র তারা॥
তোমারি এ রচনারি ভাব লয়ে নরনারী হাহা করে, নেত্রে বহে ধারা।
মিলি সুর নর ঋভু প্রণমি তোমায় বিভু, তুমি সর্ব্বমঙ্গল-আলয়।
দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, দেও ভক্তি, দেও ক্ষেম, দেও দেও ও-পদ-আশ্রয়।

আগে ব্রহ্মসঙ্গীতের একটিও স্বরলিপি ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথই প্রথম স্বরলিপি বাহির করিবার চেষ্টা করেন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "বাঙ্গালায় প্রথম স্বরলিপি যে আমার রচিত, তাহা একেবারে নিঃসন্দেহ। শৌরীন্দ্রমোহন তাহার পরে তাড়াতাড়ি একটা স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া ছাপাইয়া দিল।" ১৭৯১ শকের কার্ত্তিক (১৮৬৯, অক্টোবর) সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র শেষে অতিরিক্ত ৬ পৃষ্ঠায় "সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার চিহ্নাবলী" ও পাঁচটি ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে স্বরলিপিকারের নাম নাই বটে, কিন্তু তিনি যে দ্বিজেন্দ্রনাথই তাহার প্রমাণ আছে।

কলিকাতা বা আদি ব্রাহ্মসমাজ

কলিকাতা (পরে 'আদি') ব্রাহ্মসমাজের সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথ আমরণ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছয় বৎসর (১৮৬৮-৭১) যোগ্যতার সহিত এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের পদে কার্য করিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮০৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে (ইং ১৮৮১) আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন ট্রাষ্টি বা বিশ্বস্ত অধিকারী, ১৮১১ শকের ২৫এ মাঘ (৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯০) হইতে আচার্য, ১৮২১ শকের ১লা অগ্রহায়ণ (ইং ১৮৯৯) হইতে সভাপতি এবং ১৮২৬ শকের ১লা শ্রাবণ (ইং ১৯০৪) হইতে আচার্য ও সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

পত্রিকা-সম্পাদন

'ভারতী'।—১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৭৭) 'ভারতী' প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ইহার প্রথম সম্পাদক; তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

"জ্যোতির ঝোঁক হইল, একখানা নূতন-পত্র বাহির করিতে হইবে। আমার কিন্তু ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা'কে ভাল করিয়া জাঁকাইয়া তোলা যাক। কিন্তু জ্যোতির চেষ্টায় 'ভারতী' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই থালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল। আমি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতাম। মলাটের উপরে একটি ছবির design আমি দিয়াছিলাম; কিন্তু সে ছবি ওরা দিতে পারিল না।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদক হইলেও প্রকৃত পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই এই মাসিক পত্রিকার সঙ্কল্পয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা। রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী ও কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী সকলেই সম্পাদকীয় চক্রের মধ্যে ছিলেন।

'ভারতী'র প্রথম সংখ্যায় (শ্রাবণ ১২৮৪) সম্পাদক যে নাতিদীর্ঘ "ভূমিকা" লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য; ইহা হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

"ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাঁহার নামেই স্বপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণীস্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জ্জন এবং ভাবস্ফূর্ত্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাই নত-মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিব। পক্ষপাত-মানসে যে আমরা এরূপ করিব, তাহা নহে। যে সকল বস্তু উপার্জ্জন করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, বিজ্ঞান তাহার মধ্যে একটি; কিন্তু ভাব তাহার

গণ্য হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভাবের উদয় সম্ভবে, ভাবের উদ্রেক সম্ভবে, ভাবের স্ফূর্ত্তি সম্ভবে, কিন্তু উপার্জ্জন সম্ভবে না। যাঁহারা মনে করেন যে, আমরা আর এক জাতি হইতে তাঁহাদের ভাব উপার্জ্জন করিয়া ঠিক সেই জাতির পদবীতে আরূঢ় হইয়াছি, তাঁহারদের মনে করা মাত্রই সার। পাদ্রী সাহেবেরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক বাঙ্গালীর মত বাঙ্গলা লিখি, এবং ইঙ্গ-বঙ্গেরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক ইংরাজের মত ইংরাজি লিখি, তবে তাঁহারদের সে সুখস্বপ্নে আমরা ব্যাঘাত দিতে চাহি না। কালিদাস শকুন্তলায় এক স্থলে বলিয়াছেন "স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বং" স্ত্রীলোকদিগের অশিক্ষিতপটুত্ব; এই যে একটি কথা ইহা ভাবের পক্ষে খুব খাটে। ভাব বাহির হইতে শিক্ষা করিয়া পটুত্ব লাভ করে না, পরন্তু ভিতর হইতে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। ইংরাজী মহাকবি সেক্স্পিয়র বলিয়াছেন, Our poesy is a gum which oozes from whence 'tis nourished." কবিত্বরূপ নির্য্যাস ভিতরে যেখানে যত্নপূর্ব্বক পোষিত হয় সেই স্থান হইতে চুঁয়াইয়া পড়ে। আমাদের দেশের সেদিনকার উপস্থিত-ভাষী কবি হরুঠাকুর বলিয়াছেন,

"প্রেম কি যাচ্‌লে মেলে খুঁজলে মেলে ?
সে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে।

স্বদেশ হইতে যে ভাব আপনি উদয় হয়, অযাচিতভাবে উদয় হয়, তাহাই ঠিক। যে ভাব অন্যত্র হইতে যাচিয়া আনা হয় তাহা কৃত্রিম, তাহা কোন কার্য্যেরই নহে। বীণাপাণির হস্তে বীণাই শোভা পায়; হার্প কি শোভা পায়? এই সকল কারণে ভাবের আলোচনা আমরা স্বদেশীয় ভাবেই করিতে ইচ্ছুক।

অতঃপর আমরা বলিতে চাই যে, যে কারণে ব্রিটানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রিটানীয়া নাম ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহার বহু পূর্ব্বে এথেন্স নগরের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা মিনর্বা—এথোনিয়া নাম ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কারণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা সরস্বতী—ভারতী নাম ধারণ করিতে পারেন। সে কারণ কি ? না নামের সহিত ধামের সহিত অকাট্য সম্বন্ধ। আর্য্য-ভাষা মূল-সমেত অদ্যাপি কোথায় বিরাজ করিতেছেন? ভারতে! আর্য্যভাষার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। পুনশ্চ, যত প্রকার বিদ্যা আছে, ভারতভূমি ভারতেরই জন্মভূমি। গণিত, জ্যোতিষ,

রসায়ন, চিকিৎসা, দর্শন, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি বিদ্যা-সমূহের বীজ প্রথমে ভারতভূমিতেই অঙ্কুরিত হয়; পরে তাহার ফল দূর দূর দেশে বিকীর্ণ হইয়া, এতদিন পরে তবে তাহা সাধারণ জনগণের ভোগায়ত্ত হইয়াছে। ভারতভূমি বিদ্যার জন্মভূমি, বিদ্যার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। এইরূপ যে দিকে দেখা যায় সেই দিকেই ভারতী এবং ভারতের মধ্যে ভাবের প্রগাঢ় মিল দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব ইহা মুক্তকণ্ঠে উক্ত হইতে পারে যে, হংসের যেমন পদ্মবন, মহাদেবের যেমন কৈলাস-শিখর, ভারতীর তেমনি ভারতভূমি। কিম্বা পদ্মের যেমন সৌরভ, নক্ষত্রের যেমন জ্যোতি, ভারতের তেমনি ভারতী। ভারত-ভূমিতে যদি জাগ্রত দেবতা অদ্যাপি কেহ বিরাজমান থাকেন, তবে তিনি ভারতী। ভারতের প্রতি ভারতীর এমনি কৃপাদৃষ্টি যে তাঁহাকে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। সেই শ্বেতবর্ণা শ্বেতাম্বরা দেবী আমাদের এই দুরবস্থার সময় যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তবে কাহার চরণ সেবা করিয়া আমরা দুঃসহ কারাবাস-যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকিব? তাই আমরা ভারতী-দেবীকে বলি যে 'হে মাতর্ভারতি! তুমিই আমাদের আঁধারের প্রদীপ, তোমার আলোকেই আমাদের আলোক, তোমার অধিষ্ঠানেই আমাদের জীবন, তোমার অন্তর্ধানেই আমাদের মৃত্যু। তোমার শুভ্র বদন-জ্যোতি কাল-যবনিকার সহস্র সহস্র ভাঁজের মধ্য দিয়া এখনো যখন আমাদের নয়ন আকর্ষণ করিতেছে, তখন ইহা নিশ্চয় যে, প্রলয়-কালেও তাহা অন্তর্হিত হইবে' না। তোমার প্রসাদাৎ আমরা দুর্ব্বল হইয়াও সবল, গতশ্রী হইয়াও নবশ্রী, নির্জীব হইয়াও সজীব। আমাদের প্রতি এই যে তোমার অনিমেষ কৃপাদৃষ্টি, আমরা আমাদের নিজদোষে যেন তাহা না হারাই, এই আমাদের প্রার্থনা।'

আমরা ভাই বন্ধু একত্র হইয়া ভারতীকে আবাহন পূর্ব্বক এই ত প্রতিষ্ঠা করিলাম। এক্ষণে ভারতীর বরপুত্রগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহার যাহাতে রীতিমত সেবা চলে, তাহার ব্যবস্থা করুন; ভারতীর আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ সাত বৎসর (১২৯০ সাল পর্যন্ত) দক্ষতাবে পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, সাহিত্যানুরাগিণী কাদম্বরী দেবীর

অপমৃত্যুর (৮ বৈশাখ ১২৯১) সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতী'র সেবকেরা উহার প্রচার রহিত করাই সাব্যস্ত করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ঘোষণা করেন—"ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।" কবি অক্ষয়-চন্দ্রের সহধর্মিণী শরৎকুমারী চৌধুরাণী যথার্থ ই লিখিয়াছেন :—

"ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে বাঁধা থাকে, তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি-পরিবারে গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল—ভারতীর সেবকেরা আর ফুল তোলেন না, ভারতী ধূলায় মলিন। এই দুর্দিনে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর পালন-শক্তির পরিচয় দিলেন।" ("ভারতীর ভিটা", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা)

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'।—'ভারতী'র সম্পাদকীয় আসন হইতে অবসর গ্রহণের কয়েক মাস পরে—১৮০৬ শকের আশ্বিন মাস (ইং ১৮৮৪) হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। এই পদে তিনি দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল—১৮৩০ শক (ইং ১৯০৯) পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় তাঁহার বহু সুচিন্তিত রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

'হিতবাদী'।—১৮৯১ সনের ৩০এ মে (?) এই সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্ম হয়। এক হিসাবে দ্বিজেন্দ্রনাথই ইহার জন্মদাতা। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

"সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিতবাদী' নামটি দ্বিজেন্দ্র বাবুরই সৃষ্টি, এবং "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ" এই Mottoটিও তিনিই বলিয়া দেন। হিতবাদীর জন্মকালে পাঁচ জন একত্র মিলিয়া এক বৈঠক বসিয়াছিল; তথায় আমিও ছিলাম, দ্বিজেন্দ্র বাবুও ছিলেন। সেই সময়েই ঐ নাম ও Motto পরিগৃহীত হয়। সুতরাং এক হিসাবে দ্বিজেন্দ্র বাবুই ঐ কাগজের জন্মদাতা বলিতে হইবে। সেই বৈঠকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সম্পাদক হইতে অনুরোধ করিলেন।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্যায়, পৃ. ৭৬)

'হিতবাদী' প্রকাশের প্রাক্‌কালে রবীন্দ্রনাথ তদীয় বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে যে পত্রখানি লেখেন, তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :—

"ভ্রাতঃ—আমাদের হিতবাদী ব'লে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

বেরোচ্ছে। একটি বড় রকমের কম্পানি খুলে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাচ্ছে। ২৫,০০০৲ টাকা মূলধন। .২৫০৲ টাকা ক'রে প্রত্যেক অংশ এবং একশ অংশ আবশ্যক। প্রায় অর্দ্ধেক অংশের গ্রাহক ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। কৃষ্ণকমল বাবুকে প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্যবিভাগের সম্পাদক এবং মোহিনীকে রাজনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে ..." ('বিশ্বভারতী পত্রিকা', শ্রাবণ ১৩৪৯, পৃ. ৩০)

বিশিষ্ট সভা-সমিতির সহিত যোগ

বিদ্যার উন্নতিকল্পে গঠিত নানা সভা-সমিতির সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের যোগ ছিল। ১৮৭৪ সনের ১৮ই এপ্রিল জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' নামে বার্ষিক সাহিত্যিক-সম্মিলনের প্রথম অনুষ্ঠান হয়; দ্বিজেন্দ্রনাথ ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় ১৮৮২ সনের জুলাই মাসে ঠাকুর-বাড়ীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে প্রতিষ্ঠিত স্বল্পায়ু 'সারস্বত-সমাজে'র তিনি অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা'।—ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ইণ্ডিয়ান সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইলে যাঁহারা অর্থদানে এই সৎকর্মের সহায়তা করিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। ১০ মার্চ ১৮৭০ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ :—

"বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেকে ডাক্তার সরকারের সাইন্স-এসোসিয়েসনের নিমিত্ত হাজার টাকা করিয়া দিয়াছেন।"

'বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটি'।—১৮৮২ সনের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা স্থাপিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ সোসাইটির অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ'।—দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৩০১ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের "বিশিষ্ট সদস্য" নির্বাচিত হন। তিনি উপর্যুপরি তিন বৎসর (১৩০৪-১৩০৬, ইং ১৮৯৭-১৯০০) এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি-পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি পরিষদের সভাপতি-রূপে "এ কালের দর্শন" সম্বন্ধে চারি দিন (১৮ অগ্রহায়ণ, ৮ মাঘ, ১৯ ও ২৫ চৈত্র ১৩০৬) বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন'।—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে ১৩২০ সালের ২৭-২৯এ চৈত্র তারিখে কলিকাতা টাউন-হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৭ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্মিলনের মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত অভিভাষণটি ১৩২১ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হইয়াছে।

রচনাবলী

দ্বিজেন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—"আমি অনেক লিখিয়াছি ; এই লেখা-পড়া ছাড়া আর আমি জীবনে বড় একটা কিছুই করিতে পারিলাম না ; কখনও আমি বিষয়-কর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না ;—বাবা ইদানীং আমাকে কোনও বিষয়-কর্ম্মে থাকিতে দিতেন না। কিন্তু কখনও কোথাও আমার লেখার মধ্যে বিদেশী হাবভাব idiom তুমি খুঁজিয়া পাইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনে যদি এমন কোনও ভাব উদিত হয়, যাহা প্রকাশের উপযুক্ত খাঁটি দেশী ভাষায় প্রকাশ করা যায়,—তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী idiom-এর অনুবাদ করিতে যাইব কেন ? আমি কখনও ও-পথ মাড়াই নি। আমার লেখার এই বিশিষ্টতা আর কেহ বুঝিতে পারিবে কি না জানি না ; কিন্তু কৃষ্ণকমল পারিবে।"

বাংলা গ্রন্থাবলী।—মাতৃভাষায় রচিত দ্বিজেন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। মেঘদূত (পদ্যানুবাদ)। ১২৬৬ সাল (ইং ১৮৬০)।

২। ভ্রাতৃ-ভাব। ইং ১৮৬৩।

"নূতন গ্রন্থ।—...ভ্রাতৃ-ভাব। শ্রীযুত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক যে প্রবন্ধ ব্রাহ্ম ভ্রাতৃসভায় পঠিত হয় তাহা এই পুস্তকে প্রকটিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাহাতে পরস্পর ভ্রাতৃ-ভাব উন্নত হয় সেই ভ্রাতৃ-ভাবের ফল অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।"—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', আষাঢ় ১৭৮৫।

৩। তত্ত্ববিদ্যা :

১ম খণ্ড—জ্ঞানকাণ্ড। ৮ অগ্রহায়ণ ১৭৮৮ শক (ইং ১৮৬৬)। পৃ. ১৮২

২য় খণ্ড—ভোগকাণ্ড। (১৮ অক্টোবর ১৮৬৭)। পৃ. ৬৮

৩য় খণ্ড—কর্ম্মকাণ্ড। (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮)। পৃ. ৭০

৪র্থ খণ্ড—সাধন প্রকরণ। সংবৎ ১৯২৬ (১০ এপ্রিল ১৮৬৯)। পৃ. ৪৯

দ্বিজেন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—"আমাদের দেশে আমি যে ভাবে দার্শনিক আলোচনা করিয়াছিলাম, সে রকম আমার পূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই। 'তত্ত্ববিদ্যা' প্রকাশিত হইবার অনেক পরে কালীবর বেদান্তবাগীশের লেখার সমালোচনা করিয়া, 'তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক' নাম দিয়া একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম ['ভারতী,' ১২৮৪-৫ দ্রষ্টব্য]। কিন্তু আমার 'তত্ত্ববিদ্যা' সকলের পূর্ব্বে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর নবগঠিত সমাজের জন্য একটা philosophy আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। কি করিয়া সেই philosophy দাঁড় করান যায়, তাহা লইয়া অনেকেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি তাঁহাদিগকে 'তত্ত্ববিদ্যা' পড়িতে বলেন। 'সাধারণে'র দল যাহা খুঁজিতেছিলেন পাইলেন। তাঁহাদের নূতন philosophy প্রকাশিত হইল।...কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের ইতিহাস-পুস্তকে কোথাও ঋণ স্বীকার করেন নাই! অথচ এত বেশী মিল আছে,—শুধু যে ভাষায় তাহা নহে, আগাগোড়া তর্কের ধারায়—যে তুমি দেখিলে বিস্মিত হইয়া যাইবে।"

। স্বপ্ন-প্রয়াণ (রূপক কাব্য)। ১৭৯৭ শক (১৮ অক্টোবর ১৮৭৫)। পৃ. ২৪৩।

'স্বপ্ন-প্রয়াণে'র ১ম সর্গটি প্রথমে ১২৮০ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক (ভাদ্র ১৩০৩) স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় প্রকাশ :—"আমি যখন প্রথম 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' রচনা করিতে আরম্ভ করি, তাহার কোনও কোনও অংশ বঙ্কিম বাবুকে পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করিবার জন্য। তখনকার 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' আর এখনকার 'স্বপ্ন-প্রয়াণে' অনেক তফাৎ। আমার পুস্তকে কতকগুলো কাল্পনিক ছবির সমাবেশ ছিল। বঙ্কিম বাবু বোধ হয় সেগুলো ছাপান নাই, এক-আধটা ছাপাইয়াছিলেন কি না আমার স্মরণ নাই। কিন্তু তাঁহার 'বিষবৃক্ষে'র মধ্যে ঠিক সেই রকম ছবির অবতারণা করিয়া বসিলেন। তফাতের মধ্যে দাঁড়াইল এই যে, যাহা স্বপ্নে অশোভন হয় না, তাহা বাস্তব জগতে, গৃহস্থ-চিত্রে, বিশেষতঃ হিন্দু গৃহস্থচিত্রে অত্যন্ত অশোভন হইয়া দাঁড়াইল। নগেন্দ্রনাথের ঘরের মধ্যে সেই রকম ছবি থাকিতে পারে; কিন্তু

নরু। কাফিউ ব'লে কি ছেলেটা ম'রে যাবে নাকি? আমিই যাচ্ছি হরি মণ্ডলকে ডাকতে।

চপলা। তুমি ডাকলেও ডাক্তার আসবে কেন?

নরু নিরুপায় হয়ে ব'লে উঠলেন, ওই বেটা ছিনাথই মজালে!

শ্রীশীতাংশু মৈত্র

পেরেক

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখে পাঠকের নিশ্চয়ই সন্দেহ হবে যে, আমার মাথার পেরেকগুলো কিছু আলগা। সমালোচনার হাতুড়ি পড়লেও ঢিলে-পেরেক 'টাইট' হবে না; মনে আমার পেরেক ফুটেছে, তাই প্রবন্ধ লিখে আমায় মনের পেরেক তুলতেই হবে।

শক্ত জিনিসকে আয়ত্তে আনতে হ'লে শক্ততর জিনিসের দরকার—বোধ হয় এই জ্ঞান থেকেই হয়েছে পেরেকের উদ্ভাবন। ক্রম-বিবর্তনের ফলে বিংশ শতাব্দীতে যা 'পেরেক', খ্রীষ্টপূর্ব দু হাজার বছর আগে সেটা নিশ্চয়ই এ রকম ছিল না। সভ্যতার শিশুকালে খোঁটা বা খুঁটি থেকে মানুষ অনেক উপকার পেয়েছে; কুঁড়েঘর, বেড়া, মাচা মানুষকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আরাম দিয়েছে। শক্ত খোঁটার জোরে মেড়াকে লড়ানো তাদের খুবই সহজ ছিল। নানা রকমে ঠেকে শিখে মানুষের জ্ঞানান্বেষী মন জেনেছিল, মাটির বুকে পুঁততে হ'লে চাই মাটির চেয়ে শক্ত কাঠ, কাঠের বুকে পুঁততে হ'লে চাই কাঠের চেয়ে শক্ত লোহা। এই কষ্টলব্ধ জ্ঞান মানুষ অসংখ্য কাজে লাগিয়েছে নিজের সুখ-সুবিধা বাড়াবার জন্যে।

সভ্যতার ক্রমোন্নতির পথে এসেছিল কেঠো-যুগ, যেমন এসেছিল iron age। সেই যুগে কাঠের উপকারিতাগুলি মানুষের চোখে ধরা পড়ে। ঘর, নৌকো, আসবাব প্রভৃতি নানা কাজে কাঠের ব্যবহার হয়। সেই যুগে কাঠ যে পেরেকের কাছে (জানি না, সে সময় পেরেকের কি নাম ছিল!) অনেক সাহায্য পেয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। হাতুড়ির সৃষ্টিও বোধ হয় সেই যুগেই হয়েছিল, কেন না হাতুড়ি-হীন পেরেক একেবারেই অর্থহীন।

ভেদ্য জিনিসের ঘনতা অনুযায়ী পেরেকের দৈর্ঘ্য নির্ধারিত হ'ল। কেউ বড়,

বাড়ীর মধ্যে গৃহস্থ-বধূ গাড়ী হাঁকাইলেন, এ চিত্র একেবারেই সুশোভন হইল না। কিন্তু এই রকম চিত্র-সমাবেশের ideaটা যে তিনি আমার রচনা হইতে পাইতেছিলেন সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু অন্যত্র গুরুশিষ্য খাড়া করিয়া যে ভাবে দার্শনিক আলোচনা করিতে বসিলেন, তাহার বহু পূর্ব্বে* ঠিক ঐভাবে ঐরকম আলোচনা আমিও করিয়াছিলাম।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্য্যায়)

৫। সোনার কাটি রূপার কাটি। ? (ইং ১৮৮৫)। পৃ. ৫৮।

৬। সোনায় সোহাগা। (ইং ১৮৮৫) পৃ. ২০।

৭। আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা। ২৫ ভাদ্র ১২৯৭ (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯০)। পৃ. ৩১।

৮। সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা। (২৪ আগস্ট ১৮৯১)। পৃ. ৮২

৯। সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ (ইং ১৮৯২)। পৃ. ৪৮+৪ পরিশিষ্ট।

১০। অদ্বৈত মতের সমালোচনা। অগ্রহায়ণ ১৩০৩ (১ ডিসেম্বর ১৮৯৬)। পৃ. ৪৪+৮ পরিশিষ্ট।

১১। অদ্বৈত মতের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচনা। ৩০ অগ্রহায়ণ ১৩০৪ (১৪ ডিসেম্বর ১৮৯৭)। পৃ. ৭০।

১২। পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম। বৈশাখ ১৩০৫ (১৪ মে ১৮৯৮)। পৃ. ৬৭ (নং ২৬ দ্রষ্টব্য)

১৩। আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত। ১৩০৬ সাল (১৫ জুন ১৮৯৯)। পৃ. ১০৩।

১৪। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন। পৌষ ১৩০৬ (১৩ জানুয়ারি ১৯০০)। পৃ. ২৬

১৫। আচার্য্যের উপদেশ:

১ম খণ্ড। ১৪ চৈত্র ১৩০৬ (ইং ১৯০০)। পৃ. ৮০।

২য় খণ্ড। পৌষ ১৩০৮ (ইং ১৯০২)। পৃ ৬১।

১৬। শ্রীমন্মহর্ষি দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আচার্য্য শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা। ১৩০৮ সাল (ইং ১৯০১) পৃ. ৩১।

---

*দ্বিজেন্দ্রনাথ এই ধরনের দুইটি প্রবন্ধ লেখেন, উহা "অধ্যাত্ম-বিদ্যার প্রথম প্রস্তাব" ('ভারতী', আশ্বিন ১২৮৭) ও "দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ" ('ভারতী ও বালক', ভাদ্র ১২৯৩)।

১৭। বিদ্যা এবং জ্ঞান। (২০ এপ্রিল ১৯০৬)। পৃ. ২৪।

১৮। একটি প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর। ? (২ সেপ্টেম্বর ১৯০৬)। পৃ. ২২।

১৯। বঙ্গের রঙ্গভূমি। ১৩১৪ সাল (২০ জুলাই ১৯০৭)। পৃ. ২৫।

সূচী :—"পিতৃভূমি এবং মাতৃভূমি" ও "বাবুর গঙ্গাযাত্রা।"

২০। হারামণির অন্বেষণ। ইং ১৯০৮ (১৮ এপ্রিল)। পৃ. ৬৪।

২১। দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব। (২০ ডিসেম্বর ১৯০৮)। পৃ. ৩২।

২২। রেখাক্ষর-বর্ণমালা। ১৩১৯ সাল (২৫ মে ১৯১২)। পৃ. ১২০।

লিথোয় মুদ্রিত, কবিতায় বাংলা শর্টহ্যাণ্ড পুস্তক। ইহার প্রাথমিক খসড়া ১২৯২ সালের 'বালকে'; সচিত্র আকারে ১৩০৫ (ফাল্গুন-চৈত্র) ও ১৩০৬ সালের (আষাঢ়-শ্রাবণ) 'পুণ্য' এবং ১৩১৩ ১৫ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়।

২৩। গীতাপাঠ। ১৩২২ সাল (ইং ১৯১৫)। পৃ. ৩৩৮।

২৪। নানা চিন্তা। ১৩২৭ সাল (৫ মার্চ ১৯২০)। পৃ. ৩৩৬।

সূচী : সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য; বিদ্যা এবং জ্ঞান; সাধনের সত্য ('ভারতী', শ্রাবণ ১৩১৬); আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত; [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের] সভাপতির অভিভাষণ ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৬ষ্ঠ বর্ষ); সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ ('প্রবাসী', বৈশাখ ১৩২১); উপসর্গের অর্থ-বিচার ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৪র্থ-৫ম-বর্ষ); দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব ?

২৫। প্রবন্ধ-মালা। ১৩২৭ সাল (২০ জুন ১৯২০)। পৃ. ২০২।

সূচী : মুখ্য এবং গৌণ; কাল্পনিক এবং বাস্তবিক দুই ভাবের দুই প্রকার লোক ('ভারতী', ভাদ্র ১২৮৫); সোনার কাটি রূপার কাটি; সোনায় সোহাগা; নব্যবঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি ('তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', চৈত্র ১৮০৭ শক); আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা; সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা; বাবুর গঙ্গাযাত্রা।

২৬। কাব্য-মালা। ১৩২৭ সাল (২০ জুন ১৯২০)। পৃ. ১৬৭।

সূচী : যৌতুক না কৌতুক ('ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১২৯০); ভুন্দ-আক্রমণ কাব্য ('ভারতী ও বালক', ফাল্গুন ১২৯৬); মেঘদূত; মেরা আলি ('ভারতী',

অগ্রহায়ণ ১৩০৮); অন্তিম বাসনা ('ভারতী', ভাদ্র ১২৮৫); বাসন্তী পদ্যাবলী; দেতালায় দুপুর রাত্রি; বরাহনগরের উদ্যানে; পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম।

২৭। চিন্তামণি। ১৩২৯ সাল (ইং ১৯২২)। পৃ. ২৭০।

সূচী: হারামণির অন্বেষণ; সারসত্যের আলোচনা ('বঙ্গদর্শন', ১৩০৮-৯)।

পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়। আশ্বিন ১৩৩০ (ইং ১৯২৩)। পৃ. ১৭৯-২০৭।

এই পুস্তকের শেষাংশে দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা দ্বিজেন্দ্রনাথ কর্তৃক বিবৃত ও বিপিনবিহারী গুপ্ত কর্তৃক লিখিত।

ইংরেজী গ্রন্থাবলী।—দ্বিজেন্দ্রনাথের কয়েকখানি ইংরেজী পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; উহা—

1. Geometry in which the 12th axiom has been replaced by new ones.*

এই প্রসঙ্গে ১৩০৬ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথের "দ্বাদশ স্বীকার্য্যবর্জ্জিত জ্যামিতি" প্রবন্ধ পঠিতব্য। জ্যামিতি বিষয়ে তাঁহার আরও দুইটি প্রবন্ধ—"জ্যামিতির নূতন সংস্করণ" ('ভারতী', অগ্রহায়ণ-পৌষ ১২৮৬; বৈশাখ ১২৮৭) ও "স্থান-মান" ('ভারতী', পৌষ-চৈত্র ১২৯০; বৈশাখ ১২৯১)।

2. *Ontology*; being a translation of "Tatwa-vidya," a Bengali work, By Babu Dwijendra Nath Tagore with subsequent additions and alterations made by him in the original text. 1871. pp. 70.

3. Boxometry. ১৩২৫ (?) সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ বাক্স-রচনা-প্রণালী সম্বন্ধে ইংরেজীতে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় ('প্রবাসী', বৈশাখ ১৩২১ দ্রষ্টব্য)। তিনি ১২৮৫ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' কবিতায় "কাগজের বাক্স রচনা প্রণালী" বিবৃত করিয়াছিলেন।

* 'ভারতী', শ্রাবণ ১৩০৬, পৃ. ৩৪২ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

পত্রাবলি

দ্বিজেন্দ্রনাথের লিখিত অনেকগুলি পত্র 'সুপ্রভাত' (১৩১৭-৮), 'প্রবাসী' (১৩২৬,-৩২,-৪৬ ৪৭), 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' (শ্রাবণ ১৩২৮), 'শান্তিনিকেতন' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২), 'ভারতী' (মাঘ-ফাল্গুন ১৩৩২), 'সবুজ পত্র' (ফাল্গুন ১৩৩২), 'বিবর্ত্তন' ও 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (১৩৫২, ৪র্থ সংখ্যা) এবং 'প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে ছড়ায় চিত্তাকর্ষক সরস পত্র লিখিবার অভ্যাস দ্বিজেন্দ্রনাথের ছিল। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধে এইরূপ কতকগুলি ছড়া প্রকাশ করিয়াছেন।

জীবন-সায়াহ্নে

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবন ঘটনা-বহুল ছিল না। নিরন্তর বাগ্‌দেবীর উপাসনাতেই তাঁহার সারা জীবন কাটিয়াছে। তিনি বৈয়াকরণিক, দার্শনিক, ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ ও কবি ছিলেন; কিন্তু দেশবাসীর নিকট 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'র কবি হিসাবেই সমধিক খ্যাত।

ভারতীর বরপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের শেষ-জীবন বোলপুর শান্তিনিকেতনেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি এমনই অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, "যে-কেহ তাঁহার নিকটে আসিত, তাহাকেই তিনি সরল হৃদ্যতায় প্রীতি-পাশে বদ্ধ করিয়া লইতেন। তাঁহার শিষ্টাচার-সৌজন্যে কিছুমাত্র কপটতা ছিল না। কেবল মানুষ নহে, বনের পশুপক্ষী, জীবজন্তুও তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া অকুণ্ঠিত-ভাবে তাঁহাকে আপন করিয়া লইত। তিনি বসিয়া থাকিতেন, আর কাক, শালিক, কাঠবেড়ালী প্রভৃতি, কেহ বা মস্তকে, কেহ বা শরীরে, কেহ বা পদপ্রান্তে খেলা করিয়া বেড়াইত।"* যিনি পরকে আপন করিতে জানিতেন, তিনি যে, নিজ ভাই-বোনের প্রতি স্নেহশীল হইবেন ইহা কিছু বেশী কথা নহে। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিয়াছেন :—

"তাঁহাকে যখনই পত্র লিখিতাম তিনি কিরূপ স্নেহমাখা উত্তর দিতেন, তাহারই নিদর্শন-স্বরূপ একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

* "পুষ্পাঞ্জলি—বড়দাদা" : স্বর্ণকুমারী দেবী—'ভারতী', মাঘ ১৩৩২।

ওঁ

শান্তিনিকেতন
২৬ কার্ত্তিক ১৩৩০

স্নেহের বোন্‌টি আমার—আমার হাতে এখনো কতকগুলি করণীয় কার্য্য অবশিষ্ট আছে। সেইগুলি শীঘ্র শীঘ্র চুকাইয়া ফেলিতে আমি নিতান্তই আগ্রহান্বিত। যমের দুয়ারে কাঁটা দিবার এক্ষণে তুমি বই আর আমার কেহই নাই; সুতরাং তোমার এবারকার ভাইফোঁটা ঠিক্ আমার সময়োপযোগী, আর সেইজন্য তাহা আমি অতিশয় যত্ন সমাদরের সহিত ললাটে বরণ করিলাম। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে রাখুন ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। দিব্যধামস্থিত আমাদের প্রাণের ভাই সতুর [সত্যেন্দ্র-নাথের] বিরচিত একটী ব্রহ্মসঙ্গীত এক্ষণে আমার জপমালা হইয়াছে। সে গীতটি এই:—

কেহ নাহি আর আমার—সব তুমি। লয়েছি শরণ তব চরণে দীননাথ। যদি পাই তোমার ছায়া নাহি ডরি করাল কালে।
হায়! বিষ্ণু নাই—কে এটা গাইয়া আমাকে শুনাইবে।

তোমার নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষী
বড়দাদা—"*

দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করিয়াও একপ্রকার সর্বত্যাগী ছিলেন। সরলা দেবী লিখিয়াছেন:— "পিতৃদত্ত মাসহারার সবটাই জ্যেষ্ঠপুত্র দীপেন্দ্রনাথের হাতে যেত, নিজে কিছুই রাখতেন না। দীপেন্দ্রনাথই পরিবারে তা যথাযথভাবে বণ্টন করতেন। তাঁর নিয়মিত আহার বস্ত্রের কখন অপ্রতুল হ'ত না। কিন্তু একটি কাম্যবস্তুর অভাব মধ্যে মধ্যে অনুভব করতেন—সেটি লেখার জন্য ও বাক্স তৈরির জন্য কাগজ। একদিন শুনি যোড়াসাঁকোতে তাঁর চাকরকে কাকুতি মিনতির স্বরে বলছেন—'দীপুকে গিয়ে বলিস্ আজ যদি আমায় একটা দোয়ানি দেন আমি একখানা খাতা আনাই।' একটি দোয়ানির ভিখারী লক্ষপতি! এই নির্লোভ নির্লিপ্ত যোগীপুরুষের নিষ্কামতার, না তাঁর শিশুসুলভ নির্বিষ সরস সহৃদয়তার বর প্রার্থনা করব জানি না।"†

* "পুষ্পাঞ্জলি—বড়দাদা": স্বর্ণকুমারী দেবী—'ভারতী,' মাঘ ১৩৩২।
† "পুষ্পাঞ্জলি—বড় দাদা": সরলা দেবী—'ভারতী', মাঘ ১৩৩২।

মৃত্যু

১৩৩২ সালের ৪ঠা মাঘ, সোমবার শেষ রাত্রে (১৯ জানুয়ারি ১৯২৬) দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার "অন্তিম বাসনা" তিনি একটি গীতিকবিতায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; উহা উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিতেছি—

অস্তাচলে গেল গো দিনমণি
আইল রজনী
উঠিল শশধর রজত-রুচি।
জীবনের সুখের দিন—হায়
এমনি চলি যায়
রঙ্গ-ভঙ্গ যায় চকিতে ঘুচি॥
ফুরায় গো ফুরায় খুসি-হাসি—
পোড়া অদৃষ্ট আসি
অন্তিম যবনিকা ফেলিতে বলে।
খেলা-ধূলা সকলি অবসান—
বন্ধুজন-বয়ান
ভাসে গো অবিরাম নয়ন-জলে॥
ভাব এক এমনি—মরি হায়
কি যেন মৃদু বায়—
যাবে চ'লি আমার উপর দিয়া।
মনে হবে জীবন-যাত্রা মোর
হইয়ে-এল ভোর,
বিশ্রাম করিবারে চাহিবে হিয়া॥

প্রিয় বন্ধু-সকল তোমরা কি
কাঁদিবে পাশে থাকি
গেছি আমি এ দুখ প্রাণে না স'য়ো?
তবে মোর আত্মা যে-আকাশে
যেখানে থাক্-না সে
কাঁদিবে তোমাদের দোসর হ'য়ে॥
তুমি-ও হে ফেলিও এক বিন্দু
অধিক নহে বন্ধু
একটি-ফোঁটা শুধু নয়ন-লোর।
ফুল তুলি একটি প্রাণ-প্রিয়
মোর মাথায় দিও
সাধ-মিটায়ে চেয়ো শয়নে মোর॥
পীরিতির সোহাগে ঢলঢল্
সে তব অশ্রু-জল
মোরে তা সঁপি দিতে ক'র না লাজ;
ত্রিভুবনে আছয়ে যত মণি
সবার সেরা গণি'
রাখিব ক'রি তারে মুকুট-সাজ॥

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবেক

অন্তরে জাগ্রত আছে মানুষের সহিষ্ণু বিবেক
বলে, "দিব উপদেশ, টেক্ টেক্ নোটেক্ নোটেক্।"
ভাবখানা তার প্রায় চীনা জুতাওয়ালার মতো,
ভবু-দর বেশি ভেবে ফিরে যায় অসহিষ্ণু যত।

প্রেয়সী

রবীন্দ্রনাথের মত প্রেমস্বপ্ন আমিও দেখেছি—
ময়নাপাড়ার মাঠে কৃষ্ণকলি হরিণনয়ন,
নবীন শ্যামল দেহে তমালের কালো কোমলতা
এনেছে বিনিদ্র রাতে আষাঢ়ের মেদুর বিরহ।
প্রেমের অমরাবতী উজ্জয়িনী নীবিমোক্ষ-ধাম,
সেখানে শিপ্রার তটে প্রেয়সীর সঙ্কেত-ভবন,
মুখে-মাখা লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে মালবিকা
মণিদীপদীপ্ত কক্ষে হাত ধ'রে ডেকেছে আমায়।

রবীন্দ্রনাথের মত প্রেমস্বপ্ন আমিও দেখেছি—
আমারো যৌবনস্বপ্নে ছেয়ে ছিল বিশ্বের আকাশ;
তবু স্বপ্ন সত্য নয়, রূঢ় রুক্ষ বাস্তব জীবন,
প্রতি পদে চূর্ণ হয় গজমোতি-মিনার-বিলাস।
মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে
যে এল সঙ্গিনী হতে, আজন্মের মানসী আমার,
অর্ধেক রাজত্ব হাতে রাজকন্যা মধুমালা নয়—
আমারি দোসর সে যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-দুহিতা।

শিশুকালে নদীকূলে, সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে
শিবমূর্তি পূজা ক'রে আমাকে সে করে নি কামনা,
পল্লীর দুলালী নয়, শহরের পাষাণ-প্রাচীরে
বেড়েছে আড়ষ্ট প্রাণ নাগরিক কৃত্রিম রসদে।
যৌবন এসেছে দেহে কুমারীর অপরাধ হয়ে,
সলজ্জ সঙ্কোচ ভ'রে ফ্রক ছেড়ে জড়ায়েছে শাড়ি;
শহরের পথ বেয়ে ঘুরেছে সে ইস্কুল-কলেজে,
শিখেছে ইংরেজী বিদ্যা, শেষ অস্ত্র জীবন-সংগ্রামে।

তারপর একদিন উৎসবের বাঁশরী-সংগীতে
বেণী সুসংবদ্ধ ক'রে শিরে টেনে দিয়েছে গুণ্ঠন,

মঙ্গল-সিন্দুর-বিন্দু পরেছে সে সীমন্ত-সীমায়—
এসেছে জীবনলক্ষ্মী লক্ষ্মীছাড়া মধ্যবিত্ত ঘরে।
প্রথম মিলন-রাতে সলজ্জিত বাসর-শয্যাতে
কানে-কানে-ডাকা নাম কাব্য হতে এল না স্মরণে,
'প্রেয়সী' অথবা 'প্রিয়ে'—মনে হ'ল অসহ্য ন্যাকামি,—
সম্বোধন শুধু নয়, দাম্পত্যেরো নব-ইতিহাস।

ক্ষয়িষ্ণু সমাজবৃক্ষে শাখাশ্রয়ী স্বল্পপরিসরে
ভূমিসংস্রবহীন পরাশ্রিত প্রাণ আমাদের,
যুগান্তের ঝড় এলে উন্মূলিত শূন্যে যাব উড়ে
কিংবা ভাগ্য ভাল হ'লে ফিরে পাব মাটির আশ্রয়।
আপাতত ভাড়া-করা দেড়তলা ফ্ল্যাটের ভাড়াটে,
দুখানি সংকীর্ণ ঘরে শুরু হয় সাধের জীবন ;—
উদয়াস্ত পরিশ্রমে অস্তিত্বের প্রাণান্ত সংগ্রাম,
জীবিকার অন্বেষণে তিলে তিলে জীবনের ক্ষয়।

অচল সংসারযাত্রা টেনে টেনে নাভিশ্বাস ওঠে,
অবশেষে রাজপথে আব্রুহীন শুক্লাভিসারিণী,
অফিসে কেরানী সেজে গৃহলক্ষ্মী চালায় সংসার,—
দুজনের উপার্জনে কোনক্রমে জীবধর্ম চলে।
অভাবে স্বভাব নষ্ট, খ'সে পড়ে বনেদী মুখোশ,
ক্রমশ খাতস্থ হয় অন্ত্যজের অভদ্র জীবন,
ধনিক বন্ধুর কাছে নিতে হয় করুণার দান—
জানি তা দাদন মাত্র পরকীয়া শিকারের লোভে।

ইংরেজী কেতাবে শেখা স্বাধীনতা হয় স্বেচ্ছাচারী—
চিরকেলে সেবাদাসী দিনে দিনে স্বাধীন জেনানা,
আমার বর্বর রক্তে ক্ষেপে ওঠে আদিম পুরুষ,
তাকে আমি শান্ত রাখি সভ্যতার সামমন্ত্র প'ড়ে।
সন্দীপের মোহাকর্ষে উৎকেন্দ্রিতা আমার বিমলা,
আমি নিখিলেশ-শিষ্য, বন্দিনীর খুলেছি শৃঙ্খল ;

আমার বুর্জোয়া তন্ত্রে উমা আর রাধার মিলন,
গৃহে বৃন্দাবন র'চে আমি করি প্রেমের বিলাস।

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' আমাদের অনাচরণীয়,—
অব্যাহত জীবলীলা দরিদ্রের ঘরে অভিশাপ ;
জন্মনিয়ন্ত্রণে তাই দীক্ষা নিয়ে পাশ্চাত্য গুরুর
নিশ্চিন্ত আরামে চলে নিশীথের তমিস্র-বিলাস।
তবু চোখে অশ্রু জমে, কান্না শুনি ভাবী জাতকের,
আমার রক্তের মাঝে শুনি তার জন্মের প্রার্থনা,
দাম্পত্য-মিলনে কাঁদে মানুষের ভাবী বংশধর,
তবু তার মুক্তিপথ অবরুদ্ধ আমাদের পাপে।

যে অটল ভিত্তিমূলে সভ্যতার শাশ্বত আশ্রয়
আজ দেখি সে ভিত্তির চোরাবালি ধ্ব'সে ধ্ব'সে পড়ে,
যে সুন্দর সৌধতলে স্বপ্ন ছিল পূর্বপুরুষের
বিবর্ণ সে সৌধগাত্রে পঞ্জরাস্থি পড়েছে বেরিয়ে।
অতীত হয়েছে মিথ্যা, ভবিষ্যৎ দূর-মরীচিকা,
ভূত-ভবিষ্যৎ হারা অট্টহাসি আমরা স্থবির ;
মগজের আভিজাত্যে ঘৃণা করি ইতর মজুরে,
কাঙাল নয়নে চাই ঊর্ধ্বমুখে ধনীর প্রাসাদে।

তবু মনে স্বপ্ন নামে বাস্তুহারা মধ্যবিত্ত ঘরে,
স্বপ্ন নামে শ্রান্ত চোখে, স্বপ্ন নামে ক্লান্ত ওষ্ঠাধরে,
সৃষ্টির প্রবাহ বেয়ে স্বপ্ন নামে নিস্তেজ শিরায়,
একই জীর্ণ শয্যাপ্রান্তে স্বপ্ন নামে শীর্ণ দুটি দেহে
জানি বন্ধ্যা, তবু সেই অভিশপ্ত স্বপ্ন দেখে দেখে
ব্যর্থ এ জীবনযুদ্ধে উভয়েরই এক পরিণাম ;
আসন্ন ধ্বংসের মুখে সহযাত্রী মরণ-সঙ্গিনী,
প্রলয়ের অন্ধকারে কণ্ঠলগ্না আমার প্রেয়সী।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

মুসাফিরের ডায়েরি

হাতঘড়ি

বৈশাখের দারুণ দীপ্তি ও দাহ শুরু হয়েছে। আকাশে বাতাসে কি জ্বালা, কি তৃষ্ণা! বড় ক্লান্ত ও পথশ্রান্ত লাগছিল। পরম তৃপ্তির সঙ্গে নদীতে অবগাহন শেষে পরিপাটিভাবে বেশভূষা সমাপন ক'রে বিখ্যাত বৈশাখী শুক্লা তিথির উৎসব দেখতে চললুম রাজপ্রাসাদাভিমুখে। গতপ্রায় বসন্তের বাতাসের চকিত সুখস্পর্শ, সঙ্গে পথ-প্রদর্শক।

সহসা ওকে মনে পড়ল, কই, সে কোথায়? আজ তো সে চির-অভ্যস্ত স্থানে নেই, বহুক্ষণ তাকে ভুলে আছি, বিস্মরণের লোকে তাকে বিসর্জন দিয়েছি, মনটা 'হায় হায়' ক'রে উঠল। আজকের এই ঘটনাসহ কতবার তাকে দূরে ফেলে এসেছি, কি নিদারুণ অবহেলাই তাকে সইতে হয়েছে বারংবার। যখনই নিশ্চিন্ত আরাম, স্নিগ্ধতা ও সহজ পরিবেশ পেয়েছি, তখনই তাকে অগ্রাহ্য করেছি, সে বেদনায় নিজেকে লুপ্ত করতে চেয়েছে, আত্মঘাতী প্রয়াস করেছে নিজেকে আমার কাছ থেকে চিরতরে মুছে দেবার, চিরবিচ্ছেদ ঘটাবার। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। একান্ত প্রয়োজনে ওর সাহায্য চেয়েছি, ওর দর্শন-স্পর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছি, চির-অভ্যস্ত পরিচিত স্থানে হাত বাড়িয়েছি, সাগ্রহ আঙুলের স্পর্শ পাঠিয়েছি ওকে অনুভব করার জন্য, দেখেছি, ওর স্থান শূন্য। ওর বহুকালভোগ্য সঙ্গের দাগ রয়েছে আমার মনে প্রাণে, আমার অঙ্গে। শিউরে উঠেছি, না, না, ওকে হারালে চলবে না, ওকে আমার চাই, ওকে না হ'লে আমার একদণ্ডও অচল, সময় যেন স্থাণু হয়ে যায়, সকল কাজ পঙ্গু হয়। জগৎ কোন্ তালে পা ফেলে চলেছে ধরতে পারি না, নিজেকে সবার সঙ্গে চলমান গতিতে মেলাতে পারি না, সকল ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ি, মনে হয়, অনিশ্চয়ের দোলায় দুলছি। শশব্যস্ত হয়ে ওকে খুঁজি, প্রকাশ্য হয়ে ওঠে আমার গোপন ব্যাকুল অনুসন্ধান, সঙ্গীরা আমার চাঞ্চল্য দেখে সহানুভূতিশীল হয়, তারা চতুর্দিকে অনুসন্ধান করে, আবার ওকে ফিরে পাই, পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সানন্দে সোৎসুকচিত্তে ওকে একান্ত বিশ্বাসে হাতে ধ'রে রাখি। ও কখনও কোনও নালিশ জানায় নি, শুধু ওর উদ্বেলিত প্রাণের ধুকধুক শব্দ শুনিয়েছে, ওর সান্ত্বনাময়ী মুখচ্ছবি নির্বাধে মেলে ধরেছে। কান পেতে ওর বুকের ওঠাপড়া ও জীবনের মৃদুমন্দ ছন্দ শুনেছি, ওর প্রসন্ন মুখ দেখেছি, আবার চলার গতি ফিরে পেয়েছি, অলক্ষ্যে মনটা ঝলমল ক'রে

কেউ মাঝারি, কেউবা ছোট। আঘাতের আধিক্যে অনেক সময় কাঠগুলো ফেটে যেতে লাগল। সেই অসুবিধা দূর করবার জন্যে পেরেকের গায়ে খাঁজ কেটে তৈরি হ'ল স্ক্রুপ এবং হাতুড়ির কঠিন আঘাতের বদলে চালানো হ'ল ত্রিমূর্তের জুতসই চাপ। একই পেরেক বিভিন্ন অবস্থায় গোল, চেপটা, চৌকো, খাঁজকাটা প্রভৃতি নানা আকার নিয়েছে এবং তাদের মাথাগুলিও অবস্থাভেদে নানা রকম হয়েছে।

পেরেকের মধ্যে কত যে উপকারী জ্ঞান লুকিয়ে আছে, সেটা সত্যিই বিস্ময়কর। হাতুড়ি বা মুগুরের চাপে প'ড়ে পেরেকের পায়া রীতিমত ভারী হয়েছে। গরু-মোষগুলো যখন আমাদের পূর্বপুরুষদের নাজেহাল করত, তাদের কাবু করা হ'ল মাত্র এক হাত লম্বা খোঁটায়; আর ভেড়া-ছাগলগুলো কায়দা হ'ল আধ হাত লম্বা খোটায়। চির-চঞ্চলা নারীকে যখন পুরুষ মাত্র ঠোঁটের শিষে বা চোখের ইশারায় কাবু করতে পারে নি, অবলা যখন সবলকে "নাকের-জলে চোখের-জলে" করেছিল, তখন মানুষ যে পেরেকটা আবিষ্কার করেছিল, তার নাম 'বিবাহ'; কেউ কেউ বা পেরেকটিকে বেশি মজবুত করবার জন্যে কিছু প্রেমের পান দিয়ে নিয়েছিল। ফলে চঞ্চলার চাঞ্চল্য রীতিমত ক'মে যায়। এই প্রেমের পান-দেওয়া পেরেক থেকে মানবসভ্যতা অশেষ উপকার পেয়েছে।

সভ্যতা যখন গুহা ছেড়ে ঘর-বাড়িতে প্রবেশ করলে, দরকার হ'ল পেরেকের; সে যখন জামা-কাপড়ে উর্ধ্বগমন শেষ ক'রে অধোগমন করলে জুতোয়, দরকার হ'ল পেরেকের। ভগবানের মত বুক ফুলিয়ে পেরেকও আজ গর্ব করতে পারে—যেখানে যেখানে সভ্যতার অস্তিত্ব, হে মানব! সেখানেই আমি আছি। অবস্থাবিশেষে নামের পরিবর্তন থাকলেও আমি আসলে পেরেকই।

পেরেক যে অন্তত দু হাজার বছর আগে ছিল, স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টই তার ধর্ম-সাক্ষী। এই পেরেকই একদিন যীশুর হাতে-পায়ে-বুকে বসেছিল। যীশুবধের ব্যাপারে কাঠের ক্রুশের চেয়ে ঢের বেশি সহায়ক ছিল লোহার পেরেক; তবুও যীশুভক্তদের দৌলতে ক্রুশ হয়ে গেল 'হোলি', আর লোহার পেরেক র'য়ে গেল খ্রীষ্টধর্মের উপেক্ষিত।

শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টখণ্ডী

উঠেছে। সাথীরা আমার এ মানসিক ছন্দপতন লক্ষ্য করে হয়তো হাসাহাসি করেছে, বুঝেছে, কি ব্যর্থ আমার বাহ্'দন্তের ঘোষণা! তাদের কাছে চাতুরি করেছি, পাছে আমার উদ্বেগ অশান্তি লোকগোচর হয়, পাছে তারা আমাকে ওর প্রতি একান্ত আসক্ত অনুরক্ত ভক্তরূপে দেখে, ওর অভাবে আমার হাহাকার শোনে, তাই যোদ্ধার মত ভঙ্গী নিয়ে প্রতিবারই বলেছি, যাক, ও গেছে ভালই হয়েছে। ওকে আর সামলাতে সইতে পারি না। বড় পুরনো হয়ে গেছে ওর সঙ্গ; নিরন্তর আমাকে ঘিরে থাকে, প্রতি মুহূর্তে ওর উপস্থিতি স্মরণ করায়—সর্বদা এমনভাবে আচ্ছন্ন থাকতে ভাল লাগে না, ওর বাঁধনের নাগপাশ থেকে, মসৃণ সর্পিল স্পর্শ থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচলুম, এবার নিজের খুশিমত চলতে পারব। কোন্ অধিকারে ও ছায়ার মত আমার সঙ্গ নেবে? বলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি, কি বৃথা এ আস্ফালন, নিজের অজ্ঞাতসারে মণিবন্ধে হাত বুলিয়ে দেখি, ওর স্পর্শের দাগ রয়েছে সেখানে, ওর শূন্যস্থানে একটা বিবর্ণ রক্তহীনতার ছাপ। মনে মনে কেঁদে বলি, এ আমি কেমন ক'রে ঢাকব, কোথায় লুকাব আমার এ রিক্ততা! আমার দেউলেপনার সাক্ষী হয়ে এ যে সবার চোখে বাজবে!

মনে পড়ে, একদা আমার কৃতকর্মের সুফলতাহেতু আমার পরমপ্রিয় ও শুভাকাঙ্ক্ষীর স্নেহাশিস্‌রূপে অপ্রত্যাশিত ওকে কোন এক মধু-প্রভাতে, কোন এক শুভক্ষণে পেয়েছিলুম। তখন মন ছিল অপরিণত, ভরা যৌবনের উচ্ছ্বাসে ওকে দেখেছিলুম, ওর এগিয়ে চলার স্বচ্ছন্দ গান শুনেছিলুম, ওকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলুম, নিজের করোটিতে স্পর্শ অনুভব করেছিলুম। আমার সপ্রেম দৃষ্টি দিয়ে ওকে কতবার দেখেছি, দেখে বিস্ময়ের সীমা ছিল না, ভাবতুম, এই তো একই জগৎ, এর এক বহুদূরপ্রান্তে ও ছিল, আর এ-প্রান্তে ছিলুম আমি, মাঝে এক গোলার্ধের ব্যবধান। ও এক অচিন দেশের আলো-বাতাসে এক অজানা স্রষ্টার সৃজনে রঙে গানে হাসিতে ভ'রে উঠেছিল ধীরে ধীরে। ওর এই যে প্রাণসঞ্চার, এই যে কলমুখরতা, এ তো আমারই জন্য। কিন্তু কে জানত, এমন যোগাযোগ ঘটবে, সহস্রের মাঝে ওর দেহসুষমায় আমার চোখ ঠেকে যাবে, ওকে আমিই পাব? ওর পরিবেশ ওর সজ্জা সবই যেন অভিনব লেগেছিল, পরম স্নেহে ওকে ছুঁয়েছিলুম। সে একদিন গেছে।

আজ ও একান্ত আমার। আমার চোখের নেশা নেই, হয়তো আমার

অবচেতন অবহেলায় ও আজ ঈষৎ বিষণ্ণ ম্লান। নিরন্তর পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে অবিরাম আমার সেবায় ও নিজেকে উৎসর্গ করেছে। নিরলস ছেদহীন ওর সাধনাফলে আজ ও বিগত-যৌবন। আমার পক্ষ থেকে যে স্বল্প দাবি ওর, তা প্রায়শই অনবধানে মেটাতে পারি নি; যখনই বিস্মৃতি ছুটেছে, নিজের নির্মম ঔদাসীন্য ও ত্রুটি চোখে পড়েছে; অকালে কর্তব্যের সুরে ওকে পাওনা মিটিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তার দ্বারা ওর মানস বৈক্লব্য দূর হয় নি, ও কতদিন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে, পাণ্ডুর হয়েছে ওর দেহজ্যোতি। ওর স্পষ্ট উজ্জ্বল দৃষ্টি আজ স্তিমিত। ওর সজ্জায় লেগেছে অবহেলার ছোঁয়া, ও আজ যেন বৈরাগী। ও আজ স্খলিতগতি, কখনও উদ্যম সংগ্রহ ক'রে প্রাচীন দিনের অনুকরণে চলতে গিয়ে বেশি এগিয়ে যায়, কখনও শ্রান্তিতে ভেঙে প'ড়ে পিছিয়ে যায়, আর সেই স্বাভাবিক পূর্বতন ছন্দ ফিরে পায় না। অনেক জহুরী ওকে দেখে আমাকে ভৎর্সনার সুরে বলেন, এ কি করেছ? এমন অরূপ যে ছিল, তাকে দুঃখে ব্যথায় এমন নিষ্প্রভ প্রাণহীন করেছ কেমন ক'রে, কি নিষ্ঠুর তুমি!

নীরবে মাথা পেতে নিই সকল গঞ্জনা ও অপবাদ। সত্য আমি দোষী, দণ্ডনীয় আমার অমানুষিকতা। আমার রুক্ষতা এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে, আমি ক্বচিৎ এ কথাও মনে ঠাঁই দিয়েছিলুম যে, ও ক্ষয় হয়ে লুপ্ত হয়ে যায় যাক, আমি সুন্দরতর সাথী খুঁজে নেব। নিজের বর্বরতার ঝোঁকে ভুলে গেলুম, পরম অনুরক্ত পতিব্রতা সতীর মত আজীবন সাথীর মত ও আমাকে এ দীর্ঘকাল সুখে দুঃখে, নিদ্রায় জাগরণে ব্যথায় আনন্দে সর্বকালে সর্বরূপে ছায়ার মত অনুসরণ করেছে। বিনা প্রতিবাদে আমার সকল কাজে প্রেরণা দিয়েছে এবং সহায়তা করেছে। ও যে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে, আমার সত্তায় অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, এটাই ভুলেছিলুম। হায় রে অহঙ্কার! বাঙালীর ঘরের দম্ভ ও পৌরুষ প্রকাশের সংস্কার যাবে কোথায়, সে যে আমার রক্তের স্রোতে মিশে আছে।

এবার মোহভঙ্গ হ'ল। মেলায় তামাসা দেখতে চলছিলুম, থমকে দাঁড়ালুম, পথের বাঁকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সঙ্গীকে বললুম, ওর লোকসান আমার কিছুতে সইবে না, কোনমতেই না, যদি ওকে ফিরে পাই ভালই, নচেৎ ওর শূন্যস্থান আর পূর্ণ হবে না। ঘরে আতিপাতি খুঁজে কোথাও পেলুম না, ছুটে ঘাটে গেলুম। চাপা-জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছিল না, টর্চের সন্ধানী

আলো ফেললুম চতুর্দিকে। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল অদূরে ঘাসের ওপর। ওই তো ও ভূমিশয্যায় অভিমানে উপুড় হয়ে প'ড়ে আছে। ছুটে কাছে গিয়ে তুলে নিলুম। বড় শঙ্কা হয়েছিল, কান পেতে ওর স্পন্দন শুনলুম, ও তখনও জীবন্ত প্রাণময়। নিবিড় মমতায় ওকে নতুনভাবে গ্রহণ করলুম। কুঞ্জের মধু উৎসবে দর্শনেচ্ছু যাত্রীদলের স্রোতে মিশে এগিয়ে চললুম। দৃঢ়ভাবে ওকে আঁকড়ে রইলুম, আর যেন ও না হারিয়ে যায়, আর যেন পারিপার্শ্বিকের চাপে এ মুঠি শিথিল না হয়।

"মুসাফির"

৺সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত

গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ফরোয়ার্ড'-এ সম্পাদক শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত বিপ্লবী বীর পুণ্য-স্মৃতি যতীন মুকুজ্জে সম্বন্ধে একটি আলোচনায় সতীশচন্দ্র সেনগুপ্তের একটু পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন. তৎকালীন বিপ্লবকর্মে সতীশচন্দ্র কলিকাতার প্রধান কেন্দ্র এবং দৌলতপুর কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেন। পরিচয়টুকু সংক্ষিপ্ত হইলেও বিপ্লবচেষ্টার পটভূমে ইহা ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল। বিপ্লবের প্রথম যুগে যুবক ও ছাত্রগণকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া যাহারা মনে, প্রাণে, চিন্তায় ও কর্মে তাহাদের বিপ্লবী করিয়া তুলিতে যত্ন করিয়াছিলেন, সতীশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। ইহারা ছিলেন তখন বিপ্লবচিন্তার অনির্বাণ দীপশিখা। বিপ্লবের প্রথম পথ ছিল গোপন পথ, সেই পথে যাত্রীরা অভিসারে যাইত সুগভীর সঙ্গোপনে। তাহারই আনন্দ-বেদনার পরিচয় সতীশচন্দ্রের মধ্যে পাওয়া যাইত। বুদ্ধি, বিদ্যা, চিন্তাশক্তি, হৃদয়বত্তা ও আপনভোলা ভালবাসার বলে সেই নূতন তীর্থের পথে যাত্রী-সংগ্রহে তাঁহার ছিল নিরলস উৎসাহ।

সতীশচন্দ্র খুব দ্রুত উপলব্ধি করেন যে, বিপ্লবচেষ্টাকে গোপন পথ হইতে মুক্তি দিয়া বিস্তৃত রাজপথে আনিয়া জনগণকে তাহার সঙ্গে ছুটাইয়া দিতে না পারিলে এত বড় বিশাল দেশে স্বাধীনতা আনা সম্ভব হইবে না। অভ্যস্ত চিন্তাধারাকে এইরূপে বাঁকপথে ঘুরাইয়া ধরিয়া দূর পর্যন্ত দেখিবার দৃষ্টি, সাহস ও চিন্তাসামর্থ্য তাঁহার ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের এই গোপন প্রচেষ্টার মূল ধারাই যে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে শত ধারায় শত দিকে গণ-আন্দোলনে পরিণত

হইবে, ইহা তিনি বুঝিতেন ও বুঝাইবার যত্ন পাইতেন। এই সময় গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিলেন। গান্ধীজী এ দেশে তখন প্রায় অপরিচিত। তাঁহার শুভাগমন সতীশচন্দ্র কিরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এই প্রবন্ধে তাহার পরিচয় আছে।

রতনমণি চট্টোপাধ্যায়

সতীশচন্দ্র সেনগুপ্তের সঙ্গে আমার যখন পরিচয় হয়, তখন অসহযোগ আন্দোলন শেষ হইয়াছে, এবং কেহ বা কাউন্সিলে, কেহ গঠনকর্মে মন দিয়াছেন। অল্পদিন পরিচয়ের পরে একদিন বিগত আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া সতীশদা বলিলেন, গান্ধীজী আসায় আমরা আজ বুক ফুলিয়ে সদর-রাস্তায় বলতে পারি—স্বাধীনতা চাই। এর আগে সকলের সামনে এ কথা বলার জো ছিল না, পথে চলতে চলতে ছাতার আড়াল দিয়ে মুখ লুকিয়ে পার হয়ে গেছি, পাছে কোনও পরিচিত মানুষ অপ্রত্যাশিত স্থানে আমাদের দেখতে পায়। এ মুক্তি যে কত বড়, তোমরা ঠিক ধারণা করতে পারবে না। কথাটা তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক সতীশদা অত্যধিক ভাবপ্রবণ ছিলেন। আর তাহার চরম প্রকাশ পাওয়া গেল ১৯৩০ সালে প্রথম স্বাধীনতা-দিবসের উৎসবের সময়ে। কংগ্রেস হইতে নির্দেশ আসিল, ২৬এ জানুয়ারি জাতীয়-পতাকা উড়াইয়া স্বাধীনতার সংকল্প-বাক্য পাঠ করিতে হইবে। কলিকাতার পথে পথে প্রতি গৃহে সেদিন ত্রিবর্ণ-পতাকা উড়ানো হইল, কিন্তু সতীশদা শক্তি প্রেসের উপরে কিছুতেই পতাকা উড়াইতে দিলেন না। পরের দিন রাত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সতীশদার মুখে অত্যন্ত থমথমে একটি ভাব লক্ষ্য করিলাম। তিনি কেবল বলিলেন, ভুলি নাই, কারণ ভুলিলে আর নামাইতে পারিব না। আর দুই-চার কথা বলার চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, তাঁহার মন যেন আর বাহিরের কথায় সাড়া দিতেছে না। এমন অবস্থায় উঠিয়া পড়িলাম। তাহার পরদিন প্রেসের জন্য একটি বাড়ি দেখিবার কথা ছিল। সেই উদ্দেশ্যে সকালে শক্তি প্রেসে পৌঁছিয়া শুনিলাম, সতীশদা কাল রাত্রেই সন্ন্যাসরোগে মারা গিয়াছেন। তখনও দোতলার ঘরে চাপা কান্নার রোল শোনা যাইতেছিল।

আমি তখন শ্রীযুক্ত বিপিন গাঙ্গুলী প্রমুখ সতীশদার সতীর্থগণকে সংবাদ দিতে

বাহির হইলাম। বিপিনদা শুনিয়া বলিলেন, আজ সত্যসত্যই আমরা একজন বড় লোককে হারাইলাম।

পরে বাড়িতে অনুসন্ধান করিয়া শুনিয়াছিলাম, পতাকা-উত্তোলনের ব্যাপার লইয়া আমাদের মধ্যে যে তর্ক উঠিয়াছিল, সেই উত্তেজনার বশে সতীশদা গতরাত্রে অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারেন নাই। পরে বউদি যখন অকস্মাৎ টের পাইলেন, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

নির্মলকুমার বসু

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

বাঙালী এতদিন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে চোখে দেখে নি, তাঁহার বাঁশী শুনিয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার অনাথ অসহায় ভারতবাসী নরনারীদের জন্য যখন তিনি, তাঁহার সহধর্মিণী ও তাঁহার পুত্র বার বার জেল খাটিতেছিলেন, তখন বাঙালী এক একবার চোখ মেলিয়া দেখিতেছিল—দক্ষিণ আফ্রিকার সেই প্রকাণ্ড শক্তি ও ত্যাগের স্রোতস্বতীর উদ্ভবস্থল হিমাচলপ্রতিম কর্মবীর গান্ধী। এবার কলিকাতার লোক মোহনদাসের মোহনমূর্তি দেখিয়া চোখ সার্থক করিয়াছে। কিন্তু এ নেতা কেমন নেতা? ধড়াচূড়া পরা লেপাফাদুরস্ত বোলচালওয়ালা নেতা নয়। একটি খাঁটী ষোল আনা নিখুঁত নিরেট আস্ত মানুষ। এ যেন দধীচি মুনির তপস্যাপূত অস্থি দিয়ে গড়া। ভড়ং কায়দা কসরৎ, বক্তৃতার চরকি বাজি কিছুই নাই—আছে একটা সৌম্য-শুভ্র দীপ্তি, ত্যাগ ও সংযমের ছাপ আর মনুষ্যত্বের সুস্পষ্ট প্রকাশ। এঁর কাছে কেমন আপনা আপনি মাথা হেঁট হইয়া যায়, প্রাণ লুটাইয়া পড়ে। ইহাতে মেকি নাই ষোল আনাই খাঁটি সোণা! এমন সব লোককে দেখিয়াই মানুষের আত্মা রাখালবেশ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া নিজের ঐশ্বর্যে দীপ্ত হইয়া উঠে। ইঁহাদের বাঁশী শুনিয়া প্রাণ উদাসী হয়, লোক আর ধৈর্য ধরিতে পারে না। বাস্তবিকই মনে হয় ইঁহারা যেন ভগবানের চাপরাস সঙ্গে করিয়া আসেন। আর মানুষ ভাবিতে থাকে তাহার প্রকৃষ্ট স্বাতন্ত্র্য ইঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলা। এমন লোকের আদর্শ একটা সংক্রামক ব্যাধির মত ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়ে। গান্ধীজিকে দেখিয়া আমরা সেই নরোত্তমকুলের একজনের সাক্ষাৎ পাইলাম। ইনি তরুর মত সহিষ্ণু এবং তৃণের অপেক্ষাও নম্র। কর্মের অভিমান, কর্তৃত্বের অহঙ্কার ইঁহার চরিত্রকে স্পর্শ করিতেই পারে নাই। সেবকের দীনতায় ভক্তের

বিনয়ে গান্ধীর জীবন কি মধুর হইয়া উঠিয়াছে! সবাইকে ভাই বলিয়া যিনি বুকে ধরিবার জন্য ব্যাকুল, সকলের মধ্যে নারায়ণের আবির্ভাব দেখিয়া যাঁহার চিত্ত সেবার নিমিত্ত নিয়তই উন্মুখ, বাঙ্গালী আজ তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে প্রাণের আনন্দে তাহার পরমাত্মীয় বলিয়া বুঝিল। যথার্থ ই গান্ধী মহাশয় People's man—জনসাধারণের আপনার লোক। ইনি একটি দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রীর পুত্র এবং স্বয়ং ব্যারিষ্টার। ইঁহার সহধর্মিণীও মন্ত্রীদুহিতা। গান্ধীজায়া তাঁহার সহধর্মিণীত্ব সার্থক করিয়াছেন। স্বামী যে ব্রত লইয়া নির্যাতন মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, বারংবার জেলে গিয়াছেন, এই মহীয়সী মহিলাও হাসিতে হাসিতে সেই ব্রতপালন করিবার জন্য কারাদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। একবার গান্ধী জেলে খবর পাইলেন তাঁহার পত্নীর কঠিন পীড়ায় জীবন সংশয়। তখন জরিমানার টাকা জমা দিলেই খালাস পাইতেন। কিন্তু এই ত্যাগবীর জেলেই রহিয়া গেলেন; দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন "কর্ত্তব্যের কাছে স্ত্রী পুত্র কিছুই নয়।" তাঁহাকে যতবার আদালতে লইয়া গিয়াছে, তিনি ততবারই বলিয়াছেন "আইনে যতখানি শাস্তির বিধান আছে আপনারা আমাকে তাহার ষোল আনাই দিন। আমার গরীব দুঃখী ভাইদের সঙ্গে সমান দুঃখ সহিতে চাই।" যতকাল প্যাসিভ রেসিষ্ট্যান্স্ চলিয়াছিল, তিনি কুলীর পোষাক পরিয়া কুলীদের সহিত অভিন্ন হইয়া ছিলেন। গান্ধীর চরিত্রের আর একটা জিনিষ—তিনি ভয় কাহাকে বলে জানেন না। গান্ধী ষোল আনা অভীঃ। বেদান্তে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। সর্ব্বভূতে তিনি ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করেন। মানুষ তাঁহার কাছে ঐশ্বরিক শক্তির আধার। আমাদের প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন আচণ্ডালে পায়ে ধরিয়া ভক্তি ও প্রেম বিলাইয়াছিলেন, গান্ধীও সেইরূপ কুলী মজুর ধনী মহাজন সবাইকেই ভালবাসিয়া সকলকে ভাই বলিয়া সকলের সেবাকেই নারায়ণের পূজা, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি স্বার্থশূন্য, ত্যাগদীপ্ত বৈরাগ্যের অবতার। কিন্তু এ বৈরাগ্য কর্ম্মবিমুখ ঔদাসীন্য নয়। এতবড় কর্ম্মী জগতের ইতিহাসে বিরল, বিশেষতঃ আমাদের এই আলস্য ও নৈরাশ্যের দেশে ইঁহার জোড়া খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কত কাজই না ইনি করিয়াছেন! গান্ধী বুঝিয়াছেন "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে"—কাজগুলি না করিয়া গেলে কি করিয়া কর্ম্মের ক্ষয় হইবে? কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিয়া, কাজ ফেলিয়া রাখিয়া মানুষ কেমন করিয়া মুক্ত হইবে?

ইনি কর্মযোগী। নির্দ্বন্দ্ব নিত্যসত্ত্বস্থ আত্মবান্ হইয়া কাজ করিয়া যান। কাহারও প্রতি তাঁহার দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ নাই। বিদ্বেষকে তিনি পাপ বলিয়া গণ্য করেন। তিনি কখনও মোহে বা ক্লৈব্যে কর্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। আপনার মাঝখানে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠ রাখিয়া ভয়ক্রোধমুক্ত হইয়া, অক্ষুব্ধচিত্তে তিনি কর্তব্য পালন করেন। তিনি ভাবেন "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং"—হে নিখিল জগতের জননী, আমি যাহা করিব তাহা তোমারই পূজা। তাই ভয় তাঁহার চরণে আসিয়া প্রণাম করে, দুঃখের কাঁটা ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠে, শাস্তি বিধাতার আশীর্বাদের মত স্নিগ্ধদীপ্তিতে মধুর হয়। এই মহাপুরুষের জীবন শুধু ত্যাগ, কর্তব্যপালন ও নির্ভীকতার ইতিহাস নহে। ইহার শ্রেষ্ঠশিক্ষা—এই কর্তব্যের কাছে আত্মোৎসর্গ, আর সকল কর্মের কর্তা, সর্বকর্তব্যের বিধাতা সেই পরমপুরুষের চরণে আত্মনিবেদন। হাজার হাজার লোক এমন করিয়া সব ছাড়িয়া সমস্ত দুঃখ বেদনা শাস্তি মাথায় ধরিয়া ইজ্জৎ-রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল, তাহার মূলে একটা এতবড় শক্তি, এমন ষোলআনা আত্মোৎসর্গ। কাজ যখন বুদ্ধির দিক হইতে আসে, তখন ত গরিমা ও মহিমার তিলক তাহার ললাটে নাই, সে শুধু লাভের অঙ্ক সঙ্গে করিয়া আনে, বড়জোর মানুষের একটা বড়গোছের স্বার্থের কথা স্পষ্ট করিয়া দেয়। অবশ্য এরূপ কাজও উপেক্ষার বিষয় নয়, মানুষ ইহাকে ছাড়িয়াও টিকিতে পারে না। কিন্তু কর্ম যখন ধর্ম, কর্তব্য যখন প্রাণের ডাক, অন্তরাত্মা যেদিন লাভক্ষতি না গণিয়া পরম প্রেমে সমস্ত বিদ্বেষ ও ভয় ক্রোধের উপরে উঠিয়া কর্মের মর্মে ভগবানের চরণচিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পায়, তখনই নরের মধ্যে নারায়ণের আবির্ভাব, তখনই মূক বাচাল হইয়া উঠে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। মানুষ তখন ছোট নয়, সে বুঝে "শিবোহহং"। বাস্তবিকই যখন এমন একটা বিশ্বাস প্রাণে জাগিয়া উঠে, জীব তখন শিব হইয়া যায়। সে তখন মঙ্গলময়ের অনন্ত করুণার অমৃতস্বাদ লাভ করে। সে তখন বিন্দু নহে সিন্ধু—"The dew drop mingles into the ocean." তাহার হৃদয়ে ভগবানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, সে তখন তাহার ছোটখাট সীমা ভুলিয়া যায়, অসীমের ডাক শুনিতে পায়। আজ আমরা আমাদের মাঝখানে এমনি একটা প্রাণের পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলাম। পরিপূর্ণতার সাধনা, কর্ম ও বৈরাগ্যের সমন্বয়, সংযম ও শক্তির মিশ্রণ, এবং এই সকলের মুকুটস্বরূপ সমস্ত কর্মে জগন্মাতার

পূজার উপলব্ধি মনুষ্যজাতির কত বড় সম্পদ! ইহা মানুষকে বড় করে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া তোলে এবং মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য ছোটে। গান্ধীর ভক্ত ও অনুরক্ত মণ্ডলীর মধ্যে তাই হিন্দু, মুসলমান, পারসী, ইহুদী, খ্রীষ্টান, এসিয়াবাসী ও ইউরোপীয় সকলের মধুর মিলন। সদাশয় পোলাক, ক্যালেনবাক প্রভৃতি তাই গান্ধীর ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কারাগারে যাইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বাঙ্গালী বহুকাল খোসা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছে, এবার সে একবার ভিতরে ঢুকিতে শিখুক, অন্তর হইতে অন্তরে লীন হইয়া যাক। গান্ধীর জীবন তাহার কাছে বেদান্তের সত্য, ঋষিদের সাধনা, ভারতবর্ষের মর্মবাণী স্পষ্ট করিয়া তুলিবে। সে তখন কর্মযোগে নিগূঢ় তথ্য বুঝিবে, তাহার প্রাণে প্রেমের বান ডাকিবে, স্বজাতি, স্বদেশ, স্বধর্ম, বিশ্বমানব ও বিশ্বধর্ম তাহার নির্মল জ্ঞানের, সত্তাশ্রিত কর্মের ও সর্বপ্লাবী প্রেমের দানে তাহার পরিপূর্ণতার পরিচয় পাইবে।

'গৃহস্থ' বৈশাখ ১৩২২ (এপ্রিল ১৯১৫)

ভিক্ষা

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি। খবরের কাগজে খবর বাহির হইল একদিন—উড়িষ্যায় জলপ্লাবন। মহানদীর বুকে প্রচণ্ড প্লাবন নামিয়াছে; বাঁধ ভাঙিয়া তীরবর্তী মাঠ, গ্রাম ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসীদের ঘর ভাঙিয়াছে, সর্বস্ব ভাসিয়া গিয়াছে। দুই বেলা দুই মুঠা অন্নের সংস্থান নাই কাহারও। অনেকের প্রিয় পরিজন মারা গিয়াছে, দুগ্ধবতী গাভী, চাষের বলদ স্রোতের টানে ভাসিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মাঠের শস্য নষ্ট হইয়াছে, মাঠে এখনও জল দাঁড়াইয়া; জল শুকাইয়া গেলেও বীজধান ও বলদের অভাবে চাষ হইবে বলিয়া ভরসা নাই। দুর্গত জনদের সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্য সম্পাদক মহাশয় বাংলার জনসাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন।

সকলে 'হায় হায়' করিয়া উঠিল। বৈঠকখানা, চা-খাবারের দোকান, সান্ধ্য মজলিস, স্কুল-কলেজের মাস্টার-অধ্যাপকদের বিশ্রাম-কক্ষ, উকিলদের বার-লাইব্রেরি আলোচনায় মুখর হইয়া উঠিল। সকলের মনে পড়িল, তাহারা শুধু বাঙালী নয়—ভারতবাসীও; ভারতবর্ষ তাহাদের দেশ; ভারতের প্রত্যেকটি লোক, যে যেখানেই বাস করুক, তাহাদের আপনার জন। দেশপ্রেম, দেশবাসীর প্রতি প্রেম প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল প্রত্যেকের মনে।

স্কুল-কলেজের ছাত্ররা সক্রিয় হইয়া উঠিল সর্বাগ্রে। সংসারের ভার তাহাদের বহন করিতে হয় না, মনটাও হালকা, কাজেই আত্মসর্বস্বতার আবেষ্টনী ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে পারে সহজে, যে কোন হুজুগে মাতিতে পারেও সহজে। তাহা ছাড়া, একটানা স্বাদহীন জীবনে একটা বৈচিত্র্যের লোভ। শহরবাসীদের কাছ হইতে সাহায্য-সংগ্রহার্থে দল বাঁধিয়া বাহির হইবার জল্পনা করিতে লাগিল তাহারা।

আমার ছাত্ররাও বাদ গেল না। আপিসে আসিয়া ভিড় করিল একদিন। ফলে, সভা ডাকা হইল; সভাপতি আমি স্বয়ং। পাণ্ডা ছাত্রেরা বক্তৃতা করিল, শিক্ষকেরাও বক্তৃতা করিলেন। দুর্গত জনগণের দুর্গতির কথা হৃদয়স্রাবী ভাষায় বর্ণনা করা হইল। সর্বশেষে আমিও যথোচিত দরদ দিয়া বক্তৃতা করিলাম। সভায় স্থির হইল—আগামী রবিবার শিক্ষক ও ছাত্রেরা দল বাঁধিয়া সাহায্য ভিক্ষার জন্য শহরে বাহির হইবে।

আয়োজন নূতন করিয়া কিছু করিতে হইল না। সব আগে হইতে করা আছে। আপিসের এক পাশে একটা কাঠের পুরাতন বাক্স পড়িয়া আছে, মিলারের তালা লাগানো। তাহাতেই বন্ধ করা আছে প্রয়োজনীয় উপকরণ। বিশেষ কিছুই না, মাত্র গোটা দুই হাত-চার লম্বা, হাত-দুই চওড়া লাল সালুর পতাকা; তুলা-বসানো বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, একটাতে—দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-সমিতি, আর একটাতে—বন্যা-সাহায্য-সমিতি। সময়োচিত গানও দুইটি রচনা করা আছে। কেবল নামটা বদল করিয়া লইলেই চলিবে। হারমোনিয়ম স্কুলের হস্টেলে আছে। খোল ও মন্দিরা পাওয়া যাইবে স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের বাড়িতে। তিনি পরম বৈষ্ণব, নিত্য সন্ধ্যায় হস্টেলের জনকয়েক ছেলেকে লইয়া গৌরমাহাত্ম্য কীর্তন করেন।

রবিবার সকালে হস্টেলের প্রাঙ্গণে ছেলেরা সমবেত হইল। জনকয়েক শিক্ষকও আসিলেন। হেডপণ্ডিত মহাশয় আমাকে এক পাশে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ফিসফিস করিয়া কহিলেন, দেখুন, ঐ দলের সঙ্গে শহরে গিয়ে কাজ নেই আমাদের। এই রোদ মাথায় ক'রে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা আপনার পোষাবে না, আমারও পোষাবে না। তার চেয়ে উঁচু ক্লাসের জনকয়েক পাণ্ডা ছাত্র নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন নতুনগঞ্জে। শহরের অনেক ছোট-বড় হাকিমদের বাস ওখানে। আমাদের স্কুল-কমিটির হাজরা মশায়ের বাড়ি ও-পাড়ায়।

তা ছাড়া অনেক গণ্য-মান্য ধনী ব্যক্তি বাড়ি ক'রে ওখানে বাস করছেন। গান-বাজনা শুনিয়ে হৃদয় গলাবার দরকার হবে না ওঁদের। সকলেই শিক্ষিত, হৃদয়বান ব্যক্তি। দেশের দুর্দশার কথা মর্মে মর্মে বোঝেন। বদান্যতা সম্বন্ধে সুনামও আছে অনেকের। তা ছাড়া, আমাকে চেনেন সকলে, শ্রদ্ধাও করেন। অনেক দিন ধ'রে অনেক বাড়িতে টুইশনি করেছি, এখনও করছি কিনা। কাজেই একটু ঘুরলেই এত টাকা আদায় হবে যে, সকলের তাক লেগে যাবে। সেটা দরকারও। যে যাই বলুক, আমরা দুজনেই স্কুলের 'হেড' তো! এ ব্যাপারেও সকলের 'হেড'-এ না থাকলে মানাবে কেন?

প্রস্তাবটি অন্যান্য শিক্ষকদের সামনে উত্থাপন করিলাম। কাহারও পছন্দ হইল বলিয়া মনে হইল না। তথাপি, চক্ষুলজ্জার খাতিরে কেহ আপত্তি করিলেন না।

বেলা নয়টার সময়ে দল বাহির হইল। সর্বাগ্রে রহিল বিজ্ঞাপনী পতাকা, দুই প্রান্তে দুইটা বাঁশের কঞ্চি লাগাইয়া টান করিয়া ধরিয়া রহিল দুইজন ছেলে। তাহাদের পিছনে গায়ক ও বাদকেরা। তাহাদের পিছনে লাইনবন্দী অন্যান্য ছেলেরা। লাইনের মাথার দিকে এক পাশে দুইটি ছেলের হাতে ভিক্ষাস্থালী—প্রসারিত একখানা বিছানার চাদর। হারমোনিয়মে সুর বাজিল, খোলে চাঁটি পড়িল, ছেলেরা সমস্বরে গান ধরিল এবং আমাকে শুনাইবার জন্য এক কলি গাহিল। এ কয়দিনেই ছেলেরা গানটি বেশ রপ্ত করিয়াছে। প্রশংসা করিলাম। তারপর গান গাহিতে গাহিতে ছেলের দল শহরের দিকে চলিয়া গেল। আমরাও আমাদের ছোট দলটি লইয়া হাকিমপাড়ার দিকে চলিলাম।

হেডপণ্ডিত মহাশয় হাকিমপাড়ার বদান্য ও বরেণ্য ব্যক্তিদের সম্বন্ধে নানা গল্প করিতে লাগিলেন।

দত্ত সাহেবকে দেখেন নি, মাস্টার মশায়। আগে জজিয়তি করতেন, এখন মোটা পেন্‌শন পান। এ রকম লোক সচরাচর দেখা যায় না। যেমন মিষ্টি কথা, তেমনই মোলায়েম ব্যবহার। দয়া-মায়ার তুলনা নেই। কারও কষ্টের কথা শুনলে চোখ থেকে যেন জলের ফোয়ারা ছুটতে থাকে। দান করবার সময়ে বিচার-বিবেচনা থাকে না। পকেটে যা থাকে, মুঠো ভরতি ক'রে দিয়ে দেন—

কহিলাম, পকেটে কিছু থাকে তো?

নব-বর্ষ

মহাবিষুব সংক্রান্তি শেষ হইয়াছে। তুঙ্গী সূর্য মেষরাশিতে প্রবেশ করিয়াছেন। পুনরায় আমাদের নব-বর্ষ আরম্ভ হইল।

মনে হইতেছে, সূর্য যেন আজ পৃথিবীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিতেছেন, আমার অগ্নিবর্ষী কিরণজাল লইয়া তোমার সমীপবর্তী হইতেছি, তুমি প্রস্তুত আছ তো? তোমার শ্যামতনুর অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, তোমার জলে স্থলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, তোমার বৃক্ষে লতায় জড়ে জীবে সমুদ্রে পর্বতে, তোমার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে জলন্ত তেজের যে প্রদীপ্ত বাণী অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিতে আসিয়াছি, তাহার জন্য প্রস্তুত আছ তো তুমি? তোমার নদী তড়াগ বিশুষ্ক হইবে, তোমার শ্যামল প্রান্তরে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিবে তৃষ্ণার হাহাকার, ছলনার জাল বিস্তার করিবে মায়াময়ী মরীচিকা, ঝঞ্ঝার তাণ্ডবে ছুটিয়া আসিবে উন্মাদিনী কালবৈশাখী, চতুর্দিকে চাহিয়া তোমার ব্যাকুল অন্তর দুঃসহ প্রদাহ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইবে না—এই অগ্নি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত আছ তো কন্যা?

পৃথিবীর উত্তর শুনিতে পাইতেছি।

বৃক্ষে বৃক্ষে স্বর্ণশ্যাম কিশলয়ের সমারোহে, বহুবিধ ফলের সম্ভাবনায়, রঙ্গন করবী বেলা জবা যূথিকার বর্ণসৌরভসম্ভারে, দহিয়াল পাপিয়া টুনটুনি বুলবুলি কোকিল নীলকণ্ঠের সঙ্গীত-বৈচিত্র্যে, অঙ্কুরিত অসংখ্য বীজের ঊর্ধ্বমুখী প্রেরণায়, স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছতর জলধারায়, আকাশের নীলকান্ত প্রশান্তিতে পৃথিবীর সে উত্তর অদ্ভুত।

তাহার কোন শঙ্কা নাই। অফুরন্ত প্রাণ-সম্পদে সে নির্ভীক।

বিচিত্র ভাষায় মনোমোহিনী ভঙ্গীতে অনির্বাণ প্রাণের অনন্ত প্রকাশে সে যেন বলিতেছে, তাম্রবর্ণের অধিপতি হে রক্তশ্যাম ভাস্কর, স্বাগত। হে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ তেজঃপুঞ্জ-প্রদীপ্ত আদিত্য, বহু কোটি বৎসর ধরিয়া বারম্বার তোমার অগ্নিস্রোতে অবগাহন করিয়া পবিত্র হইয়াছি, হে ধ্বান্তারি, এবারও তুমি সমীপবর্তী হইয়া প্রসন্ন মনে আমার সর্বাঙ্গে তোমার অগ্নিধারা বর্ষণ কর, আমি প্রস্তুত আছি।...

ভাবিতেছি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আমরা, আসন্ন অগ্নি-পরীক্ষাকালে আমরাও কি পৃথিবীর মত বলিতে পারিব—আমরা প্রস্তুত আছি?

"বনফুল"

চোখ গোল করিয়া আমার দিকে তাকাইলেন পণ্ডিত মহাশয়; আমার মাথাটা ঠিক আছে কি না সে বিষয়ে যেন সন্দেহ জন্মিল তাঁহার।

কহিলাম, বড়লোকদের টাকা সব ব্যাঙ্কে থাকে কিনা; হঠাৎ কেউ হাত পাতলে তাই কিছুই দিতে পারেন না।

মাথা নাড়িয়া পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, তা থাকে বইকি; এঁরও আছে। তবে শুধু জমিজমার টাকাই তো নয় ওঁর, সাত-পুরুষী জমিদার ওঁরা। গিন্নীর হাতবাক্স সব সময় ঠাসাই থাকে টাকায়, ওঁর পকেটও তাই। তা কি বলছিলাম—হ্যাঁ—দান করবার সময় মাত্রাজ্ঞান থাকে না ওঁর। সেবার একজন গরিব ব্রাহ্মণ মাতৃশ্রাদ্ধের জন্যে কিছু ভিক্ষা করতে এল ওঁর কাছে। গরিবিয়ানা মতে শ্রাদ্ধ, বিশ-ত্রিশ টাকার ব্যাপার। তা দত্ত মশায় করলেন কি, শুনেই একশো টাকার এক কিতে নোট বের ক'রে দিলেন পকেট থেকে। লোকটা তো অবাক। দাঁড়িয়ে ছিল, মাথা ঘুরে ব'সে পড়ল। তারপর চেতনা পেয়ে আশীর্বাদ করবার জন্যে পৈতে বার করতে গিয়ে দেখলে, দত্ত সাহেব চ'লে গেছেন—

কহিলাম, আমাদের কি রকম দেবেন ব'লে মনে হয়?

হেডপণ্ডিত মহাশয় একগাল হাসিয়া কহিলেন, আমাকে তো ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করেন। কমপক্ষে একশো টাকা দেবেন নিশ্চয়ই।··· তারপর গণপতি হাজরাকে তো চেনেনই। আমাদের স্কুল-কমিটির জাঁদরেল মেম্বার। এখানে ওঁর গুরুগম্ভীর চেহারা আর চালচলন দেখে কাছে ঘেঁষা যাবে ব'লেই তো মনে হয় না। কিন্তু আসলে লোকটি ও রকম নয়। আমি ওঁর এক ছেলেকে পড়াতাম কিনা, জানি সব। রামায়ণে রাজর্ষি জনকের কথা পড়েছেন তো? উনিও হুবহু তাই। মস্ত বড় জমিদার, ছ-সাতটা শাঁসালো কয়লা-খাদের মালিক, আয় প্রায় বিশ হাজার টাকা। বাড়ি যদি দেখেন তো চোখ কপালে উঠে যাবে আপনার। আসবাবপত্র যে কত রকমের তার ইয়ত্তা নেই। মোটরগাড়িই চার-পাঁচটা। কিন্তু নিজে থাকেন সাধু-সন্ন্যেসীর মতন। ধ্যান-ধারণাতেই কেটে যায় সারাদিন। দান যে ওঁর কত, তার হিসেব নেই। হাত পেতে কেউ খালি হাতে ফেরে না ওঁর কাছে থেকে। বাড়িতে ঝি-চাকর অগুনতি; দরকার ব'লে নয়, দরিদ্র-প্রতিপালনের জন্যে। ব্যবহারও তেমনই অমায়িক। কেউ গেলে কাছে বসিয়ে আলাপ করেন, চা-খাবার না

খাইয়ে ছাড়েন না। বড়-ছোট ভেদাভেদ নেই। ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব গেলেও যা, আমার মত নগণ্য লোক গেলেও তাই। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট তো হরদম আনাগোনা করেন ওঁর বাড়িতে; হাতের মুঠোর মধ্যে সব, ওঁর পরামর্শ না নিয়ে কেউ কোন কাজ করেন না—

কহিলাম, কত দেবেন আশা করেন?

তর্জনী ও মধ্যাঙ্গুলি বাড়াইয়া পণ্ডিত মশায় কহিলেন, নেহাত কমপক্ষে দুশো টাকা তো বটেই, উপরন্তু সকলকে চা ও খাবার— ।...আর জজ-সাহেব! মাথার ঝাঁকানি দিয়া পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, ও রকম লোক দেখি নি মশায়। মানুষ নয়, শাপভ্রষ্ট কোন দেবতা। এত বড় চাকরি, সারা জেলাটার দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা, অথচ মাটির মানুষ; অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। মুখে সব সময়ে মিষ্টি হাসিটি লেগেই আছে। তা ছাড়া মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য। পুরোপুরি খদ্দরধারী। খাদি প্রতিষ্ঠানের খাঁটি খদ্দর। কথাবার্তা সব বাংলায়, ইংরেজীর ছিটেফোঁটাও নেই। মেমসাহেব বিয়ে করলে কি হয়, এমনই বানিয়েছেন তাকে যে, বাঙালী মেয়েকে হার মানিয়ে দেয়। আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ ঠারিয়া কহিলেন, শাড়ি পরে মশায়, খদ্দরের ক্যাটকেটে শাড়ি; বাংলায় কথা বলে; রান্নাঘরে উবু হয়ে ব'সে কুটনো কোটে, বাটনা বাটে, শাক-চচ্চড়ি-ঝাল-সুক্তনি রাঁধে; শুনেছেন কখনও? পরম বৈষ্ণবের পাল্লায় পড়লে যে ম্লেচ্ছও বৈষ্ণব হয়, কেতাবেই পড়েছেন, প্রমাণ দেখতে চান তো দেখে আসুনগে জজ-সাহেবের বাড়িতে। ছেলেপিলেগুলিও তেমনই তৈরি হচ্ছে। সেদিন ওঁর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি, ওঁর ছোট ছেলেটি ন্যাংটো হয়ে ধুলো ঘাঁটছে বাগানে। ঠিক আমাদের ছেলেদের মতন। দেখেছেন কখনও? সব জজ-সাহেবের শিক্ষা। নিজে যেমন সাদাসিদে, সকলকে তেমনইটি ক'রে তুলেছেন। দেশের লোকের ওপর দরদ কত! কারও কষ্ট শুনলে অস্থির হয়ে যান। স্ত্রীটিও তেমনই। দেবার জন্যে হাত মেলেই আছেন দুজনে। মাসে দু হাজার টাকা মাইনে, সবটাই নাকি দান ক'রে দেন। তবে বেশি দিন নয়—। বলিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া মাথা নাড়িলেন।

কহিলাম, কি ব্যাপার?

চাকরি করবেন না বেশি দিন। গোলামি পোষাচ্ছে না আর। স্বাধীন-চেতা মানুষ তো! গান্ধীজীর আশ্রমে গিয়ে বাস করবেন। স্ত্রীরও তাই

হইছে। নেহাত ওঁর বাবা এখনও বেঁচে। বুড়োর নাকি মত নেই। কোন্ বাবার আর মত থাকে বলুন? বুড়ো যতদিন বেঁচে আছে, কোনমতে চাকরি করবেন তেতো-কথা ক'রে। অত বড় চাকরি মশায়, পেলে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র হয়তো স্বর্গের সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে লুফে নেবে, যে লোক তা পেয়ে ছেড়ে দেয়, সে কি দরের লোক বলুন তো?—বলিয়া একেবারে ধ্যানস্থ হইয়া গেলেন।

কহিলাম, কত দেবেন ব'লে মনে হয়? পণ্ডিত মশায় চোখ বুজিয়াই কহিলেন, যা আমি আঁচ করেছি, তা যদি হয় তো আর কোথাও যেতে হবে না আপনাকে?

মানে?

মুচকি হাসিয়া পণ্ডিত মশায় কহিলেন, হয়তো এক মাসের মাইনেটাই দিয়ে দেবেন। ওই রকমই লোক তো! খবরের কাগজে সব পড়েছেন, দেবার জন্যে ছটফট করছেন হয়তো। তা ছাড়া মস্ত বড় সাহিত্যিক। ঝুড়ি ঝুড়ি বই লিখেছেন। দু-একটা পড়েছেন নিশ্চয়ই?

ঘাড় নাড়িয়া হাঁ জানাইলাম।

পড়বেন বইকি, আপনারও একটু-আধটু ও বাতিক আছে যে! তা একটু যদি পরিচয় দিয়ে দিই তো ছাড়তে চাইবেন না, দেখবেন। আমি একটা-আধটা কবিতা লিখেছি, তাই শুনেই যা খাতির করেন!

আরও নানা ব্যক্তির সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিলেন পণ্ডিত মহাশয়। শুনিয়া এই ধারণা মনের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, ঘণ্টা কয়েক ও-পাড়াটায় ঘুরিলে, পণ্ডিত মহাশয় যতটা বলিয়াছেন ততটা না হইলেও, ভিক্ষালব্ধ অর্থ তিন অঙ্ক ছাড়াইয়া যাইতে পারে।

প্রথমেই আসিলাম একটি ভদ্রপল্লীতে। দুই পাশে সারি সারি একতলা বাড়ি। কয়েকজন শিক্ষক, অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কেরানী, কানুনগো, সাবরেজিস্ট্রার, সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বাস করেন এখানে। কয়েকটা ছোটখাটো দোকান। আমরা গৃহকর্তাদের সঙ্গে দেখা করিলাম না। ছেলেদের উপর ভার দিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। সামান্য খণ্ডযুদ্ধে সেনাপতিদের শক্তিক্ষয় করা সমীচীন নয়। দূরে, মাঠের ওপারে, হাকিমপাড়ার বড় বড় সাদা বাড়িগুলা দেখা যাইতেছিল। ওই দিকে তাকাইয়া ঐ বাড়িগুলির মালিকদের সঙ্গে আসন্ন মোলাকাতের জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে লাগিলাম।

টাকা কিছু আদায় হইল এ পাড়াতে। কেহ আট আনা দিল, কেহ বা এক টাকা। দুই-একজন 'দিতে পারিব না' বলিয়া সাফ জবাব দিল। খান-কয়েক ছেঁড়া ধুতি ও শাড়ি পাওয়া গেল, কিছু চালও। দোকানীরাও দুই-চার আনা দিল প্রত্যেকে। সারা পাড়াটায় ঘুরিয়া দশ-বারো টাকার বেশি আদায় হইল না। কিন্তু ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইলাম না। কারণ, আসন্ন ভূরিভোজনের পূর্বে জলযোগের অকিঞ্চিৎকরতা লইয়া খুঁতখুঁত করা নিরর্থক।

পাড়াটা ছাড়াইয়া বাঁ দিকে বাঁকিলাম। কারণ সোজা রাস্তা ধরিয়া গেলে হাকিমপাড়া পৌঁছিতে অনেকটা ঘুর হয়। কিছুদূর গিয়াই সামনে পড়িল রেলপথ—দুই পাশে, যত দূর চোখ যায়, দুইটি কালো স্থূল সমান্তরাল রেখায় বিসর্পিত। আকাশে শ্রাবণের কড়া সূর্য, এখানে সেখানে রূপার পাতের মত সাদা মেঘের চাংড়া। সূর্যের আলোতে রেলের ঘষা চকচকে ইস্পাতের পাটি চকচক করিতেছে। রেলপথের পাশে খানাগুলা জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। জলের উপরে কলমির দল আর শালুকপাতার সবুজ আচ্ছাদন। শালুকের অজস্র কুঁড়ি ফুটিয়াছে।

আমি ও পণ্ডিত মহাশয়, খানার পাশ দিয়া গিয়া মাঠে পড়িলাম। ছেলে-গুলি রেল-রাস্তার ওপাশে, বোধ হয় এই সুযোগে সিগারেট টানিয়া লইতেছে। বিস্তীর্ণ মাঠ ধানের চারায় সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। বাতাসে চারার মাথাগুলা দুলিতেছে। সারা মাঠের উপর সরসর শব্দ উঠিতেছে।

আলপথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। বড় বড় লোকদের সঙ্গে কি ভাবে কথাবার্তা বলিব, তাহারই মনে মনে মহড়া দিতে লাগিলাম। স্কুলের কাজ লইয়াই সারাদিন ব্যস্ত থাকিতে হয়। বড়লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা করিবার সুযোগ হয় না। অথচ এই সুযোগের লোভেই পাড়াগাঁ ছাড়িয়া শহরে আসিয়াছিলাম। দরিদ্র হইলেও শিক্ষক, সকলে খাতির করিয়া বসাইবে, আপ্যায়নও করিবে। সকলের আশাতীত অপর্যাপ্ত দানে ভিক্ষাথালী অচিরে ভরিয়া উঠিবে। জজ-সাহেবের মত এত বড় গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে দুই দণ্ড কথা বলার সৌভাগ্য কি আর কোনদিন ভাগ্যে জুটিবে? তাহা ছাড়া গণপতি হাজরার স্কুল-কমিটিতে একাধিপত্য। আলাপ-আলোচনায় ওঁর মনের মধ্যে নিজের সম্বন্ধে একটি ভাল ধারণা করিয়া আসিতে পারি তো,

আগামী স্কুল-কমিটিতে মাহিনাবৃদ্ধির জন্ত যে প্রস্তাব করিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি, তাহার মঞ্জুর হওয়ার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে না।

মাঠ পার হইয়া কতকটা কাঁকুরে জমি। একটা বড় অশ্বত্থগাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া ছেলেদের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ছেলেরা আসিতেই তাহাদের সতর্ক করিয়া দিলাম, যে-সে পাড়া নয়, শহরের গণ্য-মান্ত ব্যক্তিদের বাস এখানে। কথাবার্তায় চালচলনে কোন বেচাল বা বেয়াদবি চলিবে না। স্থির হইল, কথাবার্তা যাহা কিছু আমরাই চালাইব। তাহারা বিনীত ও প্রশান্ত ভাবে দূরে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবে। ছাত্রদের আচরণ দেখিয়া শিক্ষকদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে সকলের মনে যেন ভাল ধারণা হয়।

বাঁধানো রাস্তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক ধারে কতকটা অন্তর অন্তর ইলেক্ট্রিকের পোস্ট। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের বাড়ি এ পাড়ায়। কাজেই মিউনিসিপ্যালিটির যাবতীয় সুখ-সুবিধার এ পাড়াতে সুপ্রচুর বর্ষণ ঘটে।

প্রথমেই চেয়ারম্যানের বাড়িতে ঢুকিলাম। দোতলা বাড়ি। সামনে কাঁটা-তারের বেড়া দিয়া ঘেরা প্রশস্ত কম্পাউণ্ড। এখানে সেখানে দুই-চারটা বর্বাতি ফুল ও ফলের গাছ। কাঁকরের অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়া বারান্দায় উঠিলাম। পাশেই বসিবার ঘর। দরজায় সামনে আসিতেই দেখিলাম, একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পিছনে বসিয়া একজন দীর্ঘকায় ফরসা রঙের লোক; মাথায় টাক, গায়ে গেঞ্জি। এপাশে ওপাশে চেয়ারে বসিয়া কয়েকজন ভদ্রলোক। সামনের লোকটি—ইনিই চেয়ারম্যান—টেবিলের উপর দুই হাত রাখিয়া, সামনে ঝুঁকিয়া মৃদুকণ্ঠে কি কথা বলিতেছেন। আর পাশের লোকগুলিও সামনে ঝুঁকিয়া গভীর মনোযোগসহকারে শুনিতেছে। কথাবার্তার দুই-চারটি টুকরা যাহা কানে আসিল, তাহাতে বুঝিলাম, মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধেই কোন গোপন আলোচনা হইতেছে।

গলা ঝাড়িলাম। চেয়ারম্যানের চোখ পড়িল আমাদের উপরে। বিস্ময় ও বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকাইলেন; কুঞ্চনরেখা ফুটিয়া উঠিল কপালে; কহিলেন, কি ব্যাপার?

আগাইয়া গেলাম। দুই-একখানা চেয়ার খালি থাকিতেও বসিতে বলিলেন না। নিজের পরিচয় দিবার পরেও তাঁহার ব্যবহারে তারতম্য দেখিলাম না। কহিলাম, উড়িষ্যায় জলপ্লাবনের কথা—

বাধা দিয়া চেয়ারম্যান কহিলেন, শুনেছি। তা কি করতে হবে আমাকে?

আমরা ভাবছি, কিছু সাহায্য পাঠাব এখান থেকে।

বেশ তো, পাঠানগে।

কহিলাম, এসব গুরুতর ব্যাপক বিপদে আমাদের মত সাধারণ লোকের ব্যক্তিগত সাহায্য তো বড় ; আপনাদের সকলের কাছে—

বাধা দিয়া কহিলেন, মাপ করবেন, সাহায্য-টাহায্য করতে পারব না। আচ্ছা, আসুন আপনারা।

পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে তাকাইলাম। কি রকম অপ্রতিভ ভাব। আগেই বলিয়াছিলেন, ইঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ আছে তাঁহার। কিন্তু ভদ্রলোকের হাব-ভাব দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে তিনি কোন দিন চোখে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। নিজের অবস্থাটু সারিয়া লইবার জন্য পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, মণ্টু কি করছে—

আলোচনা শুরু করিতে উদ্যত হইয়াই এই বাধা পাইয়া চেয়ারম্যান বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কড়া সুরে কহিলেন, মণ্টু নয়, পণ্টু—চাকরি করছে। আচ্ছা, আসুন তা হ'লে।

চলিয়া আসিলাম। ছেলেগুলি বাহিরে দাঁড়াইয়া দোতলার বারান্দায় দর্শনযোগ্য কিছুর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল ; আমাদের দেখিয়াই দৃষ্টি নামাইয়া লইয়া গভীর কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, কত দিলেন সার্‌?

ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, কিছুই না। পণ্ডিত মশায় কহিলেন, দেবে না জানতাম। ভাল নয় লোকটা। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান তো! চোরদের চাঁই।

হাকিমদের বাড়িতেও বিশেষ সুবিধা হইল না। কেহ বাড়িতে নাই, রবিবারের আড্ডা জমাইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন সবাই। বার্তা আসিল ছোট ছেলেমেয়ে অথবা ঝি চাকরের মারফৎ। হয়তো সত্য, কোন কোন ক্ষেত্রে মিথ্যাও হইতে পারে। আমরা যে ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি, এ সংবাদটা চাউর হইয়া গিয়াছে সারা পাড়াতে। সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে সকলে। ইহার জন্য অবশ্য আমিই দায়ী। রাস্তার ধারে একটা প'ড়ো জমিতে কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করিতেছিল। তাহাদের জন-দুইকে ডাকিয়া বলিয়াছিলাম, খোকা খুকু, একটি কাজ কর দেখি ; তোমাদের পাড়ায় ভিক্ষে

করতে এসেছি আমরা। উড়িষ্যায় বন্যায় সব ভেসে গিয়েছে, জান তো? তারই জন্যে। তোমরা বাড়ি গিয়ে তোমাদের বাবা-মাদের খবর দাওগে, আমাদের জন্যে ভিক্ষে সাজিয়ে রাখতে। শুধু সেই দুইজন নয়, সব ছেলেমেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া বাড়িতে খবর দিতে গিয়াছিল, ফল হাতে হাতেই পাইলাম।

ছেলেরা বলিল, আপনাদের দিয়ে হবে না সার্। আমরা যাই। কর্তারা বাড়িতে না থাকেন, কর্ত্রীদের ধরিগে। যুক্তিটি সমীচীন মনে হইল। রাজি হইলাম। এ পদ্ধতিতে দু-চার টাকা আদায় হইল, দু-চারখানা পুরাতন ধুতি-শাড়িও।

আর একটা দোতলা বাড়ির সামনে হাজির হইলাম। সামনে কতকটা জায়গা ছোট ছোট প্রাচীর দিয়া ঘেরা। রাস্তার উপরেই গেট। গেটের পাশে থামে আঁটা মার্বেল পাথরের ফলকে লেখা আছে—রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র বোস, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কলেজের অধ্যাপক। নাম শুনিয়াই চিনিলাম। খুব নামজাদা অধ্যাপক ছিলেন। নামজাদা লেখকও। মাসিকে সাপ্তাহিকে, ইংরেজী বাংলায় ভারী ভারী প্রবন্ধ লিখিয়া দেশের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন।

সামনেই বসিবার ঘর। বাড়ির ভিতরে ঢুকিবার দরজাটা বোধ হয় অন্য পাশে। তাহাই আবিষ্কার করিবার জন্য ছেলেগুলি ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। বসিবার ঘরের সামনে বারান্দায় একটা ঈজিচেয়ারে বসিয়া রায় বাহাদুর। বয়স ষাটের উপর, আধ-পাকা দাড়ি ও গোঁফে মুখ আচ্ছন্ন, মাথায় এলোমেলো বড় বড় আধ-পাকা চুল। চোখে পুরু চশমা। আমরা কাছে আগাইয়া যাইতেই কহিলেন, কে আপনারা? পরিচয় দিতেই কহিলেন, আসুন আসুন, বসুন।—বলিয়া পাশের চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বেশ ভদ্র অমায়িক লোক বলিয়া মনে হইল তাঁহাকে। তাহা ছাড়া, নিজে শিক্ষক তো, শিক্ষকের মর্যাদা রাখিবেন বইকি।

রায় বাহাদুর পুরু চশমার ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, ও ছেলেগুলিও কি আপনাদের সঙ্গে এসেছে? ছাত্র বুঝি আপনাদের? তা অত চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন?

আমাদের আসার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া কহিলাম, ওরা বাড়ির মেয়েদের

কাছে কিছু চায়। রায় বাহাদুর ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, বাড়ির মেয়েদের কাছে কিছু সুবিধে হবে না। ওদের স্থির হতে বলুন।

পণ্ডিত মহাশয়কে ছেলেদের কাছে পাঠাইলাম। রায় বাহাদুর বলিলেন, আমাদের দেশে বন্যার প্রাদুর্ভাব ও তাহার প্রতিকার—এই সম্বন্ধে ১৯৩৩ সালে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। পড়েছিলেন? অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'পড়ি নাই' জানাইতে হইল। রায় বাহাদুর মৃদু হাসিয়া কহিলেন, আজকালকার শিক্ষকরা বাইরের কিছু পড়তে চায় না। নিজেরাও কিছু শেখে না, ছেলেদেরও কিছু শেখাতে পারে না। যাকগে। প্রবন্ধটায় আমি আমাদের দেশে প্রায়ই কেন বন্যা হয়, এবং কি কি উপায় অবলম্বন করলে এ নিবারণ করা যায়, সে সম্বন্ধে বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনাও করেছিলাম। কিন্তু সরকার বা দেশের লোক কেউ কিছু করে নি। ভাল কথা কানের কাছে চেঁচিয়ে বললেও এ দেশের লোক শুনতে চায় না। কিন্তু বিপদে পড়লে ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার ক'রে সকলকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে দেয়। বিপদ কেটে গেলেই আবার নিশ্চিন্ত ব'সে থাকে, প্রতিকার করে না। এদের বিপদে সাহায্য করা উচিত নয়। ভাল ক'রে না ভুগলে এদের চৈতন্য হবে না।

কহিলাম, যারা বিপদে পড়েছে, তারা কেউ আপনার প্রবন্ধ পড়ে নি।

ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া রায় বাহাদুর কহিলেন, তা তো বুঝতেই পারছি, আপনার মত শিক্ষিত লোকই যখন পড়েন নি—

কথাটায় কান না দিয়া কহিলাম, তা ছাড়া এসব বড় বড় সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব সরকারের, দেশের জনসাধারণ কি করতে পারে?

রায় বাহাদুর তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব দিলেন, চীৎকার করতেও তো পারে, এখন যেমন করছে। তখন করলে কাজ হ'ত। আর কোন জোর না থাকুক, গলার জোর তো কম নেই কারও।

পণ্ডিত মহাশয় ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া ছিলেন, কহিলেন, এখন এসব কথা তুলে সাহায্যে পরাঙ্মুখ হ'লে তো চলবে না, ওদের কোন রকমে দাঁড় করিয়ে দিতেই হবে।

রায় বাহাদুর অগ্রাহ্যের স্বরে কহিলেন, যে পারে দিকগে। পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, আপনাদের মত লোক এসব কথা বললে কি চলে? দেশের মাথা আপনারা সব। রায় বাহাদুর কিছুক্ষণ ভাবিয়া হাঁক দিলেন, কে রয়েছিস রে?

কেহ সাড়া দিল না বা আসিয়া হাজির হইল না। বার কয়েক হাঁকাহাঁকি করিয়া রায় বাহাদুর নিজেই উঠিয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেলেন।

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, তর্ক করা কি ওঁদের সঙ্গে চলে? তর্কালঙ্কার সব। সরাসরি আর্জি পেশ করতে হয়। বাড়িতে যখন গেছেন, নিদেনপক্ষে দশ টাকার কম দিতে পারবেন না।

কিছুক্ষণ পরে রায় বাহাদুর ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, খুচরো হবে?

কহিলাম, বেশি টাকার হবে না।

রায় বাহাদুর কহিলেন, বেশি টাকার দরকার নেই, এক টাকার।—বলিয়া একটি আধময়লা এক টাকার নোট বাড়াইয়া দিলেন। কহিলেন, আট আনা পয়সা ফেরত দিন।

দানের বহর দেখিয়া চোখ কপালে উঠিল আমার। হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

রায় বাহাদুর তাগাদা দিয়া কহিলেন, বের করুন পয়সা।

অগত্যা পকেট হইতে একটি আধুলি বাহির করিয়া নামাইয়া দিলাম।

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, গোটা টাকাটাই দিন না। রায় বাহাদুর কহিলেন, ওই খুব দিয়েছি। তাও আপনারা এসেছেন ব'লে। চল্লিশ হাজার লোক আছে শহরে। এর মধ্যে হাজার লোকও যদি আট আনা ক'রে দেয় তো পাঁচ শো টাকা আদায় হবে। সাহায্য হিসেবে একটা শহরের পক্ষে ওই ঢের।

ছেলেদের কাছে আসিতেই তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কত হ'ল সার্? কহিলাম, পণ্ডিত মশায়কে জিজ্ঞাসা কর। পণ্ডিত মশায় কহিলেন, হাড়-কেপ্পন, জানতাম।

আরও কয়েক বাড়ি ঘুরিলাম। অধিকাংশ বাড়িতে কর্তারা অনুপস্থিত, গৃহিণীরা স্নানের ঘরে। দুই-চারটি ছেলেমেয়েদের পুরাতন হাফপ্যান্ট ও ফ্রক পাওয়া গেল। নগদ কিছুই মিলিল না।

কিন্তু ইহাতেও দমিলাম না। দত্ত, হাজরা ও জজ-সাহেব যদি বাড়িতে হাজির থাকেন ও সদয় হন তো সব পরিশ্রম সার্থক হইয়া উঠিবে।

মিঃ দত্তর বাড়ির সামনে হাজির হইলাম। সামনে লোহার গেট; বন্ধ ছিল; খুলিয়া সকলে ভিতরে ঢুকিলাম। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি, আধুনিক কায়দায় তৈয়ারি। সামনে ফুলের বাগান। বাগানটিতে গৃহস্বামীর রুচির

উৎকর্ষ ও যত্নের ঐকান্তিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট। বাগানের মাঝখানে লাল সুরকির অপরিসর রাস্তা। রাস্তা দিয়া গিয়া সকলে বাড়ির সামনে দাঁড়াইলাম। বসিবার ঘরে রেডিও বাজিতেছে, এবং কয়েকটি ছোট-বড় ছেলেমেয়ে জটলা করিতেছে। আমাদের দেখিয়া একটি ছেলে বাহিরে আসিতেই তাহাকে মিঃ দত্ত কোথায় জিজ্ঞাসা করিলাম। ছেলেটি কহিল, বাড়ির পেছনে নতুন বাগান হচ্ছে, সেইখানে আছেন। ওই পাশের রাস্তা দিয়ে যান। —বলিয়া হাত বাড়াইয়া রাস্তাটা দেখাইয়া দিয়া বসিবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

ছেলেদের মিঃ দত্তকে ধরিবার জন্য আদেশ দিলাম। তাহারা চলিয়া গেল। আমরা দুইজনে ধীর-পদে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

মিঃ দত্তর বাগান ও বাড়ি দুইই দেখিবার মত। মফস্বল-শহরে এ রকমটি প্রায় দেখা যায় না। মানুষের টাকা থাকিলেই হয় না, সৌন্দর্যবোধ থাকা চাই। মিঃ দত্তর ইহা যথেষ্ট আছে। ইহার জন্য তিনি প্রশংসার্হ। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় এমন মুখের ভাব করিলেন যে, মনে হইতে লাগিল, যেন সব প্রশংসা তাঁহারই প্রাপ্য। কোন একটা প্রশংসাসূচক মন্তব্য করিলেই তিনি ভাবে-ভঙ্গীতে কথাবার্তায় ইহাই জানাইতে লাগিলেন যে, সৌন্দর্যের কল্পনা তাঁহারা অর্থাৎ তিনি ও মিঃ দত্ত করিয়াছিলেন, এখানের মাটি ও মিস্ত্রীর দোষে তাহা বাস্তবের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে নাই। কাজেই সকলে প্রচুর প্রশংসা করিলেও তাঁহারা মনে তৃপ্তি পান না।

কহিলাম, ভদ্রলোকের সৌন্দর্যের ওপরে যে রকম নেশা, মনটিও তাঁর সুন্দর না হয়েই পারে না। মুখ গম্ভীর করিয়া পণ্ডিত মহাশয় জবাব দিলেন, বলেছি তো সবই, মিলিয়ে দেখবেন।

হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, কাছে-পিঠে কোথায় যেন পুরাতন মালের ব্যাপারীদের নিলামের হাঁক চলিতেছে—চার আনা, চার আনা। থমকিয়া দাঁড়াইলাম। পুরাতন মালের কারবার করেন নাকি মিঃ দত্ত? পণ্ডিত মহাশয় তো সে কথা বলেন নাই! পণ্ডিত মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইলাম। তাঁহারও মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। ব্যাপারটা দেখিবার জন্য পা চালাইয়া দিলাম।

বাড়ির ঠিক পিছনেই কাঠা দশেক জায়গা, উঁচু দেওয়াল দিয়া ঘেরা এক পাশে দরজা। দরজার সামনে দাঁড়াইতেই দেখিলাম, মিঃ দত্ত আসিতেছেন। বেঁটে-খাটো লোকটি; দোহারা গঠন; মাথায় এলোমেলো চুল,

বাইশ

নবগ্রামের জীবন-নাট্যে নূতন অঙ্ক আরম্ভ হয়েছে।

গোপীচন্দ্রের কীর্তিভূমি, গ্রামখানির ইতিহাসে বহু শতাব্দী ধ'রে পতিত প্রান্তর, ইস্কুলডাঙা আজ সমগ্র গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলটির জীবনের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে।

বহু দিন পূর্বে একদা মধ্যরাত্রে গ্রামখানা ধোঁয়ায় ছেয়ে গিয়েছিল; সেই ধোঁয়া দেখে রাধাকান্ত স্বর্ণবাবু বিপদ আশঙ্কা ক'রে ছাদে উঠেছিলেন, দেখতে গিয়েছিলেন আশে-পাশে কোথাও কোন দিকে আগুন দেখা যায় কি না! ধোঁয়ার পিছনে আগুন ছিল নিশ্চয়, কিন্তু সে আগুন কোন বসতিতে লাগে নাই। লেগেছিল গোপীচন্দ্রের লক্ষ লক্ষ ইটের ভাটায়। সেই ইটে গ'ড়ে উঠেছে নবগ্রামের এই নূতন জীবনকেন্দ্র। রচিত হয়েছে নবগ্রামের গ্রাম-লক্ষ্মীর নবরত্নবেদী। সেদিন রাধাকান্ত তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, "আমি স্পষ্ট যেন দেখলাম, মা আবার মুখ ফেরাচ্ছেন। এই কালের গতি—এই নিয়ম। ভারতবর্ষের লক্ষ্মীর রথ ঘুরেছে এই নিয়মে। অযোধ্যা থেকে হস্তিনাপুর, হস্তিনা থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ, ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে হিন্দু-দিল্লী, তারপর পাঠান, তারপর মোগলের দিল্লী; এই পথে পথে চলেছিল লক্ষ্মীর রথ। সেখান থেকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে সে রথ ইংরেজের সৈন্যবাহিনী এবং ধনসম্পদকে অনুসরণ ক'রে কলকাতায় এসে থেমেছে। দিল্লীতে রাজধানী পরিবর্তনের আয়োজন হচ্ছে, কিন্তু লক্ষ্মী এখনও কলকাতা আশ্রয় ক'রে রয়েছেন। নবগ্রামের পল্লীলক্ষ্মীরও রথ চলেছে। মানুষ বুঝতে পারে না, দেখতে পায় না। শতাব্দীতে শতাব্দীতে এক-একবার বুঝতে পারা যায়। মা এবার ওই ইস্কুলের দিকে মুখ ফেরালেন।"

নবগ্রামের জীবন-নাট্যের পটভূমি এখন এই ইস্কুলডাঙা। নামে 'ডাঙা' অর্থাৎ প্রান্তর শব্দটা এখন বেঁচে থাকলেও ডাঙা আর নাই। আগেকার কাল হ'লে 'ইন্দ্রপুরী' শব্দটা ব্যবহার করা যেতে পারত; নূতন অঙ্কে পটভূমিই পরিবর্তিত হয় নি, নায়ক পাত্রপাত্রীরাও নূতন, তাদের চারিত্রিক বিকাশভঙ্গী নূতন, তাদের ভাষা নূতন। সমৃদ্ধ শহরের একটা টুকরো তুলে যেন কেউ বসিয়ে দিয়েছে নবগ্রামের পশ্চিম প্রান্তস্থ বহুকালের পতিত প্রান্তরের উপর। রানীগঞ্জ-টাইলে ছাওয়া বড় বড় গোল থামওয়ালা বারান্দা ঘেরা পাকা ইস্কুল,

মুখে বড় বড় গোঁফ। পরনে ধুতি, কোঁচাটি পেটের নীচে গোঁজা; গায়ে গেঞ্জি। বরাভয়দানের ভঙ্গীতে ডান হাতটি তোলা, এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছাড়া বাকি চারিটি আঙুল প্রসারিত। পুরু ভ্রুর নীচে বড় বড় চোখ দুইটি উত্তেজনায় গোল হইয়া উঠিয়াছে।

রায় বাহাদুর হাঁকিতেছেন, চার আনা, চার আনা। আশেপাশে ছেলের দল সমস্বরে পাল্টা হাঁক দিতেছে, দশ টাকা, দশ টাকা।

হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া রায় বাহাদুর থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আপনার দল বুঝি? আপনি বুঝি স্কুলের মাস্টার? একটি ছেলে বলিল, হেডমাস্টার। রায় বাহাদুর ভ্রূ নাচাইয়া কহিলেন, ওঃ, তাই নাকি! তা হ'লে আট আনাই দেব। কিন্তু তার এক পয়সা বেশি নয়। হঠাৎ পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, ও, পণ্ডিত সঙ্গে রয়েছ বুঝি! জানি, ঘরের শত্রুর উস্কানি না থাকলে এমন হামলা হয় না। পরশু পইপই ক'রে বললাম, রবিবারেও আসবে। খুকীটা সংস্কৃতে কাঁচা। মাসে মাসে দশটা টাকা ঠঙ ঠঙ ক'রে বাজিয়ে দিচ্ছি। তা না এসে এই সব ক'রে বেড়াচ্ছ! যদি দেশবাসীর ওপর এত দরদ তো দেশের একটা মেয়েকে বিনা পয়সায় পড়িয়ে দরদ দেখালেই পার। পণ্ডিত মহাশয় লজ্জিত মুখে কহিলেন, আসব পরের রবিবার থেকে। রায় বাহাদুর কহিলেন, হ্যাঁ, এস; আর এই দলটিকে ডেকে নাও দেখি। বুঝিয়ে ব'লে দাও, আট আনায় সন্তুষ্ট হয়ে স'রে পড়ুক। কহিলাম, হাজার হাজার লোক আশ্রয়হীন, গ্রাসাচ্ছাদনহীন, কত দুঃখে, কত কষ্টে—

রায় বাহাদুর খেঁকাইয়া কহিলেন, জানি জানি, আর বক্তৃতা শোনাবেন না মশায়। হাজার হাজার লোকের কষ্ট তো কি করতে হবে, অ্যাঁ? সব দানখয়রাত ক'রে দিয়ে লোটা-কম্বল সম্বল করতে হবে নাকি? নিজেরা কত দিয়েছেন, এই ছেলেগুলোর বাবারা কত দিয়েছে, শুনি?

একটু রাগ হইল। কিন্তু সামলাইয়া লইয়া কহিলাম, যার যেমন সাধ্য দেব বইকি! তবে আপনার মত লোক—

কড়া সুরে মিঃ দত্ত কহিলেন, আমাকে কি ভেবেছেন বলুন দেখি? সার্ আর. এন., না, বিড়লা? পণ্ডিত বানিয়ে বানিয়ে নানা কথা বলেছে বুঝি? লোকটা যে রকম রটাতে শুরু করেছে, বাড়িতে একদিন ডাকাত পড়িয়ে দেবে দেখছি। পণ্ডিত মহাশয় আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আজ্ঞে না, আমি কিছু বলি

নি। কথায় কান না দিয়া মিঃ দত্ত কহিলেন, যে যাই বলুক, এই আট আনা দিলুম, পছন্দ হয় নিন, না হয় চ'লে যান।—বলিয়া কোমর হইতে একটা আধুলি বাহির করিয়া ছুঁড়িয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। একবার পণ্ডিত মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইলাম। মুখ কাঁচুমাচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি অপদস্থ হইয়াছি বলিয়া নয়, টুইশানিটি হাতছাড়া হইবার ভয়ে। দশ টাকার টুইশানিটি হাতাইবার জন্য দশ দিক হইতে দশ জন হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিবে।

একজন ছাত্রকে বলিলাম, নাও হে তুলে।—বলিতেই ছাত্রটি আধুলিটি কুড়াইয়া লইল। মিঃ দত্তকে কহিলাম, আসি তা হ'লে, নমস্কার। মিঃ দত্ত প্রতিনমস্কার না করিয়া কহিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন। কত ক্ষতি যে করলেন এর মধ্যেই! বাগানে লোক লাগিয়েছি, দেড় টাকা ক'রে দিন-মজুরি। পেছন ফিরলেই ফাঁকি দেয়। এতক্ষণ হয়তো ব'সে ব'সে বিড়ি ফুঁকছে সব। যত সব হাঙ্গামা জুটিয়ে নিয়ে আসবে সবাই।—বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় ভয়ে ভয়ে কহিলেন, আজ বিকেলে আসব, খুকীকে বলবেন।

রাস্তায় আসিয়া কহিলাম, দাতাকর্ণই বটে! পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, এমন করেন না কখনও। রোদে রোদে জনমজুর খাটিয়ে মেজাজটা চ'ড়ে গেছে বোধ হয়। কহিলাম, কি জানি মশায়! চলুন এবার হাজরার বাড়ি। সেখানে ভাগ্যে কি জোটে দেখা যাক।

প্রায় পাঁচ বিঘা জায়গার উপরে গণপতি হাজরার বাড়ি। চারিদিকে ঘন মেহেদী গাছের বেড়া। লম্বায় সিকি মাইলের কম হইবে না। সামনে তিনটা লোহার গেট—দুই প্রান্তে দুইটা, মাঝখানে একটা। এদিকের ও মাঝখানের গেটটায় ভারী তালা লাগানো। মাঝখানের গেটটার সামনে আসিতেই দেখিতে পাইলাম, হাজরা মহাশয় বারান্দায় বসিয়া গড়গড়া টানিতে টানিতে খবরের কাগজ পড়িতেছেন। একটা চাকর উবু হইয়া বসিয়া কলিকায় ফুঁ দিতেছে। আমাদের দিকে চোখ পড়িতেই হাজরা মহাশয় চাকরটাকে কি বলিলেন। চাকরটা ছুটিয়া আসিয়া কহিল, কি খবর, জানতে চাইছেন বাবু

কহিলাম, বন্যায় সাহায্যের জন্যে ছেলেরা সব ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে।

চাকরটা ছুটিয়া গিয়া হাজরা মশায়কে খবর দিয়াই আবার ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া কহিল, আপনাদের যেতে বললেন বাবু। ওই ওপাশের গেটটা দিয়ে আসুন আপনারা।

আশান্বিত হইয়া উঠিলাম। খবর শুনিয়াও যখন আহ্বান করিতেছেন, তখন রিক্তহস্তে ফিরিতে হইবে না। মনের কথাটা পণ্ডিত মহাশয়কে জানাইতেই তিনি সোৎসাহে সমর্থন করিলেন।

দলবল লইয়া হাজরা মহাশয়ের সামনে হাজির হইলাম। একটা ঈজিচেয়ারে প্রায় চিত হইয়া তামাক টানিতে টানিতে খবরের কাগজ পড়িতেছেন হাজরা মহাশয়। পা দুইটি একটি কুশনে-মোড়া ছোট টুলের উপর রক্ষিত। পাশে একটি টিপয়ের উপর জয়পুরী রূপার ফুলদানিতে এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা।

আমাদের দেখিয়া খবরের কাগজ হইতে চশমা-মোড়া চোখ তুলিয়া কহিলেন, কোথা থেকে আসছেন? পরিচয় দিতেই খাড়া হইয়া বসিয়া ভ্রূ নাচাইয়া কহিলেন, ও, আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার আপনি? আমার সঙ্গে আগে দেখা করেন নি তো! কহিলাম, আজ্ঞে, নানা কারণে সময় পাই নি, প্রতিদিনই ভাবি, দেখা করতে আসব—

এক টুকরা হাসি হাজরা মহাশয়ের ঠোঁটে সাপের জিবের মত লিকলিক করিয়া উঠিল; ব্যঙ্গের স্বরে কহিলেন, ও, সময় ক'রে উঠতে পারেন নি বুঝি! হঠাৎ পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে চোখ পড়িতেই কহিলেন, ও, পণ্ডিত মশায়ও সঙ্গে রয়েছেন যে! কি খবর? ছেলেগুলি সব আমাদের স্কুলেরই তো? বিনীতভাবে কহিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, উড়িষ্যার বন্যাপীড়িতদের ওরা কিছু সাহায্য পাঠাতে চায়। সেইজন্যে বেরিয়েছে সব।

হাজরা মুখ গম্ভীর করিয়া ভারী গলায় কহিলেন, এসব কাজে ছেলেদের বেরোতে দেওয়ার কি দরকার? আপনারা একেই পারতেন। এই শ্রাবণ মাসের রোদ; রোদ লাগিয়ে কোন ছেলে যদি অসুখে পড়ে, তার জন্যে দায়ী হবে কে? ছেলেদের বাপ-মারা আপনাদের হাতে ছেলেদের সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। আর আপনারা দায়িত্বজ্ঞানের মাথা খেয়ে তাদের দিয়ে এই সব কষ্ট করিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন! অত্যন্ত অন্যায়। আগামী স্কুল-কমিটির অধিবেশনে

আমাকে এ কথা তুলতেই হবে। প্রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবকেও বলতে হবে।

ঘাবড়াইয়া গেলাম। হিতে বিপরীত হইল যে! কোথায় ভাবিয়াছিলাম, এই সুযোগে আলাপ জমাইয়া মাহিনাবৃদ্ধির আবেদনটার মঞ্জুর হওয়ার পথ পরিষ্কার করিয়া লইব, তাহা না হইয়া দায়িত্বহীনতার দায়ে পড়িয়া গেলাম!

একটি ছেলে কহিল, এই রোদে আমাদের কি হবে, সার্? অন্য দেশে আমাদের বয়সী ছেলেরা রোদে জলে কত যুদ্ধ ক'রে বেড়াচ্ছে। ব্যঙ্গের স্বরে হাজরা মহাশয় কহিলেন, হ্যাঁ বাবা, সব জানি। যুদ্ধ করবার কত তাকত তোমাদের, সব জানা আছে আমার। ডেঁপোমিই শিখেছ শুধু। জরে যখন পড়বে, তখন বুঝবে মজাটা। আমাদের দিকে তাকাইয়া কড়া গলায় কহিলেন, ভিক্ষে করতে আর হবে না, ছেলেদের নিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে যান। ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষের মত না নিয়ে এসব কাজ করবেন না। একটি ছেলে কহিল, রোদে যা ক্ষতি হবার, হয়েই গেছে। রোগ যদি হয়, এতেই হবে। তবে আপনার কথামত আমরা বাড়ি ফিরে যাব, যদি আপনি আমাদের মোটা কিছু ভিক্ষে দিয়ে দেন।

হাজরা মহাশয় কহিলেন, ভিক্ষে আমি দেব না। উড়িষ্যার বন্যাপীড়িতদের জন্যে দয়ার অবতার হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমাদের জেলার জন্যে কোন দিন ভেবেছ কি? আসছে বছর যখন দুর্ভিক্ষ হবে—

ছেলেটি কহিল, দুর্ভিক্ষ হবে কিসের জন্যে? মাঠভরা ধান দেখে এলাম—

ধান নয়, ধানের চারা। কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখেছ? একেবারে শরতের আকাশ। আর বৃষ্টি হবার আশা নেই। এক সপ্তাহ বৃষ্টি না হ'লে চারা সব জ্ব'লে যাবে।

আর একটি ছেলে বলিল, দুর্ভিক্ষ হয় তো বেরোব এমনই ক'রে।

হাজরা মহাশয় ছেলেটার দিকে জ্বলন্ত চোখে একবার চাহিয়া কথাটা অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবেরও এই মত। আসছে বছর দুর্ভিক্ষ হবেই এ জেলায়। এখন থেকে তার জন্যে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। বাইরের জন্যে এক পয়সা খরচ করব না আমরা। আচ্ছা, এস তোমরা।—বলিয়া চাকরকে ডাক দিয়া কহিলেন, স্নানের জল দিতে বল্।

চলিয়া আসিতে হইল। রাস্তায় আসিয়া ছেলেরা গজগজ করিতে লাগিল,

না দেবার ইচ্ছা ছিল তো সামনাসামনি ব'লে দিলেই হ'ত। আধ মাইল হাঁটিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে, পাঁচ কথা শুনিয়ে ফিরিয়ে দেবার কি দরকার ছিল? আমি নীরবে হাঁটিতে লাগিলাম। পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, গ্রহবৈগুণ্য আর কি! তা না হ'লে এই সব লোকদের এমন ব্যবহার! কহিলাম, তা যদি হয় তো জজ-সাহেবের কাছে গিয়ে কাজ নেই, ফিরেই যাওয়া যাক।

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, তা কি হয়! আসা গেছে যখন—। তবে ওখানে বোধ হয় এমনটা হবে না। উনি অন্য ধরনের লোক। চুপ করিয়া রহিলাম।

প্রায় দশ বিঘা জায়গা জুড়িয়া জজ-সাহেবের কুঠির কম্পাউণ্ড। চারিদিকে ছোট প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সামনে অনেকখানি জায়গা পড়িয়া। এখানে সেখানে নানা রকমের ছোট-বড় গাছ। সারা কম্পাউণ্ড জুড়িয়া বর্ষায় বড় বড় ঘাস গজাইয়াছে। দুই প্রান্তে দুইটা গেট। দুই গেট হইতে দুইটি প্রশস্ত কাঁকরের রাস্তা ক্রমে বাঁকিয়া গিয়া গাড়ি-বারান্দার দুই প্রান্তে শেষ হইয়াছে। একটা গেট দিয়া ঢুকিয়া আমরা গাড়ি-বারান্দায় গিয়া পৌঁছিলাম। সামনেই টানা লম্বা বারান্দা। বারান্দার উপরেই পাশাপাশি বড় বড় ঘর। ঘরের দরজায় খদ্দরের রঙিন পর্দা ঝুলিতেছে। সারা বাড়িটা ব্যাপিয়া একটি সতর্ক স্তব্ধতা। বাড়ির ভিতরে কোন লোক আছে বলিয়া মনে হয় না।

ছেলেরা মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা বলিতেছিল। একজন উর্দী-চাপরাস-পরা আরদালী কাছে আসিয়া ঠোঁটের উপর আঙুল দিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, চুপ করুন, সাহেব লেখাপড়া করছেন। লোকটার সন্ত্রস্ত ভাব দেখিয়া ছেলে-গুলি ভয়ে কাঠ হইয়া গেল।

আরদালী ফিসফিস করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি জন্যে এসেছেন? ফিসফিস করিয়া কহিলাম, সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

কার্ড আছে?

নাই; কাগজ আছে, কিন্তু তাহা ছিঁড়িয়া সাহেবের কাছে পাঠানো যায় না। কহিলাম, কার্ড-ফার্ড নেই, দরকারও হবে না। সাহেবকে বলগে, স্কুলের ছেলেরা বন্যার জন্যে ভিক্ষে করতে এসেছে।

আরদালী কহিল, অন্য সময়ে আসতে পারেন না—এতজন না এসে দু-একজন?

কহিলাম, তা কি হয়? আজ রবিবার, তাই আসতে পেরেছি। দিন দিন কি চলে?

আরদালী অনেক ইতস্তত করিয়া কহিল, আচ্ছা, খবর দিচ্ছি গিয়ে।

পণ্ডিত মহাশয়কে কহিলাম, আসবে ব'লে মনে হয় না। পণ্ডিত মহাশয় সাহস দিয়া কহিলেন, কি যে বলেন! দেখুন না, এখনই বেরিয়ে আসবে।

সত্যই বাহির হইয়া আসিলেন। বেঁটে, পাতলা; পাথরের মূর্তির মত কঠিন মুখের ভাব; চোখের দৃষ্টিতে রুক্ষতা; ভ্রূ দুইটির ঈষৎ কুঞ্চন বোধ হয় বিরক্তি-সঞ্জাত। পরনে কোট-প্যাণ্ট, খুব সম্ভব খাদি প্রতিষ্ঠানের খাঁটি খদ্দরের তৈয়ারি। পায়ের জুতা জোড়াটি বিলাতী বলিয়া মনে হইল। বিলাতে থাকিবার সময়ে কিনিয়াছিলেন বোধ হয়; অথবা বিলাতী স্ত্রীর মত এই জিনিসটি বিলাতীই পছন্দ করেন। গটগট করিয়া একেবারে সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে সসম্মানে নমস্কার করিলাম। মাথার মৃদু ঝাঁকানি দিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া, আমার মুখের দিকে তাকাইয়া ভারী গলায় কহিলেন, কি জন্যে এসেছেন? আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, পণ্ডিত মহাশয় ছেলেদের পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমি এক পা পিছাইয়া গিয়া তাঁহাকে আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইলাম। শুধু পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে নয়, আরও অনেকের মুখে ইঁহার বিস্তর প্রশংসা শুনিয়াছি—ইঁহার বিদ্যার, জ্ঞানের, সাহিত্যিক প্রতিভার, সামাজিক সৌজন্যের, দেশমাতৃকার প্রতি নিষ্ঠার, দেশবাসীর প্রতি দরদের। কিন্তু যাহার এত গুণ, তাহার এই চেহারা! এ যেন জমাট অহমিকায় গড়া মূর্তি। আমাকে ছাত্র বলিয়া ভুল করা কিছুতেই সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছেন, আমি একজন শিক্ষক। তবু ইঁহার দৃষ্টিতে অপরিমেয় অবজ্ঞা। কহিলাম, উড়িষ্যার বন্যাপীড়িতদের সাহায্য করবার জন্যে আমরা স্কুলে একটি সাহায্য-সমিতি স্থাপন করেছি; তারই জন্যে ছেলেরা আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইতে এসেছে। নীরসকণ্ঠে জবাব দিলেন জজ-সাহেব, আপনাদের ভিক্ষা দেব কেন?

ঘাবড়াইয়া গেলাম। কি জবাব দিব? ছেলেগুলি ব্যাকুল চক্ষে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া উপযুক্ত জবাব দিবার জন্য নীরব প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। গলা ঝাড়িয়া কহিলাম, ছেলেরা চায় কিছু সাহায্য পাঠাতে। আপনাদের মত শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই তো—

বাধা দিয়া কড়া সুরে কহিলেন, কিছু দেব না।—বলিয়া রাস্তার দিকে এমন ভাবে তাকাইলেন, যেন মনে হইল, ঘাড়ে হাত দিয়া ধাক্কা দিলেন।

ছেলেগুলি আমার মুখের দিকে তাকাইল। কহিলাম, চল তা হ'লে।

চলিয়া আসিলাম। আসিতে আসিতে একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, সাহেব ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন।

বাহিরে আসিয়া ছেলেরা বলিল, আই. সি. এস. ব'লে অহঙ্কারের সীমা নেই লোকটার। ও আবার সাহিত্যিক!

মৃদু হাসিয়া কহিলাম, সাহিত্যিক ব'লেই বাঁচোয়া, কুকুর লেলিয়ে দেয় নি; অন্য আই. সি. এস. হ'লে দিত; অতখানি রাস্তা কুকুরের তাড়া খেয়ে ছুটতে হ'ল হার্টফেল ক'রে মারা যেতাম।

পণ্ডিত মহাশয়কে কহিলাম, এক মাসের মাইনেটাই দিয়ে দেবেন. বলেছিলেন যে! পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, নতুন কিছু লিখছেন বোধ হয়, মনটা এ পৃথিবীতে নেই। কহিলাম, তাই হবে। সেইজন্যে বোধ হয় আপনাকে চিনতে পারলেন না; পৃথিবীর পরিচয় তো—

একটি ছেলে কহিল, ওঁকে দেখতেই পায় নি। উনি তো আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

শহরের দিকে চলিলাম। অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে কি বলিব, তাহা ভাবিতে লাগিলাম। শেষে স্থির করিলাম, কিছুই বলিব না। বাড়িতে বাড়িতে যে খাতির পাইয়াছি, ছেলেরা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। যাহা বলিবার তাহারাই বলিবে।

পাড়া ছাড়িয়া আসিলাম। রাস্তার দুই পাশে বিস্তৃত মাঠ। এখানে সেখানে শেয়াকুলের ঝোপ। এক পাশে, দূরে মাঠের মধ্যে একটি ছোট এক-কুঠরি পাকা ঘর; সামনে এক ফালি বারান্দা। পিছনে ছোট বাগান, চারদিকে কাঁটাগাছের বেড়া। পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও বাড়িটি কার?

পণ্ডিত মহাশয় অবজ্ঞার সুরে কহিলেন, একটা হতচ্ছাড়ার। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিশদ বিবরণ দিলেন, একজন ডেপুটি ছিলেন এ পাড়াতে, তাঁরই বড় ছেলের। ছেলেটা ছোটবেলা থেকেই ডাংপিটে, লেখাপড়া কিছুই করত না। বাপ অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোন রকমে কয়েকটা ক্লাস

এগিয়েই ছেলেটা হাত-পা ছড়িয়ে এমন বসা বসল যে, এক পা আর নড়ল না। বাপ হাল ছেড়ে দিলেন শেষে; ছেলেও স্কুলে নাম কাটিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে এসে বসল। ওদের বাড়ির বাউরী ঝিয়ের চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে ছিল একটা। ওদের বাড়িতে হামেশা আসা-যাওয়া করত। তার সঙ্গে হ'ল ওর ভাব। ভাবটা ক্রমে এমন জমাট আর জটিল হয়ে উঠল যে, ছেলেটা একদিন বাপের কাছে মেয়েটাকে বিয়ে করবে ব'লে বসল। বাপ তো রেগে মার-ধোর করলেন ছেলেকে; ঝিটাকে ছাড়িয়ে দিলেন; মা কান্নাকাটি করতে লাগলেন; কিন্তু ছেলে কিছুতেই গোঁ ছাড়লে না। বাপ শেষে ওকে ত্যাজ্যপুত্র ক'রে বাড়ি থেকে দূর ক'রে দিলেন। ও মাঠের মধ্যিখানে একটা কুঁড়েঘর তুলে, মেয়েটাকে নিয়ে বুক ফুলিয়ে সকলের চোখের সামনে বাস করতে লাগল। বাপ লজ্জায় আর কারও কাছে মুখ তুলতে পারলেন না। সরকারকে ব'লে এখান থেকে বদলি হয়ে গেলেন। এখান থেকে যাবার কিছুদিন পরেই ছেলেটার মা মারা যান। মৃত্যুশয্যায় ছেলেটাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মা। ছেলেটা গিয়েছিল। মা নাকি কিছু টাকা ছেলেটাকে দিয়ে নিজের পায়ে হাত দিইয়ে ওকে দিব্যি করিয়ে নেন যে, ওই কুঁড়েঘরে না থেকে ঐ টাকা দিয়ে যেন সে একটি ছোট বাড়ি করে। সেই টাকাতেই ওই ঘরটা তুলেছিল ছেলেটা।

জিজ্ঞাসা করলাম, চলে কি ক'রে?

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, মোটর চালায়। বাপের মোটর-গাড়ি ছিল তো, তখনই চালাতে শিখেছিল। ও কাজও সব সময় করে না, মাঝে মাঝে বাড়িতে ব'সে থাকে আর দিনরাত মদ খায়। মেয়েটা তখন বিড়ি বেঁধে, কামিনের কাজ ক'রে সংসার চালায়। আজকাল পাঁড় মাতাল। ছোটলোকের সঙ্গে থেকে থেকে আচার-আচরণও ছোটলোকের মতই হয়ে গেছে।

কিছুদূর আগাইয়া আসিতেই দেখিতে পাইলাম, একটি লোক শহরের দিক হইতে সাইকেল চড়িয়া দ্রুতবেগে আসিতেছে। সাইকেলের সামনে একটি চটের থলি ঝুলিতেছে। একটু কাছে আসিতেই দেখিতে পাইলাম, লোকটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হইবে না; ফরসা রঙ, রোদে পুড়িয়া মলিন হইয়া গিয়াছে; পেশল দেহ, চওড়া বুক; মুখের গঠন সুন্দর; পরনে খাকীর হাফপ্যান্ট, হাফশার্ট; পায়ে জুতা; সবই অপরিচ্ছন্ন ও জীর্ণপ্রায়।

পণ্ডিত মশায় ফিসফিস করিয়া কহিলেন, ওই আসছে ছোঁড়াটা। কি পাষণ্ড দেখেছেন? আমার ছাত্র ছিল, অথচ আমাকে দেখতে পেয়েও সিগারেট টানছে!

ছেলেটি আমাদের সামনে আসিয়া নামিল। পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া কহিল, পণ্ডিত মশায় যে, দলবল নিয়ে কোথায় চলেছেন?—বলিয়া সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ছেলেরা অবিলম্বে তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়া আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিল।

লোকটি কহিল, শুনেছিলাম বটে, খবরের কাগজ পড়বার তো সময় পাই না।

একটি ছেলে কহিল, আপনি কিছু দিন।

পণ্ডিত মহাশয় মুখ টিপিয়া হাসিলেন, হাসির অর্থ—বেশ লোকটিকে ধরিয়াছ তোমরা!

লোকটি অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া কহিল, আমি? আমার কাছে তো বেশি কিছু নেই। বেশ, যা আছে তাই দিচ্ছি। একটি ছেলে তাহার সামনে দাঁড়াইয়া হাত পাতিল।

লোকটি পকেট হইতে মনিব্যাগটি বাহির করিয়া ছেলেটির প্রসারিত করতলের উপর উপুড় করিয়া দিতেই মনিব্যাগ হইতে পড়িল—একটি দশ টাকার নোট, দুইখানা এক টাকার নোট, কয়েকটা আনি, দুআনি ও ডবল পয়সা।

লোকটি মৃদু হাসিয়া কহিল, যৎসামান্য দিলাম ভাই। মোটর-ড্রাইভার, এর বেশি দেবার সামর্থ্যও নেই।

পণ্ডিত মহাশয়ের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল।

পাড়ার জমিদার, জজ-সাহেব, হাকিম ও বড় বড় চাকুরিয়াদের কাছে বহু অনুনয়-বিনয় করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় হতাশার যে কালো ছায়া ছেলেগুলির মুখের উপরে জমিয়া উঠিয়াছিল, এই মলিনবেশধারী দরিদ্র যুবকের হৃদয়ের অকুণ্ঠিত ঔদার্যের আলোকে তাহা এক মুহূর্তে মিলাইয়া গিয়া ছেলেদের মুখগুলি অকৃত্রিম আনন্দে ঝলমল করিয়া উঠিল।

সমস্বরে কহিল ছেলেরা, খুব দিয়েছেন। দুপুর পর্যন্ত বড়লোকদের দরজায় দরজায় ঘুরে ঘুরে যা পেয়েছি, তার ঢের বেশি পেলাম আপনার কাছে।

লোকটির মুখে একটি মিষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল।

একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, আপনার বাড়ি কোন্‌খানে?

লোকটি হাসিয়া কহিল, বাড়ি? বাড়ি আমার নেই। আছে একটা কুঁড়ে—ওই যে।—বলিয়া হাত বাড়াইয়া দেখাইল।

ছেলেটি কহিল, ভারী তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল—

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ছেলেরাও একে একে কহিল, আমারও, আমারও—

পণ্ডিত মহাশয় ধমক দিয়া কহিলেন, এখন আর জল খেতে হবে না, বাড়ি গিয়ে খেও।

যুবকটি চিন্তিত মুখে কহিল, জল খাবে? কিন্তু বাড়িতে তো জল নেই। স্ত্রীর অসুখ। জল আনতে পারে নি। বাড়ি গিয়ে আমাকেই আনতে হবে।

পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ হাসি ফুটিল। যুবক কটাক্ষে তাহা দেখিয়া কহিল, অবশ্য আমার স্ত্রী ভাল থাকলেও তার হাতে জল খাওয়া তোমাদের চলত না। আমি কুলীন বামুনের ছেলে বটে, কিন্তু আমার স্ত্রী জাতে বাউরী।

ছেলেদের মুখে ফুটিয়া উঠিল বিস্ময় ও কৌতূহল। যুবক তাহাদের মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া কহিল, অবশ্য মন্ত্র প'ড়ে বিয়ে করি নি তাকে; কিন্তু মন্ত্র প'ড়ে বিয়ে করা অনেক স্ত্রীর চেয়ে সে অনেক ভাল। কিন্তু, ওসব কথা থাক্, তোমাদের পণ্ডিত মশায় হয়তো চ'টে উঠছেন। তা তোমাদের কি ব্যবস্থা করা যায় বল তো? কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল, এক কাজ করা যাক।—বলিয়া সাইকেলের সামনে ঝুলানো চটের থলে হইতে গোটা কয়েক লেবু বাহির করিয়া ছেলেদের হাতে হাতে দিয়া কহিল, এই কটা লেবু আছে সঙ্গে, স্ত্রীর জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তোমরা ভাগ ক'রে খাও।

কয়েকটি ছেলে ক্ষীণ আপত্তি করিল, তা কি হয়? যুবকটি হাসিয়া কহিল, খুব হয়। ভাগ ক'রে খেয়ে নাও সবাই, তেষ্টা কতকটা মিটবে। পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া কহিল, ফলে দোষ নেই, কি বলেন পণ্ডিত মশায়? —বলিয়া সাইকেলে চড়িয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, মাতালগুলোর দিল দরাজ হয় বটে।

আমি এতক্ষণ কোন কথা বলি নাই। এক পাশে দাঁড়াইয়া নীরবে দেখিতে ও শুনিতেছিলাম। এখনও কোন কথা না বলিয়া চলিতে শুরু করিলাম।

শ্রীঅমলা দেবী

কমিশনর সাহেবের পাঠানো প্ল্যান অনুযায়ী ওই রাণীগঞ্জ-টাইলে ছাওয়া গোল থামওয়ালা সুবৃহৎ ডিস্পেন্সারি, বোর্ডিং-হাউস ; তার পাশে নতুন থিয়েটারের স্টেজ, ঝকমকে কয়েকটি দোকান, গোপীচন্দ্রের তৈরি ক'রে দেওয়া একটি সুদৃশ্য একতলা পাকা বাড়িতে সব-রেজিস্ট্রি আপিস ; গ্রামের দিকে ঘেঁষে ছোট একতলা বাড়িতে গার্লস-ইস্কুল, কয়েকটা বাগান, দীঘি, দীঘির বাঁধানো ঘাট, নিজেদের পাকা আস্তাবল, নিজেদের কাছারি-বাড়ি, এই সব নিয়ে নূতন যুগের রীতি ও রুচিসম্মত সমৃদ্ধ শহরের একটা টুকরো। বলতে পারা যায়, নবগ্রামের ডালহৌসি স্কোয়ার। গোপীচন্দ্রের গ্রামের ভিতরের পুরানো বাড়িটাকে বলা যেতে পারে বেল্‌ভেডিয়ার। নবগ্রামের নূতন কালের ভাষায় যে ধরন আমদানি হতে চলেছে, তাতে এই ধরনের উপমা বা ভঙ্গীর প্রাধান্য দেখা দিচ্ছে। গোপীচন্দ্র যে দীঘি কাটিয়েছেন এখানে, যে দীঘির ভিতর থেকে বেরিয়েছে বিষ্ণুমূর্তি, সেই দীঘির নাম তিনি দিয়েছিলেন কৃষ্ণসায়র, বর্তমান-কালের রসিক তরুণেরা ওর নাম দিয়েছে লালদীঘি। নবগ্রামের লালদীঘির পাড়ের উপরেই একটি পাকা দালানে পোস্ট-আপিসও উঠে এসেছে। শুধু নবগ্রামের লালবাজার অর্থাৎ থানাটি যথাস্থানে সেই পুরানো আমলের বাজারের মধ্যেই আছে।

স্বর্ণবাবু নবগ্রামের এ দিকটায় বড় হাঁটেন না। শুধু ওই দিকটা কেন, গ্রামের ভিতরে তাঁর নিজের পাড়ায় যে সীমানাটুকুর মধ্যে তাঁর জ্ঞাতিবর্গের বাস, সাজার ঠাকুরবাড়ি এবং তাঁরই সম-অবস্থাসম্পন্ন হৃতমান বা হতমান রাধাকান্ত ও শ্যামাকান্তের বাস, সেই সীমানাটুকুর বাইরে বড় যান না। বৈকালের দিকে আজকাল নিয়মিত গ্রামপ্রান্তের দেবীস্থান—মহাপীঠে যান, দেবীকে প্রণাম করেন ; কামনাও করেন, কামনা করেন গুপ্তধনপ্রাপ্তির। মাটির তলায় প্রাচীনকালের পুঁতে রাখা রাশি রাশি ধনসম্পদ। "হে জগজ্জননী, স্বপ্নে তুমি স্থান নির্দেশ ক'রে দাও। সেই ধনসম্পদ নিয়ে স্বর্ণভূষণ আর একবার দেদীপ্যমান হয়ে উঠুক, গ্রহণমুক্ত বৈশাখী দ্বিপ্রহরের সূর্যের মত। তোমার এই স্থানটিকে অমরাবতী ক'রে তুলবে।"

মহাপীঠের চারিদিকেও এখন গোপীচন্দ্রের নাম খোদিত করা রয়েছে, এখানেও অনেক কীর্তি ক'রে গেছেন গোপীচন্দ্র। নতুন একতলা একখানি পাকা ঘর তৈরি করিয়ে দিয়েছেন, বারান্দায় মার্বেল দিয়েছেন, মার্বেলের

ধর্মঘট

৫ম দৃশ্য

হরিচরণের বাড়ি। সময় রাত্রি। পর্দা সরলে দেখা গেল, অনীতা হ্যারিকেন জ্বেলে বই পড়ছে। একপাশে একখানা ইজিচেয়ার রয়েছে। সান্ধ্যভ্রমণ সেরে হরিচরণ বাড়ি ফিরছে।

হরিচরণের প্রবেশ

হরিচরণ। হ্যালো গডেস অফ্ লার্নিং! অয়ি বাণী বিদ্যারূপিণী! তুই সরস্বতী দেখছি আজও আবার তোমার ঘাড়ে ভর করেছে?

অনীতা। তুমি আবার ঠাট্টা করছ?

হরিচরণ। তুমি কি আমার ঠাট্টার লোক? বলছিলাম, তোমার কোন্ ইয়ার (year) হচ্ছে?

অনীতা। ওসব ইয়ার-ফিয়ার বুঝি না।

হরিচরণ। আমিও বোঝাতে চাই না। বিয়ে পাসের পর ছেলেমেয়ে পাস তো হয়ে গেছে; এম. এ. পাসটা না হয় এ জন্মের মত তোলা থাক্ না! পরের জন্মের জন্যে একটা কাজ থাকা চাই তো!

অনীতা। পয়সার অভাবে না হয় বাবা আমায় বি. এ., এম. এ. পড়াতে পারে নি; ঘরে ব'সে এক-আধখানা বই পড়লে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

হরিচরণ। মহাভারতের কথা আমার মত জড়-ভরতের মাথায় ঢোকে না, তবে তোমার শখের পড়া চালাতে গেলে কেরোসিনটা যে বাড়ন্ত হয়, সেটা বুঝতে পারি। তেলটা তো আর খোকার মামার বাড়ি থেকে আসে না, তাই তোমায় পড়তে দেখলেই আমার চোখ করকর করে, বুক চড়চড় করে আর মুখ চুলবুল করে।

অনীতা। খোকার মামার বাড়ি থেকেই বা তেল আসতে যাবে কেন? খোকার বাপের বাড়ি যখন তার মায়ের ভাত-কাপড়ের ভারী বোঝাটা বইছে, তখন সামান্য একটু তেলের ভার আর বইতে পারবে না?

হরিচরণ। দেখ, আমি মুখ্খু মানুষ, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারব না, বহুবার বলেছি, আজও আবার বলছি, তোমার লেখাপড়ার তেল যোগাতে আমি পারব না, রাত্তিরে আলো জ্বেলে ওসব হবে না। এতই যখন শখ, দুপুরবেলায় চার ঘণ্টা সুনিদ্রা না দিয়ে লেখাপড়া করলেই পার।

অনীতা। দুপুরে আমায় খালি ঘুমুতেই দেখ।

হরিচরণ। তা ছাড়া আর কি কর? স্কুলে মাস্টারি করতে যাও, না, কলেজে পড়তে যাও?

অনীতা। একদিন যদি বাড়ি থাক, তা হ'লেই বুঝতে পারবে কি করি! ছেলেদের দৌরাত্মির চোটে বাড়িতে টেঁকা যায় না; তার ওপর কাঁথা সেলাই, জামা সেলাই, সাবান কাচা, দৈনিক একটা কাজ তো আছেই। তাই সব কাজ মিটিয়ে রাত্তিরে নিরিবিলিতে একটু পড়ি, তাও রোজ নয়।

হরিচরণ। আহা-হা! তোমার প্রাণে এত ব্যথা, তা আমি জানতুম না; কাল থেকে ছেলের দুধ বন্ধ ক'রে দেব, ওসব বাজে খরচ দরকার নেই, সেই পয়সায় তোমায় পড়বার তেল কিনে দেব।

অনীতা। ছিঃ ছিঃ! কি বলছ তুমি? এতই যদি তোমার চক্ষুশূল হয়, কাল থেকে আর বই ছোঁব না। তুমি নিজে শিক্ষিত, আমি তাই আশা করেছিলুম, আমায় লেখাপড়া করতে দেখলে তুমি খুশি হবে।

হরিচরণ। শুধু খুশি নয়, পরম নিশ্চিন্ত হয়েছি; আমার চাকরি গেলে বা আমি ম'রে গেলে আমার ছেলেমেয়েরা যে উপোস ক'রে মরবে না, এটা কম ভরসার কথা?

অনীতা। আমায় আর চাকরি ক'রে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে কাজ নেই, তোমার ম'রেও কাজ নেই। দোহাই তোমার, বাক্যবাণ আর সহ্য হয় না; তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি, এ জন্মে আমি আর বই ছোঁব না।

হরিচরণ। রাগের মাথায় ফস ক'রে একটা সাংঘাতিক দিব্যি ক'রে বসলে? দেখি, কি বই পড়ছিলে? (বইখানা অনীতার হাত থেকে নিয়ে) সর্বনাশ! এ যে শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য', দাম পাঁচ সিকা; এ যে রীতিমত আগুন নিয়ে খেলা!

অনীতা। কেন, ওতে আবার আগুন কোথায় পেলে? বইখানা তো খুব চমৎকার! শরৎচন্দ্র যে কত বড় দরদী ছিলেন, তা এতেই বুঝতে পারা যায়।

হরিচরণ। এ বই তোমার পড়া উচিত নয়। নারী যে কি অমূল্য রত্ন, আর সেই রত্ন লাভ করতে হ'লে আমাদের কত দাম দেওয়া উচিত, সেটাই শরৎবাবু আমাদের শিখিয়েছেন। পুরুষ-শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' লিখেছেন পুরুষ-পাঠকের জন্যে; তোমাদের পড়া উচিত 'পুরুষের মূল্য' আর সে বই

নারীরই লেখা উচিত। আজ পর্যন্ত কোন নারীই 'পুরুষের মূল্য' লেখে নি, তাই তোমরা আজও আমাদের দাম জান না।

অনীতা। আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের লেখক-লেখিকারা যত বই লিখেছেন, তার প্রায় সবগুলোতেই পুরুষের মূল্যের কথা লেখা আছে। তোমাদের দাম আমরা খুব ভাল রকম জানি, আর নিজেরা সর্বস্বান্ত হয়েও তোমাদের দাম দিয়ে থাকি।

হরিচরণ। কি দাম যে দাও, তা দেখতেই পাচ্ছি; প্রথম দাম অবাধ্যতা, যে কাজ করতে তোমায় বহুবার মানা করেছি, সেই কাজই তুমি করবে।

অনীতা। কি করব বল? তুমি তো আপিস থেকে ফিরে চা খেয়ে বেরিয়ে গেলে আড্ডা দিতে, না হয় তাস খেলতে। আমি বাড়ি ব'সে করি কি বল তো?

হরিচরণ। ব'সে ব'সে ঠাকুরদেবতার নাম করলেই পার, তাতে পরকালেরও কাজ হবে, আর ইহকালেও তেল না পুড়িয়ে সময় কাটবে।

অনীতা। গুরুদেব যখন পরকালের জ্ঞান দিচ্ছেন, তখন এই বয়েস থেকেই শুরু করি। ইহকাল ব'লে তো আর আমাদের কিছু নেই।

হরিচরণ। তোমার বয়েস প্রায় তিরিশ হ'ল না? অবশ্য এটা তোমার উঠতির বয়েস, তাই পরকালটা এখন ভাল লাগবে না। তা হ'লে আর এক কাজ কর, সন্ধ্যে থেকে আমি না ফেরা পর্যন্ত তুমি বরং ঘুমিয়ে নাও; দোহাই তোমার, বাজে তেল পুড়িয়ো না।

অনীতা। তোমার আদেশ মাথা পেতে নিলুম। আজ তো একটু সকাল সকাল ফিরেছ, আজ কি করব বল?

হরিচরণ। আজ আমার একটু পা টিপে দাও, আমি শুয়ে শুয়ে বইটা পড়ি। নারীলাভ হবার ঢের আগে বইটা প'ড়েছিলুম, তোমাদের দামটা ঠিক মনে নেই। আর একবার প'ড়ে দেখি, তোমাদের উচিত দাম আমি দিচ্ছি কি না! (হরিচরণ ইজিচেয়ারটায় পা ছড়িয়ে শুয়ে বই পড়তে লাগল, অনীতা পা টিপতে লাগল)

অনীতা। (স্বগত) আমার শিক্ষিত স্বামী! সুখে থাকব ব'লেই বাবা আমায় লেখাপড়া-জানা বর জুটিয়েছিলেন। বাবা, আজ তুমি স্বর্গ থেকেই

দেখতে পাচ্ছ, তোমার বিদ্বান জামাই আমায় কত সুখে রেখেছে! মূর্খ লোকে বিদ্যেকে ভয় করে, কিন্তু শিক্ষিত লোকে বিদ্রূপ করে।

হরিচরণ। পেয়েছি! পেয়েছি! (লাফিয়ে উঠল)

অনীতা। কি হ'ল? কি পেয়েছ?

হরিচরণ। যা এতদিন খুঁজছিলুম, খুঁজেও যা এতদিন পাই নি, তাই আজ পেয়েছি।

অনীতা। কি পেয়েছ, তাই বল না?

হরিচরণ। পেয়েছি জ্ঞান, তোমার মূল্য। এস, তোমার মূল্য দিই। (হাত ধ'রে জোর ক'রে ঈজিচেয়ারে বসাল) আজ জানলুম, তুমি দেবী আর আমি তোমার দাস। ব'স দেবী এই ঈজিচেয়ারে, আর আমি বসি তোমার চরণ-প্রান্তে; পা দুখানি আমার কোলের ওপর তুলে দাও, ভক্তিগদগদচিত্তে আমি তোমার পদসেবা করি। (ব'সে প'ড়ে পা দুটো টানতে লাগল)

অনীতা। কি ইয়াকি করছ? এমনিতেই তো পাপে ডুবে আছি; দোহাই তোমার, আর পাপ বাড়িয়ো না। (পা সরিয়ে নিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল)

হরিচরণ। তোমার সেবা করার যোগ্যতাও আমার নেই? আমি তোমার মূল্য দিতে চাইছি, কিন্তু তুমি মূল্য ফিরিয়ে দিচ্ছ। ভগবানের কাছে, সমাজের কাছে, শরৎবাবুর কাছে আমি কি কৈফিয়ৎ দেব?

অনীতা। তোমায় কৈফিয়ৎও দিতে হবে না, মূল্যও দিতে হবে না। আবার আমি তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি, আর কোনদিন বই ছোঁব না। ভাত বেড়ে দিচ্ছি, খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়গে যাও। [প্রস্থান

হরিচরণ। লেখাপড়া! স্ত্রীর বিদ্যেচর্চা! ভাত রাঁধব কি আমি? [বেগে প্রস্থান

২য় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

"নিখিল-বঙ্গ-গৃহিণী-রক্ষা-সমিতি"র আপিস-ঘর; সভ্যারা কেউই প্রায় আসেন নি; পর্দা সরলে দেখা গেল, সভাপত্নী, সুজাতা ও কাত্যায়নী খুব কাছাকাছি ব'সে কাগজপত্র দেখাশোনা করছেন। এমন সময় ব'ড়ো কাকের মত চেহারা নিয়ে প্রবেশ করলেন সম্পাদিকা

সম্পাদিকা। ছিঃ ছিঃ! এই আমাদের সোনার বাংলা! ভারতের সবচেয়ে অগ্রগামী প্রদেশ! নিজেকে 'বাঙালী' ব'লে মনে করতে লজ্জা হচ্ছে।

সভাপত্নী। কি রমা, এত চঞ্চল হচ্ছ কেন? একেবারে স্টেশন থেকে না কি?

সম্পাদিকা। হ্যাঁ, বাড়ি গিয়ে নাওয়া-খাওয়া করতে আর প্রবৃত্তি হ'ল না। যা দেখেছি, তাতে আর স্থির থাকতে পারছি না। শহরের লোক আমরা, ট্রাম-বাসে চড়ি, সিনেমা দেখি, নাটক-নভেল পড়ি, সভায় বক্তৃতা দিই, দরকার হ'লে লেকেও ডুবে মরি। নিজেদের কত উন্নত আলোকপ্রাপ্ত ব'লে গর্ব করি। আলোর নীচে কতবড় অন্ধকার যে হাঁ ক'রে আমাদের গিলতে আসছে, তা জানেন আপনারা?

সভাপত্নী। আমি খুব ভাল রকমই জানি। শহর দেখে দেশ চেনা যায় না, তাই তোমায় আমি পাঠিয়েছিলুম শহর থেকে দূরে। দুঃখের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াও, তবেই তো দুঃখ দূর করতে পারবে। যে বিরাট কাজ নিয়ে আমরা নেমেছি, তা সফল করতে হ'লে গ্রামেই আমাদের যেতে হবে।

সুজাতা। দেখুন মিস রায়, আপনি যা দেখেছেন, তার দু-চার কথা আমাদের শোনান। আমরা কিছুই জানি না।

সম্পাদিকা। আপনারা জানবেন কোথেকে? কটা লোকই বা জানে? দেখবার চোখই বা কটা লোকের আছে? হায়, এই আমাদের বাংলা দেশ! এই আমাদের মা-বোন! পেটে ভাত নেই, শরীরে স্বাস্থ্য নেই, দেহে শক্তি নেই, কুড়িতেই বুড়ী আর তিরিশেই জীবন শেষ। তারা হাসে না, কথা কয় না, লেখাপড়া জানে না, আশা-আকাঙ্ক্ষাও তাদের কিছু নেই। তারা জানে শুধু ভাগ্য আর ভগবান, এই দুটি জিনিসের ওপর নির্ভর ক'রেই তারা এগিয়ে চলে মরণের মুখে। মাত্র একটি জিনিস আছে তাদের অপর্যাপ্ত, সেটি সন্তান; বাংলার প্রায় প্রতি ঘরেই পাওয়া যাবে ছটি আটটি ক'রে রুগ্ন মুমূর্ষু ছেলেমেয়ে; মা তাদের আনে, মা-ই বেশিগুলিকে সঙ্গে নিয়ে যায়। অমূল্য জীবনের এতখানি অপচয় পৃথিবীতে আর কোন দেশে হয় না।

কাত্যায়নী। এসব দৃশ্য কি আমাদের নেতাদের চোখে পড়ে না?

সুজাতা। মেয়ে-নেতাও তো কিছু কিছু হয়েছেন, তাঁরাই বা কি করছেন? সাংঘাতিক অবস্থা তো আর একদিনে হয় নি!

সভাপত্নী। নেতাদের কথা আর কি বলব? তাঁরা সকলেই পুরুষ, কাজেই

নারীর ওপর সকলেরই সমান স্বার্থ। কুসংস্কার, অশিক্ষা আর ধর্মাচরণের উঁচু পাঁচিল তুলে তাঁরা নারীকে বন্দী ক'রে রাখেন। রক্তচক্ষুর ভয়ে সে মাথা তুলতে পারে না, মুখটি বুজে পুরুষের সমস্ত দাবি মিটিয়ে যায়।

সুজাতা। পুরুষ-নেতারা না হয় স্বার্থপর, স্ত্রী-নেতারাই বা কি করেন?

সভাপত্নী। তাঁরা সকলেই পুরুষ-ঘেঁষা। পুরুষের হাততালি আর বাহবাতে তাঁরা নেতা হয়েছেন, পুরুষই তাঁদের পিঠ চাপড়ে ঠাণ্ডা ক'রে রাখে। মা-বোনদের দিকে ফিরে তাকাবার তাঁদের অবকাশ কোথায়?

সুজাতা। মিস রায় যা বলছেন, সে তো বড় সাংঘাতিক ব্যাপার; আজই এর প্রতিকার না হ'লে পঞ্চাশ বছর পরে বাংলায় আর নারীজাতিই থাকবে না।

সভাপত্নী। প্রতিকার করবার জন্যেই তো আমাদের এই সমিতির জন্ম; সেদিনও বলেছি, আজও আবার বলছি—এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন করতে হ'লে বাংলার সমস্ত বিবাহিতা নারীকে সমিতির পতাকাতলে সমবেত হতে হবে; অন্যায়ের বিরুদ্ধে সকলকে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে; বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে। তারপরে আমাদের সুদিন আসবে—আসবে সাম্য, সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য, শ্রী।

সম্পাদিকা। যখনই গ্রামের মেয়েদের এই সব আশার কথা শুনিয়েছি, তখনই তাদের মরা মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে; কিন্তু সুখের কল্পনা করবার শক্তিও আর তাদের নেই। তাই তারা মাথা হেঁট ক'রে খালি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। তারা যে কত অসহায়, তা দেখলে চোখের জল সামলানো যায় না। কাজ বড় সোজা নয় সবিতাদি,—"এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"।

সভাপত্নী। কাজ যে সোজা নয়, তা জানি; আর সেইজন্যেই তোমার ওপর ভার দিয়েছি। সমিতির প্রচারের কাজ কতদূর কি করলে?

সম্পাদিকা। আমার যাবার যতদূর সম্ভব, তার ত্রুটি করি নি। যেখানে যেখানে গিয়েছি, বিপুল সাড়া পেয়েছি; স্বেচ্ছাসেবিকারা দলে দলে এগিয়ে এসেছে; বাংলার প্রতি ঘরে তারা সমিতির বাণী প্রচার করবে। আমার বিশ্বাস, বাংলার সমস্ত বিবাহিতাকে সমিতির পতাকা-তলে সমবেত করতে খুব অল্পদিনই লাগবে। আর আমাদের ইস্তাহারগুলো তাড়াতাড়ি

ছাপাবার ব্যবস্থা করুন, সমস্ত কেন্দ্রে এখনও প্রচুর ইস্তাহার পাঠাতে হবে।

কাত্যায়নী। রমা দেবীর কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

সভাপত্নী। আশার কথা শুনলে কার না আনন্দ হয়! তবে আনন্দটাকে এখন কিছুদিন চেপে রাখতে হবে। পুরুষ-মহলে জানাজানি হ'লে সমূহ বিপদ। লড়াইয়ের আগে শত্রুকে কোনও কথা জানাতে নেই।

(নীলিমা আর অনীতার প্রবেশ)

সুজাতা। আরে, তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কত দামী কথা হয়ে গেল, কিছুই শুনতে পেলে না।

সভাপত্নী। আসুন, আসুন। এইবার একটি খুব দরকারী কথা আপনাদের বলছি। কোন কাজ করতে গেলেই সকলের আগে চাই পয়সা। আমরা যে বিরাট কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছি, সেখানে পয়সা ছাড়া এক পা চলবার উপায় নেই। কাজেই আমাদের খুব দরকার একটি ফাণ্ডের। জানি, আপনারা সকলেই রিক্তহস্তা; দু-চারজনের হাতে বাজার-খরচের পয়সাটা আসে, অনেকের স্বামী আবার সেটুকু দিয়েও আপনাদের বিশ্বাস করেন না। তবুও চাঁদা তুলতেই হবে; যত সামান্যই হোক, মাসিক কিছু পয়সা সমিতির ফাণ্ডে প্রত্যেককেই দিতে হবে।

কাত্যায়নী। নিশ্চয়ই দোব; দরকার হ'লে জানাবেন, গায়ের এক-আধখানা গয়না যার যা আছে, তাও আমরা দিতে প্রস্তুত; 'হারিয়ে ফেলেছি' ব'লে না হয় কর্তাদের কাছে বকুনি খাব।

সুজাতা। আজ আমি এই আঙটিটাই দিয়ে দিচ্ছি। (আঙুল থেকে আঙটি খুলে দিলে)

নীলিমা। আমার একটা দুল নিন, দুটো দিলে সন্দেহ করবে। (কান থেকে দুল খুলে দিলে)

অনীতা। আমার তো ভাই গয়নার বালাই নেই, আমার এই এক আনা পয়সা নাও।

কাত্যায়নী। দে দে, তোর এক আনার দাম ষোলো আনারও বেশি। আমি আর সুজাতা চাঁদা তোলার ভার নিচ্ছি, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।

সভাপত্নী। সত্য আর ন্যায় আমাদের দিকে; তার ওপর আছে আপনাদের

সচেষ্ট আন্তরিকতা; কাজেই জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। সকলে এক সুরে বলুন—নিখিল-বঙ্গ-গৃহিণী-রক্ষা-সমিতির জয়!

সকলে। নিখিল-বঙ্গ-গৃহিণী-রক্ষা-সমিতির জয়!

সম্পাদিকা। আপনাদের কণ্ঠে গান বহুদিন আগেই ম'রে গেছে; মরা কণ্ঠেও আজ আপনাদের গাইতে হবে জাতীয় সঙ্গীত; ধরুন সকলে—

(সমবেত সঙ্গীত)

মুক্তি চাই মুক্তি চাই আমরা মুক্তি চাই।
হাতের পায়ের ভাঙব শিকল
আর কোন কাজ নাই।
সকল সভ্য দেশের নারী
দমন করে অত্যাচারী,
সকল রাষ্ট্রে দখল করে
পুরুষ-সমান ঠাঁই।
সেই অধিকার চাই।
চাই নে মোরা থাকতে কারো মুখ চেয়ে,
দয়ার দান দু-এক মুঠো ভাত খেয়ে,—
ছিন্ন ক'রে সকল বাঁধন
মুক্ত জীবন করব যাপন,
বাংলা-মায়ের কন্যা মোরা
সাম্যের গান গাই।
আমরা মুক্তি চাই।

২য় দৃশ্য

সোমনাথের বাড়ি, সন্ধ্যাবেলা; আপিসের পর সোমনাথ বাড়ি ফিরছে, হাতে বাজারের ঝুলি। পর্দা সরল দেখা গেল, সুজাতা ব'সে আছে দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে

সোমনাথ। (প্রবেশ ক'রে) ও মিনু, মিনু, বাজারটা ধর্ তো মা।

অপর দিক দিয়ে মিনু প্রবেশ করলে

মিনু। এস বাবা। (হাত থেকে বাজার নিয়ে রাখলে) বাবা, আজ বিকেল থেকে মায়ের কি হয়েছে; আমাদের খেতে দেয় নি; কোন কাজ করে নি, রান্নাও চড়ায় নি। ওই দেখো না, ঠায় একভাবে ব'সে আছে।

সোমনাথ। অ্যাঁ! (হঠাৎ সাপ দেখলে লোকে যেমন চমকে ওঠে, তেমনই ক'রে চমকে উঠল)

মিহু। (কাঁদো-কাঁদো স্বরে) খোকা, আমি, দিপু কত ক'রে বললুম—মা, খেতে দাও; মা মোটে কথাই কইলে না। খুকুমণিটা মাই খাবার জন্মে কত কাঁদলে, তাকেও মা মাই দিলে না, কেঁদে কেঁদে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সোমনাথ। নিশ্চয়ই তোমরা খুব দুষ্টুমি করেছিলে, তাই রাগ করেছে। আচ্ছা, আমি খেতে দিচ্ছি। (ঝুলির ভেতর থেকে একটা মোড়া বার ক'রে) এই নাও, এতে বিস্কুট আছে, তোমরা সকলে মিলে খাওগে যাও। (মিহুর প্রস্থান) (জনান্তিকে) তাই তো, কি হ'ল? কি অপরাধ করলুম? সকাল পর্যন্ত দেখে গেছি, বেশ প্রসন্নময়ী, হঠাৎ আবার এই ভয়ঙ্করী মূর্তি কেন? (স্ত্রীর প্রতি) ওগো, শুনছ? (দু পা এগিয়ে যায়, চার পা পেছিয়ে আসে) (জনান্তিকে) কি পাপ করলুম? নিশ্চয়ই কোন মহাপাতক হয়েছে, যার ফলে বিয়ে-করা স্ত্রী আপিস-ফেরত কেরানী স্বামীর দিকে আজ ফিরে তাকাচ্ছে না! অপরাধটা জানতে পারলে না হয় ক্ষমা চাই, নাকে-খৎ দিই; কিন্তু সেটা জানা যায় কি ক'রে? আপিস থেকে ফিরে এই যদি স্ত্রীর অভ্যর্থনা হয়, তা হ'লে এবার লোকালয়ে না ফিরে বনালয়েই যেতে হবে। যাবার আগে কারণটা তো জেনে নিতে হবে। (আবার দু পা এগিয়ে যায়, চার পা পেছিয়ে আসে) আরে! খোঁপায় কি একটা কাগজ আঁটা রয়েছে না? খোঁপায় তো মেয়েরা ফুল গোঁজে, না হয় ফিতে বাঁধে; কাগজ আঁটার ফ্যাশান কবে হ'ল আবার? অনেক মেয়ের খোঁপাই তো চোখে পড়ে, কাউকে তো কাগজ আঁটতে দেখি নি। অপরূপ সাজ, অসাধারণ আচরণ, ব্যাপারখানা কি? (পা টিপে টিপে খোঁপা লক্ষ্য ক'রে একটু এগিয়ে গেল) কি লেখা রয়েছে না? "বাংলার গৃহিণীরা চায় মেয়েমানুষের মত বাঁচতে।" সর্বনাশ! এ তো দেখছি ধর্মঘটের প্রথম অঙ্ক! ঘরে ঘরে বাংলার গিন্নীরাও কি শেষে ধর্মঘট করবে না কি? কই, এই দুঃসংবাদ কোন খবরের কাগজেই তো দেখি নি! সবই যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে; আসল খবর দেবে কে? ইনি তো অ্যাটম্-বোমাটি হয়ে ব'সে আছেন; ফাটবেন যখন, তখন হয়তো আমার সবংশে

নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। (মিনুকে ডাকলে) ও মিনু, মিনু! শিগগির শুনে যা একবার।

মিনু। (প্রবেশ ক'রে) কি বাবা ?

সোমনাথ। দেখ্, তোর মায়ের খুব সাংঘাতিক অসুখ; তোরা আর ওকে মোটেই বিরক্ত করিস না, ওর কাছে যেতেও চাস না।

মিনু। (কাঁদো-কাঁদো স্বরে) আমার বড় ভয় করছে; মায়ের কি অসুখ বাবা ?

সোমনাথ। এ বড় সাংঘাতিক অসুখ মা; ডাক্তার কবিরাজ হাকিম বদ্যি রোজা কেউই এ রোগ সারাতে পারে না; এর নাম ধর্মঘট-জ্বর; এ জ্বর যাকে ধরে, তাকে একটু কাহিল করে বটে, কিন্তু আর পাঁচজনকে নাকানি-চোবানি খাওয়ায়। যাই হোক, তোরা ওকে আর বিরক্ত করিস না, আমি এক্ষুনি আসছি। [প্রস্থান

ঝি খেঁদীর মার প্রবেশ

খেঁদীর মা। কি গো দিদিমণি, বাসনগুলো কি আজ আর মাজতে হবে না ? এইবার নিয়ে তো চারবার আসা হ'ল; মা-ঠাকরুণ যে কি গোঁ ধ'রে ব'সে আছেন, জানি না। রান্নাঘরের চাবিটা খুলে দিলেই তো আমি কাজ সেরে চ'লে যাই বাপু।

মিনু। না গো দিদি, গোঁ নয়; মায়ের ভারী অসুখ। আপিস থেকে এসেই সব শুনে বাবা বেরিয়ে গেলেন, বোধ হয় ডাক্তার ডাকতে গেছেন।

খেঁদীর মা। কি অসুখ গো দিদিমণি ? দিব্যি তো গ্যাট হয়ে ব'সে আছেন দেখছি।

মিনু। কি একটা জ্বরের নাম করলেন; অসুখটা নাকি খুব ছোঁয়াচে; বাড়ির সকলকে নাকানি-চোবানি খাওয়ায়।

খেঁদির মা। তা তো দেখতেই পাচ্ছি; সকলের আগে আমিই নাকানি-চোবানি খাচ্ছি। রোগের পায়ে গড় বাবা! আজ আর আমি আসব না, দরকার হ'লে বাসনগুলো নিজেরাই মেজে নিও; কাল আবার ভোরে আসব। [প্রস্থান

মিনু। ওমা! মা! হে মা কালী! মায়ের অসুখ ভাল ক'রে দাও মা।

উপরে খোদিত করা আছে চরণাশ্রিত গোপীচন্দ্র। সামনে পাকা নাটমন্দির; তাতেও গোপীচন্দ্রের দানই প্রধান দান এবং তাঁরই চেষ্টায় কলকাতার বহু ধনী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অনেক টাকা সংগৃহীত হয়েছে। নাটমন্দিরের পর বেশ বড় একটি পুকুর; পুকুরের ঘাটের মাথায় দুটি শিবমন্দির, সেও গোপীচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত। পুকুরের বাঁধানো ঘাট, এই ঘাটটি বাঁধিয়ে দিয়েছেন স্বর্ণবাবু। সিমেন্টের উপরে তাঁর নাম খোদিত ক'রে দিতে তিনি ভোলেন নাই, কিন্তু যাত্রীর পায়ে পায়ে সিমেন্টের সঙ্গে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে সে নামের চিহ্নও নাই। রাধাকান্ত আবার তাঁর চেয়েও স্থূলবুদ্ধি ছিলেন। এখানে তিনিও তাঁর সাধ্যমত দান ক'রে গেছেন। তার সংবাদও কেউ জানে না। জানাবার কোন ব্যবস্থা তিনি করেন নাই। দানগুলি অবশ্যই ছোটখাট, বিশিষ্ট দানের মধ্যে তিনি কয়েক শত টাকা খরচ ক'রে এই পুকুরটির পঙ্কোদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন। তার সকল চিহ্নই ঢাকা পড়েছে পুকুরের জলে। জলে দাগ কাটে না, সেখানে নাম লেখার উপায় নাই।

বৈকালে স্বর্ণবাবু কলকাতার ভদ্রলোকটিকে নিয়ে মহাপীঠে গেলেন। ভদ্রলোকটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, কর্মপ্রবণ স্বভাবের লোক, গোপীচন্দ্রের কীর্তিভূমি তিনি নিজেই ঘুরে ফিরে দেখে এসেছেন। ওই দেখার মধ্যে সম্পদের পরিমাপের একটা অঙ্কও ক'ষে নিয়েছেন। আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখাও করেছেন, কয়েকজনের নামও সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। মহাপীঠ যাওয়ার সময় ক'রে উঠতে পারেন নাই, অথচ মহাপীঠে দেবীকে প্রণাম না ক'রে যেতেও পারেন না, সুতরাং স্বর্ণবাবুর সঙ্গে খুব আনন্দের সঙ্গেই গেলেন।

বললেন, কলকাতার যাঁরা বাসিন্দে, বুঝলেন না, তাঁদের দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি পাড়াগাঁর লোকদের চেয়ে অনেক বেশি। কোন বিজ্‌নেস আমরা কালীঘাটে পূজো না দিয়ে ক্লোজ করি নে। সায়েবী কেতায় সাজানো আপিসে গণেশের মূর্তিটি আমাদের দরজার মুখেই ব্র্যাকেটে সাজিয়ে রাখি। আপিসের কাপড়-চোপড় রাখবার জন্যে বাড়িতে আলাদা র‍্যাক থাকে আমাদের। লক্ষপতি কোটিপতিকেও আপনি কখনও কাপড় প'রে শৌচে যেতে দেখতে পাবেন না, আমরা গামছা প'রে শৌচে যাই। অবিশ্যি সায়েব হয়ে গেছে এমন লোকও আছে। তারা প্রায়ই ব্যারিস্টার, ডাক্তার, মানে বিলেত-ফেরতের দল।

আট বছরের বড় ছেলে খোকার প্রবেশ

খোকা। দিদি, মায়ের কি হ'ল ভাই? আমাদের আজ কিছু খেতে দেবে না? বড্ড খিদে পেয়েছে, তুমি খেতে দাও ভাই।

মিনু। লক্ষ্মী সোনা, আর একটু সবুর কর্ ভাই; আমার কাছে তো আর কিছু নেই; বাবা এক্ষুনি আসবে, এলে পরে আমরা সকলেই খেতে পাব।

খোকা। বাবা আসুক, এলে আমি সব বলব; আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে, তোমায় কি বলব ভাই! উঃ! মা-টা কি পাজি!

মিনু। না রে, ও কথা বলিস নি; মায়ের ভারী অসুখ; বাবা বোধ হয় ডাক্তার ডাকতে গেছেন।

খোকা। ঠিক হয়েছে; আমাদের যেমন খেতে দেয় নি, তেমনই অসুখ হয়েছে, এখন নিজেই খেতে পাবে না।

মিনু। ছিঃ! ও কথা বলতে নেই, মা হয় যে! অসুখ ভাল হয়ে গেলে আবার মা আমাদের খেতে দেবে। তুই এখানে একটু ব'সে থাক্, আমি খুকুমণিকে একবার দেখে আসি। [প্রস্থান

৩য় দৃশ্য

গণেশবাবুর বাড়ি, সন্ধ্যার পর। পর্দা উঠলে দেখা গেল, গণেশবাবু চা খাচ্ছেন, কাত্যায়নী পাখার বাতাস করছেন। ভেতর থেকে সোমনাথ ডাকলে, দাদা, বাড়ি আছ?

গণেশ। কে, সোমনাথ নাকি? এস ভায়া। (সোমনাথের প্রবেশ) ব্যাপার কি? বউমা কি আজ বাড়িতে ঢুকতে দেন নি নাকি?

কাত্যায়নী। কি ঠাকুরপো? আপিসের পোশাক না-ছেড়েই যে চ'লে এসেছ? গুরুতর কিছু হয়েছে নাকি?

সোমনাথ। বউদি, দয়া ক'রে এক কাপ চা খাওয়াবেন? কষ্ট দিচ্ছি, কিছু মনে করবেন না।

কাত্যায়নী। ছিঃ! ও কথা ব'লো না ভাই; ব'স, এক্ষুনি চা আনছি, তৈরি করাই আছে। [প্রস্থান

সোমনাথ। দাদা, বাঘের ঘরেই ঘোগের বাসা হয়েছে; আমরা এদিকে আপিসে আপিসে ইউনিয়ন-ধর্মঘট নিয়ে ক্ষেপে আছি, বুকে "Hungry Employees"-এর ব্যাজ আঁটছি; বাড়ি ফিরে দেখি, তোমার বউমাও খোঁপায় ব্যাজ এঁটে ব'সে আছেন, তাতে লেখা আছে—"বাংলার গৃহিণীরা চায়

মেয়েমানুষের মত বাঁচতে।" রান্নাঘরে তালা বন্ধ, ছেলেপুলেদের খাওয়া বন্ধ; ব্যাজ এঁটে বিকেল থেকে দেওয়াল-মুখো হয়ে তিনি ব'সে আছেন।

গণেশ। তাই তো ভায়া, মহা বিপদ দেখছি; ও ব্যাজ তোমার বউদির খোঁপাতেও ঝুলেছে। বাইরে আমরা আগুন লাগাতে যাচ্ছি, এদিকে ঘরেই আমাদের আগুন লাগছে।.

সোমনাথ। বোঝ দেখি একবার, কি লঙ্কাকাণ্ডটা হবে!

গণেশ। সবই তো বুঝছি ভাই; কি যে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে, তা জানি না। আচ্ছা, বউমা কি আজ থেকেই ধর্মঘট আরম্ভ করলে নাকি? বউমা তা হ'লে দেখছি রীতিমত গরমপন্থী; আমার কিন্তু চা জুটেছে, রাত্তিরে ভাতও পাব ব'লে আশা আছে।

কাত্যায়নী প্রবেশ করলেন, এক হাতে চা, অন্য হাতে কিছু খাবার

কাত্যায়নী। এই নাও ঠাকুরপো, একটু জল খাও। সুজাতা কি আজ থেকেই চা বন্ধ ক'রে দিলে নাকি?

সোমনাথ। (খেতে খেতে) শুধু চা কি বউদি? রান্নাঘরেও তালা বন্ধ।

কাত্যায়নী। সবেতেই ছুঁড়ীটার একটু বাড়াবাড়ি আছে।

সোমনাথ। সে যাই হোক, এই যে সব আপনারা ফ্যাসাদ বাধাচ্ছেন, এসব কি ভাল হচ্ছে?

কাত্যায়নী। কি আর করি বল ভাই, ভাল-মন্দর ধারণা তো সব লোকের সমান নয়। আমরা আমাদের অবস্থা একটু ফেরাতে চাইছি, তাতে তোমাদের অবস্থা যদি খারাপ হয়, আমরা তার কি করতে পারি, বল?

সোমনাথ। হঠাৎ আপনারা এত স্বার্থপর হলেন কি ক'রে জানি না; আর কি অপরাধে যে আমরা আপনাদের পর হয়ে উঠলুম, তাও জানি না। আচ্ছা, বলুন তো, দাদার আর আপনার স্বার্থ কি আলাদা?

কাত্যায়নী। দেখ ঠাকুরপো, স্বার্থ বড় সর্বনেশে জিনিস; এতবড় জগৎটা চলছে খালি স্বার্থ নিয়ে। তোমার দাদার স্বার্থে আমি কোন্ দুঃখে ভাগ বসাতে যাব বল? আমরা দুজনে দুটি আলাদা প্রাণী, আমি খেলে তোমার দাদার পেট ভরে না; তা হ'লে আমাদের স্বার্থটা কি ক'রে এক হবে বল তো?

গণেশ। ভায়া, যুক্তির বহরটা দেখলে তো? এ যুক্তি কাটবার ক্ষমতা তোমার নেই।

কাত্যায়নী। এর মধ্যে তো যুক্তির কিছু নেই; সোজা কথাটা সোজা ভাবেই বলেছি। তোমাদের ল্যাজে পা পড়েছে কিনা, তাই ভাবছ, কথাটা সাংঘাতিক।

সোমনাথ। যাই হোক বউদি, সারাদিন আপিসে হাড়ভাঙা খাটুনির পর ফিরেছি, শরীর মন দুটোই মর-মর; এখন আপনার সঙ্গে স্বার্থ নিয়ে লড়াই করতে পারব না। ছেলেমেয়েগুলো সব বিকেল থেকে উপোস ক'রে আছে; আমি বেঁচে থাকতে তো আর তাদের উপোস করিয়ে মারতে পারি না; এখন তাদের কিছু খাওয়াবার ব্যবস্থা করিগে। আর দাদা, তুমিও এ বিষয়ে একটু ভেবে রেখো, কাল সন্ধ্যেয় আবার আসছি। [প্রস্থান

কাত্যায়নী। আহা, বেচারী বড় বেকায়দায় প'ড়ে গেছে!

গণেশ। ছিঃ ছিঃ! বউমার ব্যবহারটা দেখ দেখি; বলা নেই, কওয়া নেই, ধর্মঘট ক'রে ব'সে রইলেন, এ বেচারী এখন করে কি? এ তোমাদের বড় অন্যায়।

কাত্যায়নী। ছুঁড়ীটার বয়েস কম, মাথাটাও একটু গরম কিনা, তাই একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছে।

গণেশ। একটু নয়, রীতিমত বাড়াবাড়ি। সোমনাথ ছোকরার মন-মেজাজ নেহাৎ ভাল তাই, তা না হ'লে আজই একটা কাণ্ডকাণ্ড হয়ে যেত। আচ্ছা, তোমরা যে ব্যাজে আবদার করেছ, তোমরা মেয়েমানুষের মত বাঁচতে চাও, এতদিন কি তোমরা পুরুষমানুষের মত ম'রে ছিলে?

কাত্যায়নী। না, তা নয়; এতদিন তোমরা আমাদের পোষা জন্তু ক'রে রেখেছিলে, তফাতের মধ্যে আমাদের দু পা; আমরা আমাদের জন্তু-জীবন শেষ করতে চাই; মেয়ে-জন্তুর বদলে আমরা হতে চাই মেয়ে-মানুষ।

গণেশ। আমরা কিন্তু তোমাদের মেয়ে-মানুষ ব'লেই জানতুম।

কাত্যায়নী। মনে হয়তো তাই জানতে, কিন্তু ব্যবহারে তা দেখাও নি; তোমাদের কাছে সে ব্যবহার পেলে আমাদের আজ এই দুর্দশা হ'ত না।

গণেশ। আমাদের ব্যবহারটা যে কোথায় খারাপ হয়েছে আর তোমাদের দুর্দশাই বা কি, আমরা কিছুই জানি না।

কাত্যায়নী। জেগে যে ঘুমোয়, তার ঘুম ভাঙাতে গেলে ঠেলা দিতে হয়। চোখ দিয়ে যখন তোমরা আমাদের দুর্দশা দেখতে পাও নি, তখন আমরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দোব।

গণেশ। তা না হয় দিলে। রান্না করা, বাসন মাজা, ছেলেপুলের মা হওয়া, এই সবই তোমাদের কাজ ছিল; আজ জানলুম, এগুলো জন্তুর কাজ; এই কাজগুলো না করলেই তোমরা মেয়েমানুষ হয়ে যাবে? এরই জন্যে তোমরা ধর্ম্মঘটের আয়োজন করছ?

কাত্যায়নী। না গো, না, তা নয়। এতদিন তোমরা পরম দেবতা হয়ে ছিলে, আমাদের সেবাদাসী ক'রে রেখেছিলে। আমরা চাই তোমাদের দেবত্ব কাটিয়ে মানুষ করতে, আর সেই সঙ্গে নিজেদের সেবাদাসীত্ব কাটিয়ে মেয়েমানুষত্ব আদায় করতে।

গণেশ। অর্থাৎ দেবতা-রূপে আমরা তোমাদের যে সেবা খেয়েছি, সেইটাই সুদে-আসলে আদায় করতে চাও?

কাত্যায়নী। হ্যাঁ, যেটুকু আমাদের ন্যায্য পাওনা, সেইটুকুই আদায় করতে চাই। এতকাল ঠ'কে আসছি, আর আমরা ঠকতে চাই না।

গণেশ। সেটা খুব ভাল কথা; এর জন্যে তোমরা ধর্ম্মঘট করতে যাচ্ছ কেন?

কাত্যায়নী। তোমরাই তো এই কাজটা শিখিয়েছ; কাজটা খুব সোজা কিনা।

গণেশ। আমরা তোমাদের শিখিয়েছি?

কাত্যায়নী। তুমিই তো সেদিন বললে, নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে হ'লে ধর্ম্মঘট না করলে চলে না।

গণেশ। ও, তোমরা তা হ'লে আমাদের ছোরায় আমাদেরই জবাই করছ? আপিসে আপিসে আমরা ধর্ম্মঘট করছি তোমাদেরই ভালর জন্যে; দু পয়সা আয় বাড়লে তোমাদেরই সুখ বাড়বে। আর তোমরা কিনা আমাদের সঙ্গেই ধর্ম্মঘট করছ? যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!

কাত্যায়নী। তোমাদের অবস্থা তোমরা ফেরাও, আমাদের অবস্থা আমরা ফেরাই; আমরাই বা তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে ব'সে থাকব কেন?

গণেশ। সাধু! সাধু! আমরা তো আর পারলুম না, ভগবান তোমাদের

ভাল করুন। অন্তত কাজ আজও তো করছ; আমায় দুটি ভাত দাও, খেয়ে শুয়ে পড়ি।

কাত্যায়নী। আচ্ছা দিচ্ছি, তুমি এস। [প্রস্থান

৫

সোমনাথের ঘর, সময় রাত; পর্দা উঠলে দেখা গেল, সুজাতা একই ভাবে দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছে; খোকন মেঝেতে ব'সে ঢুলছে। সোমনাথ ভেতর থেকে ডাকলে, "ও মিনু!" হাতে একটা বড় ঠোঙা নিয়ে প্রবেশ করলে

খোকা। (চমকে উঠে) বাবা, তুমি এত দেরি করলে কেন? আমার ঘুম পায় না? বিকেল থেকে মা আমায় কিছু খেতে দেয় নি; কতবার বললুম, বড্ড খিদে পেয়েছে; মা কোনও কথাই বললে না।

সোমনাথ। তোমার মায়ের অসুখ করেছে কিনা, তাই। আমি খাবার এনেছি, তোমার দিদিকে ডাক, সকলে মিলে ভাগ ক'রে খাও।

খোকা। ও দিদি! বাবা খাবার এনেছে—

(বলতে বলতে খোকা ছুটে বেরিয়ে গেল; ঠোঙাটা রেখে সোমনাথ আপিসের জামা-কাপড় ছাড়তে লাগল। ইতিমধ্যে খোকা মিনুকে নিয়ে ফিরল)

খোকা। এই যে বাবা, দিদি ঘুমিয়ে পড়েছিল; ডেকে তুলে এনেছি।

সোমনাথ। এই নাও মিনু, তোমাদের খাবার, সকলে মিলে খেয়ে শুয়ে পড়গে যাও। (ঠোঙা থেকে কিছু খাবার তাদের দিলে, তারা হাসতে হাসতে চ'লে গেল। সোমনাথ মেঝেতে বসল, গলায় কাপড় দিয়ে জোড়হাতে ব'লে চলল) হে মা কালী! হে বাবা তারকনাথ! হে মা দুর্গা! হে বাবা বিশ্বনাথ! হে তেত্রিশ কোটি দেবতা! তোমরা আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর ঠাকুর। আমার ওপর প্রসন্ন হও। আমি ধন-দৌলত বাড়ি-গাড়ি কিছুই চাই না, শুধু আমার স্ত্রীর মনটি সংসারের দিকে ফিরিয়ে দাও ঠাকুর। যে দুর্ভোগ আজ আমার হচ্ছে, এই দুর্ভোগ রোজ হ'লে আমি পাগল হয়ে যাব, ছেলেপুলে সব পথে বসবে; দোহাই তোমাদের! সেই সর্বনাশের হাত থেকে আমায় বাঁচাও। (জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুজে ব'সে রইল। সুজাতা আসতে আসতে ফিরে বসল, দেখা গেল, জামার ভেতর থেকে সে কি বার করছে)

সুজাতা। (গম্ভীর কণ্ঠে) শোন। (বজ্রের বিকট শব্দে লোকে যেমন

চমকে ওঠে, সোমনাথও তেমনই চমকে উঠল ; কথা বলার চেষ্টা করলে, কিন্তু আওয়াজ বেরুল না। সুজাতা আবার বললে) শোন।

সোমনাথ। (জনান্তিকে) আমার কাতর প্রার্থনা তা হ'লে ঠাকুরদের কানে পৌঁছেছে ? (ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল, গলায় কাপড় দেওয়া অবস্থায় জোড়হাতে সুজাতার সামনে এগিয়ে গেল) আদেশ হোক ; সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে আমি শুধু শুনতে চাই তোমার আদেশ। ওগো মোর—

সুজাতা। (ধমকের সুরে) থাম, কাজলামি ক'রো না ; এদিকে এস।

সোমনাথ। (সামনে গিয়ে দাঁড়াল, অতি করুণ কণ্ঠে বললে) বল দেবি, কি আদেশ ?

সুজাতা। এই নাও ধর্মঘটের নোটিস। আমাদের সমস্ত দাবি এরই মধ্যে জানানো আছে। আজ থেকে পনেরো দিন পরে আমাদের ধর্মঘট শুরু হবে। (নোটিসটা হাতে দিলে)

সোমনাথ। (খানিকটা প'ড়ে) আহা! ওগো চির-বঞ্চিতার দল! তোমাদের বক্তব্য আর দাবি আমি সমর্থন করছি ; বিশ্বাস কর, তোমাদের দুঃখে আমিও দুঃখিত ; তোমায় আশ্বাস দিচ্ছি, দাবিগুলো আমি সাধ্যমত মেটাতে চেষ্টা করব। (নোটিসখানা দেখতে দেখতে জনান্তিকে) ত্রুটি কিছুই নেই ; সমিতি হয়েছে, কম্‌রেড-মার্কা সভাপত্নী সম্পাদিকা হয়েছে, দাবিগুলি বেশ তৈরি হয়েছে, ধর্মঘটের নোটিসও পড়ল। এতকাণ্ড যে হ'ল, খবরের কাগজওয়ালারা সব কোথায় ছিল ? কেউই তো কোন খবর দেয় নি ! ধর্মঘটের মুখপত্র যে 'অধীনতা', তাতেও তো কিছু দেখি নি ! অ্যানার্কিস্টরাও বোধ হয় এত গোপনে কাজ সারতে পারে নি।

সুজাতা। ভাবছ কি ? আইনত নোটিস দেওয়া রইল, ঠিক সময়ের মধ্যে দাবি না মেটালে ধর্মঘট হবে।

সোমনাথ। অনেক কথা জানবার ইচ্ছে হচ্ছে, রাতও কিন্তু অনেক হয়েছে ; আজ আর কোন কথা তুলব না। একটিমাত্র অনুরোধ, রাখবে কি ?

সুজাতা। আগে থেকে কথা দিতে পারি না ; অন্যায় অনুরোধ হ'লে কোনমতেই রাখব না। অনুরোধটা কি, বল শুনি ?

সোমনাথ। বিকেল থেকে তো একভাবে ব'সে আছ ; তোমার যে কত কষ্ট কত পরিশ্রম হয়েছে, আমি তা জানি। তাই অনুরোধ করছি, খালি পেটে

থেকে পিত্তি পড়িয়ো না; ঠোঙায় এখনও কিছু খাবার আছে, কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়। বল, আমার এই অনুরোধ রাখবে?

সুজাতা। বিচার ক'রে দেখছি, তোমার অনুরোধটা অন্যায় নয়; তবে অনুরোধ রাখতে পারি একটিমাত্র শর্তে; বল, তুমি সেই শর্ত পালন করবে?

সোমনাথ। তোমার সমস্ত শর্ত আমি আজীবন বিনা-শর্তেই পালন ক'রে আসছি; না শুনেই বলছি, তোমার এই শর্তও আমি পালন করব; বল তোমার শর্তটা কি?

সুজাতা। তোমাকেও কিছু মুখে দিয়ে শুতে হবে। শর্তটা কি খুব কঠিন ব'লে মনে হচ্ছে?

সোমনাথ। এর চেয়ে ঢের কঠিন শর্ত আমি পালন করেছি; এই সামান্য শর্তটা যদি পালন করতে না পারি, তা হ'লে আমি তোমার স্বামী হবার যোগ্যই নই।

সুজাতা। আঃ! বাঁচা গেল।

সোমনাথ। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

(খাবারের ঠোঙাটা তুলে নিয়ে সুজাতা কিছু খাবার সোমনাথকে দিলে; সোমনাথ খেতে লাগল আর সুজাতা দাঁড়িয়ে রইল)

(মিনুর প্রবেশ)

মিনু। বাবা, খুকুমণি উঠেছে; আমার কাছে আর থাকছে না।

সোমনাথ। (সুজাতার প্রতি) এইবার তো মেয়ে নিতে পার; খাবারটা খেয়ে মেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়গে যাও; রাত অনেক হয়েছে। [সুজাতার প্রস্থান

মিনু। বাবা, মায়ের তো সাংঘাতিক অসুখ; খুকুমণিকে নেবে কি ক'রে? অসুখ কি সেরে গেছে?

সোমনাথ। না মা, অসুখ মোটেই সারে নি; বড় ডাক্তারের ওষুধ এনে দিয়েছি, তাই একটু উপকার হয়েছে; আজ আর কিছু হবে না।

মিনু। আমার কিন্তু ভয়ানক ভয় করছিল।

সোমনাথ। না না, ভয় ক'রো না; মা কালী সব ভাল ক'রে দেবেন।

মিনু। হে মা কালী! মায়ের অসুখ ভাল ক'রে দাও, তোমায় ষোলো আনার পূজো দোব। ক্রমশ

শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টখণ্ডী

বিরূপাক্ষের বিষম বিপদ

স্বাধীনতা

দেশ তো স্বাধীন হয়ে গেল, আপনাদেরও স্ফূর্তির অন্ত দেখলুম না। কিন্তু আমার বাড়িতে তার ফলে যে কাণ্ডগুলো হ'ল, সে খবর রাখেন কি? পটকা, কেন্তী আর পান্তকে সামলাতে যে আমার কালঘাম ছুটে গেছে! এই বাজারে মনে করুন, একখানা কাপড় যোগাড় করতে গো-ভাগাড়ে যেতে হয়, আর আমি আপিস থেকে ফিরে এসে দেখি, ছু ধোপ যায় নি, তারা আমার তিনখানা কাপড় ছিঁড়ে ফ্ল্যাগ ক'রে ব'সে আছে!

তার ফলে—আপনাদের কাছে ঘরের খবর বলতে তো আর আপত্তি নেই, বাইরের লোক না জানলেই হ'ল, মানে—একখানি বাঁধিপোতার গামছা প'রে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে এখন বাড়ি ফিরে ব'সে থাকি। লোকে ডাকাডুকি করলে ওপরের কাটা-জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে আলাপ-পরিচয় সেরে নিই। আচ্ছা, কি বলতে ইচ্ছে করে একবার ভাবুন! এই সেদিন এঁদের ফ্রক আর শার্টের জন্যে রেশন-কার্ডে কাপড় এনেছি, এখন তো তিন মাস হাহুতাশ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা হ'লে আমি কি করব বলতে পারেন?

যদি বলেন, তোমার দোষ, তুমি বাড়ির কর্তা, তোমাকে কেউ মানে না? আজ্ঞে না। আমি অপরাধ স্বীকার ক'রে বলছি, কেউ না। এখন দিন-কালটা কি পড়েছে দেখুন, একেবারে যে পুরোপুরি মানে-না-মানার যুগ, ছানাপোনা সব বিগড়েছে। কাউকে একটু জোরে কথা বলার জো আছে? তা হ'লে তো আর কাঁধে মাথা রাখবে না।

সেদিন মেজো ভাইপো ভুঁটেটাকে বললুম, হ্যাঁরে, বাড়িতে ছু বেলা তো গোগ্রাসে গিলছিস, একটু কয়লার দোকানে লাইন দিয়ে সের পাঁচেক আন্ না। অবস্থা যা হয়েছে, তাতে তো আর কাঁচামাল ছাড়া কিছু খাওয়ার উপায় নেই।

সে নাক-মুখ বেঁকিয়ে বললে, ওসব ছোটলোকের কাজ আমার দ্বারা হবে না। ওদিকে ছোঁড়ার মুখে দিবারাত্তির শুনুন, কিষাণ-মজদুর ভাইদের জন্যে তার ঘুম হয় না, যতক্ষণ না তাদের তেতলায় ফ্যানের তলায় শুইয়ে দেশের সবাইকে ফুটপাথে গড়াগড়ি দিইয়ে ছাড়ছে, ততক্ষণ সে বিপ্লবের বাণী

ছাড়া আর কিছু প্রচার করবে না। ইনক্লাব জিন্দাবাদ শুনে শুনে কান কালা হয়ে গেল। অথচ কয়লার অভাবে বাবুর বাড়িতে হাঁড়ি চড়ছে না, সেদিকে খেয়াল নেই।

ও দিকে লাইন না দেওয়াতে এবং কয়লা না পাওয়াতে আমার বিপদ বুঝুন, বাড়ির তিনটে কাঠের পুরোনো আলমারি, সেকেলে একটা কাঠের সিন্দুক নীচের ঘরে ছিল, আমার বামুনঠাকুর সেগুলিকে কাটারি দিয়ে কেটে কেটে উনুনের গব্বায় সঁপে দিয়ে ব'সে আছেন। এসব কি আগে জানি? উত্তরের কাঠের বারান্দায় সেদিন এক চোপ বসাতে তবে আমার নজরে পড়ল।

বলতে গেলুম, সে একেবারে বারুদের মত জ্ব'লে উঠে বললে, কোয়লা আনিবার পারু নাই, মুই করিমু কাঁই, দিয়েশলাই জ্বালিকিরি রন্না হইব?

বুঝলুম, যুক্তি অকাট্য। সত্যি, দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে কত রান্নাই বা হতে পারে! কিন্তু এদিকে আমি যে যাই!

ঠাকুরের কাছে ধমক খেয়ে নিজেই কাঁচুমাচু হয়ে শেষে ব'লে উঠলুম, বুঝেছি বাবা, আমারই দোষ, তুমি আর রোষ ক'রো না, আমি নিজে যাচ্ছি কয়লার দোকানে।

বেলা পাঁচটা থেকে ইঁট দিয়ে লাইন পেতে পেতে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ যখন দোকানের মধ্যে পৌঁছলুম, তখন পাঁচ পো আন্দাজ মাল আছে, তাও গুঁড়ো, তা দিয়ে রান্নার হাঁড়ি গরম করার চেষ্টা করতে যাওয়াই পাগলামি, বরং ভুবড়ির খোলে দিলে ফুল কাটবে ভাল। অগত্যা তাই নিয়ে এলুম। গিন্নী মুখ বেঁকিয়ে সেগুলি ছাতে রাখতে বললেন, পরে শুনলুম, যাই হোক বুদ্ধি ক'রে তাই দিয়ে গুল পাকিয়ে তিনি কোনক্রমে কাজ চালিয়েছেন।

এই তো অবস্থা। এর ওপর যেহেতু স্বাধীনতা পাওয়া গেছে, অতএব সেই থেকে পটুকা আর খেঁদীর সখা-সখীদের ঘন ঘন নেমন্তন্নর বহর বেড়েছে, তাঁরা তাঁদের মাকে ধরছেন, তিনি আমাকে ধরছেন, কিন্তু আমার আর কিছু ধরবার নেই, দু হাত ছেড়ে দিয়ে ছাত থেকে লাফ মারব কি না ভেবে ঠাওর ক'রে উঠতে পাচ্ছি না। যে যেখানে আছে, সবাই স্বাধীন হয়ে গেল; কিন্তু আমার পরাধীনতা বোধ হয় জীবনে ঘুচবে না দেখতে পাচ্ছি।

স্বাধীনতা মানে আমি যা বুঝি, আমার গুষ্টিবর্গ আবার উল্টো বোঝে, আমার পাড়া-প্রতিবেশী আবার অন্য বুঝে ব'সে আছে। মানে, সকলে

চাইছে যে এবার থেকে যা-খুশি করব, মারব, কাটব, ধরব, কারুর কিছু বলবার তোয়াক্কা রাখব না। এই তো হয়েছে বিপদ কিনা!

মশাই, সেদিন পাড়ায় এক চোরকে ধরলুম, সে শাসিয়ে ব'লে গেল, আচ্ছা, এবার ইলেক্‌শনে কাউন্সিলে যদি আমাদের মেজরিটি না ঢোকাই তো কি বলেছি! স্বাধীন দেশে কে চোরকে ধরে একবার দেখাব? দোকানে জিনিস কিনতে যাই, তারাও চোখ গরম ক'রে ব'লে ওঠে, স্বাধীন দেশে যা-খুশি দর বলব, তাই দিতে হবে, আর কনট্রোলের ধার ধারি না। অবশ্য তেমনই তেমনই ক্রেতারাও স্বাধীন দেশে দেখা দিয়েছেন, দর চড়া বললে মাল-টালের দাম না দিয়েই টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। সেও এক মহা বিপদ! সুখ আর কিছুতে নেই।

চাকর, বামুন, ঝি—তারা তো কিছুদিন আগে থেকেই স্বাধীন, এখন তো আমরাই তাঁদের অধীন হয়ে হাতজোড় ক'রে ব'সে আছি। পাঁচ টাকা খোরাক-পোশাক দিয়ে এই বাজারে লোক রাখতে জিব বেরিয়ে যায়, এখন পঁচিশ টাকা দিয়েও কারুর মন পাই না। তরকারিতে, মনে করুন, বেশি ঝাল দিলে 'উঃ-আঃ করবার জো নেই, তা হ'লেই বামুন পালালেন। ঝিকে দুখানা কড়ার বেশি আর একখানা পোড়া মাজতে দিলে সে বিড়বিড় ক'রে মনিবের উদ্দেশে 'পোড়ারমুখো' বলতে শুরু করে, তারপরই ঠিক তার তিন দিন জ্বর, কামাই। না পোষায় রাখবেন না, আজকাল কি তাদের কাজের অভাব আছে? আচ্ছা, কি বিপদ বলুন দেখি, তা হ'লে আমি এদের নিয়ে স্বাধীন দেশে করি কি?

"বিরূপাক্ষ"

কবিতা

রাম-শ্যাম-যদু-মধু-খেঁদি-বুঁচি-পটলি
সবাই কবিতা লেখে, তুই কেন হটলি?
আর কিছু না পারিস, চয়নিকা খুলিয়া
এটা-ওটা-সেটা থেকে ছ' লাইন তুলিয়া
পাঠা তুই শারদীয়া সংখ্যার জন্যে;
কেন তুই পারবি না, পারে যাহা অন্যে?

শ্রীপ্রভাত বসু

স্বর্ণবাবু কোন উত্তর দিলেন না। অত্যন্ত অন্যমনস্কের মতই চলেছিলেন তিনি। গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে তাঁর বাড়ি, বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি মাঠে পড়লেন। এই মাঠের পথ ধ'রেই গ্রামকে পাশে রেখে, সাধারণত একাকীই তিনি মহাপীঠে গিয়ে থাকেন। মধ্যে মধ্যে তাঁর সমবয়স্ক কোন অনুগত ব্যক্তি সঙ্গে থাকে, বর্তমান কালের বিচিত্র গতি ও মানুষের মতি নিয়ে আলোচনা ক'রে থাকেন।

একটু এসেই বাউড়ীপাড়ার প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি নোটন বাউড়ীকে ডাকলেন। তাঁর চাপরাসীটি মুসলমান, নোটন বাউড়ী হ'লেও হিন্দু। নোটনকে তিনি ইঙ্গিত করলেন, সে ইঙ্গিত নোটন অবিলম্বে বুঝে নিয়ে, মাথায় একটা গামছা বেঁধে লাঠি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। সাধারণত স্বর্ণবাবু চাপরাসী নিয়ে মহাপীঠ যান না। আজ কলকাতার ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে নিয়ে যাবার সময় মনে হ'ল, এতে তাঁর বংশোচিত মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। নোটনকে ইঙ্গিত ক'রে তিনি মুখে তাকে তিরস্কার ক'রে বললেন, তোর কি দিন দিন ভীমরতি হচ্ছে? সময়ে হাজির হ'স না কেন?

নোটন অবিলম্বে প্রণাম জানিয়ে অপরাধীর মতই জবাব দিলে, আজ্ঞে, পাড়াতে একটা গোল বেধেছে, তাই দেরি হয়ে গেল। ভাবলাম, হুজুর তো এই পথেই যাবেন, পথেই সঙ্গ ধরব।

স্বর্ণবাবু গোঁফে তা দিতে দিতে অগ্রসর হলেন।

কলকাতার ভদ্রলোকটি স্বর্ণবাবুর নীরবতায় নোটনকেই জিজ্ঞাসা করলেন, কি নাম মুরুব্বির? লাঠিখানি তো দেখি চমৎকার। লাঠি খেলতে পার?

নোটন হেসে বললে, তা আজ্ঞে, পারি বইকি খানিক-আধেক। এ বয়সেও পাঁচ-সাতজনের মোহড়া পারি নিতে।

তারপর দুজনের মধ্যে গল্প জ'মে উঠল। নোটন বক্তা, কলকাতার ভদ্রলোক শ্রোতা; নোটনের বক্তব্য সত্য অর্ধসত্য অতিরঞ্জিত রোমাঞ্চকর দাঙ্গার কাহিনী। তার এক পক্ষে মালিক স্বর্ণভূষণবাবু, অন্য পক্ষে গোপীচন্দ্রবাবু, তাঁর অবর্তমানে এখন কীর্তিচন্দ্রবাবু। কাহিনীর মধ্যে একই কথা, গোপীচন্দ্রের বাহিনী সংখ্যায় অধিক, তাদের অধিকাংশই গালপাট্টাধারী পশ্চিমদেশীয় জোয়ান, আর স্বর্ণবাবুর বাহিনীতে স্বল্প কয়েকজন দেশী লাঠিয়াল, তাদের মধ্যে নোটন অন্যতম। কাহিনীর শেষ, গোপীচন্দ্রের বাহিনীর পরাজয়, স্বর্ণবাবুর বাহিনীর জয়।

স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি

অশ্রু ও রক্তপাতের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে নূতন প্রভাত সূচিত হইতেছে। আজিকার নব-জন্মদিনে ভারতবর্ষের কোন্ সমাজ আমরা প্রত্যাশা করিব, অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইয়া সামাজিক জীবনকে আর কি দিয়া সমৃদ্ধ করিব? আঘাতে আঘাতে দেশ ভাঙিয়া গিয়াছে, ভগ্নস্তূপ হইতে পুনরায় তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে—ইহাই আজিকার কামনা ও কর্তব্য।

এতদিন শহরে বসিয়া সমাজ-সংস্কারের যে প্রয়াস শুরু হইয়াছিল, তাহার দিন ফুরাইয়াছে। শহরের বাহিরে যে বিরাট দেশ ক্রমশ স্তিমিত হইয়া পড়িতেছে, তাহাই ভারতবর্ষ। এ ভারতবর্ষ রাজনীতির উত্তেজনায় প্রাণ ফিরিয়া পাইবে না; রাজনীতিকে সম্বল করিয়া কোনদিনই সে বাঁচিয়া ছিল না. ভারতবর্ষ জীবিত ছিল তাহার সমাজের সম্পদ লইয়া।

কিন্তু এ সম্পদ কিসের সম্পদ? ইহা আমাদের বারো-মাসের-তেরো-পার্বণের আনন্দ ও উৎসবের সম্পদ, তাহা শিল্পের সম্পদ। দেশকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে উৎসব ও শিল্প-কলাকে ফিরিয়া পাইতেই হইবে। কিন্তু যে দেশে মানুষকে আজ এক মুষ্টি অন্ন ও এক খণ্ড বস্ত্র সংস্থানের জন্য তাহার সমস্ত মনুষ্যত্বটুকুই নিঃশেষিত করিতে হইতেছে, সেখানে আনন্দ-উৎসব ও শিল্প-কলার পুনঃপ্রবর্তন-চিন্তা স্বভাবতই বিলাস ও ব্যঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবে।, এই পরিহাস ধৈর্যের সহিত অতিক্রম করিতে পারিলে তবেই জাতিকে পরিণতিতে পৌছাইয়া দেওয়া পুনরায় সম্ভব হইবে। মানুষ কেবল অন্ন-বস্ত্রের হাহাকার লইয়াই সম্পূর্ণ নহে, তাহার চিত্ত ও চেতনার গরিমায় সে মানুষ; তাহার উন্মুক্ত বুদ্ধি ও উন্মুখ হৃদয় যেখানে নিজেকে উন্মীলিত করিবার অবকাশ ও সুযোগ পায় না, অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্যের মাঝেও সেখানে সে বন্দী ও পরাধীন। মনুষ্যত্ব-বিকাশের বিভিন্ন পথ যে সমাজে উন্মুক্ত থাকিবে, ভারতবর্ষ সেই স্বাধীনতা মাথায় করিয়া লইবে। আজ যে স্বাধীনতায় আমরা সমুপস্থিত. তাহা কেবল রাজনীতিগত হইলে ব্যর্থ হইবে, ইহা সার্থক হইবে মনুষ্যত্বের স্বাধীনতায়। যথেচ্ছাচারিতার সুযোগকে যেন স্বাধীনতা বলি[illegible] না করি।

শক্তির বলে জয় করা এবং অধিকারের বলে ভোগ করা—উভয়ই বীরের কাজ। সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করা কঠিন, কিন্তু তাহার রক্ষণ আরও সুকঠিন। বাঁচিয়া থাকা এবং টিঁকিয়া থাকা এক নহে। যে বীরত্ব একদা মহামৃত্যুকে বরণ করিতে শিখাইয়াছে, সেই তেজ বক্ষে লইয়াই আজ বাঁচিবার

মন্ত্র শিক্ষা করিতে হইবে, আর দেশকে সেই ভাবেই প্রস্তুত হইতে হইবে। স্বাধীনতা অর্জিত হইলেই কাজ সমাপ্ত হইল না, সেই স্বাধীনতা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

কিন্তু নিজেদের চিনিয়া লইবার পূর্বে স্বাধীনতাকে তাহার নিজের স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারা সম্ভব নহে। পৃথিবীর এক-একটি দেশ তাহার এক-একটি বিশেষত্ব লইয়া প্রস্ফুটিত এবং তাহাই তাহার গরিমা। আজ নূতন করিয়া সম্মুখপানে যাত্রারম্ভ করিবার পূর্বে পশ্চাতের দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইতে হইবে। ভারতবর্ষ কি লইয়া যাত্রা শুরু করিয়াছিল, কোথায় আসিয়া সে ঠেকিয়াছে, কোথায় তাহাকে চলিতে হইবে; আর জানিতে হইবে, আমাদের কাছে এই ভূখণ্ড কিসের পরিচয়ে ভারতবর্ষ বলিয়া গরীয়সী। ভারতবর্ষ কেবল অন্ন খুঁটিয়া খায় নাই, বহু সাধনায় সে ধর্ম অন্বেষণ করিয়াছে, তাহার সত্য-সন্ধান জগতের এক বিরাট উপলব্ধি; সৌন্দর্যবোধকে জাগরিত ও বিকিরিত করিতে করিতে আত্মসংস্কৃতির যে সূক্ষ্ম স্তরে উপনীত হইয়াছে, শিল্প-কলায় তাহারই পরিপূর্ণ প্রকাশ একটি পরম বিস্ময়। ইহা আমাদের আত্মপ্রসাদের কাকলী নহে, সভ্যজগতে ইহাই ভারতবর্ষের দান, ইহাই তাহার পরিচয়। ভারতবর্ষ আত্মোপলব্ধির দেশ, আত্মসংস্কৃতির দেশ।

কিন্তু এ দেশ যেখানে বড়, এতদিন তাহার সেই স্বরূপটিকেই সাধারণের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার অবসর পাই নাই। সকলের মধ্যে দেশপ্রেম জাগাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছি, অথচ দেশ যাহার পরিচয়ে জগৎবিদিত, সেদিক হইতে প্রেরণা জাগাইতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। দেশ বলিতে বুঝিয়াছিলাম— বিস্তৃত ধূ ধূ প্রান্তর, শৈবালদামে অবরুদ্ধগতি শীর্ণ নদীগুলি; আর বুঝিয়াছিলাম—গৃহে গৃহে ম্যালেরিয়ার প্রকম্পিত সর্বনাশ। দেশের রিক্ত রূপটিই কেবল চোখে ভাসিয়াছে, অগৌরবাকে জন্মভূমি বলিয়া গৌরব করিতে তাই এই বিলম্ব।

দেশকে বাঁচাইতে হইলে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইতে হইবে। এ শ্রদ্ধার জন্য পল্লবিত করিয়া প্রপাগাণ্ডা করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের সংস্কৃতির খেই হারাইয়া ফেলিয়াছি মাত্র, কেবল সেইটুকুই ধরাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাহার জন্য সর্বতোভাবে পুরাতনকেই অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে এমন নহে। বর্তমান ও আধুনিক সুখ-সুবিধার মধ্য দিয়াই ইহার পথ।

বিজ্ঞানীদের কর্মপ্রচেষ্টায় দেশ খাইয়া পরিয়া থাকিবে, ইহা আমরা আশা করিতে পারি, দিকে দিকে তাহার কাজ শুরু হইয়েছে। কিন্তু যে সৌন্দর্যবোধ সমাজকে সুস্থ, সাবলীল ও পরিচ্ছন্ন রাখিবে, তাহার জন্য আজ আমরা কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিব? 'সাইন্টিফিক লিভিং'-এর সহিত যদি 'আর্ট অফ লাইভ্‌লিহুড'-কে এক করিয়া গাঁথিয়া লইতে না পারি, মানুষে মানুষে হানাহানি কখনই প্রশমিত হইবে না। ইহার জন্য সৌন্দর্যচর্চার প্রয়োজন। রুচি ও আত্মোৎকর্ষের এই শিক্ষা জীবনকে শ্রীমণ্ডিত ও মর্যাদা দান করে; ইহারই পরিপূর্ণতা মানুষের সংস্কৃতি। মানুষে মানুষে আন্তরিক মিল সংস্কৃতি দ্বারা যত সহজ-সম্পর্কে সংস্থাপিত হয়, আইনকানুন করিয়া তাহা সম্ভব নহে। সংস্কৃতি মানুষের আত্মীয়তাকে সুবৃদ্ধি করে। "আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি"—শিল্পের দ্বারা আত্মসংস্কৃতি মানুষের অবশ্যকর্তব্য।

আজ শিল্পচর্চার প্রতি এবং শিল্পকে জাতির জীবনে সন্নিবেশিত করিবার জন্য মানুষের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু কি উপায়ে তাহাকে সমাজের সহিত সংযুক্ত করিতে পারা যায়, তাহা সাবধানতার সহিত চিন্তা করিবার বিষয়। শিল্পকলাকে ভারতবর্ষের সমাজ কোনদিনই বিলাসের সামগ্রীরূপে পৃথক করিয়া দেখে নাই, জীবনযাত্রার দৈনন্দিন অনুষ্ঠানগুলির সহিত তাহার সম্পর্ক বিজড়িত করিয়া তুচ্ছ কাজটিকেও সরস ও উপভোগ্য করিয়া লইত। জীবনপ্রণালী সরস থাকিলে সমাজ আপনা-আপনি সজীব হইয়া উঠে। তাই তাহারা উৎসব করিয়া কাজ করিতে জানিত, কাজকে কেবল দায় হিসাবে সাঙ্গ করিত না। তাহারা অনুষ্ঠান করিয়া হাল কর্ষণ করিত, ধান্য রোপণ করিত, অনুষ্ঠান করিয়া সে ধান ঘরে তুলিত। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলিকেও এইরূপে উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া আনন্দ-মুখর করিয়া লইত। আনন্দ জীবনের জটিল ভারকে পরিশ্রমেই অবসন্ন ও অবসান হইতে দেয় না, প্রতি মুহূর্তেই প্রাণকে সতেজ ও নবীন করিয়া রাখে। কিন্তু ধান-চাল লইয়াই মানুষ উৎসব করিতে পারে না, যাহা নিতান্ত প্রতিদিনের, তাহা একান্ত প্রয়োজনের হইলেও, মানুষ তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। তাই ব্যবহারের সাধারণ বিষয়কেও শিল্পের মনোহারিতায় মনোরম করিয়া লইত। প্রকৃতির অন্তঃপুরে পালিত গ্রাম্য-সমাজ-জীবনে এই যে এত দেব-দেবীর ব্রত-পার্বণ, ইহা দেব-আরাধনা নহে, ইহা শিল্পের পূজা, ঋতুতে ঋতুতে ইহা প্রকৃতির বন্দনা। শিল্পের মহিমায় প্রতিদিনের কাজকে

নিত্যদিনের উৎসব বলিয়া যাহারা গ্রহণ করিতে শিখিয়াছিল, তাহাদের উৎসব-অনুষ্ঠান সংস্কার নহে, সংস্কৃতি।

এই উৎসব ও শিল্প-সংস্কৃতি একদিকে যেমন কর্ম-জীবনকে ভার বলিয়া মনে হইতে দেয় নাই; রুচি ও সৌন্দর্যের প্রস্ফুটিত সুষমা আর এক দিকে মানুষের সংসারখানি সাজাইয়া গুছাইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিয়া বিরাম ও আরামকে মধুর করিয়া রাখিয়াছিল। ধনে-ধান্যে লক্ষ্মী আসিবেন, কমলাসনা গৃহে আসিবেন, গৃহখানি পরিচ্ছন্ন কর, নির্মল রাখ। তিনি সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া আসিবেন,—অঙ্গন ও ঘর আলিম্পনে আঁকিয়া দাও। মানুষের থাকিবার ঠাঁইখানিকে পূজার ছলে এই যে মাজিয়া ঘষিয়া আঁকিয়া জুকিয়া মনোরম করিয়া রাখিবার নির্দেশ, এ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বোধ কেবলমাত্র স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের বোধ নহে, ইহা তাহারও অধিক, আরও গভীর, ইহা মানুষের 'এস্থেটিক সেন্স্'—যাহা অন্তর ও বাহির উভয়কেই একত্রে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করিয়া রাখে।

কিন্তু আজ সমাজের অভ্যন্তর হইতে আনন্দ উৎসব ও শিল্পকলার এ স্বতঃস্ফূর্ত ধারা কেন শুকাইয়া গেল, সমাজের সে পরিপূর্ণ রূপখানি আর তো দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা কেন ভাঙিয়া পড়িল? উৎসব করিতে আর তো উৎসাহ জাগে না! অথচ যে উৎসব ও পূজা-পার্বণ সমাজের সকলকে একত্র করিয়া চালাইয়াছে, আজ তাহাকেই চালাইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতে হইতেছে। এক কালে যাহা আপনা-আপনি চলিত, আজ তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলায় সুখ নাই, উৎসব আজ গ্রাম্য-জীবনের বোঝা। আনন্দকে ভোগ না করিয়া রীতির শাসন হিসাবে তাহাকে সহ্য করিতে হইতেছে,—সমাজের কেন এই বিপর্যয়, তাহা জানিতে হইবে, নতুবা উপর হইতে সংস্কারের প্রলেপ বারংবার খসিয়াই পড়িবে।

প্রথমেই মনে হইবে, অর্থ-নৈতিক সংঘাতে সমাজের মেরুদণ্ড হীনবল হইয়াছে। বিদেশী শাসন শোষণ করিয়া আমাদের নিঃশেষ করিয়াছে, বিদেশী তাহার পণ্য যোগাইয়া গ্রামের কারিগরদের হাত বন্ধ রাখিয়া দুই হস্তে দেশের অর্থ বাহিরে লুটিয়া লইয়াছে। ইহা সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। তাহারা বলপূর্বক যাহা ছিনাইয়া লইয়াছে, তাহার সহিত আরও কিছু বেশি আমরা উপযাচক হইয়া বিসর্জন দিয়াছি। তাহারা আমাদের রাজার নিকট হইতে

রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে, আর আমরা ধীরে ধীরে আমাদের দেশখানি সমর্পণ করিয়াছি। দেশের মান, ধর্মের মান, শিল্প ও সংস্কৃতির মান, শিক্ষা-দীক্ষা খাওয়া-পরা দেশের সকল কিছুকেই আমরা অবজ্ঞা ও উপেক্ষা দ্বারা ভারতবর্ষকে অকিঞ্চন করিয়াছি। শহরকে কেন্দ্র করিয়া বিদেশের যে শিক্ষা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার বিপুল আলোড়ন গ্রামের সমাজকে আঘাত করিয়াছে। আঘাতে আঘাতে গ্রাম কেবল ভাঙিয়াছে, আঘাতে আঘাতে তাহা নবীন আকার লইয়া গড়িয়া উঠে নাই। বিদেশী শিক্ষার যাহা শুভ ও সার্বজনীন, নগরীর সঙ্কীর্ণ স্বার্থেই তাহা সীমবদ্ধ রহিল, তাহার বাহিরে সমাজ-জীবনে ইহা কোন উপকারেই লাগাইতে পারিলাম না।

উপকারে লাগিবার কথাও নহে। কোন্ শিক্ষা, কোন্ সংস্কৃতি বড়, তাহা লইয়া তর্ক নিষ্প্রয়োজন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে সর্ববস্তুই যথাযোগ্য, যেখানে যাহার স্থান, সেখানেই তাহা স্বাভাবিক। অথচ বিদেশী শিক্ষা ও তাহার সুখ সুবিধার নূতন মোহে মাতিয়া গ্রাম ও তাহার সমাজকে সর্বদিক দিয়া অনুন্নত বিবেচনা করিয়া তুলনায় আমরা নব-আলোকে সুসংস্কৃত ও সভ্য বিবেচনা করিয়া গর্ব বোধ করি। শহরের এই আরোপ-করা সভ্যতা আমাদের গ্রামের সর্বনাশ। ভারতবর্ষের যে ধর্ম যে সংস্কৃতি তাহার গ্রামগুলিকে পরিপুষ্ট করিয়াছে, তাহার শহরগুলি আজ আর তাহা লইয়া পরিবর্ধিত নহে। তাই আজ গ্রাম্য সমাজ শহরের নির্দেশের মধ্যে আপনার অন্তরের বাণী শুনিতে পাইতেছে না।

শহরে বসিয়া গ্রাম ও তাহার সমাজকে সংশোধন করিবার চেষ্টা যে না হইয়াছিল এবং এখনও যে হইতেছে না তাহা নহে, কিন্তু সংশোধনের এ দৃষ্টি কাহার দৃষ্টি? পাশ্চাত্য যুক্তি-তর্ক দিয়া আমরা গ্রামের ভাল-মন্দ সকল কিছুকেই নাকচ করিয়াছি। উৎসবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও তাহার অনুষ্ঠানগুলিকে মর্যাদা দিই নাই, গ্রাম্য-সমাজের জীবন-প্রণালীও সেই উপযোগী তাহার বিশ্বাস—যাহা তাহাদের 'গাইডিং ফোর্স' তাহাকেই আমরা বিদ্রূপ করিয়াছি। মানুষ দুঃখ সহিতে পারে, কিন্তু উপহাস সহ্য করিতে পারে না। শহরের উপকার ও সংশোধনের আগ্রহকে গ্রাম তাই সন্দেহ করিতেছে। উন্নতি ও সংস্কৃতির নামে যে নাগরিক শিক্ষাচার আরোপ করিতে চাহিতেছি, সে চেষ্টা আন্তরিক হইলেও সুখের হইবে না। উৎকর্ষ ও মনোহারিতার ঔজ্জ্বল্যে নাগরিক সংস্কৃতি উন্নত সন্দেহ নাই, তাহার একটা আকর্ষণকারী

মোহও আছে; কিন্তু শহরের প্রাচুর্যের বাহিরে গ্রামের সাদাসিধা জীবন-যাত্রার ঘাড়ে এত ভার সহিবে না। ছোট ছোট মানুষের ছোট ছোট বিশ্বাস ও সামর্থ্যের এত শক্তি নাই যে, বৃহৎ ও ভিন্নপন্থী আদর্শকে অনায়াসে বহন করিতে পারে। যাহা অনায়াসে বহিতে পারি তাহাই সঙ্গে লইতে পারি, পাথেয় বোঝা হইলে পথপ্রান্তেই ফেলিয়া চলিতে হয়। আজ যে সংস্কৃতির ধারা প্রচলন করিতে চাহিতেছি, আমাদের গ্রাম্যসমাজে তাহা বোঝা। ইহার গতি ফিরাইতে হইবে। ভারতবর্ষের যাহা আদর্শ, আজ তাহাকেই পুনরায় বরণ করিয়া লইতে হইবে। ইহা সঙ্কীর্ণতা নহে, ভাবোচ্ছ্বাসও নহে। নবীন ভারতের সার্থকতার ইহাই পথ।

ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতি সুখকেই একমাত্র বলিয়া স্বীকার করে নাই, তাহার শিক্ষা সার্থকতাকেই শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা দিয়াছে। ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় ভারতবর্ষকেই গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহার স্কন্ধে ইউরোপের মুণ্ড জোড়া লাগিবে না। নিজেদের সংস্কৃতিকেই শোধন ও যুগোপযোগী করিয়া সৃজন করিতে হইবে। আমাদের সংস্কৃতির যাহা মূল উৎস, সেইখানেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। ভারতবর্ষ বলিয়াছে—ভূমৈব সুখম্। এক দিকে সে যেমন উপলব্ধি করিয়াছে, অল্পে সুখ নাই, আর এক দিকে সে সতর্ক রহিয়াছে, বলিয়াছে, মা গৃধঃ—লোভ করিও না। ইউরোপের সংস্কৃতি লোভে প্রমত্ত, ভোগে উন্মত্ত। বিজ্ঞান আজ সেখানে সত্যের পথ নহে, লোভের মদ। দুই সভ্যতার ইহাই 'সংস্কৃতিগত প্রভেদ, আর যাহা 'ইউনিভার্সাল' তাহা একা ভারতবর্ষেরও নহে, ইউরোপেরও নহে; তাহা সকলের, তাহার চিন্তা সমস্যা নহে। কিন্তু মত ও পথ লইয়া যেখানে প্রভেদ ও পার্থক্য, আমাদের আজ সেইখানেই সজাগ থাকিতে হইবে, বুঝিতে হইবে ইউরোপ ইউরোপে সুন্দর, ভারতবর্ষ ভারতবর্ষে। চোখের কাজল চোখেই মনোরম, গালে লাগিলেই ভয়ঙ্কর। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে তাহার নিজের পথেই তুলিয়া দিতে হইবে।

নাগরিক সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রয়োজন শিথিল হইয়াছে। তাহার বিষয় স্বতন্ত্র। ব্যক্তিগত শিক্ষার যেখানে অবকাশ রহিয়াছে, বিচার-বুদ্ধি দিয়া জীবনের ভালমন্দকে বিশ্লেষণ করিয়া প্রয়োজনমত গ্রহণ ও বর্জনের সে অধিকারী। কিন্তু গ্রাম্য-জীবনের উৎকর্ষ ব্যক্তিগত নহে, তাহা সমাজগত। তাহার সুখ-দুঃখ, আশা-আদর্শ সকল মানুষকে একত্রে লইয়া। তাহা সাধারণ,

কিন্তু ব্যাপক। তাহার যে শিক্ষা, তাহা বুদ্ধির শিক্ষা নহে, তাহা বিশ্বাসের শিক্ষা। ধর্মমত তাহাদের বিচারের বিষয় নহে, বিশ্বাসের অবলম্বন। যাহাকে অবলম্বন করিয়া গ্রামের ছোট ছোট মানুষের আশা ও আদর্শ বড় আকার পাইয়াছে, আজ তাহাকে তাহারই আলোকে দেখিতে হইবে। তাহাদের বিশ্বাসকে শহরের বিচার-বিবেচনা দিয়া নিরুৎসাহ ও খর্ব করিলে চলিবে না; সে বিশ্বাস উচ্ছেদ না হইতে দিয়া বরং যাহাতে আরও দৃঢ় ও পুষ্ট হইতে পারে, তাহারই প্রেরণা যোগাইতে হইবে। কেবল সতর্ক থাকিতে হইবে, এইখানেই বিশ্বাস যেন পঙ্কিলতায় শীর্ণ না হয়। যে বিশ্বাস সুস্থ ও সজীব, আজ তাহারই প্রবর্তন করিতে হইবে। ধর্মবিশ্বাস সরল ও প্রাণবন্ত হইলে তবেই উৎসব-অনুষ্ঠান সফল হইবে। অভাব-অনটনে মানুষ উৎপীড়িত, তাই তাহার ধর্মবিশ্বাসও পীড়িত; তাহারই আশ্রয়ে বর্ধিত যে উৎসব-অনুষ্ঠান, ইহা স্বভাবতই বিকারগ্রস্ত। এমনটি পূর্বে ছিল না যে, ধর্মমত ও ধর্মস্পৃহাকে ভারতবর্ষ দৈনন্দিন কাজে-কর্মে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপের মধ্য দিয়া ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাইয়া আনন্দের পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছে, তাহার ষোলো আনাই সংস্কারমুক্ত এমন নহে। আচার-বিচারের খুঁটিনাটির প্রাধান্য অনেকস্থলেই ভারগ্রস্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সমাজজীবনে আনন্দের স্রোত প্রবল থাকিলে কুসংস্কারের বিভীষিকায় কাতর হইবার কারণ নাই। স্রোতে শৈবালদাম ভাসিয়া আসে, ভাসিয়া যায়, গতিরুদ্ধ না হইলে তাহা পচিতে পারে না। উৎসবের সার্থকতা আজ চাল-কলার নৈবেদ্যেই সীমাবদ্ধ সন্দেহ নাই; কিন্তু উৎসব আনন্দের বাহন, অনুষ্ঠান শিল্পের উপচার, ইহাই গ্রাম্য-সমাজ ও তাহার সংস্কৃতিকে পুনরায় চিনাইয়া দেওয়া আজিকার কর্তব্য।

যুগপ্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্ব হইতেই গ্রামের বিবিধ অনুষ্ঠানগুলিকে মার্জিত আকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত নানা উৎসব পালন করিয়া নিজের জীবনে উৎসবের নবীন তাৎপর্য এবং অনুষ্ঠান মাত্রই যে কুসংস্কার নহে, তাহার দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান। উদাহরণস্বরূপ বৃক্ষরোপণ-উৎসবের কথা উল্লেখ করিব। বৃক্ষ-পূজা অনার্য ও মূর্খের আচরণ বলিয়া আমরা শিক্ষিতধর্মের জাত যাইবার আশঙ্কায় ইহাকে পরিহাস ও পরিহার করিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে নূতন করিয়া গ্রহণ করিতে শিখাইলেন। বৃক্ষ কেবল বৃক্ষমাত্রই নহে, পত্র-পুষ্প-ফল এবং ইন্ধনেই

মানুষের প্রতি তাহার শেষ প্রয়োজনটুকু সাধিয়া সে তস্মসাৎ হয় না। নিত্য প্রয়োজনের ঊর্ধ্বেও ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে, ইহা ধরিত্রীর এক পল্লবিত সৃষ্টিশোভা। প্রকৃতির মহিমাকে মনপ্রাণ দিয়া স্বীকার ও বন্দনা করিবার জন্য বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান প্রকৃতির সহিত মানুষের সম্পর্ককে রোমান্টিক করিয়া লইবার এক বিশেষ উৎসব। মানুষের উৎসব তাহার সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ জীবনে বিরাটের প্রসাদ ও স্পর্শ।

উৎসবকে সজীব করিতে পারিলে আনন্দের রসে সমাজের শাখায় শাখায় আপনা-আপনি কুসুম ফুটিয়া উঠিবে। মানুষের যে সকল সুকুমার বৃত্তি আজ সুপ্ত ও লুপ্তপ্রায়, তাহা জাগিয়া উঠিবে। উৎসবের টানে মানুষ সমস্ত কিছুকে ভালবাসিতে শিখিবে, তাহার অন্তর-বাহির মধুর বলিয়া প্রতিভাত হইবে। এ মাধুর্যকে আরও নিবিড় করিয়া উপভোগ করিবার জন্য শিল্পের প্রয়োজন। শিল্প ক্ষুদ্রকে বৃহৎ, সামান্যকে অসামান্য করিয়া গ্রহণ করিতে শেখায়। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, নাট্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে বিবিধ কলার মধ্য দিয়া মানুষ নিজের অপূর্ণ রূপখানি পরিপূর্ণ শোভায় বড় করিয়া সৃজন করে। উৎসবের আনন্দস্রোতে শিল্পচেতনার বিকাশ লইয়া মানুষ নিজেকে ভাসাইয়া দেয়।

উৎসবের বাহিরেও শিল্পের উৎস হইতে যে সৌন্দর্যধারা নীরবে ঝরিয়া পড়িতেছে, সমাজ ও সংসার তাহার স্পর্শে প্রতিদিন নবীন ও প্রফুল্ল রহিবে। মানুষ প্রাণের ভিতর সৌন্দর্যস্পৃহার যে বৃত্তি গোপন রাখিয়াছে, চর্চা দ্বারা তাহার গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সুন্দর হইবে, তাহার চলা-বলা মাধুর্যে সুন্দর হইবে, তাহার ব্যবহার প্রেমে সুন্দর হইবে, তাহার ধর্মবোধ নির্মলতায় সুন্দর হইবে। চারিদিক হইতে মানুষ তাহার জীবনকে সুন্দর করিয়া লইবে, ইহাই শিল্পের পরম প্রয়োজন। শিল্প যেখানে ব্যক্তিগত সাধনা, এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। সমাজগতভাবে, ব্যবহারিক জীবনের মধ্য দিয়া ইহার কি উপযোগিতা, তাহাই আজ চিন্তা করিবার বিষয়। অর্থনীতির চাপে সমাজকে ভাঙিয়া-চুরিয়া বিদেশী শাসন বিদায় লইতেছে। অভাবের তাড়নায় জীবনের পরিধি আজ কেবল খাওয়া-পরার সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ, শিল্প ও সংস্কৃতি এখানে অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক। কিন্তু দেশ আগে তাহার অর্থনীতি সামলাইয়া লইবে, পরে রহিয়া-বসিয়া সময় আসিলে তবে সংস্কৃতির বিষয় লইয়া

মাথা ঘামাইবে, এই অপেক্ষায় কাল কাটাইলে চলিবে না। উভয় পক্ষে সমান ভর রাখিয়া তবে পাখি উড়িতে শিক্ষা করে। দেশ ও সমাজকে চালাইতে হইলে অর্থনীতি ও সংস্কৃতি উভয়েরই সমান প্রয়োজন। অন্নবস্ত্রের অভাবে মানুষ বাঁচে না, সংস্কৃতির অভাবে মনুষ্যত্বও বাঁচে না।

এই সংস্কৃতি কাহাকে অবলম্বন করিয়া সফলতা লাভ করিবে? ভারতবর্ষ ধর্ম ও উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া তাহার যাবতীয় শিল্পকলায় সত্য, শিব ও সুন্দরকে বিকশিত করিতে চাহিয়াছে। যাহা সত্য তাহার সুন্দর প্রকাশে, তাহার মঙ্গল প্রয়োগে এ দেশের শিল্পবোধ পরিণত ও সম্পূর্ণ। 'আর্ট ফর আর্ট্‌স্ সেক'—ইহা এ দেশের সংস্কৃতির মর্মবাণী নহে। যে শিল্প শিল্পকলাতেই সমাপ্ত, জীবনের সহিত সম্পর্ক যাহার নিবিড় নহে, যাহাকে পৃথক একটা কিছু বলিয়া আলগোছে স্পর্শ করিতে হয়, এ দেশে তাহা কেবল ভাব বিলাস ও 'থিওরি' মাত্র। মানুষের সুখ দুঃখ, আশা ও আদর্শকে জীবনের ক্ষুদ্র পরিসর হইতে যে শিল্পবৃত্তি আরও কিছু ঊর্ধ্বে উঠাইতে না পারে, আত্মসংস্কৃতির সহিত আত্মনিবেদন যেখানে এক হইয়া মিলিয়া না যায়, ভারতবর্ষের শিল্প-সংস্কৃতি সেই পথকে স্বীকার করিয়া লয় নাই। ধর্মের দিক দিয়া, সৌন্দর্যের দিক দিয়া, কল্যাণের দিক দিয়া শিল্পকে সমাজের কাজে লাগাইয়া দৈনন্দিন জীবনকে অলংকৃত ও সংস্কৃত করিয়াছে।

উৎসব ও রূপচর্চার প্রয়োজন আজ অনুভূত হইতেছে। কিন্তু সমাজের প্রতিটি ব্যবস্থাই প্রত্যেকটি সমস্যার সহিত পরস্পরসংযুক্ত। একটির বিকাশ আর একটির বিকাশের অপেক্ষায় কাল গুনিতেছে। আমি শিল্পকর্ম করিয়া থাকি। ভারতবর্ষের রূপচর্চার উন্নতি তাহার ধর্মবোধ ও উৎসবের উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে, ইহাই আমার বিশ্বাস। শিল্পের একটা স্বতন্ত্র মহিমা আছে সত্য, কিন্তু তাহার স্থান কেবল আর্ট-গ্যালারিতেই সীমাবদ্ধ। এ দেশের শিল্প সমাজের অঙ্গীভূত। আমার বক্তব্যে এই ধারণাটিকেই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু যথেষ্ট বাকি রহিল। যাহা বাকি রহিল, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে, তাহা আঁকিয়া বুঝাইবার। কিরূপে শিল্পকে ধীরে ধীরে গ্রামের সমাজে সহজ ভালবাসায় সরাসরি ফিরিয়া পাইতে পারি, সে সম্বন্ধে আমার কিছু কথা আছে। আশা রহিল, সুধীজনের সমীপে তাহা আর এক সময় নিবেদন করিব।

শ্রীসুনীলকুমার পাল (ভাস্কর)

আর উনিশ দিন মাত্র বাকি। ছায়ার মুখে চিন্তার রেখা; শুভার মুখে হাসির দীপ্তি। শুভার পরিণয়, চোখে সন্তোষ; ছায়ার কন্যাদায়, চোখে মমতা।

পৃথিবী সূর্যকে মাঝখানে রেখে চিরকালই ঘুরে আসছে, তার ক্লান্তিও নেই, অবসাদও নেই, বিরক্তিও নেই। কিন্তু মানুষ পৃথিবী নয়, সে আর কত পারে প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে কন্‌ট্রোলারকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরতে? মহিমচন্দ্র ক্লান্ত হয়ে ফিরলেন।

ছায়া জিজ্ঞাসা করলে, ব্যবস্থা কিছু হ'ল?

ব্যবস্থা? ব্যবস্থা করবার জন্যেই বুঝি বড় সাহেবরা আছেন? তোমার আমার ব্যবস্থা করলে তাঁদের ব্যবস্থা যে উল্টে যায়! তারপর জামা খুলতে খুলতে বললেন, কি করি বল তো? আর উনিশ দিন তো মাত্র বাকি। সাহেবের কথায় যা বুঝলাম, তাতে প্রায় পনরো আনা জিনিসই কিনতে হবে ব্ল্যাক-মার্কেটে। হাত-পাখাটা টেনে নিয়ে হাওয়া খেতে লাগলেন মহিমচন্দ্র, মাঝখানে চিড়-খাওয়া পাখার বিরক্তিকর কর্কশ শব্দ ছায়ার বিরক্তিকে আঘাত করতে লাগল।

ছায়া বললে, সমস্ত বুঝিয়ে ওদের লেখ না, নগদ টাকা থেকে কিছু কমাতে। মহিমচন্দ্র উত্তর না দিয়ে ভাঙা পাখার কর্কশ শব্দের তরঙ্গ বইয়ে যেতে লাগলেন। ছায়া আবার বললে, আমার কথা শোন, ছেলের বাপের কাছে নত হতেই হয়। এইভাবে লেখ, প্রথমে ভেবেছিলে—বিয়ের সমস্ত জিনিস কন্‌ট্রোলে পাওয়া যাবে, কিন্তু তা হ'ল না, সমস্ত কিছুই এখন কিনতে হবে ব্ল্যাক-মার্কেটে, সুতরাং নগদ হাজার টাকা থেকে পাঁচশো কমাতে; পাঁচশো না হোক, দুশোও তো কমাতে পারে।

পুত্রের পিতা কন্‌ট্রোলার অপেক্ষাও কঠিন; তাই বা কেন, বিয়ের ব্যাপারে তিনি কন্যার পিতার মান-সম্মান, অর্থ সম্পত্তি, জায়গা-জমি, মায় স্ত্রীর সোনার চুড়ি-বালার পর্যন্ত কন্‌ট্রোলার—ছায়া কি সে কথা আজও জানে না! মহিমচন্দ্র নির্লিপ্তভাবে পাখা ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, তাই কি হয়?

ছায়া বললে, দেখই না লিখে, হৃদয়নাথের হৃদয়টা বড়ও তো হতে পারে আর অনুরোধের মধ্যে যুক্তিও তো আছে।

সাহারার বুকে মেঘের কৃপা ভিক্ষার মত নিরর্থক জেনেও, ছায়ার মায়

ভদ্রলোক চতুর, তিনি বিশ্বাস করছিলেন ব'লে মনে হয় না, তবে রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে ভালই লাগছিল, তিনি শুনে যাচ্ছিলেন। কলকাতায় পল্লীগ্রামের এই রোমাঞ্চকর বাঙালী বীরত্বের কাহিনী রীতিমত বিস্ময়কর এবং উপাদেয় হয়ে উঠবে—এতে তাঁর সন্দেহ ছিল না, তিনি সেগুলি সংগ্রহও করছিলেন।

* * *

নোটন বললে, ওই দেখেন কেনে, পাগড়ি-তকমার ঝকমকানি, গতরের বহর, গোঁফ-দাড়ির জাঁকজমক। লাঠির বহর দেখেন। অথচ লাঠির কিছুই জানে না বেটারা। তবে হ্যাঁ, গায়ে ক্ষ্যামতা আছে। কুস্তিতে পালোয়ান বটে।

জঙ্গলে ঘেরা দেবস্থলটির প্রবেশমুখেই দাঁড়িয়ে ছিল কীর্তিচন্দ্রের জুড়ি। সহিস-কোচম্যানের সঙ্গে দুজন তকমা-পাগড়িধারী হিন্দুস্থানী চাপরাসীও দাঁড়িয়ে ছিল। ভদ্রলোক থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রশ্ন করলেন স্বর্ণবাবুকে, স্বর্ণবাবু, এরা কি কীর্তি মুখুজ্জেদের বরকন্দাজ? নাম ধ'রে প্রশ্ন করায় স্বর্ণবাবু চকিত হয়ে তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন এবার। তিনি কোন গভীর চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হয়েই পথ চলছিলেন। চিন্তা ঠিক নয়, সে একটা অপূর্ব মনোভাব। পরাজয় মেনে জয়লাভ ক'রে মন যে ভাবে আচ্ছন্ন হয়, সেই ভাবের মধ্যে তিনি যেন আচ্ছন্ন হয়েই চলেছিলেন। ভদ্রলোক তাঁর নাম ধ'রে প্রশ্নটা উত্থাপিত না করলে সম্ভবত তাঁর কানেই যেত না কথাগুলি। ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে তিনি একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ। কীর্তির পল্টনই বটে। রথও হাজির দেখছি। আপনার যেতে সঙ্কোচ হচ্ছে নাকি? কীর্তি এসেছে মহাপীঠে।

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন, বললেন, সঙ্কোচ কিছু না। তবে—

তবে আর কিছু না। আসুন নির্ভয়ে।

ভাবছি, অপমান করবে না তো নিজেদের এলাকায়?

গতকাল হ'লেও স্বর্ণবাবু প্রচণ্ড একটা দম্ভোক্তি করতেন। আজ কিন্তু সে করতে তাঁর ইচ্ছে হ'ল না। তিনি মৃদুস্বরে মিষ্টভাবেই বললেন, না, আসুন।

কীর্তিচন্দ্র মহাপীঠে ইচ্ছে ক'রেই এসেছিলেন, অর্থাৎ কলকাতার ভদ্রলোকটির সঙ্গে আকস্মিকভাবে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবার অভিপ্রায়েই এসেছিলেন

এড়াতে না পেরে মহিমচন্দ্র ব্ল্যাক-মার্কেটের যুক্তি দেখিয়ে, যৌতুকের পরিমাণ থেকে পাঁচ শত টাকার অনুগ্রহ ভিক্ষা ক'রে হৃদয়নাথকে চিঠি দিলেন।

এ ধারেও বাকি আর উনিশ দিন। মমতার মুখে তৃপ্তির আভাস, সন্তোষের মুখে হাসির প্রস্রবণ; সন্তোষের চোখে শুভালিঙ্গনের প্রত্যাশা, মমতার চোখে শুভাশীর্বাদের ছায়া।

হৃদয়নাথ শুষ্কহৃদয়ে ফিরলেন কন্‌ট্রোলার সাহেবের আপিস থেকে। তাঁর অনুগ্রহ মিলল না। মমতা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, উপায়? যৌতুকের নগদ হাজার টাকার সবটাই তো তা হ'লে কালো-বাজারের যৌতুকে চ'লে যায়। ছেলের বিয়েতে কি শেষে ঘর থেকে খরচ করতে হবে?

গড়গড়া টানতে টানতে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে হৃদয়নাথ বললেন, তা ছাড়া উপায় তো কিছু দেখছি না। তারপর একটু হেসে রসিকতা ক'রে বললেন, তুমিই বল না, কি ক'রে সাদা নোটগুলো কালোর হাত থেকে বাঁচানো যায়!

শুনবে আমার কথা? তা হ'লে মহিমচন্দ্রের মহিমার ওপর আর একটু বেশি ক'রে নির্ভর কর।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, প্রথমে ভেবেছিলে—বিয়ের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে কন্‌ট্রোলের পার্‌মিট পাবে, কিন্তু তা না পাওয়ায় সমস্তই এখন কিনতে হবে ব্ল্যাক-মার্কেটে, সুতরাং নগদ টাকা আরও পাঁচশো বাড়াতে হবে ব'লে লিখে দাও এক চিঠি। আর পাঁচশো না হোক, দুশোও তো বাড়াতে পারে, কথাটার মধ্যে যুক্তি যখন আছে।

মমতার যুক্তিপূর্ণ ব্ল্যাক-মার্কেটের সমস্যা সমাধানে উৎফুল্ল হৃদয়নাথ আরও জোরে গড়গড়া টানতে লাগলেন। দোহনপ্রণালীর ওপরই নির্ভর ক'রে গাভীর শেষ বিন্দু দুধও দুয়ে নেওয়া। সেই ভরসায় অনুপ্রাণিত হৃদয়নাথ মহিমচন্দ্রকে ব্ল্যাক-মার্কেটের যুক্তি দেখিয়ে পত্রাঘাত করলেন।

আর সতেরো দিন বাকি। পিওন চিঠি দিয়ে গেল। ছায়া বললে, মিনষের কি একটু মমতাও নেই!

এ ধারেও বাকি আর সতেরো দিন। এ ধারেও পিওন এল। মমতা বললে, মানুষের লজ্জা না থাক্, তার ছায়াও একটু থাকে, মিনষের কি সেই ছায়াটুকুও নেই!

শ্রীনীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পদচিহ্ন

সাতাশ

নবগ্রামে মহিলা সমিতির অধিবেশনে ম্যাজিস্টেট-গৃহিণীর বক্তৃতার প্রতিধ্বনি বিস্ময়জনকভাবে প্রবল এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠল। হাজার-খিলান-গম্বুজওয়ালা কোন ইমারতের মধ্যে একটা কথা বললে যেমন ঘুরে ঘুরে হাজার বার প্রতিধ্বনি ওঠে, তেমনই ভাবে এ-বাড়ি ও-বাড়ি সে বাড়ি, এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া, ও-পাড়া থেকে সে-পাড়া, আধুনিক জমিদার-পাড়া থেকে প্রাচীন সরকার-পাড়া, সেখান থেকে মধ্যবিত্তগৃহস্থ পাড়া, সেখান থেকে বণিক-পাড়া ময়রা-পাড়া স্বর্ণকার-পাড়া সাহা-পাড়া, সেখান থেকেও মুসলমান-পাড়া, ক্রমে নবগ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, ধ্বনির চেয়েও উচ্চতর গ্রামে ধ্বনিত প্রতিধ্বনির মত প্রবলতর উত্তেজনার সঙ্গে আলোচিত হতে আরম্ভ হ'ল।

সবচেয়ে বেশি উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে ঘোমটা তুলে দেওয়ার প্রস্তাবে। মেমসাহেব বলেছেন, এই ঘোমটার মত মেয়েদের জীবনে উন্নতির পথে কলঙ্কজনক এবং বড় বাধা আর নাই। আজকাল যাঁরা ঘোমটা-দেওয়া মেয়েদের কাপড়ের পুঁটলি বলেন, তাঁরা খাঁটি সত্য কথাই বলেন। কেন? আমরা ঘোমটা দেব কেন? এর চেয়ে হাতে পায়ে শেকল বেঁধে অন্ধকার ঘরে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া অনেক ভাল। ভগবান যে মুখ গড়েছেন, সে মুখ কেউ দেখলে সম্ভ্রমের হানি হয় বা সে মুখ দেখালে অপরাধ হয়—এ কেন বিশ্বাস করব আমরা? ঘোড়ার চোখে ঠুলি দিয়ে লাগাম দিয়ে টেনে যে দিকে কোচম্যানে চালায় সেই দিকে চলার মত আমাদের মেয়েদের পথ চলার ধারা। আমরাও মানুষ, অন্য মানুষকে আমাদের লজ্জাই বা কেন, ভয়ই বা কিসের? ঘরে ঘোমটা বাইরে ঘোমটা—শ্বশুর, ভাশুর, এমন কি বয়সওয়ালা দেওরকে দেখেও ঘোমটা দিতে হয় আমাদের—

ঠিক এই সময় অমরবাবুর গৃহিণী কাদম্বিনী হেসে মৃদুস্বরে ব'লে দিলেন, শাশুড়ীদের মধ্যে যারা ভারিক্কি, তাদের সামনেও ঘোমটা দিতে হয়।

বলেন কি!—ব'লে কমলা দত্ত শিউরে উঠলেন। এখনও সে রেওয়াজ এখানে আছে?

আছে বইকি। নতুন এসে বউদের তো শাশুড়ীদের হুকুম ছাড়া কারও সঙ্গে কথা বলবারই একতিয়ার নাই। সে পুরুষই কি, মেয়েই কি, বয়সে সমবয়সীই হোক, আর ভারিক্কিই হোক। নতুন বউকে যখন ঘোমটা খুলে

কাউকে দেখাতে হয়, তখন রেওয়াজ হ'ল বউয়ের চোখ বন্ধ করা। যে বউয়ের হাতে কাজকর্মে শব্দ হয় বেশি, তার নিন্দে হয় খটখটে ব'লে; যার চলায় পায়ের শব্দ ওঠে, তার নিন্দে হয় রণচণ্ডী ব'লে; খাওয়ার সময় যদি শব্দ হয়, তাতেও নিন্দে হয়। যার চুল বেশি লম্বা, পিঠের কাপড়ের প্রস্থে ঢাকা না প'ড়ে বেরিয়ে থাকে, তার নিন্দে হয়; মুখ তো মুখ, হাতের বাই, মানে উপর-হাত বেরিয়ে থাকলে নিন্দে হয়। উঠতে বসতে খেতে শুতে চলতে ফিরতে মেয়েদের চারিদিকে নিন্দে, শুধু অল্পবয়সে—মানে সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে মরতে পারলে প্রশংসা।

হাসতে লাগলেন কাদম্বিনী দেবী।

কমলা দত্ত এবার তীব্র ভাষায় বলতে আরম্ভ করলেন। বললেন অনেক কথা। অবশেষে উপদেশ দিলেন, আপনারা সকলে মিলে একসঙ্গে প্রতিজ্ঞা করুন, ঘোমটা দেব না। গায়ে প'ড়ে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের দরকার নাই, কিন্তু দরকার যেখানে আছে সেখানে কোন লজ্জা করবেন না কথা বলতে। আপনাদের লেখাপড়া শিখতে হবে। অল্পবয়সে বিয়ে বাপ মায়ে দিতে চাইলেও বিয়ে করবেন না মেয়েরা। গয়নাগাঁটির লোভ কমিয়ে, পোশাক-পরিচ্ছদের রুচিকে ভাল করতে হবে। সর্বাগ্রে রেওয়াজ করতে হবে শেমিজ পরার। জুতো পরাও উচিত, কিন্তু সেটা গ্রামে ঘরে না হ'লেও ক্ষতি নাই। আমার বিশ্বাস, এখানকার পুরুষের—যাঁরা নূতন, যাঁরা এখানকার প্রাণ, যাঁরা এখানকার নেতা, তাঁরা আপনাদের এ সমস্তকে অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করবেন। এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—প্রধান ব্যক্তি, পবিত্রবাবুকে আমি জানি, তিনি বাংলা দেশের একজন সাহিত্যিক, এখানকার সৌভাগ্য যে, তিনি এখানে আবির্ভূত হয়েছেন; তাঁদের বংশের জন্যই নবগ্রাম আজ এত বড়। তিনি যখন আপনাদের সমর্থন করবেন এবং তাঁর স্ত্রী কলকাতার মেয়ে ধাত্রিত্রী দেবী যখন আপনাদের সমিতির প্রেসিডেন্ট হবেন, তখন যে যতই বাধা দিক, কোন বাধাই টিকবে না।

কাদম্বিনী দেবী আসরটাকে জমিয়ে তুললেন—ঘোমটার কুফল এবং সেকালের মেয়েদের নির্যাতনের সরস কাহিনী ব'লে।

হিমাংশুর বউ, ওই যে ও-পাড়ার সরকার-বাড়ির ভাগ্নে হিমাংশু, হিমাংশুর বউয়ের সুখ্যাতির সীমা নাই। এই এতখানি ঘোমটা দিয়ে চলে। সন্ধ্যেবেলা

কেরোসিনের ডিবেতে লণ্ঠনের কালি পরিষ্কার ক'রে তেল পুরতে গিয়ে তেল ফেলেছিল; গোটা হাতে তেল, তার সঙ্গে কালি। উঠে হাত ধুতে যাবে, তেল টপটপ ক'রে গড়িয়ে পড়তে লাগল। তখন তেলসুদ্ধ দুই হাত দেওয়ালে দিলে মুছে। হঠাৎ দেওয়াল কথা ক'য়ে উঠল :—আরে রাম রাম রাম! দুর্গা দুর্গা দুর্গা! বউ উঠল চমকে, শাশুড়ী এল ছুটে,—কি হ'ল কেষ্ট, কি হ'ল? কেষ্ট হ'ল হিমাংশুর মামা—কেষ্ট সরকার। সে বললে, ঘোমটা দিয়ে বউমা হনহন ক'রে আসছে দেখে আমি স'রে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম কোথায় ছোঁয়া পড়বে ব'লে, তা বউমা দেওয়াল মনে ক'রে আমার পিঠে কেরোসিনসুদ্ধ দুই হাত মুছে দিলে। রাম রাম রাম! কেরোসিন তো ধুলে যাবে, ভাগ্নে-বউ ছোঁয়ার পাপ যে গঙ্গাস্নান না করলে যাবে না! খরচ পাই কোথা? বউমা খরচ দিক। হিমাংশু চাকরি করে, বউমার হাতে টাকার অভাব নাই। দাও টাকা। টাকা নিয়ে কোপাইয়ের ঘাটে চান ক'রে ফিরে এসে বললে, গঙ্গার সঙ্গে যোগ আছে তো, সেই ছোঁয়াচের পুণ্যে এই ছোঁয়াচের পাপ কেটে গেল। টাকা কটাই লাভ।

মেয়েদের মধ্যে হাসির রোল প'ড়ে গেল।

রজনী-ঠাকরুণ গম্ভীর হয়ে ছিলেন, তিনি হাসেন নাই। কাদম্বিনী অপেক্ষা বয়সে তিনি কিছুটা বড়। পিতৃকুলের সম্মান-বিচারে তিনি অধিকতর সম্মানী ঘরের মেয়ে; কাদম্বিনীর স্বামী অমরচন্দ্র জীবনে যতদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই, যতদিন সমান অধিষ্ঠানভূমিতে দাঁড়িয়ে পরস্পরের আলাপ-আলোচনা হয়েছে, ততদিন কোন ক্ষেত্রেই কাদম্বিনীর কাছে গুণে জ্ঞানে মর্যাদায় তিনি নিষ্প্রভ হন নাই। আজ ভাগ্যগুণে স্বামীর গৌরবের অংশভাগিনী হয়ে কাদম্বিনী ম্যাজিস্ট্রেটের মেমসাহেবের পাশে চেয়ারে ব'সে এই গ্রামের ধারা-ধরনকে নিয়ে এই ভাবে ব্যঙ্গ করছে, এটা তাঁর কাছে কোন মতেই ভাল লাগল না। তিনি নিজেও অনেক সময়ে হিমাংশুর বউয়ের মামাশ্বশুরের পিঠে কেরোসিন তেল ও লণ্ঠনের কালি মুছে দেওয়ার গল্প ক'রে এবং শুনে বিপুল কৌতুক অনুভব করেছেন এবং উচ্চ হাসিও হেসেছেন, কিন্তু আজ তিনি কৌতুকও অনুভব করলেন না, হাসতেও পারলেন না। গম্ভীরভাবে ব'সে রইলেন। মেয়েদের মধ্যে হাসির রোলটা স্তিমিত হতেই তিনি বললেন, আমি একটা কথা বলব কাদু।

কাদম্বিনী দেবী রজনী-ঠাকরুণকে জানেন, এককালে তাঁকে তিনি খানিকটা সম্ভ্রমও করতেন, ভয়ও করতেন; আজ তিনি ম্যাজিস্ট্রেট-গৃহিণীর পাশের আসনে ব'সে, বহু মূল্যবান ভূষণে ভূষিত হয়েও, রজনী-ঠাকরুণের কথায় শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বাল্যের সে ভয় আজকের সম্পদ ও সম্মানের প্রাসাদের ভিতের তল থেকে যেন হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে নাড়া দিচ্ছে। কাদম্বিনী বুঝতে পারলেন না, কি বলবেন রজনী-ঠাকরুণ! মুখ রাঙা হয়ে উঠল তাঁর। মাথার মধ্যে মুহূর্তে জেগে উঠল, কেমন রূঢ়ভাবে রজনী-ঠাকরুণের কথার উত্তর দেবেন, তারই কল্পনা। কি উত্তর দেবেন—সে থাক্, কারণ কি বলবেন রজনী-ঠাকরুণ, সে কথা তাঁর জানা নাই।

তিনি কিছু বলবার আগেই কিন্তু মাননীয়া মেমসাহেব রজনী-ঠাকরুণের দিকে চশমাসুদ্ধ চোখ তুলে চেয়ে ভুরু কুঁচকেই বললেন, বলুন না, কি বলবেন?

রজনী-ঠাকরুণ খুব সবিনয়ে বললেন, হুজুর, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মেম—

বাধা দিয়ে কমলা দত্ত বললেন, না না, আমি ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী হ'লেও মেমসায়েব নই, আর 'হুজুর' বলবেন না, হুজুরও নই।

ধরিত্রী দেবী অনেক ঐতিহাসিক নাটক পড়েছেন, তিনি ভুলটা বুঝে ব'লে দিলেন, হুজুরাইন।

অন্য সময় হ'লে কমলা দত্ত খিলখিল ক'রে হেসে উঠতেন। এ ক্ষেত্রে হাসিটা স্বামী-সকাশের জন্য মুলতুবি রেখে বললেন, হ্যাঁ, মেয়েদের হুজুরাইনই বলতে হয়, কিন্তু আমি তা বলি নি। আমি হুজুর-হুজুরাইন কিছুই নই। আমার স্বামী ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি রাজকর্মচারী, তিনি হুজুর; কিন্তু আমি আপনাদেরই মত এই দেশেরই একজন মেয়ে। তার পর তিনি হেসে বললেন, বলুন, কি বলছিলেন?

রজনী-ঠাকরুণ একটু সামলে নিয়ে বললেন, আমি, হিমাংশুর বউয়ের ব্যাপারটায়—দোষ ঘোমটার, না দোষ মামাশ্বশুরের বোকামির, সেইটা ভেবে দেখতে বলছি। মামাশ্বশুর বোকামি ক'রে চুপ ক'রে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে না থেকে, গলা-খাঁকারি দিয়ে সাড়া দিলেই তো পারত। তা হ'লে—

কাদম্বিনী মধ্যপথে বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন, ব'লো না, ব'লো না, রাজু-পিসী, আর ব'লো না। মা গো! তোমাদের মনের বলিহারি যাই! সেকালে

নবীন চাটুজ্জের বউয়ের কথা মনে নাই? হিমাংশুর বউ তো তেল কালি মুছে দিয়েছিল। নবীন চাটুজ্জের দাদা বউকে ঘোমটা টেনে হনহন ক'রে আসতে দেখে বউকে সাবধান করবার জন্যে অ্যাঁ—হ্যাঁ—অ্যাঁ—হ্যাঁ ক'রে গলা-খাঁকারি দিয়ে স'রে দাঁড়াবামাত্র বিপরীত কাণ্ড! এক হাত ঘোমটা, ভাশুরের সাড়া পেয়ে বউও তাড়াতাড়ি দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াতে গেল, গেল তো গেল, ভাশুরের গায়ে ঠেস দিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে ভাশুরকে টিপে ধ'রে দাঁড়াল। ভাশুর তো হতবাক। চারিদিকে হৈ হৈ শব্দ—কর কি বউমা, কর কি বউমা বব! যত রব উঠল, বউ তত ঘোমটা টেনে দেওয়ালের সঙ্গে ভাশুরকে টিপে ধ'রে ফিসফিস করলে, সর না ঠাকুরঝি, সর না, ভাশুর যাচ্ছেন যে পাশ দিয়ে, সর না!

এতক্ষণে কমলা দত্ত খিলখিল ক'রে হেসে উঠে যেন বাঁচলেন। হুজুরাইন শব্দটা শুনে যে হাসি তাঁর পেটে মজুত হয়ে ছিল, বালির বাঁধ-দেওয়া জলের মত সে হাসির পীড়ন থেকে মুক্তি পেলেন। সে হাসির ধাক্কাটা গিয়ে লাগল কিন্তু রজনী ঠাকুরাণীকে। রজনী-ঠাকুরাণী মাথা হেঁট ক'রে ব'সে রইলেন। সমস্তক্ষণের মধ্যে আর মাথাও তুললেন না, মুখও খুললেন না। সমিতি গঠিত হয়ে গেল। প্রেসিডেণ্ট রইলেন কমলা দত্ত নিজে, সেক্রেটারি হলেন ধরিত্রী দেবী। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি কে হবে সমস্যা দাঁড়াল। ধরিত্রী দেবী সকলের দিকে চেয়ে দেখে বললেন, বিশু, তুমি হও অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি।

বিশু অর্থাৎ বিশ্বেশ্বরী, রজনী-ঠাকুরাণীর মেয়ে। বিশ্বেশ্বরী যে তার বয়সী মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য, তাতে আর সন্দেহ ছিল না। মায়ের মতই তার যোগ্যতা, কিন্তু তার মা পিতৃকুলের যে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন, বিশ্বেশ্বরী সে পটভূমি পায় নাই ব'লেই যোগ্যতা সত্ত্বেও নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছে। রজনী-ঠাকুরাণী নিজেই বলেন মেয়েকে, সান্ত্বনা দেন, আমার কোলে আসার সাজা। উড়ে কুলীন বাপ, বাপের জমিদারি দালান কোঠা থাকলে তোর কদর হ'ত। আবার পড়েছিস উড়ে কুলীনের হাতে। বড়লোকের বউ হতে পারতিস, হাতে একহাত সোনার চুড়ি, গলায় কণ্ঠি-নেকলেস থাকত তো তোর আদর হ'ত, সমাদর হ'ত, ধন্যি ধন্যি করত লোকে। গুণের আদর তো নাই মা।

হতাদরে, উপেক্ষায় বিশ্বেশ্বরী অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-প্রকৃতির, যেমন ধার তার

কথায়, তেমনই বেঁকিয়ে সে কথা ধরে। তার উপর মায়ের এই অপমানে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল মনে মনে। সে বললে, না। আমি পারব না।

পারবে না? কেন?—বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন ধরিত্রী দেবী।

মনের মধ্যে ক্ষোভ পাক খাচ্ছিল খোঁচা-খাওয়া সাপের মত। কিন্তু সম্মুখে ব'সে আছেন ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নী, বেদিনীর মত। বিশ্বেশ্বরী বলতে সাহস পেলে না। শুধু বললে, পারব না। এমনই।

রজনী-ঠাকুরাণী এইবার বললেন, বিশু ঠিক কথাই বলেছে বউমা। ওসব কাজ ওর সাজে না।

সাজে না?—কমলা দত্ত ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে প্রশ্ন করলেন।

হাত দুটি জোড় ক'রে রজনী-ঠাকরুণ বললেন, আজ্ঞে না, সাজে না। যা ধরিত্রী-বউমার সাজে, তা বিশুর সাজে না।

কেন? এ তো বড়লোক গরিব লোকের কথা নয়, এ হ'ল মেয়েদের কথা, গরিব বড়লোক সকলের কথা।

বিশ্বেশ্বরী আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। বললে, শেমিজ জুতো পরতে বলব সকলকে, আমি নিজে শেমিজ জুতোর পয়সা পাব কোথা? আমি কুলীনের ঘরের ভাগ্নী, আমার চারজন সতীন আছে, আমি কি ক'রে বলব, স্বামী দুটো বিয়ে করলে তার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখব না?

সভাটা কেমন বিষিয়ে উঠল। রজনী-ঠাকুরাণী বুদ্ধিমতী। তিনি হাত জোড় ক'রেই বললেন, মা লক্ষ্মী, আপনি হলেন জেলার রাজপুরুষের স্ত্রী। আপনি নিজে অনেক লেখাপড়া শিখেছেন। আমরা মুখ্যু-সুখ্যু পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কথা বলতে জানি না। তার ওপর বিশু হ'ল ছেলেমানুষ, কাকে কি বলতে হয় তা ঠিক জানে না। ওর অপরাধ নেবেন না আপনি।

কাদম্বিনী বললেন, তোমার মত মায়ের মেয়ে যদি কাকে কি বলতে হয় না জানে রাজু-পিসী, তবে যে তোমাকেই লোকে দোষ দেবে। তুমি শিখিও।

আপনার মেয়ে?—প্রশ্ন করলেন কমলা দত্ত।

আজ্ঞে হ্যাঁ। হতভাগীর জিভকে আমি কোন মতে বাগ মানাতে পারলাম না। আপনি যেন কিছু মনে করবেন না।

কমলা দত্ত উচ্চশিক্ষিতা হ'লেও ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী, তাঁর মন মেয়েটি সম্পর্কে প্রশংসা এবং তিক্ততা দুইয়েই ভ'রে উঠেছিল, তিক্ততার ভাবটাই বেশি।

কথাগুলি ভাল লাগলেও তার বলবার ভঙ্গীর ঔদ্ধত্যে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তিনি নীরস শুষ্ককণ্ঠে বললেন, না না, মনে করব কি? মেয়ের আপনার তেজ আছে। একটু হাসলেনও, কিন্তু সে হাসির মধ্যে প্রসন্নতার অভাব সুস্পষ্ট।

কাদম্বিনী বললেন, যাকগে। ছোট বউ, ওটা তুমি দেখে শুনে কাউকে ক'রে নিও—মানে ওই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি। যাকে হোক ক'রে নিও। আমাদের আবার ফিরতে হবে। কলকাতা থেকে উনি আসবেন রাত্রিরে। আপনারও তো রাত্রিরে জজ সাহেবের বাড়ি ডিনারের নেমন্তন্ন আছে?

কমলা দত্ত ঘড়ি দেখলেন। চেয়ার ছেড়ে ওঠবার সময় বললেন, ভারি খুশি হলাম। খুব জোরে কাজ করুন। মেয়েদের উন্নতি না হ'লে, মেয়েরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারলে, দেশের কোন উন্নতি হবে না।

* * *

সন্ধ্যা হতে না হতে মহিলা-সমিতির এই বিবরণ সমস্ত গ্রামে চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল—বংশলোচনের বৈঠকখানা, বণিক-পাড়ার দোকান, বিভিন্ন পাড়ায় মেয়েদের মজলিসে ওই কথাই আলোচিত হতে শুরু হয়ে গেল।

পুরুষেরা বললে, তারা তারা বল মন, কালী কালী বল! হরিবোল হরিবোল!

মেয়েরা গালে হাত দিলে, কোথায় যাব মা গো! ঘেন্নার কথা!

অমূল্য, স্বর্ণবাবুর জ্ঞাতি-ভাগ্নে, নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করলে স্ত্রীকে। বিনা অপরাধেই প্রহার করলে। অমূল্য স্ত্রীকে কখনও বাড়ি থেকে বাইরে বের হতে দেয় না। নেহাত বের হতে হ'লে বাড়ির কোন বয়িয়সী তার প্রহরায় যান; বাড়িতেও তাকে অহরহ ঘোমটা দিয়ে থাকতে হয়। ম্লান মুখে হ'লেও সে তা অবনত মস্তকে মেনে চলে। আজও তার কোন ব্যত্যয় হয় নাই। কিন্তু অমূল্য এই সমিতির সংবাদ শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রচুর মদ্যপান ক'রে বাড়ি ফিরে প্রশ্ন করলে, গিয়া থা? তুম হুঁয়া গিয়া থা?

প্রশ্নের মর্ম না বুঝে অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রী স্থির হয়ে ব'সে রইল।

হুঁয়া, মিটিং-ফিটিংকে হুঁয়া?

ঘাড় নেড়ে অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রী জানালে, না, সে যায় নাই।

হুঁ, গুনা হ্যায়? হুঁয়াকা মতলব?

ঘাড় নেড়ে স্ত্রী এবার জানালে, হ্যাঁ।

হাঁ? শুনা হ্যায়? হাঁ? খুলে গা? ঘোমটা খুলে গা? জুতা পিন্‌হে গা?

স্ত্রী এবার শঙ্কিত হয়ে উঠল, বুঝতে পারলে না, কি উত্তর দিতে হবে। অমূল্য মুহূর্তে স্ত্রীর ঘোমটা টেনে খুলে ফেলে, চুলের মুঠি ধ'রে প্রহার শুরু ক'রে দিলে।

ওপ্‌ ওপ্‌! বোলো, বোলো? হাঁ? শুনা হ্যায়? বোলো, খুলে গা ঘোমটা, বিবি বনেগা?

সত্য কথা বলতে, অমূল্য স্ত্রীকে মারব ব'লে মারছিল না। সে তার স্ত্রীকে প্রহার ক'রে নবগ্রামের আধুনিকপন্থী সকল মেয়েকেই শাসন করছিল।

মুসলমান-পাড়ায় হাজী সাহেবের দলিজায় এ আলোচনা চলছিল। সেখানে একেবারে নিম্নবিত্ত মুসলমানদের ডেকে হুকুম হয়ে গেল, হিন্দু-পাড়ায় বা বাগানে মাঠে তাদের মেয়েরা যে শুধু ঘোমটা দিয়ে যাতায়াত করে, সে চলবে না। বোরখার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাউড়ী-পাড়ায় সন্ধ্যের মজলিসে খুব খানিকটা হৈ-চৈ কুৎসার হুল্লোড় চলল।

ওদিকে পবিত্রর মজলিসেও মহিলা-সমিতির আলোচনাই চলছিল, সেখানে চারিদিকের সংবাদ এসে পৌঁছচ্ছিল। পবিত্র কখনও হাসছিল, কখনও গম্ভীর হচ্ছিল। মনের মধ্যে গভীর অস্বস্তি ভোগ করছিল। অনেক নূতনের প্রবর্তন সে এখানে করেছে। থিয়েটার থেকে আরম্ভ ক'রে এখানকার সাহিত্য-সভা, লাইব্রেরি প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠান সে গড়েছে, ব্যবহারিক জীবনে পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে আরম্ভ ক'রে রীতিতে আচরণে অনেক নব্য প্রথার প্রবর্তন করেছে, তার জন্যে গ্রামে গ্রামান্তরে আলোচনাও অনেক হয়েছে। কিন্তু এই মহিলা-সমিতির প্রতিষ্ঠা ক'রে অতি অল্প সময়ের মধ্যে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, তীব্র বিরূপ আলোচনার আভাস পাচ্ছে, তাতে সে বেশ একটু বিচলিত হয়ে উঠেছে। এমন সম্ভাবনা সে কল্পনা করতে পারে নাই। অনুমানে মনে হচ্ছে, এই বিরূপ আলোচনা ক্রমে একটা বিপুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করবে। হয়তো এর দ্বারা তাদের প্রতিষ্ঠাও ক্ষুণ্ণ হতে পারে, এই ব্যাপারটায় স্বর্ণকাকার ভাই, পবিত্রর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সুহৃৎ মণিভূষণও পিছিয়ে গেল। আজ সন্ধ্যাবেলা সে আসে নাই পর্যন্ত। পবিত্রর পাশে উপস্থিত আছে মঙ্গল এবং উক। এদের সঙ্গে একদিন গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। প্রাণের বন্ধু বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আজ পবিত্র

তাদের অন্তরঙ্গ অপেক্ষা অনুগত ব'লেই মনে করে। স্থানীয় সমাজে এদের পৈতৃক প্রতিষ্ঠাও নাই, ব্যক্তিগত যোগ্যতাতেও কোন প্রভাব নাই, নিজেদের কোন মত নাই অমত নাই, শুধু সায় দিয়ে যায় তার কথায়, এতে সে তাদের অন্তরঙ্গই বা ভাবে কি ক'রে, আর এদের ভরসার মূল্যই বা কি? এক মণিভূষণ তাকে কিছু সাহায্য করতে পারে। স্বর্ণবাবুর বাড়ির প্রভাব, তাঁদের এক কালের পৈতৃক প্রতিষ্ঠার স্মৃতি, তাঁদের স্থানীয় জমিদারের প্রতিপত্তি এখনও পর্যন্ত পবিত্রদের নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির ঠিক পরবর্তী। সুতরাং সে পাশে দাঁড়ালে পবিত্র বল পেতে পারে। এ ছাড়াও মণিভূষণের একটি এমন গুণ আছে, যা পবিত্রর নাই বা আর কারও নাই। বিদগ্ধ সমাজে সাহেব-সুবার কাছে মণিভূষণ কথাবার্তা বলতে পারে না, কিন্তু গ্রাম্য সমাজে তার মত বাকপটু ব্যক্তি আর নাই; বংশলোচনের বাচালতা নাই, রাধাকান্তের গাম্ভীর্য নাই বা পাত্রজ্ঞান নাই, স্বর্ণবাবুর বাক্‌ভঙ্গীর বক্র তীক্ষ্ণতা নাই, কিন্তু সোজাসুজি স্পষ্ট কথা কটকট ক'রে ব'লে যেতে পারে। তার সঙ্গে খানিকটা সহজ রসিকতাও আছে।

পবিত্র উরুকে বললে, তুই যা তো মণিকাকার কাছে, টমটম নিয়ে যা। সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবি।

মণিভূষণ এসে হেসে বললেন, ব্যাপার 'গুরুচরণ', অর্থাৎ গুরুতর।

সেই তো। এখন করি কি?

হাতজোড় ক'রে মণিভূষণ বললে, এত বড় যুদ্ধে আমি সেনাপতি হতে পারব না। ওরে বাপ রে! ভীমরুলের চাকে মেরেছ খোঁচা! যা ভনভন ক'রে উড়ছে। সর্বনাশ, বিঁধে বিঁধে দেহপিঞ্জর ভেঙে প্রাণবিহঙ্গকে বার ক'রে ছাড়বে। বাপ্, এর মধ্যেই যা বিঁধুনি খেয়েছি!

রজনী-পিসী গিয়েছিলেন বুঝি?

বুঝি? তোমার বোধশক্তি দুর্বল। এটা আবার বোঝাবুঝির অপেক্ষা রাখে নাকি? গিয়ে, বউদিকে নিয়ে আমাকে ডেকে, সে এক ভয়ানক কাণ্ড!

তারপর?

তারপর আর কি! আমি বললাম, ক্ষেপেছ তোমরা! আমি ওসবের মধ্যে নাই। জিজ্ঞেস কর আমার বউকে, মাথার ঘোমটা এতটুকু খসলে আমি কত শাসন ক'রে থাকি। তার উপর জুতো পায়ে দেওয়া? রাম রাম রাম!

মহাপীঠে। অন্যথায় মহাপীঠে বড় আসেন না তিনি। তবে তাঁর মা মহাপীঠের নিত্য-যাত্রী। গোপীচন্দ্র নিজে তাঁকে এ নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। গোপীচন্দ্র নিজেও প্রায়ই এখানে আসতেন। তবে তাঁকে ব্যবসায় উপলক্ষ্যে বাইরে যেতে হ'ত—কলকাতা রাণীগঞ্জ ঝরিয়া কাতরাসগড়। কখনও কখনও দিল্লী এলাহাবাদ আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে শাখা-আপিসগুলি দেখতেও যেতেন। নবগ্রামে যখন থাকতেন, তখন নিত্য-নিয়মিত যেতেন প্রথম প্রথম। তাঁর কালের বিশ্বাস এবং শিক্ষা অনুযায়ী দৈবশক্তিতে স্বাভাবিকভাবেই শ্রদ্ধা করতেন তিনি। তার উপর অতি দরিদ্রের সন্তানের মাসিক চার টাকা বেতনে কর্মজীবন আরম্ভ ক'রে সুযোগের পর সুযোগ পেয়ে বিপুল সম্পদের অধিকারী হওয়ার কৃতিত্বকে সেকালের সমাজও ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ব'লে মনে করে নাই, তিনি নিজেও সে কৃতিত্বকে তাঁর নিজস্ব ব'লে মনে করতে সাহস পান নাই, এমন কি বিশ্বাসও করতে পারেন নাই। পূর্বজন্মের কর্মফল ইহজন্মের দেবানুগত্যের পুণ্যকেই সকল উন্নতির প্রত্যক্ষ কারণ ব'লে পরিতৃপ্ত চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। তাই প্রতি বার সফর থেকে ফিরে এসে মহাপীঠে ষোড়শোপচারে পূজা দিতেন, নিত্য প্রণাম করতে যেতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে যেতেন তাঁর স্ত্রী—গাড়ি থাকতেও ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্য এবং নীচ-জাতীয় সহিস কোচম্যান ও ঘোড়ার স্পর্শদোষের আশঙ্কায় হেঁটেই যেতেন। আজও যান কীর্তিচন্দ্রের মা। কীর্তিচন্দ্র বাপের মৃত্যুর পর অধিকাংশ সময়ই কলকাতায় বাস করেন ব্যবসা উপলক্ষ্যে, পনেরো দিন অন্তর শনিবার রাত্রে আসেন, রবিবার থাকেন, সোমবার কলকাতায় চ'লে যান। এর মধ্যে তিনি মহাপীঠে আসবার সময় পান না। এবং দৈবশক্তিতে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী হ'লেও তাঁর বিশ্বাস গোপীচন্দ্রের বিশ্বাসের মত নয়। কীর্তিচন্দ্র মাসিক পূজার ব্যবস্থা করেছেন, নিত্য চণ্ডীপাঠও হয়, মধ্যে মধ্যে দৈবজ্ঞের নির্দেশমত যাগযজ্ঞও হয়। মহাপীঠের কোন অভাব অভিযোগ কানে এলে তৎক্ষণাৎ সে অভাব মোচনের ব্যবস্থা করেন অকৃপণ হস্তে। নিজে আসেন পর্বে-পার্বণে অথবা কালে-কস্মিনে, মহাপীঠের বিষয় ও বন্দোবস্ত-ব্যবস্থায় গোলযোগ ঘটলে সংস্কার করবার প্রয়োজনে। কীর্তিচন্দ্র এখন এখানকার শুধু শ্রেষ্ঠ ধনীই নন, স্থানীয় জমিদারদের মধ্যেও তিনি সর্বপ্রধান হয়ে উঠেছেন। নবগ্রামের জমিদারী স্বত্ব বহুজনের মধ্যে বিভক্ত অনেক দিন থেকেই। এক পয়সা এমন কি আড়াই

জাত-জন্ম ধর্ম-কর্ম সব যাবে। চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে। সে আমি ব'লে দিয়েছি পবিত্রকে, মেমসাহেব আসছে, আমি যাচ্ছি, প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত আমি, যেতে অবশ্য বাধ্য, কিন্তু ওসবের মধ্যে আমি নাই। দিব্যি ক'রে বলছি আমি। তারপর দে ছুট। বৈঠকখানায় এসে বুক ধড়ফড় করতে লাগল। শেষ আলমারি খুলে নির্জলা আউন্স চারেক খেয়ে তবে বুকে বল পাই।—হাসতে লাগল মণিভূষণ।

মঙ্গল বললে, আর বুক ধড়ফড় করছে না তো?

করছে বইকি। আমার চেয়ে পবিত্রর বুক বেশি ধড়ফড় করছে। বার কর।

পবিত্র বললে, না।

না?

ঘরে বাইরে মার খাইও না বাপু, বাঁচব না তা হ'লে। বাইরে তো এই। এর ওপর আজই মহিলা-সমিতির সভা হয়েছে, ঘরের গৃহিণী স্বাধীন জেনানা হয়ে ব'সে আছেন, আজ যদি মুখে গন্ধ পান, তা হ'লে মারাত্মক ব্যাপার হবে।

হা-হা ক'রে হেসে উঠল মণিভূষণ। মঙ্গল-উরুও হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলে। হাসতে হাসতে উরু বললে, উঠিয়ে দাও, উঠিয়ে দাও, মহিলা-সমিতি-ফমিতি উঠিয়ে দাও। কালই ঢোল দিয়ে জারি ক'রে দাও, উঠে গেল মহিলা-সমিতি।

তারপর? মেমসাহেব যখন আমাকে ধরবেন, তখন?

মণিভূষণ বললে, ল্যাভেণ্ডার মিশিয়ে দু ঢোক খাও, তারপর হবে কথা।

হেসে পবিত্র বললে, আরে, ল্যাভেণ্ডারের ট্রিক-টিক আর অজানা আছে! ও ট্রিকটা প্রথমেই জানা হয়ে গিয়েছে। প্রথম প্রথম তো—

বাধা দিয়ে মণিভূষণ বললে, তা হ'লে মাথা ঘুরে প'ড়ে যাও, ডাক্তার ওষুধ দিক। বাস্। না হ'লে ধাক্কা সামলাতে পারবে না। সব খবর তো বলি নি এখনও।

আরও খবর আছে নাকি?

নাই? ব্যাপার গিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে কালীদহে। একেবারে নাগিনীর শরণ নিয়েছে রাজুদিদি। রাজুদিদির সঙ্গে একদল গিয়ে জুটেছে। জমাট জটলা।

মানে?

তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গিয়েছে।

তা গিয়েছে।

তাই বলছি, আগে দু ঢোক খাও। বার কর মঙ্গল।

মঙ্গল এবার আর পবিত্রর সম্মতির অপেক্ষা করলে না। বার ক'রে নিয়ে এল পানীয় এবং পানপাত্র।

মণিভূষণ বললে এবার, সন্ধ্যেবেলা খবর পেলাম, রাধাকান্তদার বাড়িতে, রাধাকান্তদার স্ত্রীর ওখানে রাজুদিদি গিয়ে জুটেছেন।

রাধাকান্তবাবুর স্ত্রী—গৌরীকান্তের মা?

হ্যাঁ গো, তবে আর বলছি কি! ওরে মঙ্গল, দে দে, শিগগির দে। নইলে এইবার পবিত্র অজ্ঞান হয়ে যাবে।

না।

পবিত্র বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললেন, দেখ্ তো উরু, টমটমটা খুলে দিলে কি না?

সদর-রাস্তার উপর গাড়ি থেকে নেমে খানিকটা গলিপথ অতিক্রম করতে হয়। দু পাশে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের বাড়ি। কঠিন আক্রোশ নিয়েই চলছিল পবিত্র। আজ স্পষ্টভাষায় প্রশ্ন করবে এই মহিলাটিকে, তিনি কতদূর যেতে প্রস্তুত আছেন? সেদিন যখন পুলিস এসে তাকে প্রশ্ন করেছিল, সে দিনের কথা তাঁর মনে পড়ে কি না? তিনি শুনেছেন কি না, তাঁর ছেলে গৌরীকান্ত সম্পর্কে তার উচ্চ ধারণার কথা বলার ফলেই তাঁর গৌরীকান্ত আজও পুলিসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে রয়েছে? তিনি জানেন কি না—

থমকে দাঁড়াল সে।

পাশের বাড়িটা স্কুলের মাস্টার কানাই সরকারের বাড়ি। কানাই সরকার তাদেরই সমবয়সী, এণ্ট্রান্স পাস ক'রে তাদের অনুগ্রহেই তাদের স্কুলে চাকরি পেয়েছে। মণিভূষণ তার নাম দিয়েছে বিলিতী মাস্টার। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনে বিনামূল্যে কিছু দেখলেই কানাই সরকার সেটি আনিয়ে থাকে। বিলাত পর্যন্ত তার পরিধি বিস্তৃত। সম্প্রতি জার্মানি থেকে বিনামূল্যে এক কোষ্ঠী ক'রে আনিয়েছে কানাই সরকার। সেইজন্যেই তার নাম—বিলাতী মাস্টার। কানাই সরকারের কণ্ঠস্বর শুনে সে দাঁড়াল। কানাই কাউকে

দিছিল, ব্যাপারটা কি জান? ঘোমটা খোলার আসল মানে হ'ল, পরের বউ ঘোমটা খুলবে, নিজেরা বড়লোক, মেয়েরা বাইরে বেরুতে হ'লে গাড়িতে যাবে। আমাদের বউ-ঝিরা ঘাটে যাবে, পথে যাবে, জল আনবে, বাসন ধোবে, ঘোমটা খুলে থাকবে, বাবুরা দেখবেন।

পবিত্র মাথা হেঁট ক'রে অগ্রসর হ'ল।

রাধাকান্তবাবুর বাড়ির দোরে দাঁড়াল। ভিতরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কথাবার্তা ঠিক নয়, কেউ যেন সুর ক'রে কিছু আবৃত্তি করছে। ভাল আবৃত্তি করছে, নির্ভুল উচ্চারণ, ছন্দ বজায় রেখেও অর্থ এবং ব্যঞ্জনার প্রকাশ তার মধ্যে স্পষ্ট। চেনা কণ্ঠস্বর, পবিত্র চিনতে পারলে, কণ্ঠস্বর গৌরীকান্তের। সে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল।

—হারে মূঢ়ে, শিক্ষা তবু হ'ল না তোমার;
সেই রত্ন নিয়ে তবু এত অহংকার!
এ কি ভয়ংকরী কান্তি, প্রলয়ের সাজ!
যুগান্তের উল্কাসম দহিছে না আজ
এ মণি-মঞ্জীর তোরে।

পবিত্র চমকে উঠল।

উঃ, ঈর্ষার কি তীব্র আত্মপ্রকাশ! হায় রে মানুষ! তার মনে হ'ল, নিন্দা ধরিত্রীর ভূষণসম্ভারের বিরুদ্ধে।

—চিত্তে মোর উঠিছে ক্রন্দন,
আনিছে শঙ্কিত কর্ণে, তোর অলঙ্কার
উন্মাদিনী শঙ্করীর তাণ্ডব ঝঙ্কার।

থরথর ক'রে সর্বাঙ্গ তার কেঁপে উঠল। এ কি নিষ্ঠুর অভিশাপ! পরমুহূর্তেই পবিত্র শুনলে, গৌরীকান্ত বলছে—গান্ধারীর এ কথার উত্তরে ভানুমতী বলছেন—

মাতঃ, মোরা ক্ষাত্র নারী—

একটা আরামের স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে পবিত্র। ওঃ, রবীন্দ্রনাথের "গান্ধারীর আবেদন" আবৃত্তি ক'রে শোনাচ্ছে গৌরীকান্ত।

এই আসরের মধ্যে গিয়ে ব্যাঘাত দিতে পবিত্রর প্রবৃত্তি হ'ল না। মনের ক্ষোভ ক্রোধ অনেকখানি উপশম হয়ে গিয়েছে তার। মনে মনে প্রশংসা

করলে এই মহিলাটির। তিনি মেয়েদের উত্তেজিত নিন্দালিপ্ত মনকে এই মহৎ আদর্শ এবং কাব্যের অমৃতধারায় অভিষিক্ত ক'রে যে কর্ম করছেন, তাকে সে কি ক'রে নিন্দা করবে? নিঃশব্দপদসঞ্চারে ফিরে গাড়ি চ'ড়ে বসল। বললে, চল্। একবার ইস্কুলের সামনে দাঁড়াবি।

ইস্কুলের সামনে নেমে হেডমাস্টারকে ডেকে বললে, কালই কানাই সরকারকে একটা নোটিস দিয়ে দেবেন। ওঁকে আমাদের দরকার হবে না।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

খবরের কাগজ

এখনো আসে নি বুঝি খবর-কাগজ!
খালি খালি লাগে তাই সবটা মগজ।
সকালের নিত্যপাঠ আধুনিক গীতা,
ঘনলেখ-কলেবর অতি-পরিচিতা।
বইয়া বিচিত্র বার্তা আনে অহরহ,
কখনো সুন্দর, শুভ, কখনো দুঃসহ।
দূরকে ধরিয়া আনে নিকটের গায়,
নিকটকে নিয়ে কত দূর পানে ধায়।
বহুরূপী সমাজের অগণিত চিত্র,
কেহ নাহি পড়ে বাদ শত্রু ও মিত্র।
কত যে আশার কথা, নিরাশার ক্ষোভ,
কত বদান্যতা আর কত ক্রূর লোভ,
দেবতার ধ্যান, পূজা, কত শুভ কৃত্য,
ঘৃণিত তাণ্ডব লীলা, পিশাচের নৃত্য,
কত সৌভাগ্যের হাসি, কত আঁখিজল।
সার্থক কামনা, কত যাতনা নিষ্ফল,
সকলি কুড়ায়ে আনি মানবের হিতে
নিত্যপ্রাতে পরিবেশে, ছুটি চারিভিতে
হাতে নাহি পেলে এই সংবাদ-পাতাটি
সকালটা হয় যেন একেবারে মাটি।

"ভাস্কর"

অনাবশ্যক

মনের কথা বলব কারে
সবাই আছ অহঙ্কারে,
  প্রেমের কথা পিছলে পড়ে হায়,
উদাস হয়ে বেড়াই ঘুরে
থামার মতি চলার সুরে,
  ফোটার আগেই পাপড়ি ঝ'রে যায়।
সবাই হ'লে সবগ্রাসী
গলায় প'রে কাজের ফাঁসি,
  আমি ছুটির বালাই নিয়ে মরি,
তোমরা থাকো কাজের ঠেলায়
গান ভুলে যাই অবহেলায়,
  খুঁজে বেড়াই খেয়াঘাটের তরী।
কাটিলে মিথ্যা কাজের মোহ
ফুরিয়ে গেলে সমারোহ
  তোমরা তখন খুঁজবে আমায় জানি
আমি বীণার তারটি ছিঁড়ে
হারিয়ে যাব লোকের ভিড়ে
  কণ্ঠে আমার হারিয়ে যাবে বাণী।

অরণ্য-মর্মর

(সনেট-কাব্য)

সূচনা

আজ এই রাত্রে আমি ঘুমাব এমন !
মস্তিষ্কের কোষে কোষে ঢালি দিবে ঘুম
স্মৃতির পল্লব আর স্মৃতির কুসুম।
আজ এই ক্লান্ত চোখে নামিবে স্বপন।
সহসা শ্যামল করি আমার জীবন
লেগেছে, লেগেছে আহা, ফুল-মরসুম !
সে কটি দিনের স্মৃতি মনের কুঙ্কুম
জমা থাক্, জমা থাক্ পাথেয় যেমন।

হে বন, আজও কি তুমি কাঁপ থরথর ?
হে সুদূর, অশ্রু ঝরে আজো অভিমানে ?
আজো তো সহস্র শাখে স্পর্শ প্রতীক্ষায়
আমার মনের কোণে জাগাও মর্মর,
তন্ত্রিতে তন্ত্রিতে বাঁধা বিষাদের টানে ;
সভ্যতার ধ্বংসলীন নাগরিকতায় ॥

বনের গান

তবুও শীতের তীব্র হিমানী এড়ায়ে
ফুটেছে গোলাপগাছে একটি কুসুম ;
প্রতিটি পরাগে তার যদিও বা ঘুম,—
তবু সে জেগেছে বন্ধু, মাধুরী ছড়ায়ে।
আমের মুকুলশাখে অলক এলায়ে
ফুটাল কি বনলক্ষ্মী সোনালীর চুম ;
নূপুর বাজিছে শোন, রুম ঝুম-রুম,
বাতাপির শাখে শাখে, সে লক্ষ্মীর পায়ে।

তবুও হৃদয়ে কেন জড়ের কুয়াশা ;
ঝাউয়ের কম্পন ব্যথা জমা স্তরে স্তরে ;
তাই নাই কোনখানে বনের ইশারা ;
মধুমাসে নামে না তো মাধবীর আশা,
দোলে না রঙনছায়া শিলাবেদী 'পরে ;
বসন্তে এ মন আজো হিমানীর কারা ॥

২

কাঁপায়ে সহস্র কোটি পাতার আঙুল,—
এত কি আঙুল আছে !—নিল
মোরে ডাকি
সবুজ বনেতে আহা, বনানীর পাখী ;
এক পথে যেতে যেতে পথ হ'ল ভুল।
পায়ের নীচেতে দেখি কত ঘাসফুল,
কানে কানে গেয়ে গেল কত ছোট পাখি
ধূলিকণা ঝেড়ে ফেলে ফুলবাস মাখি
সহসা বেড়িল মোরে বাতাস আকুল।

আধুনিক মন গেল কত দূরে স'রে !
খুঁজিলাম বনে বনে রাজার কুমার,
বনে বনে সাড়া যার গাছে গাছে লেখা।
অশ্রুতে ফুটিল ফুল পথের কাঁকরে,
দেখিলাম পায়ে পায়ে পদচিহ্ন তার,—
নিবিড় বনের বুকে উনমনা একা।

৩

আমারে ডাকিল বন দিগন্তের পারে,
যেখানে শুয়েছে সুখে নীলার পাহাড় ;
যেখানে পান্নার চিক দেবদারু-সার,
গোলাপের চুনি কাটে হীরা-রবি ধারে।
যে বন নিশ্চল ছিল শীতের প্রহারে,
বসন্ত জাগাল প্রাণ রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার ;
গলানো সোনার ছাপে কাটিল আঁধার ;
নুয়ে পড়ে কচিশাখা পল্লবের ভারে।

লালের প্রাচীর ঠেলি অশোক-পলাশে,
নেবুফুলে মাতোয়ারা রাঙা পোড়ামাটি,
একদিন দেহভস্মে আছিল শ্মশান,
আজ সে উদ্ভিন্ন তৃণে শিশুমুখে হাসে ;
আজ শ্যাম লতাগুচ্ছে ফুল পরিপাটি ;
শৈবালে ঢেকেছে তার নিষ্ঠুর পাষাণ ॥

৪

'নিজেরে চেন না তুমি?'
—কানে কানে বলে,
যে আজ গোপনে রহে পত্র ঝরোকায়;
'তুমি চাও একদিন প্রেমের চুমায়,
সহসা আমারি মত সাজ' ফুলে-ফলে।
বসন্তের দীর্ঘশ্বাসে ধমনীর তলে
নবীন রসের জন্ম সবুজ পাতায়;
প্রেমের নিশ্বাস যেন তোমারে জাগায়,
সহসা অজানা বাণী প্রাণে আসে চ'লে।

হে নারী, হৃদয় খোল আমারি মতন;
তবে কেন শীত আজো অন্তরে তোমার?
আত্মারে গুণ্ঠন কর দ্বিধা বেদনাতে?
ঝরাও পুরানো পত্র, খোল তো গুণ্ঠন;
জাগাও বনের প্রাণ মনের মাঝার;
নিজেরে বিলায়ে দাও বসন্তের হাতে॥'

৫

হে প্রেম, শিখেছি আমি আত্মসমর্পণ,
শিখেছি তোমার ভাষা বনের শিক্ষায়;
সহজ হয়েছি কত শ্যাম বনচ্ছায়,
সভ্যতার পাশ কাটি বনেরি মতন।
অরণ্যের মর্মবাণী আজি চিত্তে শোন;
সে যেমন জেগে ওঠে যবে ডাক পায়;
প্রতিটি কোষেতে তার জীবন জাগায়,
ডালে ডালে কুঁড়িরূপে দুরন্ত যৌবন।

আজ আমি পা রেখেছি লতার তলাতে,
আজ আমি বুকে ধরি গোলাপের লাল,
কলার পাতায় পড়ি প্রেমের লিখন।
বসন্তে যেমন বন উৎসবেতে মাতে
তেমনি সহসা ফিরে নিজেরে পেলাম;
দেখিলাম প্রেমও আছে পাশে অনুক্ষণ॥

পোড়ো বাড়ির গান

বহুদূরে আকাশেতে তুলিয়াছে শির
দ'লের আমেজমাখা সবুজের পাতা,
নীল আকাশের নীচে সবুজের ছাতা,
ইউক্যালিপটাস করে আকাশেতে ভিড়;
ঝন্‌ঝন্‌ বাজে পাতা বাতাসে অধীর;
আশেপাশে দেখা যায় চিলেদের মাথা;
জড়ায়ে ধরেছে তারে লতাগাছ সাদা;
শুঁয়োপোকা হেঁটে চলে তলে বিটপীর।

কত পাখি আসে যায় ছোট পাখা মেলে,
সকালে নয়ন খুলে যবে চেয়ে দেখি,
বনের অন্তরে বাজে পাখিদের সাড়া।
আকাশে দাঁড়ের মত কালোপাখা ফেলে,
দিনরাত দলে দলে আসা-যাওয়া এ কি?
বসন্তের আমন্ত্রণে এসেছে যে তারা॥

২

বিকালের দীর্ঘ ছায়া নামে গাছে গাছে;
সপেটার ফলে ফলে জমিছে আঁধার;
সহসা বাতাসে হেলে কলাকাঁদি সার;
সন্‌সন্‌ ডালে ডালে হাহাকার বাজে।
নিজেরে গুটায়ে চিত্রখোলসের মাঝে
যে শামুক তৃণগুল্মে হ'ল আগুসার,
মানুষের পায়ে পায়ে নিষ্ঠুর প্রহার
ঠেলিয়া এনেছে তারে ঈশ্বরের কাছে।

পোড়ো বাড়ি বাটা'লির ঘায়ে থরথর;
বেলকেঁই খ'সে পড়ে কুড়ুলের চাপে;
বনের মর্মেতে তারা জ্বালাল অনল
বনের মৃত্যুতে বাঁধি মানুষের ঘর।
অপুষ্ট খেজুরগুচ্ছ আতঙ্কেতে কাঁপে।
বনভূমি আঘাতের বেদনা-বিহ্বল॥

৩

সহসা নিশ্বাস এক ওঠে আলোড়িয়া
গোলাপের দল হতে করবীর 'পরে,
আমার ললাটে চোখে গেল স্পর্শ ক'রে
সমগ্র কাননভূমি হৃদয় মথিয়া।
'কেন যাবে, কেন যাবে?
যেও না চলিয়া'
হলুদ ঘাসের ফুল পায়ে পায়ে ধরে,
পথভোলা ঝরা পাতা বাতাসেতে ওড়ে,
ডাকে অশথের শুঁড়ি অর্ধেক পুড়িয়া।

'বনে তো অনেক স্থান, আঁধারে শীতল,
তবু কেন চ'লে যাবে আলোর পীড়নে?
এখনও বনানী দেখ, ছায়াময় কত!
স'রে এস—যারা দিল এ বুকে অনল,
যারা চায় বাঁধিবারে ইটের শাসনে,
তুমি তো, তুমি তো নও
তাহাদের মত।'

৪

কাঠের ধোঁয়ায় গায় জলের কেটুল্—
'কত লোক এসেছিল, কত লোক যায়,
এখনও তাদের স্মৃতি রাতের পাখায়
এ বাড়ির কোণে কোণে করে চল্‌বল্।
কত লোক এই ঘরে তাতায়েছে জল,
সে সব লোকের স্মৃতি কোথায় মিলায়!
ক্ষণ বিরামের এই পথিকশালায়
কে তুমি গানের সুরে জ্বালালে অনল?

শিখার ধোঁয়ায় আমি হয়ে যাব কালি,
বহ্নি তো নিবিয়া হবে ভস্ম-অবশেষ।
পাতা-ফুল সব কিছু মিশাবে ধূলিতে।
তোমার অনলে তবু নিত্য শিখা জ্বালি,
বাজিবে ভুবনে ওই সঙ্গীতের রেশ;
ঊর্ধ্বে সে ভাসিয়া যাবে নক্ষত্রে
মিলিতে।'

৫

'টিক্ টিক্ টিক্ টিক্'—বলে টিকটিকি,
'হলুদপাতার ভস্মে পুরাতন দিন,
ধূলার মাকড়জালে হয়ে থাকে লীন,
মুমূর্ষু নিশ্বাস তার ভাঙা ইঁট লিখি।
তারকার মুখ থেকে এসে গান শিখি?
যে গানেতে মাথা তোলে চারারা নবীন,
যে সুরেতে বেজে ওঠে ফুল-ফোটা বীণ,
পোড়ো বাড়ি সেই সুরে আজ গেল
বিকি।'

অনেকে এসেছে, তারা জ্বালে নি তো
আলো,
আজও তাই ভিতে ভিতে নিরন্ধ্র
তিমির'
ঘাসের চোখেতে তাই শিশিরের ব্যথা।
সহসা আলোর গানে আঁধার ঝরালো,
উড়ে গেল ব্যর্থ দল বাদুড়ের ভিড়।
কে তুমি শোনালে নব জীবনের কথা?

৬

গাছের ছায়াতে ঘোরে আজও
টিপপোকা,
কাল সেও চ'লে যাবে অতীত মিছিলে,
কুন্দের সাদাতে লাল ল্যাভেণ্ডার মিলে
সাজাবে না বেশিদিন ফুলের ঝরোকা।
আজ এই আম লিচু-পেয়ারার থোকা
কাল তো শুকায়ে যাবে গোড়া কেটে
দিলে।

ব্যাঙেরা পালায়ে যাবে দূর খালে বিলে ;
কালের খাতায় এরা নাহি লেখা-জোকা।
তবু আজও ডালে ডালে বেজে ওঠে
গান,
তবু আজও কাঁচপোকা চলে অভিসারে!
শাখা মেলে বুকে চায় কারে বনভূমি ?
নারিকেল-পেয়ারার বিনিময় প্রাণ।
রেণু হতে নবজন্ম পল্লব মাঝারে।
ধ্বংসের পটেতে প্রেম, তবু জয়ী তুমি।

পৃথিবীর গান

'আমি তো দেখেছি বহু',—ব'লিল
পৃথিবী,
কানে কানে চুপিচুপি চোরের মতন ;
বাসের সমান আমি দাঁড়ানু যখন
বুকের কাছেতে তার ;—বলিল পৃথিবী।
'শোন কথা, বহুদিন দেখেছে পৃথিবী'—
পৃথিবীর কণ্ঠে আজ ভীরু আবেদন,—
'কেউ তো দেখে না তবু আপনি আপন
গড়াই রূপের সোনা—আমি যে পৃথিবী।
আমার রূপের কীর্তি ফুলের বিলাস,
বৃন্তে ফোটে, শাখে ফোটে নবজন্ম লাভ,
কেউ তো আসে না কাছে—তবু
দিনযামি,
চামেলী-চম্পক-কুন্দে বিলাই সুবাস।
ব'স এইখানে যদি এলে তুমি কবি,
শোন অন্তরের বাণী—ব'লে যাই আমি।

২

ঝোপে ঝোপে বাতাসেতে দোলে
নেবুডাল,
আমের মুকুল করে স্বর্ণ বরিষণ,
কাঁঠালের কলিগন্ধে মাতে সারা বন,
অলকে পড়ুক খসি প্যান্সির লাল।
এইখানে লতা আর শালের আড়াল
পাতায় পাতায় গৃহ করেছি বন্ধন,
শোন আজ কান পেতে মাটির ক্রন্দন,
তৃষিত মাটির ভাষা সুপ্ত চিরকাল।
বাতাপি যুগলে দোলে প্রতি শাখে
শাখে ;
ভাঁটিফুলে মউমাছি বসেছে বিহ্বল।
এই বনে বুক রেখে শোন কথা বলি,
পেঁপের ময়নার যথা নীচে চাহি থাকে ;
প্রজাপতি রঙ দেখে হয়েছে পাগল ;
প্রতিটি কথায় মম ফোটে পুষ্পকলি।

৩

সভ্যতার ধাপে ধাপে হয়ে' অগ্রসর
তারে-দণ্ডে কত লোক বেঁধেছে আমায়।
কখনো প্রাসাদচূড়ে, কুটিরের ছায়,
লভেছি সহস্র রূপ দেশ-দেশান্তর।
কারখানা, শিক্ষালয়, নৌকার বহর,
বিজলির জোয়াল তো বেঁধেছি গলায়।
ফেলেছি নিশ্বাস গ'লে চিমনি-ধোঁয়ায়।
আবার হয়েছি ফুল, হয়েছি অম্বর।
তখনি ফুলের বাসে, আকাশের নীলে
পৃথিবীর কত রূপ তোমার অন্তরে
ধরেছে নিমেষে জানি, গড়েছে তো ছবি।
এইখানে নীল আর সবুজের মিলে
আদিম অরণ্যে শেষে আসিলাম স'রে।
তোমারেও ডাকি তাই, হে আমার
কবি।

৪

বাদামের পাতা ঝরে তবু কাল হবে,
ঝরিবে সান্ত্বনাপাতা ডাকেতে মাটির ;

পাখির ডানার গতি হবে যাবে স্থির,
পাকা ফল মাটি হয়ে মাটিতে মিশবে।
তুমিও ঝরিয়া যাবে একদিন যবে—'
কোমল-করুণ সুর শুনি পৃথিবীর;
'এইখানে বুক পেতে—এই নদীতীর—
ভুলে যেও একদিন চলেছিলে যবে।'

ঘুম-পাড়ানিয়া সুরে বলিল পৃথিবী—
'তাই তো ডেকেছি কবি, ঘুমাবে যখন
মাটি হয়ে এ মাটিতে শ্রান্ত মনপ্রাণ।
সেদিনও রহিব জাগি আদিম পৃথিবী।
বনের ঘুমের গান মনে মনে বোন।
ঘুমাবার আগে শুধু গেয়ে যেও গান।

৫

আমার উদাসী বক্ষে চৈত্রের সন্ন্যাস,
সহস্র ফুলের চুমা তবু পদতলে।
ঘাসেতে রোদের সোনা শান লেগে জ্বলে,
বুকেতে এঁকেছে ক্ষত তবুও পলাশ।
হে কবি, গানেতে তাই ধাঁধার প্রকাশ?
জীবন ঝরিছে তবু নব বীজ ফলে,
রহস্য-নির্ণয়ে বুঝি কাঁদ পলে পলে
খাতাতে খুলিতে চেয়ে নব মধুমাস?

আমার একটি খাতা আদি হতে খোলা,
একটি অঙ্কেতে সব জমা বুকে রাখি;
প্রতিটি নিমেষ মম যুগ হয়ে বাজে;
অতীতের সুতো দিয়ে বর্তমান-তোলা।
অথবা ধরেছি আমি মাটি দিয়ে ঢাকি,
হে কবি, আশ্রয় নাও মৃত্তিকার মাঝে।'

আমার গান

আমার গানের তারা আকাশ ফোটায়,
পৃথিবীর ফুল তারে দেয় না তো প্রাণ।
পৃথিবী, চেয়েছ তুমি শুনিতে এ গান,
খাঁচা ভেঙে গান মম উড়েছে পাখায়।
বনে বনে, ফুলে ফুলে পৃথিবীর গান—
ক্যানাফুলে, বকফুলে, প্যান্‌সি, জবায়,
চাঁদের হীরার ফুলঝুরির ঝরায়,
নদীর দু কূল ছেপে জলের উজান।

আমারে ধরে নি কোন মাটির কুসুম,
কোন বনানীর শাখে শ্যামল পাতায়;
ধরে নি আমারে প্রেম, হে পৃথিবী শোন,
মাটি হয়ে মিশে-যাওয়া এ মাটির ঘুম
চায় না আমার গান ধরণী-সীমায়।
এ গানের ভাষা তুমি শেখ নি এখনো।

২

হে পৃথিবী, বুকে কত শ্যামল স্বপন;
আমের মুকুল-ঝরা কত তৃণদল;
ভাঁটির ঝোপেতে কত পতঙ্গ বিহ্বল;
ছায়াঢাকা রোদমাখা সকালের ক্ষণ।
কচি-লাল আমপাতা নাচায়ে পবন
ব'য়ে গেল দোলা দিয়ে বাতাপির ফল;
সুবাসের ভারা ল'য়ে বন টলমল;
বসন্তের ফুলঘ্রাণে, পতঙ্গ উন্মন।

এরি মাঝে ঝোপেঝাড়ে রেখেছ কি পাতি,
বিভ্রান্ত কবির লাগি নিরালা আবাস?
তোমার বুকের ঘন অঞ্চল শিথিল
হে পৃথিবী, সেথা সুপ্ত মায়াবিনী রাতি।
আমারে ডাকিল কাছে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,
জন্মান্তের গূঢ় এক সম্বন্ধ জটিল।

৩

অবোধ্য রহস্যে কোন্ পাতা ঝ'রে যায়,
পুরাতন বৎসরের কঙ্কাল যেমন;

দীর্ণ পত্ররাশিতলে প্রবল যৌবন,
নূতন পাতার প্রাণ আবার ফলায়।
ফুল ফোটে গুচ্ছে গুচ্ছে; ফলেরে
পাকায়;
আতাফলে, নোনাফলে রসপ্রস্রবণ;
মাটি ঠেলি মাথা তোলে নবীন জীবন।
মুকুলের ভারে আম পল্লব নোয়ায়।

জন্মরহস্যের এই গোপন ভাণ্ডার
আজি হ'ল উন্মোচিত নয়নের পাতে;
বীজ হতে অঙ্কুরিত দেখিলাম ফল
গন্ধের ইঙ্গিতে আসি বুকেতে তোমার;
ধ্বংস সৃষ্টি একসাথে বাঁধা হাতে হাতে,
স্তরে স্তরে উন্মোচিত প্রাণের দ্বিদল॥

৪

দুই হাতে ডাকে মোরে, 'আয়, আয়, আয়
উদাসী, বনের বুকে মৌনপদ ফেলে।
সহসা ধরেছে বন সব শোভা মেলে।
পোড়ো বাড়ি শ্যামলিত সবুজ মায়ায়।
ভাঁটিফুলে আলিপনা গাছের তলায়;
বোঁটা খসে ঝিঙেফুল কাছে স'রে গেলে;
সবুজ হলুদ ফুল ওঠে ঘাস ঠেলে;
সুবাসিত নেবুফুল সুবাস বিলায়।

তবু আমি পাতা নই, নই আমি ফুল।
হে পৃথিবী, মানুষ যে কতবড় আরো।
পাতার নিশ্চিহ্ন লুপ্তি মাটির অন্তরে,
সে মাটির বুকে নাই মানুষের মূল।
লতার আড়াল শুধু বৃথাই বিস্তারো,
ভালবাসি, তবু আমি যাব দূরে স'রে॥

৫

সহসা সূর্যের আলো বোঁটার মতন
আঁধারে খসায়ে ফেলে যে বনের বুকে,
প্রজাপতি কাঁচপোকা বসে মুখে মুখে,
সে বনও আমার বাসা করে নি রচন।
শান্তির নীরব ভাষ্য পড়িবার মন
মানুষের জীবনের নিরঙ্কুশ দুখে
অর্জন করি নি আজও আপনার সুখে।
তাই বুঝি চলে মম ব্যগ্র অন্বেষণ।

আমি চ'লে যাব দূরে প্রদীপ জ্বালায়ে—
সবুজ আঁধারে এই অস্থির নয়নে
কতটুকু শান্তি তুমি পার ঢেলে দিতে?
শুধু পার শিকড়ের শিকল পরায়ে
জাগ্রতেরে বন্দী রাখা আদিম মরণে।
জীবনেরে পার তুমি নির্বাণেতে নিতে॥

৬

হে পৃথিবী, দিকহারা পাখিদের ঝাঁক
সন্ধ্যায় সকালে করে আকাশেতে ভিড়;
ডানার কম্পিত চাপে বাতাস অধীর;
পাখিতে ভরেছে আর ও-নদীর বাঁক।
'এইজন পথহারা, ডাক্ তারে ডাক্,'
বন-টীয়া ব'লে দিল নাচাইয়া শির;
শালিকের বুলি শুনি কিচিরমিচির;—
'ওরে আয়, এইখানে পা দুখানি রাখ্।'

আমি ইথারের মত, বাতাসের মত
দূর থেকে আসিয়াছি, দূরে যাব ভেসে,
মাটি মোর ঘর নয়—পাতার আসরে
আমি রহিব না জেগে ফুলেদের মত।
আমারে পাবে না তুমি পাখিদের দেশে।
হে পৃথিবী, ঘর মোর আকাশেরও 'পরে।

৭

পূর্ণিমা অতন্দ্র জাগে বনের প্রহরী;
ডালিমের বীথিকায় আলোছায়া-খেলা;

গণ্ডা বা আধ পয়সা রকমের জমিদারী স্বত্বে স্বত্ববান শরিকের অভাব ছিল না। আধ পয়সা, এক পয়সা, এক আনা ক'রে কিনে কীর্তিচন্দ্র এখন নবগ্রামের পাঁচ আনা পরিমাণ জমিদারী স্বত্বের মালিক। জমিদারেরাই মহাপীঠের সেবায়েত বা মালিক, সুতরাং সে দায়িত্ব পালনের জন্য কীর্তিচন্দ্রকে আসতেই হয়। কিন্তু আজকের আসাটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। মহাপীঠে যারা নিত্যযাত্রী, তারা একটু বিস্মিত হয়েছিলেন। কীর্তিচন্দ্র জানতেন যে, কলকাতার এই ব্যক্তিটি নিশ্চয় মহাপীঠে যাবেন। এই যাওয়ার সময় তিনি নিখুঁত হিসেব ক'রে স্থির করেছিলেন, হয় দ্বিপ্রহরের পূজার সময়, নয় সন্ধ্যায় আরতির সময়। কলকাতার এই ব্যবসায়ীদের তিনি খুব ভালভাবেই জানেন। এঁদের হাতের পলা-পান্না, গোমেদ-রত্ন, লোহা-সীসের আংটিতে, নানাবিধ কবচে বিশ্বাস, দৈবশক্তিতে নির্ভরতা, ব্যবসায়ের মূলধনের উপর বিশ্বাস এবং নির্ভরতার চেয়েও বেশি। সাহেবের প্রীতি এবং দেবতার দয়া—এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টার গুরুত্ব বেশি, সেটা সঠিক বলা না গেলেও কোনটাই কম নয়, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায়। সুতরাং দুই সময়ের মধ্যে যে কোন এক সময়ে ভদ্রলোকটিকে এখানে পাবেন, এ তিনি জানতেন। দুপুরেও একবার তিনি এসেছিলেন। আবার সন্ধ্যার মুখে এসেছেন। এই কারণেই মহাপীঠে একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

ভদ্রলোক প্রণাম করছিলেন দেবীমন্দিরের সামনে। কীর্তিচন্দ্র মন্দিরের পিছন দিকে ছিলেন। সেখানে মহাপীঠের পূজক, গদিয়ান সাধুর সঙ্গে এখানকার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত নিয়ে আলোচনা করছিলেন। পূজক এবং গদিয়ান সাধু নানা অভাব-অভিযোগের কথা জানাচ্ছিলেন তাঁকে।

প্রণাম সেরে মন্দিরপ্রদক্ষিণ-পথে কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে স্বর্ণবাবুর দেখা হয়ে গেল। স্বর্ণবাবুর পিছনে কলকাতার ভদ্রলোকটি। কীর্তিচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে স্বর্ণবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বললেন, ভাল আছেন কাকা? তারপরই গভীর বিস্ময় প্রকাশ ক'রে ভদ্রলোকটিকে বললেন, আরে, এ কি ব্যাপার? রমণীবাবু যে? এখানে কোথায় মশায়?

রমণীবাবু শুষ্ক হাসি হেসে দাঁত মেলে বললেন, আরে বাপ রে! মশায়—মশায়—মশায়!

কীর্তিচন্দ্রের কান দুটি লাল হয়ে উঠেছিল, তাঁর অসহিষ্ণু চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ অত্যন্ত আকস্মিক এবং এই প্রকাশের পূর্বে তাঁর মুখ কান লাল হয়ে

চাঁদের জোয়ারে বন পাতা-গাঁথা ভেলা;
আসিছে বনের বাণী বাতাসে সঞ্চরি।
আসন্ন ফাগুয়া যেন দুই মুঠি ভরি
ডালে ডালে বনদেবী ছড়ায়েছে মেলা;
সুবাসে মাতাল কাঁপে সারা রাত্রিবেলা,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে সুবাস বিস্তারি।

তবু আমি দূরে যাব, ওগো অরণ্যানী,
চাঁদ আর ফুল দিয়ে বেঁধ না আমায়।
আমার চলার পথ বহুদূরে খোলা।
যদি থাকি—চিরদিন থেকে যাব জানি।
ডুবে যাব বিস্মরণী পদ্মের নেশায়।
তাই তো বিদায় চাই—
চাই আমি ভোলা।

শেষ

'শেষগান গাও কবি, বিদায়-বেলায়,
কাঁঠালিচাঁপার বুকে রবে প্রতিধ্বনি।
এইখানে ভাঁটিঝোপে ভাঁটিফুল গনি'
বনের আলস্য তুমি নিয়েছ হিয়ায়।
তবু পৃথিবীর ডাক বাঁধে নি তোমায়,
তৃণের প্রান্তটি শীর্ষে কুসুমের মণি,—
ডালে ডালে প'ড়ে গেলে পাতার
জীবনী,
তবু পড়িলে না বাঁধা—হায় বন্ধু, হায়!'

'হে পৃথিবী, নক্ষত্রের আমি চিরসাথী
তবু বসন্তের দিনে মম বাতায়নে
নামহীন ছোট ফুলে বিজয় তোমার
যেমন উল্লসি ওঠো বসন্তেতে মাতি,
তেমনি উল্লাস মনে আন অকারণে।
মাটির মায়াতে মুগ্ধ মানি আমি হার।'

শ্রীমতী বাণী রায়

ক্ষুদিরাম

মজঃফরপুরে আমাদের উকিলদের একটি ছোট আড্ডা ছিল। আমরা প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে একত্র হইয়া গল্প করিতাম, রাজা-উজির বধ করিতাম। পরনিন্দা ও পরচর্চাও যথেষ্ট হইত, আর হইত রাজনীতিক তর্কবিতর্ক।

ইংরেজী ১৯০৮ সাল, বাংলা ১৩১৫।

সেদিন ছিল ১৭ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার; ৩০এ এপ্রিল, অমাবস্যা। রাত্রি প্রায় আটটার সময় একটা ভীষণ শব্দে আমরা সকলেই চমকিয়া উঠিলাম। অমন আওয়াজ আর শুনি নাই। কেহ বলিল, রেল-স্টেশনে দুই এঞ্জিনে ঠোকাঠুকি হইয়া থাকিবে। কেহ বলিল, কোন বয়লার ফাটিয়া গিয়া থাকিবে। আড্ডা শেষ করিয়া আমরা যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

গরমের সময় আমাদের প্রাতঃকালে কাছারি বসিত। ১লা মে প্রথম প্রাতঃকালীন কাছারির আরম্ভ। আমরা প্রত্যুষে কাছারি আসিয়া শুনিলাম, রাত্রে জজ কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের গাড়িতে বোমা ফেলিয়া কাহারা পলাইয়া

গিয়াছে। সে গাড়িতে ছিলেন আমাদেরই উকিল বন্ধু কেনেডি সাহেবের স্ত্রী ও কন্যা। তাঁহারা নিহত হইয়াছেন। জজ-সাহেবের বাংলো নিকটেই ছিল। গিয়া দেখি, তাঁহার বাংলোর গেটের কাছে রাস্তার উপর খানিকটা স্থান ঘিরিয়া আট-দশটি পুলিস পাহারা দিতেছে। মধ্যখানে ধূলায় মেশানো রক্ত জমাট বাঁধা, তাহার উপর মাছি ভনভন করিতেছে। জজ-সাহেবের এবং কেনেডি সাহেবের গাড়ি দেখিতে একই রকম ছিল। আততায়ীরা জজের গাড়ি নির্বাচন করিতে ভুল করিয়াছিল। কেহ বলিল, জজ-সাহেবের পরমায়ু ছিল, তাই তাঁহার গাড়ি একটু পিছনে আসিতেছিল বলিয়া বাঁচিয়া গেলেন। সাহেবদের ক্লাব-ঘরটিও জজ-সাহেবের বাংলো হইতে অল্প দূরে অবস্থিত। সাহেব বোধ হয় ভয়ে ভয়ে থাকিতেন। ওই অল্প একটু রাস্তাও হাঁটিয়া আসিতেন না, গাড়িতেই যাতায়াত করিতেন। আমরা জজের এজলাসে গিয়া প্রাণরক্ষা হইয়াছে বলিয়া সাহেবকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলাম। জজ-সাহেব কেনেডি সাহেবের স্ত্রী ও কন্যার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কাছারি বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া বাংলোতে ফিরিয়া গেলেন।

উকিলদের ঘরে বোমা কি বস্তু তাহা লইয়া নানা জল্পনাকল্পনা চলিতে লাগিল। ইহার পূর্বে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের 'সন্ধ্যা' কাগজে "কালী মায়ীর বোমা"র উল্লেখ থাকিত। কিংস্‌ফোর্ড যখন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন. তখন অনেক তরুণ বাঙালী ছাত্র তাঁহার হাতে কঠিন শাস্তি পাইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল সুশীল। তাহার সম্বন্ধে 'সন্ধ্যা'য় উপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, "সুশীলের তুড়ি লাফ, ফিরিঙ্গি বলে বাপ বাপ'। এই সুশীলকে কিংস্‌ফোর্ড সাহেব বেত্রদণ্ডের হুকুম দিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, সেইজন্যই বিপ্লবীগণ তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল। 'সন্ধ্যা' কাগজে এই নিষ্ঠুর দণ্ডের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিল "কসাই কাজী কিংস্" নামে কয়েকটি প্রবন্ধ।

১লা মে শোনা গেল, মজঃফরপুর হইতে ২৪ মাইল দূরে পুশা নামক স্টেশন হইতে একটি বাঙালী ছাত্রকে পুলিসে ধরিয়া আনিয়াছে। দৌড়িয়া স্টেশনে গিয়া শুনিলাম, পুলিস ছাত্রটিকে লইয়া সোজা সাহেবদের ক্লাবের বাড়িতে গিয়াছে। সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব তাহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতেছেন।

পরদিন সকালে মিঃ উড্‌ম্যান ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বাঙালী উকিলদিগকে

নিজের এজলাসে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমাদের মধ্যে প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সরকারী উকিল। তাঁহার সঙ্গে আমরা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত হইয়া দেখি, কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে একটি ১৫।১৬ বছরের প্রিয়দর্শন বালক। এতগুলি বাঙালী উকিল দেখিয়া ছেলেটি মৃদু মৃদু হাসিতেছে। কি সুন্দর চেহারা ছেলেটির! রঙ শ্যামবর্ণ, কিন্তু মুখখানি এমনই চিত্তাকর্ষক যে, দেখিলেই স্নেহ করিতে ইচ্ছা হয়। কাঠগড়ার এক দিকে পুলিস কলার পাতায় কিছু মিষ্টান্ন ও এক ঘটি জল এবং গেলাস রাখিয়া গেল। ছেলেটি তাহা স্পর্শও করিল না।

উডম্যান সাহেব তখন ছেলেটির বর্ণনা পড়িয়া আমাদের শুনাইতে লাগিলেন। তখন জানিলাম, ছেলেটির নাম—ক্ষুদিরাম বসু, নিবাস মেদিনীপুর। ক্ষুদিরামের বর্ণনা পড়িতে পড়িতে ক্রোধে উডম্যান সাহেবের বদন রক্তবর্ণ ও ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল। তিনি বলিলেন যে, এই নিরপরাধ বালককে যাহারা কুপথে চালাইয়া বিপন্ন করিল, সেই নেতাদের বিরুদ্ধে সকল বাঙালীর আন্দোলন করা কর্তব্য। বর্ণনাতে ক্ষুদিরাম যে সব লোকের নাম করিয়াছিল, তাহারা কোন কালে বিপ্লবী ছিল না বা হয় নাই। যাহা মনে আসিয়াছিল, এমন কয়েকটি মনগড়া ঠিকানাও দিয়াছিল। পরে তাহা তাহার কাছেই শুনিয়াছিলাম। বর্ণনা শুনানো হইতেছে এমন সময় একটি তার আসিল শিববাবুর কাছে। শিববাবুর একমাত্র দৌহিত্র নন্দলাল পুলিসের সাব-ইন্সপেক্টর ছিল। সম্প্রতি ছুটিতে দাদামহাশয়ের বাড়িতে আসিয়া কিছুদিন থাকার পর কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেছিল। রাস্তায় ট্রেনে একটি ছেলের উপর সন্দেহ হওয়ায় দাদামহাশয়কে তার করিয়া জানিতে চাহিয়াছে যে, ছুটিতে থাকা কালে সে ওই ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করিতে পারে কি না! তখনই উডম্যান সাহেব তার পাঠাইলেন ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিয়া।

তার পরদিন শুনিলাম, সেই ছেলেটি মোকামাঘাটে ধৃত হইবার সময় আত্মহত্যা করিয়াছে। নিজের বর্ণনায় ক্ষুদিরাম তাহার নাম বলিয়াছিল—দিনেশ। শেষে বিচারকালে তাহার প্রকৃত নাম বাহির হইল—প্রফুল্ল চাকী।

এখন প্রফুল্লর সহযাত্রী এবং সমস্তিপুর-অধিবাসী বাঙালীদের নিকট প্রফুল্ল সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাও লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সমস্তিপুর মজঃফরপুর হইতে বত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। একটি রেলের

বাঙালী কর্মচারীর বাড়ি ছিল শহরের পশ্চিমপ্রান্তে মাঠের দিকে। ক্ষুদিরাম আমাদের বলিয়াছিল যে, উহারা বোমা নিক্ষেপ করিয়া রেলের রাস্তা ধরিয়া চলিতে থাকে সমস্তিপুরের দিকে। সকালবেলা পুশা স্টেশনের নিকট একটা নির্জন আম-বাগানে লুকাইয়া থাকে। এদিকে রাত্রিতেই পুলিসের লোক সমস্ত স্টেশনে পাঠানো হইয়াছিল। তাহারা সাধারণ পোশাক পরিয়া অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। ক্ষুধায় কাতর হইয়া প্রফুল্ল ক্ষুদিরামকে পাঠাইয়াছিল স্টেশন-সংলগ্ন দোকান হইতে মুড়ি আনিবার জন্য। ক্ষুদিরাম হিন্দি বলিতে পারিত না। মুদীর দোকানে গিয়া বলিল, মুড়ি দে। বলিতেই পাশে দাঁড়ানো কনস্টেবল তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। ক্ষুদিরাম আমাদের বলিয়াছিল যে, ধৃত হইবার পর সে কি একটা চীৎকার করিয়াছিল, উদ্দেশ্য—প্রফুল্ল আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবে। কেন না সে নিজে পিস্তল চালাইতে জানিত না, যদিও সঙ্গে বেশ বড় একটি পিস্তল ছিল। কিন্তু প্রফুল্ল আসিল না। ক্ষুদিরাম বলিয়াছিল, প্রফুল্লর আসা উচিত ছিল, আসিলে আমরা উভয়েই পলাইতে পারিতাম। প্রফুল্ল রিভল্‌ভার চালনায় সিদ্ধহস্ত ছিল। কনস্টেব্‌ল কি অন্য লোকেদের তাড়ানো তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল না।

যাহা হউক, প্রফুল্ল চলিতে লাগিল সমস্তিপুরের দিকে। বেলা দুপুরের কাছাকাছি সেই বাঙালী কর্মচারীটি দেখিতে পাইলেন, মাঠের মধ্য দিয়া একটি উস্কখুস্ক-চুল বাঙালী ছাত্র আসিতেছে। আগের রাত্রেই ওখানে রেল-স্টেশনে বোমার দুর্ঘটনার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। বাঙালী বাবুটি বুঝিলেন, এই ছাত্রটিই একটি পলাতক বিপ্লবী। যত্ন করিয়া গোপনে প্রফুল্লকে নিজের বাড়ি লইয়া আসিলেন। তাহার স্নানাহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বাজার হইতে নূতন জামা ধুতি জুতা কিনিয়া দিলেন। তারপর রাত্রের ট্রেনে কলিকাতার টিকিট কিনিয়া নিজে গিয়া ইণ্টার ক্লাসে উঠাইয়া দিয়া আসিলেন।

ঠিক ঐ গাড়িতে ঐ কামরাতেই যাইতেছিলেন নন্দলাল আর মজঃফরপুরের বাঙালী দুই-একটি যুবক। অল্প সময়ের মধ্যেই নন্দলালের সঙ্গে প্রফুল্লর ভাব জমিয়া উঠিল। শুনিয়াছি, প্রফুল্লর দৈহিক শক্তি পরীক্ষা করার জন্য পাঞ্জা ধরাধরিও করিয়াছিল। সকালবেলা জাহাজে গঙ্গা পার হইতে হয়। অত প্রত্যূষে কুলি পাওয়া যাইতেছিল না। উদ্বিগ্ন নন্দলালকে সান্ত্বনা দিয়া প্রফুল্ল নিজেই তাহার বাক্স বিছানা বহন করিয়া লইয়া গেল। অপর পারে পৌঁছিয়া

উঁহারা কলিকাতাগামী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। নন্দলাল কোথায় যেন গা-ঢাকা দিল। একটু পরে পাঁচটি কন্‌স্টেব্‌ল সঙ্গে লইয়া আসিয়া প্রফুল্লকে বলিল, আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিতেছি। ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জন করিয়া উঠিল প্রফুল্ল, "তুমি বাঙালী হইয়া গ্রেপ্তার করিতে চাও আমাকে! আচ্ছা, তবে এই নাও দণ্ড।" বলিয়া রিভল্‌ভার ছুঁড়িল। নন্দর আরও কয়েক মাস আয়ু ছিল, তাই মাথা নীচু করিয়া এ যাত্রা রক্ষা পাইল। তখন পুলিস ওকে ঘিরিয়া ফেলিলে প্রফুল্ল একবার নিজের কপালে আর একবার বুকে গুলি করিয়া প্ল্যাট্‌ফর্মে পড়িয়া গেল। বাংলার এই প্রথম বীর পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিল। পুলিস মৃত প্রফুল্লর ফোটো তুলিয়া লইল। শুনিয়াছি, ক্ষুদিরামকে দিয়া সনাক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার ছিন্ন মুণ্ড মজঃফরপুরে লইয়া আসিয়াছিল। বিচারকালে প্রফুল্লর সেই অবস্থার ফোটো আমি দেখিয়াছি। কপালের ঊর্ধ্ব দিকে একটি ও বাঁ দিকের বুকের উপর দিকে একটি গুলি-প্রবেশের চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই যে, কি অমিত বীর্য ও মনের বল থাকিলে মানুষ নিজের শরীরে দুইবার গুলি লাগাইতে পারে! কি প্রশস্ত নিটোল ললাট ছিল প্রফুল্লর! আর বক্ষদেশ কি উন্নত ও বিস্তৃত! বাঙালী হইয়া এই প্রথম দেখিলাম বাঙালী বীরের প্রকৃত মূর্তি।

প্রফুল্ল চলিয়া গেল। এখন ক্ষুদিরামের বিচার হইবে, তাহার আয়োজন হইতে লাগিল। আমরাও তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এই কার্যে উৎসাহ ও সাহস লইয়া আসিলেন কালিদাস বসু উকিল মহাশয়। এই তিন মাস হইল, তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তখনও জানিতাম না যে, দেশে স্বাধীনতা এত শীঘ্র আসিবে আর নির্ভয়ে এই কাহিনী বলিতে পারিব। যদি জানিতাম, তাহা হইলে এই লেখাটি পূর্বেই লিখিয়া কালিদাস-বাবুকে দেখাইয়া আরও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বাহির করিতে পারিতাম।

যেদিন প্রফুল্ল আত্মহত্যা করিল, সেই দিনই মানিকতলা বাগান ঘিরিয়া ফেলিয়া পুলিস বারীন ঘোষ, উপেন বাঁড়ুজ্জে, উল্লাসকর প্রভৃতি অনেক যুবককে গ্রেপ্তার করিল। ভারতবর্ষে বোমা বাহির হইয়াছে শুনিয়াই কলিকাতার পুলিস সতর্ক হইয়া সন্দেহজনক স্থান ঘিরিয়া ঐ গ্রেপ্তার করিয়াছিল। ক্ষুদিরামের মুখ দিয়া কোন কথাই ওখানকার সম্বন্ধে বাহির হয় নাই। পরে ক্ষুদিরাম বলিয়াছিল

যে, সে নূতন ঐ দলে ঢুকিয়াছিল। কোথায় কাহারা এই দলে আছে, তাহা সে জানিত না। এইরূপই নিয়ম ছিল উহাদের। ক্ষুদিরাম বলিয়াছিল, মেদিনীপুরে ওর নিজের বাড়িতে একটি চিঠি আসে ওর নামে, তাহাতে আদেশ ছিল—অমুক তারিখে অমুক সময় হাওড়া স্টেশনের নির্দিষ্ট স্থানে সে অপেক্ষা করিবে; সেখানে অমুক কথা বলিয়া যে তাহাকে ডাকিবে তাহার নির্দেশমত তাহার সঙ্গে যাইতে হইবে। প্রফুল্লকে আগে চিনিতও না ক্ষুদিরাম।

এদিকে নিরপরাধ দুটি বাঙালীও ধৃত হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইল, একটি—শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল বন্দোপাধ্যায়, কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হেড-ক্লার্ক। তাঁহার অফিস ছিল ধর্মশালার নিকটে। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম ধর্মশালায় থাকিত, কিশোরীবাবুর কাছে বসিয়া গল্প করিয়া আসিত। কিশোরীবাবুও দুই-একদিন উহাদের নিজের বাড়িতে লইয়া গিয়া ভাত ডাল মাছের ঝোল খাওয়াইয়াছিলেন। ধর্মশালায় ছেলে দুইটির ভাত জুটিত না। এই অপরাধ তাঁহার। যাহা হউক, দশ হাজার টাকার জামিনে আমি ও আমার একটি উকিল বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহাকে খালাস করিয়া আনি। এই জামিন হওয়ার অপরাধে সুরেনবাবুর নাম হাইকোর্টে মুন্সেফ-পদপ্রার্থীর তালিকা হইতে অপসারিত হইল।

দ্বিতীয় ধৃত ব্যক্তি ছিলেন—শ্রীমান মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী। আমহার্স্ট স্ট্রীট ইহার ভ্রাতা ডাঃ নীলমণি চক্রবর্তীর এক্স-রে-চিকিৎসালয় ছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের যক্ষ্মা হইয়াছিল, ডাক্তার দেখাইতে প্রফুল্লর সহিত এক গাড়িতে কলিকাতা গিয়াছিল—এই অপরাধ। বহু কষ্টে স্থানীয় ডাক্তার আমার বন্ধু পরলোকগত উপেন্দ্রনাথ ভায়া নিজে জামিন হইয়া তাঁহাকে খালাস করিয়া আনেন। এই ঘটনার অনতিকাল পরে মৃত্যুঞ্জয় মারা যান। কিশোরীবাবুর নামে মকদ্দমা সরকার পরে উঠাইয়া লয়। তিনি অন্যত্র বদলি হইয়া যাইবার পর তাঁহার আর কোন খবর পাই নাই।

এখন ক্ষুদিরামের বিচার। ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে প্রাথমিক বিচার বিশেষ চঞ্চলতার সৃষ্টি করে নাই। কেবল প্রফুল্লর রিভলভারটি লইয়া একটু রহস্য হইয়া গেল। হাতের মুঠার মধ্যে লুকানো যায়, এত ছোট সাদা ঝকঝকে বস্তুটি। স্থানীয় পুলিস-কর্মচারীগণ তাহা খুলিয়া কয়টি গুলির কক্ষ খালি হইয়াছিল দেখিতে পারিলেন না। অবশেষে কলিকাতা হইতে বিশেষজ্ঞ

আসিয়া এই কার্য সম্পন্ন করেন। আমি সে রিভলভার দেখিয়াছি। অস্ত্রটি বেলজিয়মের তৈয়ারি।

দায়রায় ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনের জন্য কালিদাসবাবুর নেতৃত্বে আমরা প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। নির্ধারিত দিনে রংপুর হইতেও দুইটি উকিল এই কার্যে সহায়তা করিতে আসিলেন। একজনের নাম সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, দ্বিতীয় উকিলবাবুটির নাম স্মরণ নাই।

যে কারণেই হউক, উডম্যান সাহেব ক্ষুদিরামের উপর স্নেহ-ব্যবহার করিতেছিলেন। জেলে তাহাকে রাঁধিয়া দিবার জন্য পৃথক পাচক-ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং বাঙালীর রুচিমত খাদ্যই তাহাকে খাওয়ানো হইত। আম ও অন্যান্য ফলও তাহাকে দেওয়া হইত। জেলে গিয়া ক্ষুদিরামের সহিত দেখা করিবার জন্য উকিলবাবুদের অনুমতি দেওয়া ছিল। ক্ষুদিরাম বই পড়িতে চাহিলে ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনচরিত ও রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী দিয়াছিলাম। পুলিস পরে দয়া করিয়া বই তিনখানি ফেরত দিয়াছিল। প্রথম দুইখানি হারাইয়া গিয়াছে। হিতবাদী-প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গদ্য-গ্রন্থাবলীখানি এখনও রহিয়াছে। ক্ষুদিরামের বিচার করিতে আসিলেন মিঃ কার্নডফ, একটি প্রবীণ আই. সি. এস. জজ। ইনি অনতিকাল পরেই হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন।

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যবস্থায় ক্ষুদিরামকে ফিটন-গাড়ি করিয়া প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত জেল হইতে কাছারিতে আনা হইত। রাস্তায় উভয় পার্শ্বে লোক দাঁড়াইয়া থাকিত ক্ষুদিরামকে দেখিবার জন্য। বহু লোক উহাকে সেলামও করিত।

এজলাসে লোকারণ্য। দেশীয় লোক ব্যতীত নীলকুঠীর ইংরেজ সাহেব অনেকে উপস্থিত থাকিতেন। তিন-চার দিন সাক্ষীগণের জবানবন্দী, জেরা ও বক্তৃতা শেষ হইলে পর ক্ষুদিরামের উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইল। আদেশ শুনিয়া ক্ষুদিরাম জজকে বলিল, একটা কাগজ পেন্সিল দিন, আমি বোমার চেহারাটা আঁকিয়া দেখাই। অনেকের ধারণা নাই, ও বস্তুটি কি রকম দেখিতে। জজ ক্ষুদিরামের এ অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। বিরক্ত হইয়া ক্ষুদিরাম পাশে দাঁড়ানো কন্‌স্টেবলকে ধাক্কা দিয়া বলিল, চলো বাইরে। বিচার শেষ হইলে একটি নীলকুঠীর সাহেব তাঁহার পাশে উপবিষ্ট একটি বাঙালী যুবককে প্রশ্ন

করেন, Are you a Bengali youth? যুবকটি বলিল, Yes। সাহেব বলিলেন, Try to follow in the foot steps of your brother।—বলিয়াই বিচার-কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার পর আমরা হাইকোর্টে আপীল করিলাম। ক্ষীণ আশা ছিল, যদি মৃত্যুদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। জেলে তাহাকে এ প্রস্তাব করিতেই সে অসম্মতি জানাইল, বলিল, চিরজীবন জেলে থাকার চাইতে মৃত্যু ভাল। কালিদাসবাবু বুঝাইলেন, দেশে এমন একটি ঘটনা হয়তো ঘটিতে পারে যে, তোমায় বেশিদিন জেলে থাকিতে নাও হইতে পারে। অবশেষে সে সম্মত হইল। কলিকাতা হাইকোর্টের আপীলে প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু ক্ষুদিরামের হইয়া খুব হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু ফাঁসির হুকুম বহালই রহিল।

ইহার পর কালিদাসবাবু ক্ষুদিরামকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বড়লাটের নিকট একটি ক্ষমাভিক্ষার দরখাস্ত দিতে চাহিলেন। ক্ষুদিরাম তাহাতে কিছুতেই সই করিবে না। কিন্তু কালিদাসবাবু বুঝাইলেন, তোমরা দুইজনে তো অপরাধ করিয়া ফাঁসি যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া ধরা দাও নাই। পলাইয়া গিয়াছিলে, বাঁচিয়া থাকিয়া দেশের অন্য কাজ করিবে বলিয়া। এ দরখাস্তও সেইরূপ—যদি বাঁচিয়া যাও, দেশের অনেক কাজ করিতে পারিবে। ক্ষুদিরাম কালিদাসবাবুকে খুশি করার জন্য সই করিয়া দিল।

কিন্তু কিছুই হইল না। ১১ই আগস্ট ফাঁসির দিন ধার্য হইল। আমরা দরখাস্ত দিলাম যে, ক্ষুদিরামের ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিব এবং তাহার মৃতদেহ হিন্দুমতে সৎকার করিব। উড্‌ম্যান সাহেব আদেশ দিলেন, দুইজন মাত্র বাঙালী ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিবে, আর শববহন করিবার জন্য বারোজন ও শবের অনুগমনের জন্য বারোজন থাকিবে। ইহারা কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়া শ্মশানে যাইবে।

জেলে ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য আমি এবং ৺ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল অনুমতি পাইলাম। আমি তখন 'বেঙ্গলী' কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা। বোমা পড়া হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় সংবাদ সে কাগজে পাঠাইতাম। কৌতূহলী পাঠক ঐ সময়ের 'বেঙ্গলী' কাগজের ফাইল পাইলে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন। আমি অতি গোপনভাবে বাড়িতে

বসিয়া একটি বাঁশের খাটিয়া প্রস্তুত করাইলাম। যেখানে মাথা থাকিবে, সেখানে ছুরি দিয়া কাটিয়া "বন্দে মাতরম্‌" লিখিয়া দিলাম।

ভোর ছয়টায় ফাঁসি হইবে। পাঁচটার সময় আমি গাড়ির মাথায় খাটিয়াখানি ও আবশ্যকীয় সৎকারের বস্ত্রাদি লইয়া জেলের ফটকে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, নিকটবর্তী রাস্তা লোকে লোকারণ্য। ফুল লইয়া বহু লোক দাঁড়াইয়া আছে।

সহজেই আমরা দুইজনে জেলের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঢুকিতেই একটি পুলিস-কর্মচারী প্রশ্ন করিলেন, 'বেঙ্গলী' কাগজের সংবাদদাতা কে? আমি উত্তর দিলে হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, যান ভিতরে। দ্বিতীয় লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইলে, আমরা জেলের আঙিনায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ডান দিকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে ফাঁসির মঞ্চ। দুই দিকে দুইটি খুঁটি আর একটি মোটা লোহার রড বা আড় দ্বারা যুক্ত, তারই মধ্যস্থানে বাঁধা মোটা একগাছি দড়ি ঝুলিয়া আছে, তাহার শেষপ্রান্তে একটি ফাঁস। একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম, ক্ষুদিরামকে লইয়া আসিতেছে চারজন পুলিস। কথাটি ঠিক বলা হইল না। ক্ষুদিরামই আগে আগে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিয়া আনিতেছে। আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল। স্নান সমাপন করিয়া আসিয়াছিল। শেষে শুনিয়াছি, খুব প্রত্যুষে উঠিয়া স্নান করিয়া কারাবাসকালীন বর্ধিত চুলগুলি আঙুল দিয়া বিন্যস্ত করিয়া নিকটবর্তী দেবমন্দির হইতে প্রহরী কর্তৃক সংগৃহীত চরণামৃত পান করিয়া আসিয়াছিল। আমাদের দিকে আর একটিবার চাহিল। তারপর দৃঢ়পদবিক্ষেপে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। মঞ্চে উপস্থিত হইলে তাহার হাত দুইখানি পিছন দিকে আনিয়া রজ্জুবদ্ধ করা হইল। একটি সবুজ রঙের পাতলা টুপি দিয়া তাহার গ্রীবামূল অবধি ঢাকিয়া দিয়া গলায় ফাঁসি লাগাইয়া দেওয়া হইল। ক্ষুদিরাম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এদিক ওদিক একটুও নড়িল না। উডম্যান সাহেব ঘড়ি দেখিয়া একটি রুমাল উড়াইয়া দিলেন। একটি প্রহরী মঞ্চের এক প্রান্তে অবস্থিত একটি হ্যাণ্ডেল টানিয়া দিল। ক্ষুদিরাম নীচের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া উপরের দড়িটি একটু নড়িতে লাগিল। তারপর সব স্থির।

আমরা জেলের বাহিরে আসিলাম। আধ ঘণ্টা পরে জেলের দুইজন বাঙালী

যুবক ডাক্তার আসিয়া খাটিয়া ও নূতন বস্ত্র লইয়া গেলেন। নিয়ম অনুসারে ফাঁসির পর গ্রীবার পশ্চাৎদিকে অস্ত্র করিয়া দেখা হয় যে, পড়ামাত্র মৃত্যু হইয়াছিল কি না! ডাক্তার দুইটি সেই অস্ত্র-করা স্থান সেলাই করিয়া, ঠেলিয়া বাহির হওয়া জিহ্বা ও চক্ষু যথাস্থানে বসাইয়া, নূতন কাপড় পরাইয়া, দুইজনে খাটিয়া ধরিয়া মৃতদেহটি জেলের বাহিরে আমাদের দিয়া গেলেন।

কর্তৃপক্ষের আদেশে আমরা নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়া শ্মশানে চলিতে লাগিলাম। রাস্তার দুই পাশে কিছু দূর অন্তর পুলিস প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের পশ্চাতে শহরের অগণিত লোক ভিড় করিয়া আছে। অনেকে শবের উপর ফুল দিয়া গেল। শ্মশানেও অনেক ফুল আসিতে লাগিল। একটি সাব-ইন্‌স্পেক্টরের নেতৃত্বে বারোজন পুলিস শ্মশানের এক প্রান্তে বসিয়া রহিল।

চিতারোহণের আগে স্নান করাইতে গিয়া ক্ষুদিরামের মৃতদেহ বসাইতে গেলাম। দেখিলাম, মস্তকটি মেরুদণ্ডচ্যুত হইয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দুঃখ বেদনা ক্রোধে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাথাটি ধরিয়া রাখিলাম। বন্ধুগণ স্নান শেষ করাইলেন। তারপর চিতায় শোয়ানো হইলে রাশিকৃত ফুল দিয়া মৃতদেহ সম্পূর্ণ ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কেবল উঁহার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি অনাবৃত রহিল। দেহটি ভস্মীভূত হইতে বেশি সময় লাগিল না। চিতার আগুন নিভাইতে গিয়া প্রথম কলসী-ভরা জল ঢালিতেই তপ্ত ভস্মরাশির খানিকটা আমার বক্ষস্থলে আসিয়া পড়িল। তাহার জন্য জ্বালা-যন্ত্রণা বোধ করিবার মনের অবস্থা তখন ছিল না।

আমরা শ্মশানবন্ধুগণ স্নান করিতে নদীতে নামিয়া গেলে পুলিস-প্রহরীগণ চলিয়া গেল। তখন আমরা সমস্বরে একবার "বন্দে মাতরম্" বলিয়া মনের ভার খানিকটা লঘু করিয়া যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্গে লইয়া আসিলাম একটি টিনের কৌটায় কিছু চিতাভস্ম কালিদাসবাবুর জন্য। ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলায় সে পবিত্র ভস্মাধার কোথায় হারাইয়া গিয়াছে।

ইহার পর ৩৯ বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি কিছুই ভুলি নাই। ক্ষুদিরামের উত্তপ্ত-দেহভস্ম-দগ্ধ শ্বেতচিহ্নটি আমার বুকের উপর এখনও রহিয়াছে, আর বুকের ভিতরে অম্লান আছে তাহার হাস্যোজ্জ্বল কচি মুখখানি।

তখন ভাবিতাম, বালকটি নিজের হাতে বোমা ফেলে নাই, কিন্তু প্রফুল্লর সঙ্গে ছিল বলিয়া আইনের চোখে অপরাধী হইল। ইহাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে

ওঠে; স্বর্ণবাবু তা জানেন; তিনি গোঁফে তা দিয়ে হেসে বললেন, আমার এখানে উঠেছেন উনি। দেবদর্শন করতে এসেছেন।

কীর্তিচন্দ্র একটু দ'মে গেলেন, বুঝলেন স্বর্ণবাবুর ইঙ্গিত; রমণীবাবুকে আগলে দাঁড়াবেন তিনি, কোনক্রমেই পথ ছেড়ে দেবেন না। মুহূর্তে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে তিনি বললেন, সেই তো আশ্চর্য হচ্ছি। আমার সঙ্গে এত পরিচয়, কলকাতার আপিসে দিনে দুবারও আসেন তিনবারও আসেন, অথচ এখানে এসে আপনার ওখানে উঠলেন—

বাধা দিয়ে স্বর্ণবাবু বললেন, উঠলেন তার কারণ আছে বইকি। সে কি তুমি শোন নি? বউঠাকরুণ, মানে—তোমার মা আজ আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন, সে জান তো? তিনি কিছু বলেন নি? ওঁর আসার কথা তিনি জানেন দেখলাম।

কীর্তিচন্দ্র ক্ষোভে রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি প্রাণপণে অগ্ন্যুদ্গারের চেষ্টা করলেন, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পারলেন না। নিজেই তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনিই আজ নবগ্রামের জীবন-নাট্যের সর্বপ্রধান ব্যক্তি। গোপীচন্দ্র নিজে দরিদ্র ছিলেন, প্রথম জীবনের দারিদ্র্যের মধ্যে স্থানীয় মাননীয়দের অনেক উপকার অনেক স্নেহ পেয়েছিলেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা ছিল, তার উপর ছিল তাঁর স্বভাবগত বিনয়, যার ফলে উত্তর-জীবনে বহু সম্পদের অধিকারী হয়েও কখনও রূঢ় হতে পারেন নি। কীর্তিচন্দ্র ধনীর সন্তান হয়েই জন্মেছেন, প্রকৃতির মধ্যে আছে অসাহঞ্চুতা এবং প্রচণ্ড রূঢ়তা। গোপীচন্দ্রের প্রতিষ্ঠাপথে যারা বাধা দিয়েছে, তাদের উপর আছে নিষ্ঠুর আক্রোশ। বাধা যারা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বর্ণভূষণই প্রধান। আক্রোশ তাঁরই উপর সর্বাপেক্ষা বেশি। সে আক্রোশ এত প্রবল যে, হিংসায় উন্মত্ত হয়ে গোপন কল্পনায় যে সব কথা ভেবেছেন, দু-একজন অন্তরঙ্গের কাছে প্রকাশ করেছেন, সুস্থ মানসিকতার প্রসন্ন অবসরে সে সব কথা শুনে তিনি নিজেই শিউরে উঠেন। সেই স্বর্ণভূষণ তাঁকে ইঙ্গিতে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তোমার মা আমার কাছে করুণাপ্রার্থী হয়ে এসেছিলেন, তাঁর সে প্রার্থনা আমি পূর্ণ করেছি; এই ভদ্রলোককে অপমান করবার পূর্বে সেই কথাগুলি স্মরণ কর। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, তবুও কীর্তিচন্দ্র স্বর্ণবাবুর এই কথার উত্তরে অগ্ন্যুদ্গার করতে পারলেন না।

হত্যা না করিলে কি সত্যই ইংরেজ-রাজত্বের অবসান ঘটিত ? আজ ভাবিতেছি, ক্ষুদিরামের মত বীর বাঙালী যুবকগণই নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া স্বাধীনতার আবির্ভাব ত্বরান্বিত করিয়া গিয়াছে। পাপপুণ্যের বিচার করা সহজ নয়। মহাত্মাজীকে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তথাপি যে বীরত্ব, যে মনের বল, যে অদম্য সাহস, জীবনদান করিবার যে অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাকে সম্ভ্রম না করিয়া, শ্রদ্ধা না দেখাইয়াও তো থাকিতে পারি না। মহাত্মাজীর জয় হউক এবং ইঁহাদের নামও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকুক।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

গান্ধী-বাণী-কণিকা

(ইংরেজী হইতে ছন্দে অনুবাদিত)

(১)

আমি জানিয়াছি পথ,—
সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কটময়
ক্ষুরধার অসিবৎ।
সে পথে মনের আনন্দে আমি চলি,
কেঁদে উঠি, যবে প'ড়ে যাই পা পিছলি।
জানি জানি তাঁর আশ্বাসবাণী
মিথ্যা হবার নয়,
এ পথ চলিতে অবিচলিতের
বিনাশের নাহি ভয়।

(২)

যে কাজ আমার হাতে আছে, আমি
তাই শুধু ক'রে যাই ;
'কেন-কস্মাৎ' দুশ্চিন্তায়
মাথা ঘামাতে না চাই।
এটুকু বুদ্ধি আছে,—
বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝিবার নয়
মিছে ঘোরা তার পাছে।

(৩)

সত্যের সন্ধানী

ধূলি হতে যদি নাহি হয় দীন
ব্যর্থ হবে সে, জানি।
পথের যে ধূলা পদতলে দলি'
বিশ্বজগৎ চলে,
সত্যান্বেষী পথিকের পথ
রবে সে ধূলিরও তলে।
পথের ধূলারও পদধূলি বহি' মাথে
যেতে হয় ভাই সত্যের সাক্ষাতে।

(৪)

আমি জানি, আমি জানি,—
সবাই আমরা বহিবারে পারি
তাঁহারি ঐশী বাণী
শুধু যদি করি জয়—
সর্বমানবভয়
নয়ন মোদের শুদ্ধ সত্যে
অপলক চেয়ে রয়।
বিশ্বাস আমি করি,—
মানুষের ভয় ঘুচেছে আমার
সত্যের পথ ধরি'।

(৫)

সত্যের বিধি মানি শুধু আমি,
সত্যই মোর প্রাণ,
সত্য ভিন্ন নাহি সেবি আমি
আর কোন ভগবান।

(৬)

সত্য ও প্রীতি ধর্ম ও নীতি
অভীতি—আমার হরি;

জ্যোতির জ্যোতি ও প্রাণাতীত তিনি
রয়েছেন প্রাণ ভরি।
অসীম অপার করুণায় তাঁর
উথলে অন্তরীক্ষ,
ভক্তের বুকে ভগবান তিনি,
নাস্তিকে নাস্তিক্য।
যদিও তাঁহারি নামে
বহু দুষ্কৃতি হয়েছে হতেছে,—
তাঁর রথ নাহি থামে।
সকল দুঃখে চিরদুখী তিনি,
ধৈর্যের নাহি শেষ,
মুহূর্তে পুনঃ করেন ধারণ
দারুণ রুদ্রবেশ।
তাঁর চেয়ে কোন বড় ডেমোক্র্যাট
জন্মে নি ভূভারতে,
দেওয়া আছে তাঁর সম অধিকার
সৎ কি অসৎ পথে।
তাঁর বাড়া কেবা স্বেচ্ছাচারী গো,
দুরন্ত খামখেয়ালী?
মুখ হতে কেড়ে সুখের পেয়ালা
হাসেন হাসির হেঁয়ালি।
তাই তো শাস্ত্রে বলেছে,—এ সবই
তাঁর লীলা, মায়া, ছল,—
'অস্তি' বলিতে শুধু সেই এক,
মোরা 'নাস্তির' দল।
নাস্তি মোদের অস্তি হবার
সাধ যদি জাগে, তবে
কণ্ঠ মিলাও সে লীলাময়ের
মোহন বংশীরবে।

(৭)

জবরদস্ত তাঁর সম প্রভু
দেখি নাই কভু আর ;
নিজ প্রভুত্বে করেন না তিনি
কারেও অংশীদার।
দীন দুর্বল সর্বরিক্ত
হয়ে যে শরণ মাগে
মাথা তুলে খাড়া দাঁড়ায় সে যাহে
সারা বিশ্বের আগে
সে শক্তি করি দান,
নিজ হাতে তিনি ঘুচান তাহার
সকল অকল্যাণ।

(৮)

আমি কি দেখেছি, জানো ?—
ভেঙেছে হৃদয়, ভেঙে পড়ে দেহ,
বুঝি বাহিরায় প্রাণও,—
এমন সময় হয়েছে উপায় ;
মরণের কাছাকাছি
কে যেন কহিছে,—'রাখো বিশ্বাস
আমি আছি, দ্বারে আছি।'
মনে তো পড়ে না একবারও মোর
ঘটেছে এমন ধারা,
সর্বনাশের পূর্বক্ষণে
মেলে নি তাঁহার সাড়া।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সর্বস্ব যাক, সেও ভাল, তবুও আমি আমার পৌরুষের বিনিময়ে নিরাপত্তা চাহি না। * সমগ্র জাতির ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা হিংসা সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়।

মহাত্মা গান্ধী

হাসপাতাল। পাশাপাশি দুটো বেড। এক ছোকরা আর এক বুড়ো রোগী, খুব ভাব হয়ে গেছে দুজনের মধ্যে। কথাবার্তা হচ্ছে।

ছোকরা বলছে, চাষবাসের অবস্থা খারাপ। জল হচ্ছে না, ভুঁই-ক্ষেত খাঁ-খাঁ করছে; শুনলাম, পাকিস্তান হয়ে যাচ্ছে মুসলমান ব'লেই একটা-না-একটা কাজে লাগিয়ে দেবে। আকাশের দিকে চেয়ে লাঙল ঠেলে বেড়াতে হবে না। ঘর-বাড়ি ছেড়ে তাই শহরে চ'লে এলাম। এসে বাবু এই দুর্ভোগ!

বুড়ো-লোকটি বলছে, আহা, দেশে-ঘরে যেতে আমারও বড্ড ইচ্ছে করে, হয়ে ওঠে না, কাচ্চাবাচ্চা অনেকগুলো, ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। নইলে একটা দিনও থাকি এই পোড়া শহরে! সুন্দরবনের চেয়ে সাংঘাতিক হয়েছে কলকাতা, এ আর মানুষের বসবাসের জায়গা নয়।

বাড়ি কোন্‌খানে মুরুব্বি?

অনেক দূর। অজ পাড়াগাঁ। হরিহর গাঙের উপর, কেশবপুর গঞ্জের নাম শুনেছ?

হাঁ, হুঁ। গ্রামের নামটা বলুন দিকি।

রায়পাশা। চেন?

চিনি নে! হরিহরের আড় পারে যে হ'ল আমাদের বাড়ি—খানপুর।

আহা-হা, কি জল গাঙের! দশ হাত জলের নীচের পাটাশেওলা আর পলিমাটি দেখা যেত। এখন আছে সেইরকম? ছেলে-বয়সে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে কতদিন তোমাদের খানপুরে গিয়েছি শেয়াকুল খেতে। সুতোয় কুচো চিংড়ি বেঁধে গাঙের ধারে ধারে কাঁকড়া ধ'রে বেড়াতাম।

সে দিনকাল আর নেই বাবু। আমরাই বা কত দেখেছি! তরিতরকারি কেউ পয়সা দিয়ে কিনত না। এখন সজনের খাড়া বিক্রি হচ্ছে পয়সায় দু-গাছা ক'রে। সব উড়ে পুড়ে গেল।

ঘোর কলি। ধর্ম একেবারে দেশ ছেড়েছেন। আগে একটা খুন-খারাবি হ'লে অঞ্চল জুড়ে তোলপাড় প'ড়ে যেত, এখন এতবড় শহরের উপর দিন-দুপুরে কি রকম কচুকাটা করছে দেখছ তো! তোমার তবু বাবা হাঁটুতে মেরেছে, আমার পিঠে। আর ইঞ্চি-টাক বসাতে পারলে এই আজকে শুয়ে শুয়ে গয়গুজব করতে হ'ত না।

ছোকরাটি আন্তরিক দুঃখিত হয়ে বললে, খুব রক্ষে পেয়েছেন বাবু। ছোরা মেরেছে, ধস্তাধস্তি ক'রে ওর থেকে বাঁচা যায় কখনও কখনও। কিন্তু এই যে আবার বন্দুকের রেওয়াজ হচ্ছে, পঞ্চাশ হাত দূর থেকে দেওড় ক'রে স'রে পড়ে, মুখ থুবড়ে মরা ছাড়া আর তখন করবার কিছু থাকে না।

সর্বরক্ষে, তোমার হাঁটুতে লেগেছে, বুক কি কপাল ফুটো ক'রে দেয় নি।

চিরকাল খোঁড়া হয়ে থাকতে হবে বাবু। কাজের চেষ্টায় এসেছিলাম, খোঁড়া-মানুষকে কাজ কে দেবে! লাঙল চষব, ক্ষেত-খামারের কাজ করব, সে উপায়ও আর রইল না।

আমার চাকরিটাও গেল এইবার বাবা। বয়েস হয়েছে, ম্যানেজারের মন যুগিয়ে টিঁকে ছিলাম কোনরকমে। এর পর আর উঠে আমায় দশটা-পাঁচটা আপিস করতে হবে না। তোমার তবু যাই হোক গ্রামে একটা আস্তানা আছে, হাসপাতাল থেকে বিদায় দিলে ছেলেপুলে নিয়ে আমি যে কোন্ চুলোয় গিয়ে উঠব, ভাবতে পারি নে। বাপ-দাদারা ঘর-বাড়ি করেছিলেন, তার ভিটেগুলো কেবল আছে শুনতে পাই।

বাপ-দাদার ঘর-বাড়ি না থাক্, উঠবার জায়গার অভাব কি বাবু? আমাদের সাতখানা ঘর, অত লাগে না। দলিচঘরে গিয়ে থাকবেন, ঢেঁকিশালে রান্না করবেন। এক মাস দু মাস স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন। ধীরে সুস্থে ঘর-দুয়োর বেঁধে নেবেন নতুন ক'রে। আমরা খানপুরের সর্দারেরা আর রায়পাশার মিত্তিররা আলদা ছিলাম না তো কোনকালে।

সে কথা ঠিক। লক্ষ্মীপুজোর পরদিন বাবা সর্দারদের দাওয়ায় বসিয়ে খাওয়াতেন, ছেলেবেলায় বরাবর দেখে এসেছি। তোমাদের বিয়ে-খাওয়ায় বরযাত্রী যেতেন আমাদের কর্তারা। দস্তুরমত সমাজ-সামাজিকতা ছিল। আজকে উঠে গেছে সে সমস্ত।

উঠে গেছে কে বললে? শহরে ব'সে শোনা যায় অমনই। আপনি জনম কাটালেন এখানে চাকরি নিয়ে, আর আমিও কাজের ধান্দায় ঘুরছি মাস দুই। ভাবছি, আমাদের মতই বুঝি সমস্ত মানুষ। তারা ঠিক আছে, মরেছি বাবু আমরা।

হাসপাতাল থেকে ছাড় পেয়ে একবার গ্রামে যাই তা হ'লে? কি বল?

যাবেন। যদ্দিন আমরা আছি, কোনরকম দায় ঠেকতে হবে না।

অফিস-ঘরে থানা-অফিসার রোগী ছুটোর খবর নিতে এসেছেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলছেন, করেছেন কি সার্, পাশাপাশি রেখে দিয়েছেন? ছোকরা ওই বুড়ো-লোকটিকে ছোরা মারে, মিলিটারির গুলিতে সে-ও জখম হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। একসঙ্গে দুটিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টই বললেন, এখানে ছুরি মারবে না। সে তাকত হয় নি এখনও।

তা জানি। তাকত থাকলেও মারত না। দেখছি তো সার্, রাজাবাজারে হল্লা ক'রে শিয়ালদহ স্টেশনে ঢুকলেই আর এক মূর্তি। গাড়িতে ব'সে এ ওর দেশলাই চেয়ে নিয়ে বিড়ি ধরাচ্ছে।

শ্রীমনোজ বসু

ত্রি

১

আজিকে সম্ভব যাহা কাল তাহা হবে অসম্ভব
অন্তরীক্ষ হতে জানি হয়েছিল সমস্ত উদ্ভব
অন্তরীক্ষে পুনরায় একে একে লুপ্ত হবে সব।

২

শূন্যে ঘুরিছে রাহু ও কেতু
মধ্যে কেবল শূন্য-সেতু
শূন্য বিচার শূন্য হেতু।

৩

মনে নাই কবে কোন্ দিন
হাত পেতে লয়েছিনু ঋণ
তাহারই আভাস পাই মাঝে মাঝে ক্ষীণ।

৪

হাত পেতে আছি তব দ্বারে
বাতায়নে আস বারেবারে
দেখ তবু চেন না আমারে।

৫

প্রত্যহ আলোর শেষে আসে অন্ধকার
অন্ধকার অবসানে আলোক আবার
প্রত্যহ ইঙ্গিত আসে জাগার যাবার।

৬

দুরন্ত যৌবনে বল কে রাখিবে অঙ্ক দিয়া ঘেরে
উজ্জ্বল মহিমা তার তুচ্ছ করে সর্ব হিসাবেরে
সদ্য-ফোটা কমলিনী আজও চাহে বৃদ্ধ তপনেরে।

৭

আবির্ভাবই তিরোভাব! তুমি ওই দেহটাই?
আবরণ খুলিবার সময় কোথায় পাই?
পেয়েছিনু ততখন যতখন আস নাই।

৮

শুষ্ক রুক্ষ পত্রস্তূপে মলয় জাগায় আজও কম্পিত মর্মর
যুগে যুগে যযাতিরা কামনার স্বপ্ন দেখে জরায় জর্জর
শ্মশানেতে সুরা মাগে শবাসন তান্ত্রিকের তৃষিত খর্পর।

৯

অন্ধকারে হোক লুপ্ত সকল আলোক
নিষ্করুণ আলিঙ্গনে ছিন্নভিন্ন করহ নির্মোক
বাহুপাশ গলরজ্জু হোক।

১০

নহ উর্বশী নহ তুমি সতী সীতা
নহ মরীচিকা নহ স্বপনের চিতা
তুমি যে অনির্মিতা।

১১

পিপাসিতা চাতকিনী, নিশাচরী চতুরিকা শিবা,
শ্যেনদৃষ্টি, সর্প-বেণী ময়ূরী-ভঙ্গিমা-ভরা গ্রীবা
একসাথে সমন্বয় কিবা।

১২

রুপালী স্বপন বাজায়ে সোনার বীণায়
ফুলের ফানুসে সন্ধ্যা-মেঘের মীনায়
কে বল নিজেরে চিনায়?

১৩

আঁধার আসিছে ঘিরে
স্বপন নামিছে ধীরে
ভিড়িল কি তরী তীরে?

১৪
সমস্ত অন্তর ভরি জাগে অহরহ
এবার এসেছি বন্ধু—লহ লহ লহ
কি কথা কহিতে চাহ কহ।

"বনফুল"

অতি-আধুনিক অর্থনীতি

আমাদের জীবন নানা শাসনে শাসিত; একেবারে প্রত্যক্ষভাবে শাসন করে রাজনীতি ও সমাজনীতি, আর অপ্রত্যক্ষভাবে শাসন করে অর্থনীতি। রাজনীতি ও সমাজনীতির শাসন আমরা হাড়ে-হাড়ে অনুভব করতে পারি, কিন্তু অর্থনৈতিক মারটা কি ভাবে যে আমাদের পিঠে পড়ে, আমরা অনেকেই তা জানি না। জিনিসের দাম একটু বাড়লেই আমরা দোকানদারকে ধমক দিই; কিন্তু কে কোথায় কি ভাবে যে বোড়েটি টিপলে আর বাজিমাৎ করলে, তার কোন খবরই আমরা রাখি না। মাঝে থেকে দোকানদারেরা আমাদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য গালাগাল খেয়ে মরে।

বিগত মহাযুদ্ধের দৌলতে আমাদের খোল-নল্‌চে দুইই বদলেছে, কিন্তু হুঁকোটি ঠিক আছে; আমরা আছি, কিন্তু আমাদের ধ্যান জ্ঞান স্বভাব অভাব আচার আবদার সবই বদলেছে সাংঘাতিক রকমে। কলেজে অধ্যাপকের কাছে আমরা যে অর্থশাস্ত্র শিখেছি, সেটা বাস্তবজীবনে যে কি রকম অনর্থশাস্ত্র হয়ে উঠেছে, তারই কিছু পরিচয় দেব। বলা বাহুল্য, অর্থশাস্ত্রের "মূল্য-নির্ধারণ" অধ্যায়ের আলোচনাই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অর্থশাস্ত্রের স্বর্ণযুগ যখন ছিল, তখন সমস্ত বিষয়টি কি সোজাই না ছিল! দোকানী দোকান খুললে, খদ্দের এল সওদা করতে; একজন জানে, এই দামের কমে বেচব না, আর একজন জানে, এর বেশি দামে কিনব না। দু দলে টানা-হেঁচড়া ক'রে আপোসে একটা দাম ঠিক হ'ল, অর্থশাস্ত্র বললে—এইটাই শাস্ত্রসম্মত দাম। এখানে মজা ছিল এই যে, দোকানদার লাভের অঙ্ক বাড়াতে চেষ্টা করলে খদ্দের কলা দেখিয়ে অন্য দোকানে গিয়ে হাজির হ'ত, আর দোকানদারের লাভের আশা-লতা ছিঁড়ে যেত। খদ্দেরের ছিল তখন পোয়া-বারো; ন্যূনতম দামে জিনিস তো সে পেতই, উপরি পেত খাতির আর দোকানদারের ভদ্র ব্যবহার।

মহাযুদ্ধের অতল-গহ্বরে আমাদের খাঁটি-সোনা সব গেছে, সোনার গয়না

গেছে, আমাদের সোনার সংসার গেছে; মায় অর্থশাস্ত্রের সোনার যুগও গেছে। সেই স্বর্ণযুগ যে কি ভাবে নষ্ট হয়েছে, সেটা দেখা যাক।

অর্থশাস্ত্রের মতে আমদানি ও চাহিদার পারস্পরিক প্রভাবের ওপর নির্ধারিত হয় পণ্যের মূল্য। মহাযুদ্ধের ফলে তৃতীয় প্রভাবের আমদানি হয়েছে, যার নাম "কন্‌ট্রোল" বা নিয়ন্ত্রণ। "কন্‌ট্রোলে'র ব্যবহারিক বাংলা হ'ল "পরের ধনে পোদ্দারি" কিংবা "ঢাল-তরোয়াল-বিহীন নিধিরামের সর্দারি"। জমি, পরিশ্রম, মূলধন আর সংগঠন—সবই রইল তোমাদের, মালটি তৈরি হ'লে কিন্তু আমার গুদামে পৌঁছে দিতে হবে, না হয় তোমাদেরই গুদামে আমি তালা বন্ধ ক'রে রাখব। খরচ পরিশ্রম বিবেচনা ক'রে উচিত লাভ দিয়ে আমি বেঁধে দেব দাম; আর আমারই বাছাই-করা খদ্দেরকে তোমরা মাল সরবরাহ করবে। এই বাঁধা পথ থেকে এক-পা বিপথে গেলেই তোমাদের ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দেব। নিয়ন্ত্রণ নামক তৃতীয় শক্তির শুভাগমনে আমদানি ও চাহিদা এই দুই শক্তি মূল্য-নির্ধারণ ব্যাপারে একেবারে অক্ষম হয়ে গেছে। নিয়ন্ত্রণ-শাসিত মূল্য-নির্ধারণকেই বলি—অতি-আধুনিক অর্থশাস্ত্র।

অতি-আধুনিক অর্থশাস্ত্রের শাসনে আমাদের ভাগ্যচক্র একেবারে ঘুরে গেছে। যে দোকানদারকে কলা দেখিয়ে আমরা বুক ফুলিয়ে পাশের দোকানে সওদা করেছি, আজ তারই দোকানের সামনে মাথা হেঁট ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরনা দিই, রোদে পুড়ি, জলে ভিজি, শীতে কাঁপি; দোকানদার তার টাটে ব'সে আমাদের পাল্টা কলা দেখায়। গাঁটের পয়সা দিয়ে জিনিস কিনতে যাই, চোরের সাজা ভোগ ক'রে ঘরে ফিরি। ক্রয়-বিক্রয়ের যে রীতিনীতি ভূতপূর্ব অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়, সেগুলো আজকাল এক রকম অচল হয়ে গেছে। ট্যাঁকে পয়সা থাকলেই তখন সওদা করা যেত; আজকাল পয়সা ছাড়া চাই ধৈর্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা। অর্থ ও ধৈর্যের পারস্পরিক প্রাচুর্যের ওপর পণ্যক্রয়-ক্ষমতা নির্ভর করে। যার অর্থের প্রাচুর্য আছে, সে ধৈর্যপরীক্ষা না দিয়েই সওদা কিনতে পারে; আর ধৈর্যের যার প্রাচুর্য আছে, সে অর্থ-প্রাচুর্য না দেখিয়েও জিনিস কিনতে পারে। তাই তেল মাখতে গেলে আজকাল শুধু কড়ি ফেললেই হয় না, নাকেও দড়ি দিতে হয়।

তারপর ধরুন খাতির। যে স্বর্ণযুগ গতায়ু হয়েছে, সে যুগে খদ্দেরের কি খাতিরটাই না ছিল! দোকানের সামনে দিয়ে রাস্তা চলতে গেলেই কর্মচারী ছুটে এসে হাত ধ'রে বলত, আসুন স্যার! স্যার যদি দোকানে দয়া ক'রে

কীর্তিচন্দ্রকে স্তব্ধ দেখে স্বর্ণবাবুই আবার বললেন, মায়ের সঙ্গে দেখা হয় নি বুঝি তোমার ?

কীর্তিচন্দ্র এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, হ্যাঁ, দেখা হয়েছে। আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছেন। বলেছেন, আপনার সঙ্গে যে সব মামলা-মকদ্দমা আছে সবই মিটিয়ে নিতে হবে ; বললেন, স্বর্ণ-ঠাকুরপোকে আমি কথা দিয়ে এসেছি। আমি ব'লে দিয়েছি ম্যানেজারকে।

স্বর্ণভূষণ একটু হাসলেন, আশ্চর্যের কথা, তাঁর রাগ হ'ল না এতে। বলিলেন, কিন্তু আমি তো তাঁকে মামলা মিটমাটের কথায় 'না' বলেছি কীর্তি। না, না, না। মামলা মিটে গেলে বাঁচব কি নিয়ে হে ? ভাবব কি দিন রাত্রি ?

কীর্তিচন্দ্র বললেন, আমাকে মামলা তুলে নিতে হবে,—মায়ের হুকুম।

কিন্তু আমি তো তুলব না।

আমরা সেগুলোতে হারব।

স্বর্ণবাবু হেসেই জবাব দিলেন, হারবার বা হেরে হারাবার সঙ্গতি আছে তোমার ; কিন্তু সে মতি নাই। সে তুমি পারবে না কীর্তি। যাক, এখন একটু পথ দাও, মাকে প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

স্বর্ণবাবু দ্বিতীয় বার প্রদক্ষিণপথে যখন কীর্তিচন্দ্রের কাছাকাছি এলেন তখন কীর্তিচন্দ্র বলছিলেন, যেন ঘোষণা করছিলেন, ওর মালিককে আমি ব'লে এসেছি, নবগ্রামে আমার সম্পত্তি ক্রোক করতে এলে তাকে মাথা নিয়ে ফিরতে হবে না। নবগ্রামের কেউ তোমাকে আঙুল তুলে সাহায্য করবে না। তারা জানে, করলে তারও মাথা থাকবে না।

স্বর্ণবাবু আবার থমকে দাঁড়ালেন, বললেন, রাগের মাথায় কথাটা বললে বটে কীর্তি, কিন্তু কথাটা সাজল না। সংসারে মাথা থাকতেও বেশির ভাগ লোকই কন্ধকাটা। যারা মাটিতে মাথা নামিয়েই আছে, তাদের কন্ধকাটাই বলি আমি। দু-চারজনের যাদের মাথা আছে, তাদের মাথা নিতে গেলে মাথা দিতেও তো হতে পারে। মাথা নিতে পারে তারাই, যারা নিজের মাথার পরোয়া করে না। তুমি কিন্তু তা পার না ; মাথার ভয়ে তুমি অস্থির।

কীর্তিচন্দ্রের চোখ দুটি দু টুকরো জলন্ত আঙরার মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। কিন্তু কথার জবাব তিনি দিতে পারলেন না। তাঁর মূর্তি দেখে আশপাশের লোকেরা ত্রস্ত হয়ে স'রে গেল। শুধু একটি কিশোর ছেলে দাঁড়িয়ে রইল,

ঢুকলেন, মালিক স্বয়ং জোড়-হাতে নমস্কার জানিয়ে বসবার জায়গা দেখিয়ে দিতেন; এক-আধ খিলি পান বা একটা সিগারেটও তাঁরা অনেক সময় ছাড়তেন। তারপর স্ত্রার পঁচিশ রকমের জিনিস ঘেঁটে একটি পছন্দ করতেন, পছন্দ না করলেও ক্ষতি ছিল না। দোকানদার শেষ নমস্কার ক'রে আবার পায়ের ধুলো দেবার আমন্ত্রণ জানিয়ে স্ত্রার্কে ছাড়তেন। ভদ্র ব্যবহার পাবার লোভে অনেক খদ্দের দু-চার পয়সা দাম বেশি দিয়েও বড় দোকানে যেতে ভালবাসত। আর আজকাল? লোকের বাড়ি শেয়াল-কুকুর যে অভ্যর্থনা পায়, দোকানদারের কাছে খদ্দের সেই অভ্যর্থনাটুকুও পায় কিনা সন্দেহ। পান-সিগারেট তো গেছেই; মৌখিক-মিষ্টতাও লোপ পেয়েছে। কোন রকমে খদ্দের যদি দোকানে প্রবেশ করতে পারে, তা হ'লে দোকানদার তার সামনে এক রকমের জিনিস ফেলে দিয়ে আগেই জানিয়ে দেয়, এ ছাড়া অন্য কোন রকম জিনিস নেই, ইচ্ছে হয় নিন, না ইচ্ছে হয় চ'লে যান। খদ্দের ছিল দোকানদারের লক্ষ্মী, আজ সে হয়েছে ঘোর-অলক্ষ্মী, তাই দোকানদার তাকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করতে ব্যস্ত।

খদ্দের ও দোকানদারের মধ্যে যে মধুর সম্প্রীতির সম্বন্ধ ছিল, সেটা লোপ পাবার কারণ হ'ল—কন্‌ট্রোল। ব্যাপারটা একটু বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক। সেকালের শাশুড়ীরা পুত্রবধূ-নির্যাতনের জন্য কুখ্যাত; কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, শাশুড়ীরা পূর্বাবস্থায় পুত্রবধূ থাকাকালীন বহু নির্যাতন সহ্য করতেন; সেই পুত্রবধূরাই কালক্রমে যখন শাশুড়ী হতেন, তাঁরা পূর্বস্মৃতি ভুলতে পারতেন না; কাজেই আরও জোরের সঙ্গে তাঁরা তাঁদের শাশুড়ীগিরি ফলাতেন। পুত্রবধূ-নির্যাতন তাই বংশানুক্রমেই চ'লে আসছে। গুরুমশাইয়ের পড়ুয়া-নির্যাতনও প্রায় একই রকম বিখ্যাত; প'ড়ো যখন গুরুমশাই হয়, সেও খানিকটা নির্যাতন না চালিয়ে পারে না। কন্‌ট্রোলের দোকানদারর আজকাল যে ব্যবহার করে, তারও হয়তো এই রকমই কোন কারণ আছে। কন্‌ট্রোল-কারবারের পথ রীতিমত মাজা-ঘষা হওয়া চাই; পথের বন্ধুরতা থাকলে কারবারে লাল বাতি জলতে মোটেই দেরি হয় না। তার ওপর আছে পারমিট-প্রাপ্তি, সেও এক পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির ব্যাপার; কত দিন কত বার কত ঘণ্টা হত্যা দিলে যে দেবতা প্রসন্ন হন আর পারমিট-বর দান করেন, দোকানদাররা সব জানে। তারা তখন খদ্দের-পর্যায়ে থাকে, তাই এই সমস্ত কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়। কাজেই তারা যদি দোকানদারের অবস্থায় উন্নত হয়ে পূর্বস্মৃতি মনে

রাখে এবং খদ্দেরের ওপর কিছুটা ঝাল মেটায়, তা হ'লে আমাদের আর বলবার কিছু থাকে না।

ক্রয়-বিক্রয়ের এই যে অতি-আধুনিক রীতিনীতি, এটা সেকেলে অর্থনীতি-শাস্ত্রে মেলে না। যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির কেতাব যে শাস্ত্রীমশাই লিখবেন, তাঁকে নিশ্চয়ই পুরোনো শাস্ত্রকে ঢেলে সাজতে হবে; কলেজের অধ্যাপকদেরও বিতরণ করতে হবে হিতকারী ব্যবহারিক জ্ঞান। যতদিন না আমরা নূতন জ্ঞানে জ্ঞানী হই, ততদিন আমরা কি করব, সেটা অনেকেই ঠিক করতে পারি না। আমি কিন্তু নির্জনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, হে ভগবান, তোমার কেল্লার বজ্র ফেলবার মত উপযুক্ত মাথা যদি খুঁজে না পাও, তা হ'লে অন্তত আমার মাথায় একটি ফেলে দাও, কন্‌ট্রোল আর কিউয়ের হাত থেকে আমি নিষ্কৃতি পাই ঠাকুর।

শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টখণ্ডী

সংবাদ-সাহিত্য

মহাত্মা গান্ধী গত ২রা অক্টোবর উনআশি বছরে পদার্পণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

তিনি নিজেই এতকাল কামনা করিয়া আসিতেছিলেন যে, একশ পঁচিশ বছর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবেন, কারণ তখনও ভারতবর্ষ স্বাধীনতা-লক্ষ্যে পৌঁছায় নাই। বিগত তেত্রিশ বৎসর এই স্বাধীনতার জন্য তিনি ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিয়াছেন, নিজে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছেন ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গত সাতাশ বছর। তৎপূর্বে আফ্রিকাতে ভারতবাসীর সেবায় ও ভারতবাসীদের স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজে দীর্ঘকাল কাটিয়াছিল। প্রার্থিত স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত মরিবার কল্পনাই তিনি করেন নাই, যদিও প্রয়োজনবোধে কয়েকবার আমরণ অনশনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ স্বাধীনতা হস্তামলকবৎ আয়ত্ত না হইলেও আমরা স্বাধীনতার দ্বারদেশে পৌঁছিয়াছি। আমরা দেশ জুড়িয়া উল্লাস করিতেছি।

কিন্তু গান্ধীজী উল্লাস করেন নাই। ভারতবর্ষকে তিনি কোনও ক্রমেই বিভক্ত করিতে চাহেন নাই। তাঁহাকে বুঝানো হইয়াছিল যে, দেশ বিভক্ত হইলেই ভ্রাতৃবিরোধের অবসান ঘটিবে। কার্যত তাহা ঘটে নাই, বরং বিভাগের পরেই সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড প্রবলতম আকার ধারণ করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক

প্রীতির প্রতিষ্ঠাই এখন তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন, এই প্রীতি স্থাপিত না হইলে ভারতবর্ষের সর্বনাশ হইবে, এতদিনকার স্বাধীনতার সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

কিন্তু শুধু এই কারণেই তাঁহার মনে হতাশা আসে নাই। তিনি আজীবন শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সাধনা করেন নাই, ভারতবাসীর চিত্তশুদ্ধির জন্য তাঁহার সাধনা আরও বৃহত্তর, আরও ব্যাপকতর। তিনি দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন, এই চিত্তশুদ্ধি এখনও হয় নাই। তাঁহার সহকর্মী স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীরদের মধ্যেই ইহার অভাব তিনি দেখিয়াছেন। তাই একশ পঁচিশ বছর পর্যন্ত বাঁচার আশা তিনি ত্যাগ করিয়াছেন এবং মৃত্যুকেই তিনি আহ্বান করিয়াছেন। যাঁহারা দেশের সর্বত্র গান্ধী-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছেন, তাঁহাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হইতেছে এই নিদারুণ হতাশা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করা।

* * *

মুক্তি আমরা লাভ করিয়াছি বটে কিন্তু মুক্ত হই নাই, বাংলাদেশের গৃহস্থ মেয়েরা যে অর্থে এই কথাটি ব্যবহার করে সেই অর্থেই মুক্ত হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। পরাধীনতার নাগপাশে দীর্ঘকাল বাঁধা থাকিয়া আমরা অন্তরে বাহিরে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমাদের ভিতরে সর্ববিধ অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল। রাষ্ট্রে সমাজে শিক্ষায় স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে চরমতম দুর্নীতির আশ্রয় লইতে আমাদের বাধে নাই। আমরা পরস্পর ঈর্ষা ও কলহ করিয়াছি, নিয়মানুবর্তিতা পরিহার করিয়া সর্বত্র আত্মসর্বস্ব ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছি। সংঘ ও সমাজকে শক্তিশালী করিবার জন্য ব্যক্তিগত যে বিনয় ও আত্মত্যাগ একান্ত আবশ্যক তাহা আমাদের কাহারও নাই। সর্বাপেক্ষা লজ্জার কথা এই যে, দেশের যুবশক্তি নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে বন্ধন মনে করিয়া দুর্বিনীত হইয়া উঠিয়াছেন। ফলে স্বাধীনতা পাইয়াও আমরা অরাজকতার লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি। কলিকাতার ফুটবলমাঠে যাহা ঘটিতেছে, তাহা একটি সাংঘাতিক ব্যাধির উপসর্গের প্রকাশ মাত্র। কল্যাণকর নেতৃত্ব ভয়ে আত্মগোপন করিয়াছে; খল ও স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা লোভ ও মাদকতার সাহায্যে যুবশক্তিকে বিভ্রান্ত করিতেছে। এই সর্বনাশ হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র পথ চিত্তশুদ্ধি। এই চিত্তশুদ্ধির কথা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনুশীলনতত্ত্বে বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন, ইহার কথাই স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছেন এবং আজ

গান্ধীজী নিজের জীবনের আদর্শ ও কর্ম সর্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া এই চিত্তশুদ্ধিই দাবি করিতেছেন।

* * *

অশুদ্ধ চিত্ত লইয়া শাসন-সংক্রান্ত কাজে কর্তৃত্ব লাভ করিলেও দেশের কি সর্বনাশ ঘটে, বাংলা দেশের বিগত কয়েক বৎসরের শাসন তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অন্য সকল ব্যবস্থার কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধু অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানে যে জঘন্যতম দুর্নীতির আশ্রয় ইহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে বাংলা সরকারের কোটি খানেক প্রজা অকালমৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সে দুর্নীতির জের আজিও চলিতেছে। অবশ্য অনেকে এখন তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ব্রিটিশ-শাসনের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া পাপমুক্ত হইতে চাহিতেছেন। তাঁহাদের কথা মানিয়া লইয়া আমরা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দুইটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিতে পারি, যেখানে তৃতীয় পক্ষের বিশেষ কোনও হাত ছিল না। আমরা কলিকাতা করপোরেশন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলিতেছি। উভয় ক্ষেত্রে আমরা বারংবার দেখিয়াছি, দলগত বা ব্যক্তিগত বিবিধ অনাচারে জনসাধারণের কল্যাণকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের চিত্তশুদ্ধির অভাবেই এই দুইটি আস্তাবলকে পরিষ্কৃত রাখা সম্ভব হয় নাই। কলিকাতা করপোরেশনের স্বার্থগত দলাদলি কি কুৎসিত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেদিন বর্তমান মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীর রায় চৌধুরীর পদত্যাগ ব্যাপারেই তাহা প্রকট হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাও অনুরূপ কলঙ্কিত।

* * *

আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট দৃঢ়হস্তে বড় মেজো ও ছোট আস্তাবল পরিষ্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু শুধু তেঁতুলবীচি ও সাবান-পাথরের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইলেই তাঁহাদের কর্তব্যের সমাধা হইবে না, যে পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে জুয়াচোরেরা জনসাধারণকে হত্যা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, সেই পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। এতদ্‌ব্যতীত এই সকল হত্যাকারীর প্রকাশ্য বিচার ও কঠিন শাস্তিরও বিধান করিতে হইবে। খাদ্য ব্যাপারে যাহারা মানুষের জীবনকে এইভাবে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদিগকে অন্তত ছয় মাস কাল তেঁতুলবীচি ও সাবান-পাথর মাত্র খাইতে দিলেই ইহাদের যোগ্য শাস্তি হইবে। বর্তমানে যে কন্‌ট্রোল ব্যবস্থা চালু আছে, তাহা মোটেই কার্যকরী নয়; সাধারণ মানুষ ইহার কবলে পড়িয়া মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা এখনও ভোগ

করিতেছে। কন্‌ট্রোলের যাঁহারা কর্ণধার, তাঁহাদের দোষেই এইরূপ হইতেছে। তাঁহারা অনেকেই পূর্বতন পাপদুষ্ট। নির্মমভাবে তাঁহাদিগকে শাসন না করিলে ১৩৫০-এর মন্বন্তর ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে। যাহারা মানুষের জীবন লইয়া দীর্ঘকাল ছিনিমিনি খেলিয়াছে, তাহারা দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু। আমরা স্বাধীন হইয়াছি বলিয়াই তাহাদের দুর্মতি সহসা পরিবর্তিত হইবে না। এখনও লাভ ও লোভের লীলা সর্বত্র দেখিতে পাইতেছি। ভাগ্যচক্রের আবর্তনে আজ যাঁহারা কর্তৃপক্ষপদবাচ্য হইয়াছেন, চিত্তশুদ্ধির পরীক্ষায় তাঁহারা উত্তীর্ণ না হইলে তাঁহারাও আবার মৃত্যু এবং মহামারী ডাকিয়া আনিবেন।

* * *

ভারত-সমবায়ের সর্বত্র শাসন-ব্যবস্থায় যদি এই অনুশীলন বা চিত্তশুদ্ধি কার্যকরী হয়, তবেই দল ও সম্প্রদায়গত কলহ-বিদ্বেষ হইতে দেশ ও জাতি রক্ষা পাইবে এবং মহাত্মা গান্ধীর হতাশ-মনে আবার আশার সঞ্চার হইবে। তখন আরও ছেচল্লিশ বর্ষকাল তাঁহাকে আমরা আমাদের মধ্যে রাখিবার দাবি জানাইতে পারিব।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় খবর এই যে, বাংলাভাষা বাংলাদেশে সরকারী মর্যাদা লাভ করিতে চলিয়াছে। একদল উচ্চাশাসম্পন্ন বাঙালী বাংলাভাষাকে সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন। ইহাতে আমাদের যুক্তির সমর্থন না থাকিলেও এই অঘটন ঘটিলে আমরা আনন্দিত হইব। কিন্তু বাংলাদেশে বাংলাভাষার এই দাবি একান্তভাবে সকল বাঙালীরই; বাংলা সরকারের ঘোষণায় সারা দেশ জুড়িয়া আনন্দ ও উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছে। রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়-সংক্রান্ত শব্দকোষ আমাদের এখনও অসম্পূর্ণ। তাছাড়া ইংরেজীতে যে ধারায় লিখিতে পড়িতে ও পরস্পর ব্যবহার করিতে আমরা অভ্যস্ত কেবলমাত্র অনুবাদের সাহায্যে তাহার পরিবর্তন সম্ভব নয়; "আই হ্যাভ দি অনার টু বি স্যর্, ইয়োর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট"-এর অনুবাদে "আপনার বিনীত ভৃত্য হইবার অধিকার লাভ করিয়া অধীন সম্মানিত" এই বয়ান ব্যবহার করিলে বাংলাভাষার গৌরব বাড়িবে না। ভাষাকে যথার্থ মর্যাদা দিতে হইলে রুচি ও মনোভাবেরও পরিবর্তন দরকার। ইহার জন্য চিঠিপত্র দলিলদস্তাবেজে ব্যবহৃত আমাদের প্রাচীন পাঠগুলি লইয়া আলোচনা ও অনুসন্ধান আবশ্যক। পরিভাষা গঠনে ও বিবিধ সম্বোধনের পাঠ নির্ণয়ে অবিলম্বে এই উদ্দেশ্যে গঠিত একটি

বিশেষজ্ঞ-সমিতির সাহায্য লইতে হইবে। বিলম্ব হইলে গোলযোগ অনিবার্য। আগে হইতেই একটা আদর্শ শব্দকোষ ও পরিভাষা নির্ধারিত না হইলে একই অর্থে বিবিধ শব্দ বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত হইতে থাকিবে।

*　　　*　　　*

আর একটি কথা কর্তৃপক্ষের এই সময়ে স্মরণ রাখা কর্তব্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসর হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিভিলিয়ান ও পরে পাদরিদের চেষ্টায় প্রয়োজনীয় ইংরেজী বহু শব্দের পরিভাষা প্রস্তুত হইতেছিল। বোল্টস, হালহেড, উইলকিন্স, ডানকান, এল্‌ফিনস্টোন, আপজন, ফরস্টার, কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, ইয়েটস্, ওয়েঙ্গার, রামকমল সেন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কাজ অনেকটা অগ্রসর করিয়া রাখিয়াছেন; অনেক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বলিত পুস্তকও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় পরিভাষা সঙ্কলনের কাজ আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, প্রফুল্লচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র বসু, যোগেশচন্দ্র রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের প্রধানেরা এই কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; এই সকল পরিভাষা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট এ-বিষয়ে কিছু কাজ করিয়াছিলেন। পূর্বগামীদের চেষ্টার ফল আজ উপেক্ষা করিলে আমরা পাকা ঘুঁটি কাঁচানোর অপরাধে অপরাধী হইব। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি যে, বিগত দশ-পনেরো বৎসরে বাংলাভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাসের বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কাজ অনেকটা আগাইয়া আছে। এখন প্রয়োজন সংহতির।

*　　　*　　　*

আর দুইটি বিষয়েও আমাদের এখনই নজর দিতে হইবে। যদি ইংরেজী পঞ্জিকাকে ভারতবর্ষের সর্বত্র গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশীয় আত্মমর্যাদায় ঘা লাগিলেও অনেক অসুবিধার হাত হইতে আমরা বাঁচিয়া যাইব। কিন্তু ইংরেজী ক্যালেণ্ডার যদি গৃহীত না হয়, আমাদিগকে শকাব্দ সম্বৎ যাহাই হউক একটা পদ্ধতি সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে। বিবিধ সন বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত থাকায় জাতীয় জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার দিনগুলি আমরা ইংরেজীমতে পালন করিতে বাধ্য হই, যেমন ৯ আগস্ট, ১৫

আগস্ট, ২ অক্টোবর, ২৬ জানুয়ারি ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের ২৫ বৈশাখ ও ২২ শ্রাবণ আমরা বাংলা দেশে পালন করি বটে, কিন্তু ওই দুইটি দিবসকে সমগ্র ভারতীয় উৎসব-দিবস করিতে হইলে, আমাদিগকে ৭ মে ও ৭ আগস্টেরই শরণ লইতে হয়। এক্ষেত্রে অবিলম্বে এইটি সৌর সনকে লীপ-ইয়ার সমন্বিত করিয়া খাড়া করিতে না পারিলে, গোলযোগ রাহয়াই যাইবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীনারায়ণ ভঞ্জ "স্বাধীন ভারতের বর্ষমাস" নামে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ আমাদের পাঠাইয়াছেন। আগামী সংখ্যায় আমরা তাহা প্রকাশ করিব। ইতিমধ্যে যাঁহাদের হাতে ক্ষমতা আছে, তাঁহারা অবহিত হইলে ভাল হয়।

* * *

অন্য বিষয়টি হইতেছে, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। বাংলা-সংস্কৃত মিশাল ভাষায় রচিত হইলেও এই বিষয়ে "বন্দেমাতরম্" গানের দাবি পাকা হইয়া গিয়াছে বহু আত্মত্যাগ ও বহু রক্তপাতের মধ্যে। উহা অপেক্ষা উপযুক্ততর জাতীয় সঙ্গীতও আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই। এখানে সমগ্র ভারতবর্ষকে "বন্দেমাতরমে"র প্রাধান্য স্বীকার করিতেই হইবে। মহাত্মা গান্ধী স্বীকার করিয়াছেন। তবে আমরা কানাঘুষায় শুনিতেছি, দিল্লীর প্রধান মহলে "বন্দে-মাতরম্"কে স্থানচ্যুত করিবার চক্রান্ত চলিতেছে। এইরূপ হইলে সারা বাংলা দেশে বিক্ষুব্ধ আন্দোলন চালাইতে হইবে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য যে প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করিতেছেন, "বন্দেমাতরম্"কে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদায় বহাল রাখিবার জন্য তাঁহারা সর্ববিধ চেষ্টা করিলে ভাল হয়। সমস্ত দেশের সমর্থন তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবে।

* * *

গতকল্য (৯. ১০. ৪৭) সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে, মাতৃভাষার সাহায্যে কার্য পরিচালনা সরকারী বিভাগে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। একটি মোকদ্দমার রায় বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম প্রদান করিয়াছেন অবৈতনিক বিচারক মন্মথমোহন বসু। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বর্তমান সভাপতি। তাঁহার হাতে এই শুভ সূত্রপাত খুবই সমীচীন হইয়াছে। ভবিষ্যৎ বাঙালীদের জন্য এই রায়টি সযত্নে সংরক্ষিত হওয়া উচিত।

যাঁহারা বৈপ্লবিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার দ্বার-দেশে পৌঁছিয়া দিয়াছেন, সংসালব্ধ স্বাধীনতার সুযোগ লইয়া আমরা এতদিনে তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যে যথোপযুক্ত সম্মান দেখাইতে পারিতেছি। কিন্তু স্বাধীনতা

একা তাঁহাদের চেষ্টাতেই আসে নাই। বহু বাধার মধ্যে বিবর্তনের পথে যাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত সম্মান দিতে আমরা যেন কখনও কার্পণ্য না করি। তাঁহারা ধীরে ধীরে আন্দোলনের দ্বারা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর বহু আইনের পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন; বহু অপহৃত অধিকার ক্রমে ক্রমে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনার ফলেই কঠিন বিপ্লব ও রক্তপাত ব্যতিরেকেই আমরা আত্মশাসনাধিকার লাভ করিয়াছি। এই সব বিবর্তনবাদী দেশভক্তদের অগ্রণী ছিলেন দেশনেতা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নবেম্বর—১২৫৫ বঙ্গাব্দের ২৬ কার্তিক শুক্রবার কলিকাতা তালতলা ৩৩নং নিমুগোস্বামীপুকুর ওয়েস্ট লেনস্থিত বাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ আগামী ২৬ কার্তিক (১৩ নবেম্বর) বৃহস্পতিবার সুরেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিক উৎসব দিবস। স্বাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পুরোহিত সুরেন্দ্রনাথের জন্মের শতবার্ষিক উৎসব যাহাতে যথাযথভাবে পালিত হয়, দেশের বর্তমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট সেই আবেদন জানাইতেছি।

—

গত ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ সুফল আমরা কতটুকু পাইয়াছি তাহার হিসাব ছাপাইয়া আমরা—বাঙালীরা যে নানাদিক দিয়া কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিয়াছি সেই হিসাবটাই বড় হইয়া দেখা দিতেছে। বাংলাদেশ দু'ভাগ হইয়া পড়াতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জগতে আকস্মিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্য বিশেষ করিয়া ব্যাঙ্কিং-ব্যবসায়ে যে অনিশ্চয়তা আসিয়া পড়িয়াছে তাহার বিষময় ফল অল্পাবস্তর প্রত্যেকেই ভোগ করিতেছি। রেলওয়ে ও পোস্টাপিসগত যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন হইতে চলিয়াছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সমূহ সর্বনাশ ঘটিতে বসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, স্থায়ী ও সাময়িক সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা পূর্ববঙ্গেই তাহাদের সংখ্যাধিক্য ছিল। বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়, সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং পুস্তক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রকাশকরা অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করিতেছেন। পূর্ববঙ্গে যে অব্যবস্থার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বাস করিতে হইতেছে, সেই ভূমিতেই যদি তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত থাকিতে চাহেন, সুস্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে সময় লাগিবে। যদি তাঁহারা স্থান ত্যাগ করাই সমীচীন বোধ করেন তাহা হইলেও আর্থিক দুরবস্থা অনিবার্য; অন্তত

কিছুকালের জন্ম আত্মরক্ষার দায়ে শিক্ষা-সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব তাঁহারা কী করিতে পারিবেন না। এখনই আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমাদের ডি. ইত্যাদি যথাস্থানে পৌঁছিতেছে না, পৌঁছিলেও অর্থাভাবে অনেকে তাহা করিতে পারিতেছেন না। প্রথমত এই আর্থিক কারণেই বাংলাদেশের শি ও সংস্কৃতি খণ্ডিত হইতে চলিয়াছে। তারপর ধর্মকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের চাপ আছেই। এই চাপ ভাষা ও সাহিত্যকেও অবিকৃত থাকিতে দিবে বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর গণ্ডি স্বভাবতই ক্ষুদ্রায়তন হইয়া আসিবে।

* * *

ওদিকে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন বা ভারত-সমবায়েও বাঙালীর ত্রিশঙ্কু অ বিহার উড়িষ্যা ছোটনাগপুর ও আসামে বাঙালীর পক্ষে প্রাদেশিকতার লাঞ্ছ প্রতিদিনই দুর্বিষহ হইয়া উঠিতেছে, এমন কি কোনও কোনও অঞ্চলের আসা বাঙালীরা অঞ্চলান্তরের বাঙালীদের বিরুদ্ধাচরণও করিতেছে। এই পর আত্ম নিগ্রহের কবলে বাঙালী জাতির চরম পরীক্ষা হইতেছে। এই অবস্থ বাঙালী যদি নিষ্ঠার সহিত আপন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ তবেই রক্ষা পাইবে। অন্য কোন সম্বল তাহার নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে প বঙ্গে লোকাপসারণ এই দিক দিয়া আত্মহত্যারই নামান্তর হইতেছে। নানা কারণে পূর্বতন আদর্শ খণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু গুজবভীত পলায়নের দ্বারা যে অধিকতর ক্লেশকর সর্বনাশকে ডাকিয়া আনা হইবে নেতৃবৃন্দকে সেই কথাটাই সর্বত্র প্রচার করিতে হইবে। পূর্ববঙ্গের যে নেতা পশ্চিমবঙ্গের আপাত-নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়া পূর্ব। জনসাধারণকে আরও আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই গুজবভীতি দূর হইবে না। ভয় বস্তুটা মানুষকে দিক দিয়াই সাহায্য করে না, এ ক্ষেত্রেও করিবে না। উভয় বিভাগের বাঙা পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে পারিলেই বাঙালী রক্ষা পাই নতুবা নয়।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সে স'রে গেল না। ছেলেটি গৌরীকান্ত। সেও এসেছিল দেবীকে প্রণাম করতে। কীর্তিচন্দ্রের উচ্চকণ্ঠের শাসনবাক্যগুলি শুনে এসে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সকলে সভয়ে স'রে গেলেও সে স'রে যাবার মত শঙ্কা অনুভব করে নাই। অবাক হয়ে সে শুনছিল কথাগুলি। কীর্তিচন্দ্রের দৃষ্টি পড়ল তার দিকে, রূঢ়তম ভঙ্গীতে তিনি বলিলেন, কি দাঁড়িয়ে শুনছ তুমি এখানে, এতটুকু ছেলে?

স্বর্ণবাবু হেসে একটু ব্যঙ্গ ক'রেই এবং সে ব্যঙ্গ গৌরীকান্তের উপর নিক্ষেপ ক'রেই বললেন, শুনবে না? ও হ'ল আমাদের রাধাকান্তদার ছেলে—গৌরীকান্ত।

হ্যাঁ, এখানে তো মাতব্বরের পুত্রই মাতব্বর হয়ে থাকে। সেই তো বলছি। কিন্তু রাধাকান্তবাবুর ছেলের ভদ্রতাজ্ঞান থাকা তো উচিত।

নিজে গৌরীকান্তকে ব্যঙ্গ করলেও গৌরীকান্তের প্রতি কীর্তিচন্দ্রের কটূক্তি স্বর্ণবাবুর বোধ করি ভাল লাগল না, মধ্যপথে বাধা দিয়ে তিনি হেসে বললেন, আমরা অভদ্রের মত যেখানে সেখানে চীৎকার করলে, ওরা আর ভদ্রতা শিখবে কোথায়, বল?

না, আমি সে কথা বলি নি। আমি বলছি, নমস্কার করতে শেখা উচিত।

গৌরীকান্ত লজ্জিত হয়ে স্বর্ণবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে কীর্তিচন্দ্রকে বললে, মা বলেন, আপনি আমার ভাইপো। আপনার মা আমার মাকে মামী বলেন। আপনাকে আমি কি ক'রে প্রণাম করব?

স্বর্ণবাবু হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন।

* * *

ওই গৌরীকান্তকে উপলক্ষ্য ক'রেই স্বর্ণবাবু এবং কীর্তিচন্দ্র মনোভাবের একটি ঐক্যমূলক মানসিকতার ক্ষেত্রে উপনীত হলেন। গৌরীকান্ত চ'লে যেতেই স্বর্ণবাবু হেসে বললেন, রামায়ণে আছে মহীরাবণের ব্যাটা অহিরাবণ মায়ের পেট থেকে প'ড়েই যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল। রাধাকান্তদার ছেলেটি হয়েছে তাই। রবিবার দিন সকালে ধ্বজা-পতাকা ঘাড়ে ছেলের দল সঙ্গে নিয়ে বের হওয়া দেখ নি বোধ হয়? কিশোর দরিদ্র-ভাণ্ডার করেছিল, সেটা কিশোরের অভাবে উঠে গিয়েছিল, আবার সেটা ও চালাতে শুরু করেছে।

কীর্তিচন্দ্র যথেষ্ট জ্বালা অনুভব করেছিলেন গৌরীকান্তের কথায়। অবশ্য

গৌরীকান্ত প্রশ্নটি তুলেছিল একান্ত সরলভাবে সত্য-সত্যই সমস্যার দ্বিধার মধ্যে প'ড়ে। নবগ্রামে গ্রামসম্পর্কে সকলেই সকলের সঙ্গে কোন-না-কোন সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ; সেই সম্বন্ধের নির্দেশেই এখানকার রীতি প্রথা এবং নীতি অনুযায়ী বয়স্ক ব্যক্তি বয়োকনিষ্ঠকে প্রণাম করে, ধনী দরিদ্রকে প্রণাম করে, প্রতিষ্ঠাবান নিতান্ত নামহীন জনকে প্রণাম করে। বর্তমানে সে প্রথা সচরাচর সময়ে অপ্রচলিত হয়ে এলেও বৎসরে অন্তত একদিন বিজয়া-দশমীর দিন সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। এবং সচরাচর সময়ে এ প্রথা পালনের রেওয়াজ বিরল হ'লেও এর বিপরীত কিছু, অর্থাৎ সম্বন্ধে বড় হয়ে বয়োকনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠকে, বা দরিদ্র ধনীকে, এমন কি নামহীন অভাজন প্রতিষ্ঠাবানকে প্রণাম করে না। কিন্তু কীর্তিচন্দ্রের দাবি স্বতন্ত্র। নবগ্রামে তিনি কারও সঙ্গে কোন সম্বন্ধ-সূত্রের বন্ধন স্বীকার করতে চান না। সে স্বর্ণবাবুর সঙ্গেও না। তিনি মনে মনে হিসাব ক'রে দেখেছেন, তাঁর সম্পদে এবং এখানকার লোকের সম্পদে অনেক পার্থক্য। তাঁর পৈতৃক কীর্তিতে এবং এখানকার লোকের কীর্তিতে সমুদ্র এবং গোষ্পদের মত প্রভেদ। গোষ্পদের সমুদ্রের সঙ্গে আত্মীয়তা দাবি করার মতই হাস্যকর এখানকার লোকের তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার দাবি। এই কারণেই ওই ছেলেটির গ্রামসম্পর্কের গুরুজনত্ব দাবি তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই অসহ্য মনে হয়েছিল। কিন্তু দেশচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বলবার মত কিছু তিনি খুঁজেও পান নাই, এবং সে বলবার মত মনোবলও তাঁর ছিল না।

স্বর্ণবাবু গৌরীকান্তের নিন্দা করতেই কীর্তিচন্দ্র তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা অনুভব করলেন; বললেন, রাধাকান্তবাবুর আর কিছু না থাক্ লম্বা লম্বা কথা ছিল। গোটা গ্রামটাকে কথায় কথায় জর্জরিত ক'রে গেছেন।

স্বর্ণবাবু হেসে বললেন, তত্ত্বকথার ফোড়ন দিয়ে রাধাকান্তদা কিন্তু কথা বলত ভাল। হ্যাঁ, বাক্যবীর যাকে বলে, তাই ছিল সে একজন। ছেলেটির নমুনা যা দেখছি, তাতে বাপকো বেটা ব'লেই মনে হচ্ছে। তার উপর রাধাকান্তদার স্ত্রীকে—কাশীর বউকে তো জান। সে তো এক অহল্যাবাঈ।

'বাঈ' শব্দটা প্রয়োগ করবার জন্যই তিনি অহল্যাবাঈয়ের নাম করলেন। নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত 'বাঈ' শব্দটা প্রয়োগ ক'রে যথেষ্ট পরিতৃপ্তি পেলেন তিনি। কীর্তিচন্দ্রও যথেষ্ট প্রীত হলেন। হাসতে লাগলেন তিনি।

স্বর্ণবাবুর 'বাঙ্গ' শব্দটাই বোধ হয় তাঁকে মনে করিয়ে দিলে ষোড়শীর কথা; হাসতে হাসতে হঠাৎ কথাটা মনে হতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, শুনেছি, গোয়ালপাড়ার সেই চাষার মেয়েটি, মানে—যে বর্ধমানে গিয়ে ব্যবসা করছে, সে নাকি মধ্যে মধ্যে রাধাকান্তবাবুর স্ত্রীর কাছে আসে।

স্বর্ণবাবু বললেন, আসে। কিশোরদের মামলায় অনেক টাকা সে দিয়েছে।

মেয়েটা তা হ'লে রোজকার করে ভাল?

হ্যাঁ, তা করে বইকি! বয়স আছে, রূপ আছে।—স্বর্ণবাবু একটু হাসলেন।

কীর্তিচন্দ্রও হাসলেন। উভয়েই মনে মনে একটি প্রীতির স্বর অনুভব করলেন এই আলোচনার মধ্যে। কীর্তিচন্দ্র বললেন, চলুন, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গাড়িতেই যাই চলুন। আসুন রমণীবাবু, গরিবের ঘরে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যাবেন।

রমণীবাবু হেসে বললেন, নিশ্চয় যাব। আমাদের পেশা চাকরি, আপনি বন্ধুলোক এবং পেশায় চাকরিদাতা। আজ আপনি পায়ের ধুলো চাচ্ছেন, না দিলে কাল চাকরির দরকার হ'লে জুতো খুলে ধুলোহীন পায়ে গিয়ে দাঁড়াব কোন্ মুখে?

কীর্তিচন্দ্র রমণীবাবুকে দেখালেন নবগ্রামের সমৃদ্ধি এবং সভ্যতার পরিচয়। এই গার্লস-স্কুল—জগত্তারিণী-গার্লস-স্কুল—আমার মায়ের নামে আর কি! এই আমাদের ঠাকুর-বাড়ি। এই টোল আমার পিতামহের নামে। ছেলেরা ঠাকুর-বাড়িতে খায়, বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। এই আমাদের দীঘি, এই দীঘিতে উঠেছিল বাসুদেবমূর্তি। এই লাইব্রেরি, এই থিয়েটার স্টেজ, এই স্কুল, এই চ্যারিটেব্‌ল ডিস্পেন্সারি।

ডিস্পেন্সারির বাড়িটি কমিশনার সাহেবের প্ল্যান অনুযায়ী তৈরি হয়েছে। প্রকাণ্ড বাড়ি, কমিশনার সাহেব হাসপাতালের পরিকল্পনা সম্মুখে রেখেই এই এই সুদৃশ্য বাড়িটির প্ল্যান পাঠিয়েছিলেন। এবং ডিস্পেন্সারির সেই ছোট ঘরের দ্বারোম্মোচনের সে অপমানও বোধ করি তিনি ভুলতে পারেন নাই, সেই হেতু পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট সমারোহও ছিল। কিন্তু কীর্তিচন্দ্র ডিস্পেন্সারি-বিল্ডিঙের স্বল্প একটি অংশ দাতব্য-চিকিৎসালয়ের জন্য দিয়ে বাকি বেশি অংশটা রেখেছেন নিজেদের ব্যবহারের জন্য। প্রকাণ্ড বড় হলে,

ভেল্‌ভেটের গদি-মোড়া সোফা কৌচ শ্বেতপাথরের টেবিল পিয়ানো বিলাতী ছবি দিয়ে সাজিয়ে নিজেদের বিশ্রামাগার করেছেন।

রমণীবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন, বাঃ, এ যে ইন্দ্রভুবন করেছেন মশায়! একেবারে কলকাতার টুকরো এনে বসিয়েছেন এখানে!

কীর্তিচন্দ্র অনর্গল ব'লে গেলেন তাঁর পরিকল্পনার কথা। তিনি ব্যবসায়ী মানুষ, ব্যবসায় ছাড়া, জমিদারি বা চাষ এতে মানুষের দুঃখ মোচন হয় না ব'লেই মনে করেন। এখানকার অধিকাংশ ভদ্রসন্তানদের তিনি চাকরি দিয়েছেন। বিদেশে গেলে তবেই মানুষ বুঝতে পারে, পৃথিবী কত বড়। অর্থ উপার্জনের সঙ্গে সেই জ্ঞান অর্জন করবে নবগ্রামের লোক। হঠাৎ তিনি স্বর্ণবাবুকে বললেন, আপনার ছেলেকে আমার হাতে দেবেন কাকা? আমি তাকে পাকা ব্যবসাদার ক'রে দেব। কত বড় হ'ল সে?

হেসে স্বর্ণবাবু বললেন, গৌরীকান্তেরই বয়সী।

কোন্ ক্লাসে পড়ছে?

পড়া-শুনাতে কাঁচা। শরীর খারাপ।

কিছু যায় আসে না তাতে। বিদেশে গেলেই শরীর ভাল হবে, আর ব্যবসা-ব্যাপারে লেখাপড়ার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই। আমি কতদূর পড়েছি? —হাসতে লাগলেন কীর্তিচন্দ্র।

স্বর্ণবাবু গম্ভীর হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, আমি উঠব এইবার।

উঠবেন?

হ্যাঁ। রমণীবাবু—

রমণীবাবু রাত্রে ট্রেন ধরবেন, তাঁকে আমিই পৌঁছে দেব গাড়ি ক'রে।

কি রমণীবাবু?

রমণীবাবু বললেন, হ্যাঁ, তা মন্দ হবে না। সেই ভাল হবে।

স্বর্ণবাবু বিষাক্ত হাসি হাসলেন এবার। বললেন, আপনার মাথার দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত কিন্তু।

কীর্তিচন্দ্র হেসে উঠলেন, বললেন, আপনার দায়িত্ব আমি নিয়েছি যখন, তখন সে চিন্তাই উনি করেন না কাকা।

স্বর্ণবাবুর জন্যে বাইরে কীর্তিচন্দ্রের জুড়ি অপেক্ষা করছিল। কিন্তু গাড়িতে

তিনি উঠলেন না, হেঁটেই চলতে আরম্ভ করলেন, বললেন, না, হেঁটেই যাব আমি।

কীর্তিচন্দ্র নিজে বেরিয়েও আসেন নাই তাঁকে বিদায় দিতে; সুতরাং সহিস কোচোয়ান স্বর্ণবাবুর প্রত্যাখ্যানের পর আর দ্বিতীয় অনুরোধ করতে সাহস করলে না। স্বর্ণবাবু ফিরছিলেন অত্যন্ত অভিমানাহত মন নিয়ে। এই ভদ্রলোকটির লোভনীয় এবং লাভজনক অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে যে মানসিক তৃপ্তি এবং একটি সুপবিত্র বৈরাগ্য তিনি অনুভব করছিলেন অপরাহ্ণে, সে কখন যে সম্পূর্ণরূপে মুছে গিয়েছে, সে তিনি বুঝতে পারেন নাই। হিসেব করতে গিয়ে শুধু বার বার অকারণেই বোধ করি মনে পড়ছে গৌরীকান্তকে, মনে পড়ছে মৃত রাধাকান্তকে, মনে পড়ছে রাধাকান্তের স্ত্রীকে। যে জয়-গৌরব অনুভব করছিলেন, সেও আর অনুভব করতে পারছেন না, বরং ওই ভদ্রলোককে উপলক্ষ্য ক'রে কীর্তিচন্দ্রের দেখানো তার পৈতৃক কীর্তিকলাপ-গুলি তাঁকে যেন পরাজয়ের গ্লানিতে পীড়িত করছে। মনে পড়ছে তাঁর উঠে-যাওয়া স্কুলটির কথা। মনে পড়ল কীর্তিচন্দ্রের উক্তিগুলি। এখানকার ভদ্র-ছেলেদের চাকরি দিয়েছে সে। কথা সত্য। গোটা গ্রামটার ভদ্রসন্তানদের অধিকাংশই এখন তাঁর ওখানে চাকরি করে। প্রায় গোটা নবগ্রামই আজ কীর্তিচন্দ্রের চাকর। যারা চাকর নয়, তারা খাতক অথবা প্রজা। এক তাঁর বাড়ি, রাধাকান্তের বাড়ি আর শ্যামকান্তের বাড়ি আজও কীর্তিচন্দ্রদের পদানত হয় নাই। অত্যন্ত তিক্ত হাসি হাসলেন তিনি। কীর্তি তাঁকে আজ অসঙ্কোচে বললে, তাঁর ছেলেকেও সে চাকরি দেবে। অবশ্য তিনি তা হতে দেবেন না। কিন্তু সুদূরভবিষ্যতে তাঁর বংশের কেউ-না-কেউ পদানত হবে ওদের। গোটা নবগ্রামই হবে।

হঠাৎ তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। কেউ যেন সুর ক'রে বক্তৃতার ঢঙে কিছু পড়ছে। বড় ভাল লাগল তাঁর। রাধাকান্তের বৈঠকখানা। কে পড়ছে? গৌরীকান্ত নিশ্চয়।

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে, তোমার চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার, ডুবাও চোখের জলে॥
নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।

বড় ভাল লাগল তাঁর। এই অন্ধকার জনহীন পথে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল, অপার সান্ত্বনা পেলেন তিনি। এ সুর অপরিচিত নয়, কিন্তু এর প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণ নূতন। সবটা যেন স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় না। তবু মন তাঁর জুড়িয়ে গেল। একবার ইচ্ছা হ'ল, গৌরীকান্তকে ডাকেন। কিন্তু লজ্জা অনুভব করলেন। মনে মনে সেইখান থেকে আশীর্বাদ ক'রেই চলতে আরম্ভ করলেন তিনি।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দাবি

মক্‌মক্‌ কিচিমিচি কিচিমক্‌ কিচিরমিচির—
শুনিয়া অদ্ভুত শব্দ তাড়াতাড়ি খুলিনু কপাট,
পরিচিত কেহ নহে, নহে কোন খাজা বা খিজির,
নহে নেতা উপনেতা, চেয়ারম্যান, মেম্বর বা লাট ;
দেখিলাম, করি যেন মরি-বাঁচি প্রেরণা সম্বল
উড়িছে চামচিকা এক বিস্তারিয়া ডানা আর ঠ্যাঙ।
ভাবিতেছি কারে ডাকি— কুকুর অথবা দমকল ?
হেনকালে শুনিলাম— ভয় নাই, আমি কোলা ব্যাঙ,
দিতেছি অভয়। হে বাঙালী কবি, শুন মন দিয়া
পার্টিশন-সমস্যার আমরা করিব সমাধান।
মানবীয় ভাষাযোগে পার যদি তোলহ ছন্দিয়া
আমাদের ভাবরাশি, পার যদি গাহ নব-গান।
সবিস্ময়ে দেখিলাম, ভেকও এক চৌকাঠের ধারে
উচ্চক্ষু বসিয়া আছে। দৃষ্টি দিয়া গিলিছে আমারে।

চামচিকা কহিল, দেখ, করিয়াছি বহুকাল বাস
সেই গৃহ-পরলেতে, যেই গৃহে নেতাজী সুভাষ
থাকিতেন অহোরাত্র, করিতেন কত পড়ালিখা
কত না স্বদেশ-চিন্তা। নহি আমি সামান্য চামচিকা।
পার্টিশন-বিষয়েতে নেতা-গন্ধী কথা বলিবার
আছে মোর সুতরাং আছে আছে আছে অধিকার।

ছুছুঁরও কহিল হাসি, সাধুসঙ্গ ঘটেছে আমারও।
আমিও করেছি বাস বহুকাল পদপ্রান্তে তাঁর
খ্যাতি যাঁর বিশ্ব জুড়ে, নাম যাঁর সামান্ত চাষারও
জানে আজকাল। সুতরাং একচ্ছত্র মোর অধিকার
মারে কেবা? শুনেছি বিবিধ গান বিচিত্র সুরের,
ছিনু টেবিলের নীচে – হেঁ হেঁ, খোদ রবি ঠাকুরের।

"বনফুল"

দি বক্স টানেল

(চার্লস রীড)

৭ই মে ১৮৪৭ সাল।

দশটা পনেরোর ট্রেনটা প্যাডিংটন স্টেশন থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাঁ দিককার একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরায় চারজন যাত্রী, এদের মধ্যে দুজনের চেহারা বর্ণনার যোগ্য।

মহিলাটির ললাট শুভ্র, পেলব, মসৃণ ও কোমল; ভ্রূলেখা সুস্পষ্ট; চোখ দীর্ঘপল্লবচ্ছায়ায় রহস্যময়, ক্ষণে ক্ষণে তার রঙ বদলায় যেন; আর সুকুমার ওষ্ঠরেখার ফাঁকে কুন্দধবল দাঁতের সারি সুবিন্যস্ত। তার ওই চোখ আর মুখটুকুর আকর্ষণে পুরুষের নজর তার নাকের উপর পড়ে না। তার নিজের জাত যারা, তারা অবশ্য এ নিয়ে তার সম্বন্ধে অনেক বাজে কথা বলতে পারে, বলবেও। নিতান্ত সাদামাটা একটা ধূসর রঙের পোশাকও প'রে আছে, লজঞ্জুসের মত বোতামের সারিতে গলা পর্যন্ত আঁটা। গায়ে জড়ানো একটা স্কটিশ শাল, রঙটা চোখে বেশ মোলায়েম ঠেকে। একটি আঁটোসাঁটো-পালকে পালিশ পাতিহাঁস যেন, বেশ আরামে গুটিশুটি মেরে ব'সে আছে। হাতে একখানা বই,—ওই ধরার ভঙ্গীতেই ওর কব্জিটুকুর সুধু একটু ইশারা যেন নজরে পড়ে।

তার সামনের বেঞ্চে যে ব'সে আছে সে, আমি যাকে বলি "বিশিষ্ট," সেই ছাদের সুপুরুষ, এটা তার পক্ষে গৌরবের কথা; কেন না, সে যে গোষ্ঠীর মানুষ, সেখান থেকে যে সব মূর্তিমান জোয়ানমর্দের আমদানি হয়, তারা প্রায়ই কল্পনাতীত কিম্ভূত—মানে, ও একজন সোয়ারী অফিসার, বয়েস পঁচিশ। গোঁফ আছে; তবে বউ-খেদানো গোঁফ নয়—মানে, চুমুক দিতে গেলেই

যে সব গোঁফে ঝোপঝাড়ে শিশিরের ছিটের মত ঝোল থাকে লটকে, সে জাতীয় নয়; ছোট ঘন কয়লার মত কুচকুচে কালো গোঁফ। দাঁতগুলো এখনও তামাকের ধোঁয়ায় রসিয়ে ওঠে নি। ওর পোশাকটা ওর গায়ে সেঁটে বসে নি, আবার ঝুলঝুলও করছে না। মন-ভোলানো ওর হাসিটি। আর আমার ওকে যেজন্যে ভাল লাগছে, তা হচ্ছে ওর ওই গেরমানি ভাবটা, একেবারে বেপরোয়া; ঠিক জায়গাটিতে ভরপুর হয়ে আছে—মানে, ওর মনে, মুখে নয়। আমাকে আর অন্য অনেককে, যাদের মধ্যে ও বস্তু নেই, যেন ও দুই কনুই মেরে ঠেলে হটিয়ে দিয়ে চলেছে। এক কথায়, এমনটি কখনও কখনও শোনা যায় বটে, চোখে বড় একটা পড়ে না। তরুণ অভিজাত যাকে বলে।

উৎসাহে উত্তেজিত গুঞ্জনে ও কথা ক'য়ে চলেছে ওর সঙ্গীর কানে কানে, সেও ওর বন্ধু অফিসার। কথার বিষয় যা, তা নিয়ে আলোচনা না হওয়াই ভাল ছিল—মানে, নারী। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, কেউ আড়ি পেতে ওর কথা শোনে তা ও চায় না। কেন না, ক্ষণে ক্ষণে ও সম্মুখবর্তিনীর দিকে চোরা চাউনিতে চাইছে আর স্বর আরও খাটো ক'রে ফেলছে। মেয়েটি, মনে হয়, কেতাবের মধ্যে একেবারে ডুবে আছে, আর তাতেই ও একটু নিশ্চিন্ত হচ্ছে।

শেষে দুই জনীতে বাস্তবিকই একেবারে ফিসফিস ক'রে ফেললে কথার আওয়াজ। যে ছোকরা স্লাউতে নেমে গেল আর ভবিষ্যতের ইতিহাস থেকে একেবারে মুছে গেল, সে বাজি রাখলে (জিতলে দশ পাউণ্ড, হারলে তিন পাউণ্ড) যে, যে ছোকরা আমাদের সঙ্গে বাথের (এবং অমরত্বের) অভিমুখে চলেছে, পথে ইতিমধ্যে ওই দুটি মহিলার একজনকে চুম্বন করার তার হিম্মৎ হবে না।

রাজি, সই !

অবশ্য যার আমি এতক্ষণ এত গুণগান করলুম, সে যে চুপিচুপিও এমন একটা অকর্মে লিপ্ত হতে পারে, সেজন্যে সত্যিই আমার খারাপ লাগছে। কিন্তু সারাক্ষণই কেউ কিছু আর বিজ্ঞ হয়ে ব'সে থাকতে পারে না, জীবনের ঘড়িটাতে যখন পঁচিশটা বাজে, তখনও না। আর এ সবও ভেবে দেখ, তার পেশা, তার ওই চেহারা; আর তা ছাড়া প্রলোভনটাও—হয় দশ পাউণ্ড জিত, নয় তিন পাউণ্ড হার।

স্লাউয়ের পর দলটা এসে ঠেকল তিনজনে। টোয়াইফোর্ডে মহিলাদের একজনের রুমালটা প'ড়ে গেল; ক্যাপ্টেন ডলিনন নিরীহভাবে তার উপর গিয়ে পড়ল। এই সূত্রে গোটা দুই-তিন বাক্যবিনিময় হ'ল।

রেডিং স্টেশনে আমাদের এই কাহিনীর রাজপুত্র একটা নিরাপদ কারবারে টাকা খাটিয়ে বসল—মানে, একখানা 'টাইমস্' আর একখানা 'পাঞ্চ' কিনলে। শেষেরটার পাতায় পাতায় এচিং আর উড্‌কাটের ছবি। বিষয়—বীরদর্পী পুরুষ আর সুন্দরী ললনা কোনও একটা হামবড়া ক্ষ্যাপার কিংবা ওই রকম একটা আর কারুর দিকে কৃপাহাস্যে কৃপাকটাক্ষ হানছে। এখন এটা মানতেই হবে যে, একত্রে একবার হাসতে পারলে, পরস্পরের মনের মধ্যেকার বরফের চাপটা গ'লে যায়। অতএব সুইন্‌ডনে পৌছবার অনেক আগেই, 'কথায় কাটে কথার প্যাঁচ' শুরু হয়ে গেল। সুইন্‌ডনে পৌছবার পর দেখা গেল, ক্যাপ্টেন ডলিননের তুল্য অমন একটি সেবাপরায়ণ যুবক খুঁজে পাওয়াই ভার। হাতে হাতে যোগান দিচ্ছে সব। এই সূপ এগিয়ে দিচ্ছে, এই মুরগীর রোস্ট এগিয়ে দিচ্ছে; এই একজনের সূপ, ব্রাণ্ডি আর কোচিনীল দিয়ে রাঙিয়ে দিচ্ছে, এই অন্যজনেরটা ব্রাণ্ডি আর চিনি মিশিয়ে মিঠে ক'রে দিচ্ছে।

গাড়িতে ফিরে এসে মহিলাদের মধ্যে একজন দরজার ওধারে ভিতর দিকে গেল আর একটি ভদ্রলোকের সীটের তদারক করতে।

পাঠক! তুমি কিংবা আমি হ'লে অবশিষ্ট সুন্দরীটি কি করতেন? নিশ্চয় স'রে পড়তেন সুড়সুড় ক'রে। আর সুন্দরী না হয়ে যদি মাঝারি হতেন, তা হ'লে লজ্জায় লাল হয়ে উঠত সব, আমরা সুদ্ধু। হাতের মাখন-মাখানো রুটিটা হাত থেকে ছটকে গেলে সেটা যেমন মাখনের দিকটাতেই মুখ থুবড়ে কার্পেটের উপর পড়বেই, এ কথাটাকে তার চেয়েও সত্যি ব'লে মেনে নিও।

কিন্তু ইনি হলেন অ্যাডনিস—ফুলবাবু, তায় অশ্বারোহী, অতএব ভিনাস প্রেমলক্ষ্মী একত্রেই র'য়ে গেলেন তার সঙ্গে—একাকিনীই। অপরিচিত কুক্কুরীর সঙ্গে কোনও কুকুরের যখন ভেট হয়, তখন লক্ষ্য ক'রে দেখো, কি রকম ডগমগ, কি সুন্দর, কি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে তার ভাবখানা! সুইন্‌ডনের পর থেকে ডলিনস ঠিক তেমনিটি হয়েছে। আর হতভাগাটার কথা যদি সত্যি ক'রে বলতে হয় তো বলব যে, তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। আর পুষিকে দেখেছ, সরের বাটি এগিয়ে আসতে দেখলে তার ভাবখানা কেমন হয়? ঠিক

তেমনই হয়েছে মিস হেথরনের ভাবখানা, উত্তরোত্তর সে স্থির গম্ভীর হয়ে উঠছে।

আমাদের ক্যাপ্টেন অল্প একটু পরেই একবার বাইরের দিকে চাইলে, তারপর হেসে উঠল হো-হো ক'রে। এই ব্যাপারটাতে মিস হেথরন ওর দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু হয়ে।

হোঃ হোঃ! আমরা বক্স টানেল থেকে আর মোটে এক মাইল। হো-হো!

বক্স টানেল থেকে ঠিক এক মাইল দূর থাকতে বরাবরই কি আপনি হেসে ওঠেন?

বরাবর।

হেতু?

সে—মানে, হুঁম্‌ম্‌, সে এক ভদ্রলোকের কেচ্ছা।

ক্যাপ্টেন ডলিনন মিস হেথরনকে তখন এই গল্পটা বললে, একজন মহিলা আর তার স্বামী পাশাপাশি ব'সে চলেছে ওই বক্স টানেলের ভেতর দিয়ে। আর একজন ভদ্রলোক ব'সে আছে ঠিক তাদের সামনের বেঞ্চে। ঘুরঘুটি অন্ধকার। গাড়ি টানেল থেকে বেরবার পর মেয়েটা বললে, আচ্ছা জর্জ, এ কি অদ্ভুত কাণ্ড তোমার, টানেলের মধ্যে চলার সময় আমাকে চুমু খেলে!

ওসব কিছুই আমি করি নি।

কর নি?

না। কেন?

কেমন যেন মনে হ'ল, খেলে তুমি।

এইখানে ক্যাপ্টেন ডলিনন খুব হেসে উঠে সঙ্গিনীটিকে হাসিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। উঁহু! কিছুতেই তা হবার নয়। ট্রেনটা গিয়ে ঢুকল টানেলে।

মিস্ হেথরন। এঃ!

ডলিনন। কি! কি, হ'ল কি?

মিস হেথরন। ভয় লাগছে।

ডলিনন। (পাশে এসে ব'সে) ভয় পাবেন না; ভয় কি? আমি তো কাছে আছি।

মিস হেথরন। আপনি কাছে আছেন—ক্যাপ্টেন ডলিনন, বড্ড বেশি কাছে।

ডলিনন। আপনি আমার নাম জানেন?

মিস হেথরন। আপনি বলছিলেন, তখন শুনেছি। উঃ, এই অন্ধকারটা থেকে বেরতে পারলে বাঁচি!

ডলিনন। খুশি হয়ে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে কাটিয়ে দিতে পারি আপনাকে ভরসা দিতে দিতে, বুঝেছেন!

মিস হেথরন। হ্যুৎ!

ডলিনন। পুচ!

(গম্ভীর পাঠক, এর পরই যে সুন্দরীর সঙ্গে আপনার ভেট হবে, ঠোঁট দুটো তার দিকে যেন ধাওয়া না করে। তা হ'লেই কিন্তু ওই আওয়াজটার অর্থ জেনে ফেলবেন।)

মিস হেথরন। এঃ! এঃ!

মিস হেথরনের বন্ধু। কি! কি! হ'ল কি?

মিস হেথরন। খোল, খুলে দাও। দোর খুলে দাও।

[দ্রুত ফিস ফিস কথার আওয়াজ। দড়াম ক'রে দরজাটা এঁটে বন্ধ করার আর ঝড়াক্‌সে খড়খড়ি টেনে দেওয়ার শব্দ।] ওইরকম অস্পষ্ট সব আওয়াজ কথাবার্তার মধ্যে বসিয়ে দেওয়ার জন্যে যদি কোন সমালোচক আমাকে তেড়ে আসে, তা হ'লে আমিও তাকে কলা দেখিয়ে জবাব দেব যে, বাপু হে, ঠ্যাঙাঠেঙি করতে হয়তো যে তোমার সমান, তার সঙ্গে লাগ; তার চেয়ে বড় যারা—সোফোক্লিস, ইউরিপাইডিস, অ্যারিস্টোফেনিস তারাই এই পথ দেখিয়েছে; নিতান্ত অনিচ্ছায় আমি তাদের পন্থানুসরণ করেছি।

মিস হেথরনের চিক্কুরটা মাঠেই মারা গেল; কেন না, ঠিক সেই মুহূর্তেই বেয়াড়া এঞ্জিনটা এমন চিকরিয়ে 'সিটি' মেরে উঠল, যেন চল্লিশ হাজার খুন হয়ে যাচ্ছে ওর চোখের ওপর। আর কৃত্রিম শোক নিজেকে যেমন জাহির করতে পারে, আসলটি তা পারে না—এ তো জানা কথা।

টানেল থেকে বাথে পৌছবার মধ্যে আমাদের বন্ধুবর যথেষ্ট সময় পেল তার ব্যবহারটা ঠিক সুকুমারভদ্রজনোচিত হয়েছে কি না, এ প্রশ্ন নিজেকে করবার।

অতি অনুতপ্ত গম্ভীর বদনে (সত্যি কি মিথ্যে তা জানি নে বাপু) সে দরজাটা মেলে ধরলে। তার সাম্প্রতিক বন্ধুরা ওকে পাশ কাটিয়ে ওপারে

যাবার চেষ্টা করলে। অসম্ভব! তারই ঘাড়ের উপর দিয়ে ডিঙিয়ে যেতে হবে। যাকে সে অপমান (চুম্বনের সংস্কৃত পর্যায়) করেছে, সেই মেয়েটি ওর পায়ের কাছাকাছি কোথাও চোখ নামিয়ে ফেললে, চোখে তার মৃদু ভৎর্সনা, মুখ লজ্জায় রাঙা। আর অন্যটি, যাকে আর কি ওরকম অপমান করে নি, সে কটমটিয়ে চেয়ে যেন ছোরা হানলে, আগুন ঠিকরে পড়ল তার চোখে। তারপর তারা চ'লে গেল।

ডলিননের নিতান্ত ভাগ্যি যে, তাদেরই রেজিমেণ্টের মেজর হস্‌কিন্স তার সুহৃদ। রাগী লোক; ছোকরারা তাকে ঠাট্টা করে, কেন না, বিলিয়ার্ডের গোলা আর সিগারের আগুন ওসব ওর কাছে অতি তুচ্ছ, ওগুলোকে ও নেহাৎ তাচ্ছিল্যই করে। লোকটা জীবনে ঢের কামানের গোলা আর কামান-ধরানো মশাল নিয়ে কারবার করেছে, তা ছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, মেসের ছোকরাদের ওসব খোঁচা ও ঢের গলাধঃকরণ করেছে, তাতে ক'রে, আর যাই হোক, ওর পক্ষে কোনও অভদ্র কাজ করা বা কথা বলা অসম্ভব হয়েছে।

ক্যাপ্টেন ডলিনন ভদ্রলোককে গল্পটা খুব ফুর্তি ক'রেই বললে। কিন্তু মেজর হস্‌কিন্স ওর উত্তেজনা গায়ে না মেখে, নির্বিকার মুখে বললে যে, সে একজনের কথা জানে, ঠিক ওই কারণেই যে মারা পড়েছে। বললে, ও এমন কিছু না। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, হতভাগার মরাই উচিত।

এতে ছোকরার মুখটা লাল হয়ে উঠল। দেখে মেজর বললে, মানে, লোকটা পঁয়ত্রিশ বছরের ঢেঁকি। আর তোমার বোধ হয়, এই একুশ।

পঁচিশ।

তা ও একই কথা। আমার একটা উপদেশ নেবে?

যদি দেন।

কাউকে এ কথা ব'লো না। আর দেখ, হোয়াইটকে বাজিহারার তিনটে পাউণ্ড পাঠিয়ে দাও, যাতে সে বোঝে যে তোমার হার হয়েছে।

তা করা শক্ত,—বাঃ! জিতেছি যে!

তবু যা বলছি, তাই কর হে।

মানুষের একান্ত সাধুতায় অবিশ্বাসীরা জানুক যে, এই জঙ্গী-সোয়ার অপরাধে লজ্জা পায়। কি আর করে, এই সৎকাজটা করতেই হ'ল তাকে, যদিও নিতান্ত অনিচ্ছায়। আর এইটে হ'ল তার প্রথম ধাক্কা, মুষড়ে যাওয়ার।

এক হপ্তা পরে একটা নাচের মজলিসে গেছে সে। মনটা একটা খুঁৎখুঁতে ভাবে ভরা, সাধারণত ভদ্র ইংরেজের যেমনটাই হয়ে থাকে আর কি, কিছুই যেন মনের মতন চলছে না। জর্জ ডলিননের রূপগুণ সম্বন্ধে মনে মনে তার নিজের যে মাপকাঠি তারই যোগ্য কোন মেয়ের দেখা পায় কি না—মিছেই সেই খোঁজে সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় পাশ দিয়ে চ'লে গেল একটা মধুময় স্বপ্ন, না মায়া! মেয়েটি তার রূপের ছন্দ আর ছন্দের সুষমায় এক লহমায় ওকে তাক লাগিয়ে দিলে। চেয়ে দেখলে আবার, হতেই পারে না; হ্যাঁ, এই তো! মিস হেথরন। (এ নয় যে, নামটা সে জানত) কিন্তু এ কি অভিনব পরিণতি রূপের! যে ছিল যেন পাতিহাঁসটি, সে আজ হয়েছে যেন ময়ূরী, একেবারে ঝকমক ঝলমল করছে। ওকে আগের চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর দেখাচ্ছে; আর যেন আয়তনের দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে একবার হারিয়ে গেল মেয়েটি। আবার খুঁজে পেল তাকে। মেয়েটি এত রূপবতী যে, তার রূপও স্নায়ুকে পীড়িত ক'রে তুলছে। আর ওই কিনা একমাত্র মানুষ, যে মেয়েটির সঙ্গে একটু নাচতেও পারে না, আলাপও করতে পারে না! যদি মামুলী ভাবে পরিচয় শুরু হয় ও খুশি হতে পারত, তবে হয়তো ওই একটা চুম্বনেই তার অবসান ঘটত; এখন সবই ভণ্ডুল হ'ল।

মেয়েটি নাচছে, আর রূপের ফুলকি ঠিকরে পড়ছে তার চতুর্দিকে, সুধু ওকেই বাদ দিয়ে,—সে ওকে চেয়ে দেখেই নি। পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ওর দিকে সে চাইবেও না। একটা লোক দেখা যাচ্ছে একেবারে নাছোড়বান্দা। মেয়েটা তার এই আঁটুলিপনাতে খুশির হাসিই হাসছে তার দিকে চেয়ে। লোকটা কুচ্ছিত, কিন্তু মেয়েটা ওকে হেসে কৃতার্থ করছে। ডলিনন, লোকটার কৃতিত্বে তার কুরুচিতে তার কুরূপে তার আস্পদ্দায় অবাক হচ্ছে। শেষে ডলিনন নিজেকে যেন অপমানিতই বোধ করতে লাগল। কে হে লোকটা? আর ওর অধিকারই বা কি এসব এমনিতর ক'রে চালাবার! ও ব্যাটার ওকে চুমু খাবার কোনদিন হিম্মৎ হয় নি নিশ্চয়। ডলিনন আপন মনে গজরায়। ও কথা ডলিনন প্রমাণ করতে পারে না বটে; কিন্তু যেমন ক'রেই হোক, ওর সম্পত্তি লুঠ হচ্ছে যেন এমনই ধারার ভাব ডলিননের।

সে বাড়ি ফিরে গেল, মিস হেথরনকে স্বপ্নে দেখলে, আর যত কদাকার কৃতি লোকদের উপর হাড়ে চ'টে রইল। একপক্ষকাল ধ'রে সুন্দরীটি কে,

তাই খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলে। কিছুতেই আর নাগাল পায় না তার। শেষে যে ভাবে তার খবরটা পেলে, তা বলছি।

একদিন এক উকিলের মুহুরী ওর সঙ্গে এসে দেখা করলে অল্পক্ষণের জন্যে আর ওর বিরুদ্ধে মিস হেথরনের পক্ষে রেলগাড়িতে অপমানের দরুন এক মকদ্দমা রুজু করলে।

ছোকরা তো একেবারে ঘাবড়ে গেল, মুহুরীটিকে ভেজাবার অনেক চেষ্টা করলে। কিন্তু সে যন্ত্রটি এমন যে, ওর শর্তের, ওর কথার অর্থ সে ধরতেই পারল না। যাই হোক, এই দুর্ঘটনায় প'ড়ে মহিলাটির নামটা জানা গেল। আর নাম থেকে ধাম জানা একটা ছোট ধাপ বইত নয়। সেইদিন এবং পরে পরে আরও অনেকদিন, আমাদের ভগ্নচূড় মহাবীর মেয়েটার দরজায় ওত পেতে ধন্না দিয়ে প'ড়ে থাকতে লাগল, ফল কিছুই হ'ল না।

কিন্তু একদা এক মনোরম অপরাহ্নে মেয়েটি নিতান্ত মামুলীভাবেই যেন বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে, রোজই যেন ওইটেই তার অভ্যাস। আর সাধারণের হাওয়া-খাওয়ার পথটা, সেখানে গিয়ে হন হন ক'রে হেঁটে বেড়াতে লাগল। অতএব ডলিননকেও তাই করতে হ'ল। পথে বার বার ওদের দেখা হ'ল, বার বার পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতে হ'ল; আর মেয়েটির চোখে করুণার আভাস কিছুমাত্র ফোটে কি না, বেচারা তারই তল্লাস করতে লাগল। কিন্তু হায়, সে না চোখ ফিরিয়ে চাইলে, না তার মুখে ওকে যে চেনে তার আভাসটুকুও পাওয়া গেল। যাই হোক, মেয়েটা বেড়াচ্ছে তো বেড়াচ্ছেই, বেড়াচ্ছে তো বেড়াচ্ছেই। ইতিমধ্যে আর সব হাওয়া-খোরদের দল শ্রান্ত হয়ে চ'লে গেল। তখন ওই অপরাধী লোকটা বুকে বল সংগ্রহ ক'রে মাথার টুপিটা নামিয়ে কাঁপা গলায় (জীবনে এই প্রথম তার গলা কাঁপছে কথা কইতে) মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার অনুমতি চাইলে।

মেয়েটি দাঁড়াল, মুখ তার রাঙা হয়ে উঠল; আর তার ভাবে, সে তাকে যে চেনে তা না স্বীকার করলে, না অস্বীকার করলে। এরও মুখ রাঙা হয়ে উঠল। ভাঙা ভাঙা বাধো বাধো ভাষায় ব'লে চলল, সে যে কী লজ্জায় ম্রিয়মাণ, শাস্তিই যে তার উচিত প্রাপ্য, হৃদয়ে কি শাস্তিই না সে বহন করছে; মেয়েটি কি ক'রে জানবে যে সে কী দুর্বিহ জীবন যাপন করছে, এবং উপসংহারে সে মিনতি ক'রে জানালে যে, ওর পরিচয়ে বঞ্চিত হয়ে এমনিতেই সে মর্মাহত,

এমন হতভাগ্যকে জগতের সামনে উদ্‌ঘাটিত ক'রে যেন আর অপদস্থ করা না হয়।

মেয়েটি কৈফিয়ৎ দাবি করলে। ছোকরা বললে মকদ্দমার কথা, মেয়েটির নাম দিয়ে যা রুজু হয়েছে। মেয়েটা তার কাঁধ দুটোকে একটু 'কে জানে বাবা'-গোছ দোলা দিয়ে বললে, উঃ, এগুলো কি হাঁদা! এই উক্তিতে একটু ভরসা পেয়ে ছোকরা অনুনয় ক'রে জানতে চাইলে যে, দূর থেকে ভালবাসব, তোমায় জানতে-দেব-না-গোছের অকপট আত্মদানে বহু বৎসরান্তেও তার এই উন্মত্ততার, তার এই অপরাধের স্মৃতি ওর মন থেকে মুছে যাবে কি না!

ও তা বলতে পারে না।

এখন অবশ্য তাকে বিদায় নিতে হচ্ছে, যেহেতু তাকে গিয়ে আবার ক্রেসেণ্টে একটা নাচের আয়োজন করতে হবে, সব্বাই যাবে।

বিদায় নিলে তারা। আর ডলিনন ওই নাচে, যেখানে সব্বাই যাবে, সেখানে যাবেই এই প্রতিজ্ঞা করলে।

উপস্থিত হ'ল সেখানে গিয়ে। গিয়ে মিস হেথরনের সঙ্গে দস্তুরমত যোগাড় ক'রে পরিচয় করলে। নাচলেও তার সঙ্গে। মেয়েটির ব্যবহার অমায়িক। আর মেয়েদের স্বাভাবিক চতুরতায়, সে বাইরে এমন ব্যবহার দেখালে যেন ওই সন্ধ্যেবেলাই তাদের এই প্রথম আলাপ।

সেদিন রাত্রে, সেই প্রথম, ডলিনন প্রেমে পড়ল। অবশ্য পাঠকদের আমি রেহাই দেব প্রেমিককুলের চিরন্তন সেই কলা-কৌশলের মারপ্যাঁচ থেকে, যাতে ক'রে ছোকরা যেখানেই মেয়েটা থাক্, যে নাচে মেয়েটা নাচুক, যে পথেই মেয়েটা ঘোড়া দাবড়ে যাক, দৈবাৎ সেখানে ও গিয়ে পড়বেই। তার আনুরক্তি মেয়েটার পেছনে তাকে চার্চে পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে, যেখানে নাকি এই জঙ্গী সওয়ার এই একটা জ্ঞান লাভ করলে যে এমন জগৎ আছে যেখানে এলে মানুষ পোল্কাও নাচে না, চুরুটও ফোঁকে না,—ওই জগতের এ দুটো এক নম্বর পাপ।

ছোকরা মেয়েটির খুড়োর সঙ্গে আলাপ করলে, তিনি ওকে পছন্দ করলেন। শেষে সে লক্ষ্য করলে যে, মেয়েটি ওকে অন্যমনস্ক দেখলেই ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালবাসে। বক্স টানেলের তিন মাস পরে ক্যাপ্টেন ডলিনন একদা রয়্যাল নেভির ক্যাপ্টেন হেথরনের সঙ্গে দেখা করলে, জীবনে দুবার মাত্র এঁর

সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে। অখণ্ড মনযোগে প্রাণপণে তার একটা খালকাটা অভিযানের গল্প গলাধঃকরণ করার পর সামান্য একটু নরম ক'রে আনতে পারল তাঁকে। তারপর ওঁর সঙ্গে একদিন দেখা ক'রে ওঁর কন্যার সঙ্গে পূর্বরাগ যাপন করবার অনুমতি চাইলে। তৎক্ষণাৎ সেই সুযোগ্য নাবিকবর একেবারে নাবিক-অফিসারের মূর্তি নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

এমন সময় অন্তরাল থেকে তাঁর ডাক এল, একটা খুব রহস্যময় ডাক। ফিরে এসে ক্যাপ্টেনের সুর একটু বদলে গেল। বললেন, ঠিক হ্যায়। আর জানালেন যে, তাঁর দর্শনপ্রার্থী ইচ্ছা করলেই এখন তার গন্তব্যের দিকে ছুটতে পারে।

পাঠক, ব্যাপারটা আন্দাজ ক'রে নিয়েছেন! নাবিক কম্যাণ্ডারটি, তাঁর কন্যা অর্থাৎ আমাদের নায়িকাটির মতে একমত এবং খুশি হয়েই রাজী।

তিনি বিদায় নিয়ে যেতে না যেতে ক্যাপ্টেন ডলিনন দেখলে যে, তার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী সুড়ুৎ ক'রে হাজির বসবার ঘরটিতে। সে ওর কাছে এগিয়ে যেতে দেখলে, ওর মিষ্টি মুখে একটা দিশাহারা-গোছ ভাব ঘনিয়ে উঠেছে। মেয়েটি একবার হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেললে আর তারপরই আবার কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেললে। এর পর দোরগোড়ায় এসে হস্তচুম্বন ক'রে বিদায় নিতে নিতেই ক্যাপ্টেন অমুক আর মিস অমুকীর বদলে তারা জর্জ আর ম্যারিয়ান হয়ে উঠল।

একটা ভদ্রোচিত যুক্তিসঙ্গত সময় অতিবাহিত হতে দেওয়া গেল (কেন না, আমার গল্পটার দয়ামায়া আছে আর নিতান্ত কষ্টকর প্রতীক্ষার দিনগুলো সে ডিঙিয়ে চ'লে থাকে)। তারপর এরা দুজনে খুবই খুশি। আর একবার সেই রেলপথে তারা বার হ'ল মধুচন্দ্রযাপনে, একেবারে ওরাই শুধু। ম্যারিয়ান-ডলিননের পোশাক হুবহু সেই সেবারকার পোশাক; সেই পাতিহাঁসের মত তুষ্ট পুষ্ট আর মনোরম। এবারে জর্জ আর তার সামনের বেঞ্চে নয়, একেবারে তার পাশেই, আর ম্যারিয়ান তার দীর্ঘপল্লবের আড়াল থেকে ওকে পান করছে প্রশান্ত মনে।

ম্যারিয়ান, বিবাহিত দম্পতির উচিত পরস্পরের কাছে সব খুলে বলা। যদি সব খুলে বলি, তবে কি কোনদিন তুমি আমাকে মাপ করতে পারবে? না—

নিশ্চয়। বল।

আচ্ছা বেশ, তা হ'লে তোমার বক্স টানেলের কথা মনে পড়ে তো! (এই প্রথম, সে ভরসা ক'রে ও কথা তুললে) খুব লজ্জিত হয়েই জানাচ্ছি যে, হোয়াইটের সঙ্গে বাজি ধরেছিলাম যে তোমাদের দুজনের মধ্যে একজন মেয়েকে চুমু খাব। জিতলে দশ পাউণ্ড, হারলে তিন পাউণ্ড।—এই ব'লে জর্জ মুখটা খুব করুণ ক'রে মনে মনে একচোট হেসে নিলে।

গম্ভীর মুখে উত্তর হ'ল, ও কথা আমি জানি জর্জ। আমি তোমাদের কথা শুনতে পেয়েছিলাম।

ও! সত্যি শুনেছিলে? অসম্ভব।

আমার সঙ্গিনীর কানে ফিস ফিস করতে শোন নি আমাকে? ওর সঙ্গে বাজি ধরেছিলাম।

বাজি ধরেছিলে? কি আশ্চর্য! বাজিটা কি?

এক জোড়া দস্তানা, আর কিছু না।

তা তো জানি; কিন্তু কি নিয়ে?

যে, তুমি যদি ওকাজ কর তবে তুমিই আমাকে বিয়ে করবে প্রিয়তম।

ও! কিন্তু দাঁড়াও, তা হ'লে তুমি আমার উপর এত চটতে পারতে না মণি। আর তা ছাড়া, আমার বিরুদ্ধে সেই মকদ্দমাও তো রুজু করেছিলে না?

শ্রীমতী ডলিনন চোখ নিচু করলে।

আমার ভয় হয়েছিল যে, তুমি আমায় ভুলতে শুরু করেছ। জর্জ, তুমি কি কখনও আমাকে মাপ করতে পারবে!

মণি আমার! এই তো বক্স টানেল।

পাঠক! আর না। তেমন কিছুটি আর নয়। বারে বারেই অন্ধকার জায়গা এলেই ওই সব ব্যাপার ঘটাতে আস্কারা দিতে হবে এমনটি আশা করতে পার না। আর তা ছাড়া বিবেচনা ক'রে দেখো, ব্যাপারটা ঠিক নয়। মনে রেখো যে, দুটি বুদ্ধিমান বিবাহিত নরনারী এরা। আমি নিশ্চয় বলছি, ওসব কোনও অঘটন ঘটে নি। এঞ্জিনের সঙ্গে হতাশ চিৎকারে পাল্লা দেওয়াও চলে নি এবার।

শ্রীজীবনময় রায়

সংবাদ-সাহিত্য

১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আমরা তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ি এবং অগিল্‌ভি হস্টেলে থাকি। হস্টেলের হইয়া শান্তিনিকেতন-টীমের সঙ্গে ফুটবল খেলিতে গিয়াছিলাম। খেলার শেষে সকলে মিলিয়া রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করিতে গেলাম, তিনি তখন "উত্তরায়ণে"র একটি ছোট ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। ঠিক সেই সময়ে বড় রকমের একটি ট্রেন দুর্ঘটনা হইয়াছিল। কথায় কথায় সেই প্রসঙ্গ উঠিল। কে যেন বলিল, মৃতের সংখ্যা কাগজে যাহা বাহির হইয়াছে আসলে তাহা অপেক্ষা মরিয়াছে অনেক বেশি। ক্ষতিপূরণ এড়াইবার জন্ত রেল-কর্তৃপক্ষ আধমরাদের পিটাইয়া মারিয়া রাতারাতি লাশ সরাইয়া ফেলিয়াছে। বক্তার নজির ছিল এই যে, এইরূপ বরাবরই হইয়া আসিতেছে। কথাগুলি শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন, এই ঘৃণ্য আত্মাবমাননা তোমরা কেমন ক'রে স্বীকার কর বুঝতে পারি না। এই স্বীকারোক্তির দ্বারা নিজের দেশ ও জাতকে যে তোমরা কতখানি নামিয়ে দাও, তা বোঝবার মত শক্তিও তোমরা হারিয়েছ। ভেবে দেখ, তোমরা যা বলছ তা যদি সত্যিই হয়, অর্থের খাতিরে মানুষ এত নীচেও নামতে পারে; এই নৃশংস নীচতা করে কারা? কোম্পানির সাহেব কর্মচারীরা শুধু নয়। আমাদের দেশের অনেকে নিশ্চয়ই এতে লিপ্ত থাকে। যাদের নিয়োগ করা হয় অথবা যারা এসব জানে, তাদের মধ্যে কি একজনও এমন নেই, যে এই পৈশাচিক শয়তানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে, শাস্তির ভয় না ক'রে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারে যে, এই পাপ সে সমর্থন করে না! যদি বরাবরই এরূপ ঘ'টে থাকে, কই, কখনও তো কাউকে প্রতিবাদ করতে শুনি নি! এরা সবাই কি পিশাচ হয়ে গেছে?

জবাব দিতে না পারিয়া আমরা চুপ করিয়া রহিলাম। উত্তেজিত কবি একটু থামিয়া আবার বলিলেন, আর এসব যদি মিথ্যাই হয়, আমরা সারা দেশ জুড়ে এমন মিথ্যার প্রশ্রয় দিই কি ক'রে? মানুষের এতখানি অবনতি যে সম্ভব, মানুষ হয়ে আমরা তা মেনে নিই কেন? কেন জোর গলায় বলতে পারি না—এ হতে পারে না, এ মিথ্যা?

আমরা কেহই কথা বলিতে পারি নাই। লজ্জায় সকলে অধোবদন ছিলাম।

বিগত আগস্ট মাস হইতে বাংলা দেশ যে ভয়াবহ আত্মকলহে লিপ্ত হইয়াছে এবং যাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ বাংলা দেশের হিন্দু ও মুসলমান পৃথক হইতে বসিয়াছে, আশা করিয়াছিলাম, উভয় সম্প্রদায়ের জ্ঞানী গুণী ও সহৃদয় ব্যক্তিরা পরস্পর দোষারোপ না করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভুল ও অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন হইবেন ও তাহার প্রতিকার-চেষ্টা করিবেন। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের উপর আমাদের অনেকখানি ভরসা ছিল। দুঃখের সহিত দেখিলাম, আমাদের ভরসা নিষ্ফল হইল। রাজনৈতিক মতলববাজ কয়েকজন লোক ছাড়া বিরোধ-অবসানে কেহই অগ্রসর হইয়া আসিলেন না, সংবাদপত্রে আত্মপ্রচার-মূলক বিবৃতি প্রকাশ ছাড়া সত্যকার কাজ কিছু হইল না। শুধু হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের সকলকে লজ্জা দিয়া অশীতিপর একজন অবাঙালী বৃদ্ধ দুর্বৃত্তদের হৃদয় জয় করিতে আসিলেন। তিনি উভয় সম্প্রদায়কেই আহ্বান করিলেন পাপ স্বীকার করিতে। সাময়িক উত্তেজনার বশে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিতে বলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করিলেন, লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এবং অপহৃতা নারীদের যথাস্থানে প্রত্যর্পণ করিতে। ইহাও দেখিলাম, তিনি প্রায় বিফল হইয়া ফিরিয়া গেলেন। পরে সংবাদপত্রে দেখিলাম, তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে বিহারের দুর্বৃত্তেরা, হাজারে হাজারে না হউক, অনেকে স্বেচ্ছায় আইন ও শৃঙ্খলার কবলে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। মনুষ্যত্বের প্রতি যে বিশ্বাস হারাইয়াছিলাম, তাহার কিছুটা ফিরিয়া পাইলাম।

* * *

রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদিগকে লজ্জা দিয়াছিলেন তখন আমাদের বয়স কম ছিল, জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল না। আজ মনুষ্যত্বের দুর্গতির সেই পুরাতন প্রশ্ন উঠিলে তাঁহাকে বলিতে পারিতাম, ধর্মসংক্রান্ত বা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির বশে একটা জাতকে জাত পশু হইয়া যাইতে পারে, স্বার্থের বশে তো পারেই। ইহার প্রমাণ নারীহরণ ও লাঞ্ছনার কোনও প্রতিবাদ বাংলা দেশের কুত্রাপি উত্থিত হইতে দেখিলাম না সেই সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে, দুর্বৃত্তরা যে সম্প্রদায়ের গৌরব হইয়া উঠিয়াছে। দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় বাস্কেটবলের বলের মত হতভাগিনীরা নীত হইতেছে, মাঝপথে কেহই দাঁড়াইয়া বলিতেছে না—ইহা পাপ, ইহা অন্যায়। আজ বুঝিতে পারিতেছি, মানুষের বুদ্ধি ও রুচি বিকৃত হইলে কোনও অন্যায়কেই সে অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করে না, একা করে না, দশজনে করে না, একটা গোটা সম্প্রদায়গতভাবেও করে না।

বাংলা দেশে সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় একদিন একান্ত কাছাকাছি আসিয়াছিলাম। হিন্দু রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান নজরুল ইসলামকে লইয়া দুই দলেই মাতামাতি করিয়াছিলাম। আজ এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহা হয়তো আমরা উভয় পক্ষই সমর্থন করি না; কিন্তু ফল দাঁড়াইল এই যে, আমরা পরস্পর বিমুখ হইয়া পড়িলাম। শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ছেদ পড়িয়া গেল। ভাষার ক্ষেত্রে আগে দুধে জল মিশাইবার প্রয়াস দেখিতাম, রাতারাতি এমনই বদল হইয়া গেল যে এখন জলে দুধ মিশাইয়া চালু করিবার চেষ্টা দেখিতেছি। অথচ অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার ধুয়াও উঠিয়াছে! বাংলা দেশে ও বাংলা ভাষায় যাহার চাইতে বড় নাই, সেই রবীন্দ্রনাথের গান, সাহিত্য ও ছবি লইয়া শিক্ষায়তনে ও সভায় কলহ হইতে দেখিলাম, অথচ সাহিত্যিকদের তরফ হইতে কোথায়ও কোনও প্রতিবাদ হইল না। বিহার-দুর্বৃত্তদের মত নজরুল ইসলামকে লইয়া আমরা খানিকটা অনুতাপ করিলাম বটে, কিন্তু তাহাতেই কি চিঁড়া ভিজিল! বাহিরে অর্থাৎ উভয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের মধ্যে যে কলহ হইয়াছিল, তাহাতে অর্থ ও সম্পত্তি নাশ ঘটিয়াছিল, কয়েক সহস্র হতভাগ্যের মৃত্যু ও কয়েক শত হতভাগিনীর লাঞ্ছনা হইয়াছিল সত্য; কিন্তু এ সকল ভুলিয়া আবার কাছাকাছি আসা কঠিন হইত না, যদি দেখিতাম, মনে অর্থাৎ উভয় পক্ষের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মধ্যে এখনও অন্যায়ের প্রতিবাদ-স্পৃহা বজায় আছে। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাহা নাই। থাকিলে স্ব স্ব সমাজ বা সম্প্রদায়ের সকল গুণ্ডামিকে উপেক্ষা করিয়া গল্পে কবিতায় উপন্যাসে প্রবন্ধে বক্তৃতায় চিরন্তন মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে এই কুৎসিত অভিযানের, প্রবল বা সমবেত না হউক, ক্ষীণ ও একক প্রতিবাদ শুনিতে পাইতাম। নির্ভীক সত্যসন্ধী অন্তত একজনকেও বলিতে শুনিতাম, অসহায় নারীকে ধরিয়া আনিয়া এজমালি বলাৎকার কোনও ধর্মেই সমর্থন করে না। গত নয় মাস ধরিয়া এরূপ একটি ঘোষণার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছি, কিন্তু সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি বা ভয় যাহাতেই আটকাক, সে ঘোষণা আজিও হইল না।

* * *

সুতরাং পৃথক হইয়া যাওয়াই ভাল, যে সংস্কৃতি মানুষকে মানুষ রাখে না সে সংস্কৃতির ধুয়া তুলিয়া দুই মনে-পৃথককে বাহিরে এক করিয়া লাভ কি?

মানুষ পাপ না করিলে কষ্ট পায় না—সাধারণের এই ধারণা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে, আমাদের দুঃখ-ভোগের অনুপাতে পাপের পরিমাণ নিশ্চয়ই প্রভূত। হিন্দু সমাজের সর্বাপেক্ষা বড় পাপ—ছুঁৎমার্গ। স্বামী বিবেকানন্দ এই পাপের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ইহাই ছিল চিরজীবনের আক্ষেপ—"মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।" এই পাপের ফলে বহু শতাব্দী কাল হইতে আমরা আত্মনাশের দ্বারা খণ্ডিত হইতে হইতে বর্তমানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছি। এই কারণেই যে মাতা বনিতা ও দুহিতা সম্প্রদায় আমাদের কাপুরুষতা ও দুর্বলতার জন্য লাঞ্ছিত হয়, তাহারাই অপর পক্ষের শক্তির উৎস হইয়া দাঁড়ায় এবং ইহার জন্যই আত্মঘাতী যোগেন্দ্র মণ্ডলদের সৃষ্টি হয়। আজ সময় আসিয়াছে এই পাপ সর্বপ্রকারে পরিহার করার। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন এই পাপ নিবারণের জন্য একটি চিন্তিত "ফরমুলা" আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ফরমুলা অনুযায়ী কাজ হইলে অদূরভবিষ্যতে আমাদের দুর্বলতার প্রধানতম কারণটি অপসৃত হইতে পারে। উপেন্দ্রবাবু বলিতেছেন—

"কিছুদিন হইল ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ দিল্লীতে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুমহাসভা এখন জাতিভেদ উচ্ছেদ করিবার জন্য প্রচারকার্য করিবেন। এই সংবাদটি সত্য হইলে আশার কথা। হিন্দুমহাসভা এতদিন রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব লাভের আশায় বহু বক্তৃতা বহু প্রস্তাব করিয়া আসিতেছিলেন। ওই কার্যটির ভার ষোলো আনাই কংগ্রেসের উপর ছাড়িয়া দিয়া হিন্দুমহাসভা যদি হিন্দু-সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে হিন্দুদের যথার্থ উপকার হইত। যেদিন হিন্দুসমাজকে খণ্ডিত করিয়া সিডিউল্ড কাস্ট বা তপসীলী সম্প্রদায় বলিয়া একটি স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি হইল, অন্তত সেদিন হইতেও হিন্দুমহাসভার ওই কার্য আরম্ভ করা উচিত ছিল। করিলে এতদিনে হিন্দুরা বহু শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারিত। তাহা হয় নাই বলিয়া আজ এই নবগঠিত জাতি বর্ণহিন্দুদের বিরোধী। তাঁহারা এখন মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার ফাঁদে পা দিয়াছেন এবং সম্প্রতি মুসলমান নেতাগণের অনুগ্রহে কিছু রুটি ও মৎস্য তাঁহাদের ভাগে পড়িতেছে। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। মহাত্মাজী সেবারে যে 'হৈমালয়িক' ভুল করিলেন এবং যাহার ফলে হইল পুণা-প্যাক্ট, তাহাতে অন্তত বাংলা দেশে তপসীলী সম্প্রদায় হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেল। মহাত্মাজী তাহাদের 'হরিজন' বলিয়া আপ্যায়িত

করিয়া যে তাহাদের খুশি করিয়াছেন, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। এতদিনেও বুঝা গেল না, মহাত্মাজী কি বিবেচনা করিয়া হিন্দুসমাজকে দ্বিখণ্ডিত করার সম্মতি দান করিয়াছিলেন।

"মহাত্মাজী কেবল অস্পৃশ্যতা দূর করিবার মত একটি ন্যূনতম সংস্কারকার্যের জন্য প্রচার করিতেছেন। কিন্তু বর্তমানে কেবল মাত্র অস্পৃশ্যতা দূর করিলেই হিন্দুরা এক হইবে না। জাতিভেদ সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য নমঃশূদ্র হিন্দুবৃত্তের মধ্যে থাকিয়া নিজ নিজ কক্ষে ঘুরিয়া জাতি বাঁচাইয়া চলিবে, তাহা আর চলিবে না। আমরা শুধু হিন্দু—ব্রাহ্মণও নয়, নমঃশূদ্রও নয়, এইটিই হওয়া উচিত আদর্শ। একদিনে এই পাপ দূর হইবে না, কিন্তু এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া এখনই কি করিতে পারি, তাহার আলোচনা করিতেছি।

"(১) মহাত্মাজীকে অনুরোধ করা হউক, তিনি 'হরিজন' কথাটি আর ব্যবহার না করেন। যাহাদের 'হরিজন' বলা হয়, উহাতে তাহাদের আত্ম-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। তাহাদের সর্বক্ষণই স্মরণ করিয়া দেওয়া হয় যে, তাহারা "হরিজন" অর্থাৎ অস্পৃশ্য। তিনি ভাঙ্গী কলোনিতে থাকিতে চাহেন, থাকুন; কিন্তু তাহার জন্য ও-সম্প্রদায়ের লোকেরা খুশি হইলেও তাহাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি হইবে না।

"(২) গণ-পরিষদ যে নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন, তাহাতে "সিডিউল্ড কাস্ট" বলিয়া হিন্দুদের শ্রেণীবিভাগ তুলিয়া দিবার আন্দোলন করিতে হইবে। খুব ভাল হয় দেশের সকল অধিবাসীরা শুধু মাত্র ভারতবাসী বা প্রদেশবাসীই থাকিবেন। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বলিয়া ধর্মগত কি জাতিগত কোন শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ নূতন শাসনতন্ত্রে থাকা উচিত নয়। অন্তত হিন্দুসমাজে শুধু মাত্র "হিন্দু" কথাটিই থাকিবে, কোনও জাতির উল্লেখ থাকিবে না। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার-আইনে আমরা হিন্দুরা হিন্দুও ছিলাম না; ছিলাম "অ-মুসলমান" (non-muslims), যেন হিন্দুস্থান মুসলমান-দেরই দেশ, সেখানে আশ্রয় পাইয়াছে কিছু অ-মুসলমান।

"(৩) ভবিষ্যতে লোকগণনা হইলে তাহাতে শুধুমাত্র "হিন্দু" কথাটি থাকিবে, জাতির উল্লেখ থাকিবে না। বিহারে অনেকদিন হইতে আদালতে সাক্ষীর উক্তি লিপিবদ্ধ করিবার সময় তাহার "জাতি" জিজ্ঞাসা করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"(৪) এখন হইতেই প্রত্যেক বাঙালী হিন্দুর নামের প্রান্তস্থিত জাতিজ্ঞাপক

কথাটি বর্জন করিতে পারিলে ভাল হয়। অর্থাৎ নাম পড়িয়া বা শুনিয়া যেন বুঝিতে পারা না যায়, লোকটি কোন্ জাতির অন্তর্গত। বিহারে রাজেন্দ্রপ্রসাদ নামে কায়স্থও আছেন, ব্রাহ্মণও হইতে পারেন। তেমনই বাংলায় যোগেন্দ্রনাথ নমঃশূদ্রও হইতে পারেন, ব্রাহ্মণও হইতে পারেন, যাহাই হউন, আমরা জানিব বলিব শুধুমাত্র যোগেন্দ্রনাথ বলিয়া। ছাত্রেরা এখনই এই প্রথা চালু করুন না। জাতিজ্ঞাপক পদবী ব্যবহার করিতে কোন কোন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের লজ্জা হয়। আমি জানি, আমার পরিচিত দুই-তিনটি বন্ধু জাতিতে নাপিত ছিলেন অর্থাৎ 'শীল' পদবী। তাঁহারা ঐ পদবী ত্যাগ করিয়া দত্ত বা দাস হইয়াছেন। চরিত্রে, শিক্ষায়, উপার্জন-ক্ষমতায়, আকৃতি-প্রকৃতিতে তাঁহারা কোন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না। কিন্তু এমনই আমাদের সংস্কার, যেই পদবী শুনিব নাপিত, ধোপা বা নমঃশূদ্র, অমনই আমাদের নাসিকার চর্ম অজ্ঞাতসারে অবজ্ঞায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে। একটা মানুষ সমাজে কৃতী হইলে তাহার জাতিবাচক পদবীটি ব্যবহার হয় না শুধু সজনীকান্ত শুনিলেই লোকে বুঝিতে পারিবে ইনি 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক আর সাহিত্যিক, তাঁহার নামের অন্তে "দাস" না থাকিলেও চলে রাসবিহারী অ্যাভেনিউ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ উত্তম দৃষ্টান্ত, ঐরূপ শুধু সা আশুতোষ রোড সুরেন্দ্রনাথ স্ট্রীট হওয়া উচিত ছিল। শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে আমি তাঁহার পুস্তকাবলী উপহারস্বরূপ পাইয়াছি, তাহাতে নিজে লিখিয়াছেন To Upendranath with Blessings of Sri Aurobindo। আমার ব নিজের জাতিজ্ঞাপক পদবীটি বর্জন করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্তটি অনুসরণযোগ্য।

"আমাদের বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে, অদ্ভুত অদ্ভুত জাতিজ্ঞাপক পদবী আছে তাহার সকলগুলি যে সুশ্রাব্য বা সম্ভ্রম-আকর্ষণযোগ্য তাহা মনে হয় না যথা অক্রুর, কর কুণ্ড কারফর্মা, খাস্তগীর, গুড়, গুঁই, গড়গড়ি, ঘটক, ঘোষাল রক্ষিত, পালিত, পিপলাই, সিমলাই, সুর, হাতী, ঢোল, লস্কর, নস্কর, নাহা, রাহ নাথ, সোম সিদ্ধান্ত সাধুখাঁ বর্ধন বল্লভ বসাক বড়াল, মৌলিক মল্লিক ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পদবীর যাহারা অধিকারী, তাহারা এগুলা বর্জন করিলে হয়তে আনন্দিত হইবেন।

"আবার নবাবী আমলের কতকগুলি পদবী আমাদের নামের পশ্চাতে অনাবশ্যক আবর্জনার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যথা—রায়চৌধুরী মজুমদা পত্তিদার, হালদার সমাদ্দার খাসনবিস মহলানবিস, নিয়োগী ইত্যাদি।

মজা এই, এখনও বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ পাছে লোকে বৈদ্য কিনা বলিয়া সন্দেহ করেন, সেইজন্য তাঁহারা জাতিজ্ঞাপক পদবীকে রিইন্‌ফোর্সড্‌ করিয়া সেনেরা সেনগুপ্ত, দাসেরা দাসগুপ্ত লিখিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার শর্ম্মাও যোগ করিতেছেন, যেমন সেনশর্ম্মা গুপ্তশর্ম্মা। আবার অনেকে দাস এর দন্ত্য'স'র বদলে তালব্য'শ লিখিয়া নিজেদের অশূদ্রত্ব প্রচার করিতে চাহেন। জাতির অভিমান বা গর্ব এমনই হাস্যাস্পদ ও অশোভন হইয়া উঠিয়াছে।

"মেয়েদের নাম লইয়া কোনও অসুবিধা নাই। তাঁহারা হয় কুমারী, না হয় দেবী। অনেকে জাতিজ্ঞাপক পদবী না লিখিয়া শুধুমাত্র দেবী লেখেন, যদিও রবীন্দ্রনাথ ইহা অশোভন বলিয়া গিয়াছেন। নাম সংক্ষেপ হওয়া তো ভালই। কুমারী ললিতা বা শ্রীমতী কিরণবালা শুনিতে মন্দ কি? ললিতা গুঁই না লিখিয়া শুধু ললিতা লেখাই তো ভাল।

"আমরা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা জাতটা প্রচার করিতে ব্যগ্র আর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা জাত প্রকাশ করিতে লজ্জিত। এ অবস্থায় পদবী বর্জন কল্যাণকর। তরুণ-তরুণীগণ এই কার্য এখনই আরম্ভ করিয়া দেখুন না।

"(৫) পান-ভোজনে অন্তত শহরে ভদ্রসমাজে ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার শিথিল হইয়া আসিতেছে। অর্থনৈতিক কারণে অনেক ভদ্রলোক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ-পাচক রাখিতে পারেন না। একটি ভৃত্য থাকে, যাহাকে বলা হয় 'কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড,' সেই রাঁধিয়াও দেয়, অন্য কার্যও করে। এই কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড নির্বাচনের পরিধি আরও বিস্তৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তথাকথিত "হরিজন" সম্প্রদায় হইতে এই শ্রেণীর লোক যত নিয়োগ করা যায়, ততই মঙ্গল।

"(৬) ভিন্ন জাতির বরকন্যার মধ্যে বিবাহের আইন আছে। অনেক যুবক যুবতী এই আইনের সাহায্যে বিবাহিত হইতেছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারতার সঙ্গে ভিন্ন জাতির মধ্যে আরও বিবাহ হইতে থাকিবে। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে সকলেরই উৎসাহ ও সমর্থন দেখানো উচিত। বরকন্যা-নির্বাচনের ক্ষেত্র পরিধিতে যত বিস্তৃত হয়, ততই মঙ্গল। এই প্রকার বিবাহে পণের দাবিদাওয়া থাকে না। কালক্রমে এইরূপ বিবাহ দ্বারাই পণপ্রথার উচ্ছেদ হইয়া যাইবে, জাতিভেদেরও বন্ধন শিথিল হইবে।

"একদিন একটা মন্দিরের দ্বার হরিজনদের জন্য খুলিয়া দিয়া অথবা সভায় বসিয়া তাহাদের হাতে একটু শরবত বা মিষ্টি খাইলে যে তাহারা কতটা কৃতার্থ হইবে, বলিতে পারি না। আমরা এমন কিছু করিব, যাহাতে হরিজনদের

মনে আত্মসম্ভ্রম জাগ্রত হয়। তাহারা যেন বুঝিতে পারে যে, আমরা সকলেই একই হিন্দু, সমাজে একই অধিকারভোগী। ব্রাহ্মণেরা তাহাদের ক্রিয়াকর্ম্মে পৌরোহিত্য করিবেন না, অথচ তাহারা মুসলমান হইয়া গেলে বিরক্ত হইবেন—এই অন্যায় আর চলিবে না।

"বিষয়টি লইয়া দেশের মধ্যে আলোচনা চলিতে থাকিলে ভাল হয়। আইনের বলে জাতিভেদ কাগজে-কলমে উচ্ছেদ হইলেও সংস্কার থাকিয়া যাইবে। আমরা নিজেরাই যদি জাতিভেদের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে আইন করাও সাফল্যমণ্ডিত হইবে।"

গোপালদা তাঁহার অজ্ঞাতবাস হইতে নীচের রচনা দুইটি পাঠাইয়াছেন—

১। ওগো মা, মুক্তি যদি পাবেই তুমি
বক্ষে মোদের শক্তি জাগাও।
ঘুমের ঘোরে রইলে প'ড়ে
ব্যথা দিয়ে সে ঘুম ভাঙাও॥
আঁধার মাঝে যেজন রহে
হঠাৎ-আলো তার না সহে,
মাগো, নবীন উষার রাঙা রঙে
আশাহীনের মনকে রাঙাও॥
ওগো মা, ধর্ম্মভেদে বর্ণভেদে ভেদ হয় না তোমার মাটির,
সব ভেদাভেদ দূর কর মা, পরশ দিয়ে সোনার কাঠির।
নিশীথ রাতের অন্ধকারে
পরাণ বলি দিলেম কারে?
যদি দিনের আলোয় মা হয়ে মা,
ভীরু ছেলের ভয় না ভাগাও॥

২। যে মাটিতে জন্ম নিলেম আমি
যে মাটিতে হলেম ক্রমে বড়।
সুখে দুখে কাটাই দিনযামি
মন্দ ভাল অনেক করি জড়ো॥
বুঝতে পারি সে মাটি মোর কি যে
মা রয়েছেন কোল পাতিয়া নিজে
পর-অধীনতার বিষম ফাঁসে
দেখ্, চেয়ে দেখ্ সেই মা মরো-মরো॥

আপন-পরের বালাই নিয়ে তোরা
মরতে হ'লে মরিস যেন পিছে
রাতের পরে আলোক আকাশ-জোড়া
ভায়ে ভায়ে লড়লে হবে মিছে।
অনেক দুঃখ দিলেম মোরা মাকে
অন্ধ দলাদলির কঠিন পাকে
চেয়ে মায়ের ম্লান মুখের পানে
এবার সবাই মিলে প্রায়শ্চিত্ত করো॥

বিলম্বের জন্যে কোনও কৈফিয়ৎ নহে, ইহা বিজ্ঞপ্তি মাত্র। আমরা সময়মত কাগজ বাহির করিতে পারিতেছি না। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি বৈশাখ বাহির হইল। আমরা নিজেরাই অত্যন্ত বিচলিত আছি। যাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইয়া পত্রাঘাত করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের নিরুপায়তা বিবেচনা করিয়া ক্ষমা করিবেন। জ্যৈষ্ঠের কাগজ আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে বাহির করিতে চেষ্টা করিব।

দ্রষ্টব্য

এই সংখ্যায় মুদ্রিত "দুইখানি প্রাচীন সাময়িক পত্র" প্রবন্ধে (পৃ. ২৯) ১৭৯১ শকের কার্ত্তিক-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত "সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী" সহ ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপিগুলি যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত, এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। আমাদের অনুমান যে যথার্থ, ১২৯২ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'বালকে' প্রকাশিত প্রতিভাসুন্দরী দেবীর "সহজে গান-শিক্ষা" প্রবন্ধের এই পংক্তিগুলি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :—

> "যে প্রণালীতে আমরা গানের সুর লিখিয়া পাঠকদের শিক্ষার জন্য প্রকাশ করিব তাহা পোনেরো ষোল বৎসর হইল তত্ত্ববোধিনীতে বাহির হইয়াছিল।* * এখানে গীত লিখিবার যেরূপ সংকেত বলিয়া দেওয়া হইবে, তাহা ১৭৯১ শকের কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল,··· (পৃ. ১৩)।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি

১৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪

রমেশচন্দ্র দত্ত

১৮৪৮-১৯০৯

বংশ-পরিচয়; জন্ম

কলিকাতা, রামবাগান-নিবাসী দত্ত-পরিবার বাণীসেবকরূপে সুবিখ্যাত। এই পরিবারের নীলমণি বা নীলু দত্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কলিকাতার এক জন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুচ্ছুদ্দির কাজ করিতেন। শোভাবাজার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ বাহাদুর সর্বদাই তাঁহার ইংরেজী-জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। নীলমণি দত্তের তিন পুত্র—রসময়, হরিশ ও পীতাম্বর। কনিষ্ঠ পীতাম্বরই (জন্ম ১৭৯৯) রমেশচন্দ্রের পিতামহ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্র (জন্ম ১ মার্চ ১৮১৮) রমেশচন্দ্রের পিতা।

১৮৪৮ সনের ১৩ই আগস্ট কৃষ্ণ সিংহের গলির (বর্তমান বেথুন রো-র) অন্তর্গত কালীমন্দিরের পূর্বদিক্-সংলগ্ন গৃহে মাতুলালয়ে রমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন; সরকারী কার্যে তাঁহাকে দেশ-দেশান্তরে গমন করিতে হইত। বালক রমেশচন্দ্র পিতার সহিত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কখন নৌকায়, কখন বা পাল্কীতে ঘুরিয়া বেড়াইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তখন রেল ছিল না। তাঁহার শৈশবের অধিকাংশ সময় বীরভূম, কুমারখালি, ভাগলপুর, বহরমপুর, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে অতিবাহিত হইয়াছিল। বারংবার স্থান-পরিবর্তনে পুত্রগণের পড়াশুনার ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া ঈশানচন্দ্র পরিবারবর্গকে কলিকাতায় রাখাই স্থির করেন। রমেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (পরে হেয়ার স্কুল) ভর্তি হন। ইহার অল্প দিন পরেই তাঁহার মাতা থাকমণি দেবীর মৃত্যু হয় (৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯)। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে তাঁহার পিতাও পরলোকগমন করেন (৮ মে ১৮৬১)। খুল্লতাত শশীচন্দ্র (মৃত্যু ৩০-১২-৮৫) রমেশচন্দ্রের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তিনি ছিলেন সেকালের এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরেজী লেখক—*Reminiscences of a Kerani's Life, The Times of Yore, Vision of Sumeru, Shunkar* প্রভৃতির লেখক। রমেশচন্দ্র খুল্লতাতের নিকট হইতে দুইটি গুণ—চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সাহিত্যিক গৌরবস্পৃহা অর্জন করিয়াছিলেন। অগ্রজ যোগেশচন্দ্র মধ্যম ভ্রাতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"Two very important lessons my brother learned from our uncle—independence of character and thirst for fame."

বিবাহ; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা

রমেশচন্দ্র যখন এনট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময় ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় (১৬ জানুয়ারি ১৮৬৪)। পাত্রী—মাতঙ্গিনী ওরফে মোহিনী বসুজা, সিমুলিয়া-নিবাসী নবগোপাল বসুর মধ্যমা কন্যা। রমেশচন্দ্রের বিবাহিত জীবনের ফল—পাঁচ কন্যা ও এক পুত্র, শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র দত্ত।

১৮৬৪ সনে রমেশচন্দ্র কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬৬ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, তিনি পরীক্ষার ফলের উপর এনট্রান্স পরীক্ষায় সেকেণ্ড গ্রেড জুনিয়র স্কলারশিপ ও এফ. এ. পরীক্ষায় সিনিয়র স্কলারশিপ পাইয়াছিলেন।

বিলাতযাত্রা; সিবিল সার্বিস ও ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা

প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ-বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে রমেশচন্দ্র সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত গমনের সঙ্কল্প করেন। তাঁহার পিতামহ বিলাতযাত্রার বিরোধী ছিলেন; সমুদ্রযাত্রা করিলে তখনকার দিনে সমাজে অশেষ নির্যাতন সহিতে হইত। এই কারণে রমেশচন্দ্র গোপনে পলায়ন করাই সাব্যস্ত করেন। এ কথা জানিতেন কেবল তাঁহার অগ্রজ যোগেশচন্দ্র; তিনি বাটী হইতে গোপনে অর্থসংগ্রহ করিয়া দিয়া ভ্রাতার বিলাত-গমনে সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ সনের ৩রা মার্চ প্রাতে স্বদেশের নিকট বিদায় লইয়া, আত্মীয়-স্বজনগণের অগোচরে রমেশচন্দ্র বিলাতযাত্রা করেন। এই যাত্রায় তাঁহার সঙ্গী ছিলেন দুই বন্ধু—বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরবর্তী ১১ এপ্রিল রমেশচন্দ্র লণ্ডনে উপস্থিত হন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রবেশ করেন। সে-সময়ে সিবিল সার্বিস পরীক্ষার নিয়ম ছিল—পরীক্ষার্থীর বয়স ১৭ বৎসরের ঊর্ধ্ব ও ২১ বৎসরের ন্যূন হওয়া চাই। রমেশচন্দ্রের বয়স তখন ১৯; এই কারণে প্রথম

।র তাঁহাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ১৮৬৯ সনের জুন মাসে বল সার্বিস প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ছিল ৩২৩। র মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ জনকে নির্বাচিত করিবার কথা; উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে শেচন্দ্র তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৫৩ সনে এই প্রতিযোগিতা-ক্ষার সূচনা হইতে রমেশচন্দ্রের পূর্বে, বাঙালীর মধ্যে একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ুরই ১৮৬৩ সনে সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মেধাবী রমেশচন্দ্র ১৮৭১ সনে সিবিল সার্বিসের শেষ ীক্ষায় ৪৮ জন নির্বাচিত ছাত্রের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন,—ইহা ম গৌরবের কথা নহে। এই বৎসর জুন মাসে তিনি ব্যারিস্টারি রীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

রকারী চাকুরী

জীবনের প্রথম ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া রমেশচন্দ্র বন্ধুদ্বয়ের সহিত ১৮৭১ সনে সপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাতা পৌঁছিয়া তনি অচিরাৎ সরকারী কর্মে যোগদান করেন। তাঁহার রাজকার্যের ইতিহাস সরকারী বিবরণের সাহায্যে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি :—

৪-পরগণা, আলিপুর	...	অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর	...	২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৭১
ঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ	...	ঐ	...	৭ নবেম্বর ১৮৭২
নগ্রাম, নদীয়া	...	ঐ	...	১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩
মেহেরপুর, নদীয়া	...	ঐ	...	৮ মে ১৮৭৪
বনগ্রাম, নদীয়া	...	ঐ	...	১০ নবেম্বর ১৮৭৪
নদীয়া	...	ঐ	...	৩১ আগষ্ট ১৮৭৬
দক্ষিণ শাহাবাজপুর, বরিশাল		ঐ	...	২৯ নবেম্বর ১৮৭৬
ত্রিপুরা	...	ঐ	...	১৩ জুলাই ১৮৭৮
বর্ধমান	...	ঐ	...	১২ ডিসেম্বর ১৮৭৮
বাঁকুড়া	...	ঐ	...	১ মার্চ ১৮৮০
,,	...	ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	...	১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮১
,,	...	অ্যা. ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর	...	১৫ ডিসেম্বর ১৮৮১
,,	...	জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডে. কলেক্টর (২য় শ্রেণী)		১ জুন ১৮৮২
বালেশ্বর	...	ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	...	২৭ জুলাই ১৮৮২
,,	...	জ. ম্যাজিস্ট্রেট ও ডে. কলেক্টর	...	২৪ অক্টোবর ১৮৮২
বাখরগঞ্জ	...	ঐ	...	৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩

বাখরগঞ্জ	...	ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	... ২৯ মার্চ ১৮৮৩
"	...	জ. ম্যাজিস্ট্রেট ও ডে. কলেক্টর	... ২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৩
"	...	ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	... ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪
"	...	জ. ম্যাজিস্ট্রেট ও ডে. কলেক্টর (১ম শ্রেণী)	১৩ অক্টোবর ১৮৮৪
		(ছুটি : ১৫ মার্চ ১৮৮৫ হইতে দুই বৎসর)	
পাবনা	...	জ. ম্যাজিস্ট্রেট ও ডে. কলেক্টর	... ১৫ মার্চ ১৮৮৭
"	...	ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	... ১৮ মার্চ ১৮৮৭
ময়মনসিংহ	...	ঐ	... ৪ অক্টোবর ১৮৮৭
"	...	ঐ (৩য় শ্রেণী)	... ৬ মার্চ ১৮৮৮
"	...	ঐ (২য় শ্রেণী)	... ২৯ অক্টোবর ১৮৮৯
বর্ধমান	...	ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	... ১৬ এপ্রিল ১৮৯০
দিনাজপুর	...	ঐ (২য় শ্রেণী)	... ২ ডিসেম্বর ১৮৯০
মেদিনীপুর	...	ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর (অস্থায়ী)	... ২৫ এপ্রিল ১৮৯১
"	...	ঐ (২য় শ্রেণী)	... ১৮ ডিসেম্বর ১৮৯১
		(ছুটি : ১ সেপ্টেম্বর ১৮৯২ হইতে ১ বৎসর, ২ মাস, ১৬ দিন)	
(ছুটিতে)	...	ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর (১ম শ্রেণী)	... ১৮ মার্চ ১৮৯৩
		(ছুটি : ১৭ নবেম্বর ১৮৯৩ হইতে)	
বর্ধমান	...	ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর	... ২৬ নবেম্বর ১৮৯৩
"	...	কমিশনর, বর্ধমান বিভাগ (অস্থায়ী)	... ১৬ এপ্রিল ১৮৯৪
হুগলী	...	ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর	... ১৭ এপ্রিল ১৮৯৫
উড়িষ্যা	...	কমিশনর ও করদ মহলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট (অস্থায়ী)	... ৬ অক্টোবর ১৮৯৫
		(ছুটি : ১৭ জানুয়ারি ১৮৯৭ হইতে। ২৬-১-৯৭ হইতে ১০ মাস)*	

বাঙালীর মধ্যে রমেশচন্দ্রই সর্বপ্রথম কমিশনরের দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সরকার ১৮৯২ সনে তাঁহাকে সি. আই. ই. উপাধি দান ও ইহার তিন বৎসর পরে (জানুয়ারি ১৮৯৫) বেঙ্গল লেজিসলেটিব কাউন্সিলের সদস্য-পদে মনোনীত করিয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্রের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি দশ মাসের ছুটি লইয়া ১৮৯৭ সনের জানুয়ারি মাসে বিলাত যাত্রা করেন। ছুটি ফুরাইলে আর তিনি চাকুরীতে

---

* **History of Services of Gazetted and other Officers serving under Government of Bengal—Corrected up to 1st July 1897, pp. 169-70.**

যোগদান করেন নাই,—ঐ বৎসরের অক্টোবর মাসে বার্ষিক এক হাজার পাউণ্ড পেনশনে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ইচ্ছা করিলে আরও ৯ বৎসর সরকারী চাকুরীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন।

দেশ-সেবা

দুর্লভ উচ্চ রাজপদের মোহ অতিক্রম করিয়া যে-উদ্দেশ্যে রমেশচন্দ্র সুদূর প্রবাস-যাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা প্রধানতঃ বাগ্‌দেবীর সেবা, এবং ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জনের জন্য স্বাধীনভাবে বিলাতে আন্দোলন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর সংগ্রাম করিয়াছিলেন। বিলাতে পৌঁছিয়া তিনি যখন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে ব্যস্ত, সেই সময়ে কন্যা সরলাকে লিখিয়াছিলেন :—

There is little chance of my going back to India this year. I must really make a prolonged attempt in the writing line, and see if I can do something here....Official life has no special charms for me if I can succeed in a more brilliant line, and it will not be for want of steady endeavour if I fail. (30 Apr. 1897.)

লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যাপনা।—রমেশচন্দ্র একবার তাঁহার মনের বাসনা অকপটে অগ্রজকে পত্রে জানাইয়াছিলেন ; উহা এইরূপ :—

The dream of our passing the latter days of our life in England is one which comes to me as often probably as to you. I did not think of an appointment in the India Council, but of a readership in Indian History or in Sanskrit, in Cambridge, Oxford, or London, if my "History of India" makes a name for itself. Anything which will give me a position and some little income over and above my pension, and will enable me to organise an Indian party to represent Indians' rights in England and Parliament. But it is foolish to think of these things now. (Mymensingh, 28 Sep. 1888.)

বিলাতে অবস্থানকালে তাঁহার দীর্ঘকাল-পুষ্ট বাসনা আকস্মিকভাবে কথঞ্চিৎ ফলবতী হইয়াছিল। ১৪ ডিসেম্বর ১৮৯৭ তারিখে সহসা একখানি পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। পত্রে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের কাউন্সিল তাঁহাকে তিন বৎসরের জন্য ভারতেতিহাসের লেক্‌চারার-পদে বরণ করিবার সঙ্কল্প জানাইয়াছেন। রমেশচন্দ্র ধন্যবাদের সহিত তাঁহার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কন্যা বিমলাকে লেখেন :—

You will be glad to learn that the London University College has created a chair in Indian History, and has appointed me to that chair. The appointment carries no pay, and I shall only get the fees which the

students pay for joining my class. But the appointment is a high honour ; it gives me honourable and congenial occupation, and it also gives me a sort of status and position in this country (London, 16 Dec. 1897.)

রাষ্ট্রীয় আন্দোলন।—নিজের সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া, রমেশচন্দ্র কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি অগ্রজকে লিখিতেছেন :—

I am struggling to get some literary fame by my translation of the 'Mahabharata,' though the modern style of English poetry is Greek to me. I am struggling to make myself felt as an authority on Indian subjects, though as yet the journals and newspapers will scarcely condescend to publish what I write ; and I am struggling to make my lectures at the University College a success,...I am writing all this not from mock modesty, but as I feel. It is a frightfully uphill work to establish your name, and get a footing in the crowded and unsympathetic world of London, especially if your speciality is Indian subjects which tire Englishmen to death. However, I will see to the end of this struggle, and will even learn public-speaking at this fag-end of my life—for that is the only way to influence masses of Englishmen on politics. It is worth while making an arduous and manly struggle, if only to find out if distinction and fame are or are not possible. (13 Jan. 1898.)

রমেশচন্দ্র একখানি পত্রে আজীবন-সুহৃৎ বিহারীলাল গুপ্তকে লিখিয়াছিলেন :—

In the first place, my criticisms after I have retired from the service do not in the least degree injure the prospects of other Bengalis in the service ; on the contrary, I believe they improve their chances. A little provocation does more good than eternal attempts at conciliation.......

Secondly, I know the India Office. Considerations of race are paramount there ; they want to shut us out, not because we are critics, but because we are natives, and their policy is rule by Englishmen They have matured this policy in twenty years—they have a vast mass of secret minutes in their archives on the subject. Licking the dust off their feet will not move them from this policy ; unsparing criticism and persistent fighting can, and will do it. Englishmen understand fighting, and they will yield to persistent fighting—not to begging.

Thirdly, it is admitted perhaps that my Land Revenue agitation has done some good. It has forced Government to correct past mistakes, to revise assessments in Bombay, Madras, and the Central Provinces, and to frame rules of remissions and suspensions when crops fail. And our personal interests sink into insignificance compared with these results.

রমেশচন্দ্র স্বদেশের ইতিহাস ও স্বদেশের সাহিত্যকে পাশ্চাত্য দেশে পরিচিত করিবার জন্য বিলাতে যে-সকল ইংরেজী গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধের অন্যত্র তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতবাসীর হিতার্থে তিনি যে-সকল আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার *Speeches and Papers* (2 vols.) ও জে. এন. গুপ্ত-লিখিত তাঁহার

ইংরেজী জীবনীতে মিলিবে। আমরা এই প্রবন্ধে রমেশচন্দ্রের যে-সকল পত্র বা পত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এই শেষোক্ত গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

কংগ্রেসে নেতৃত্ব।—বিলাতে অবস্থানকালে, ১৮৯৯ সনের শেষ ভাগে রমেশচন্দ্র ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতির ১৫শ বার্ষিক অধিবেশনে নেতৃত্ব করিবার জন্য আহূত হন। লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়—২৭ ডিসেম্বর ১৮৯৯ তারিখে। অধিবেশনের প্রথম দিনে সভাপতি-রূপে রমেশচন্দ্র যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার কয়েক পংক্তি এইরূপ :—

...it must be admitted, and it is no disrespect to the Indian Civil Service to say it, that that service represents only the official view of Indian questions, and does not and cannot represent the people's views. There are two sides to every question, and it is absolutely necessary for the purpose of good government and of just administration that not only the official view, but the people's view on every question should be represented and heard....National Congress is the only body in India which seeks to represent the views and aspirations of the people of India as a whole in all large and important, and if I may use the word, Imperial questions of administration. Therefore, this National Congress is doing a service to the Governmant the value of which cannot be over-estimated... It is a gain to the administration to know what we feel, and what we think, and what we desire,—though our demands cannot always be conceded.

স্বদেশে সম্বর্ধনা।—কংগ্রেস অধিবেশনের কার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিয়া কলিকাতা ফিরিলে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব রাজবাটীতে ৬ জানুয়ারি ১৯০০ তারিখে একটি সভার আয়োজন করেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সভার বিবরণ উদ্ধৃত হইল :—

সম্মান সভা।...শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত এই বৎসরের জন্য আমাদের নেতা, কারণ তিনি কন্‌গ্রেসের সভাপতি। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত। সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আর কোন্ বাঙ্গালী বিভাগীয় কমিশনর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন? শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র আমাদের অগ্রণী, কারণ তিনি বিলাতে থাকিয়া ভারতবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা, অভাব-অভিযোগের কথা রাজার জাতি ইংরেজের কর্ণগোচর করিবার পক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সেই রমেশচন্দ্র বাঙ্গালীর আদরের; তাঁহার সম্মান করা কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যানুরোধে রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর নিজ গৃহে গত শনিবার অপরাহ্নে একটি আপ্যায়ন সমিতি আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাগৃহে নগরের বহু কৃতবিদ্য পণ্ডিত ও পদস্থ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বোর্ডের মেম্বর মাননীয় ওল্ডহ্যাম সাহেব, মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, রায় বদরীদাস মকিম বাহাদুর, মাস্তবর রায় বিপিনকৃষ্ণ বসু বাহাদুর, মাস্তবর সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। রমেশবাবু সভাস্থ হইলে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁহার

গলায় স্বর্ণ রৌপ্য খচিত মালা পরাইয়া দিলেন। ক্লাসিক থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নৃত্যগীতের আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রথমে...সুরতানলয় সংযোগে গীত হয়, পরে বাঙ্গালার নটকুল-চূড়ামণি নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই

১

সবিনয় মহোদয় করি নিবেদন,
চিরদিন আছে রীতি, নটে গায় স্তুতি-গীতি,
পূর্ব্বনীতি অনুসারে করিব বন্দন,—
নিজগুণে করিবেন ত্রুটির মার্জ্জন।

২

যেই বংশে বরদাত্রী দেবী সরস্বতী,
নির্ম্মল উজ্জ্বল যার, চালিছেন বিভাভার,
সেই বংশে বংশধর তুমি মহামতি,
উন্নত হৃদয়-বলে সাধিলে উন্নতি।

৩

মাতৃভূমি বৎসল হে আদর্শ মানব,
মাজ্জিত চরিত্র-বলে, স্থাপিয়াছ জন-স্থলে,
বিদেশী হৃদয় মাঝে স্বদেশ গৌরব,
তব প্রতিভায় বৃদ্ধি তাহার বৈভব।

৪

রাজেশ্বরী উচ্চ-পদে করিল স্থাপন,
তার সনে দয়া মিশি, শান্তিপূর্ণ হ'ল দিশি,
ভারত-বান্ধব তুমি প্রজার জীবন,—
দীন নট-উপহার করহ গ্রহণ!

পদ্যটি পাঠ করিয়া রমেশবাবুকে বরণ করেন। তৎপরে দেড় ঘণ্টাকাল অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ নানা প্রকারের নাচগানে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।...নৃত্যগীত শেষ হইলে পান-ভোজন, কথাবার্ত্তা আমোদ-আহ্লাদ হইয়াছিল। বাঙ্গালী যে বাঙ্গালীকে আদর করিতে শিখিয়াছে, ইহাতে আমরা পরম সুখী হইয়াছি।

পরবর্ত্তী ২৩এ ফেব্রুয়ারি টাউন-হলে এক বিরাট্ সভায় ডবলিউ. সি. বোনার্জি কলিকাতাবাসিগণের পক্ষ হইতে রমেশচন্দ্রকে মানপত্র দান করিয়াছিলেন।

পুলিস-কমিশন।—১৯০২ সনের নবেম্বর মাসে পুলিস-ব্যবস্থার সংস্কারকল্পে সার্ অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারের নেতৃত্বে যে পুলিস-কমিশন গঠিত হয়, রমেশচন্দ্র তাহাতে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি ২৪এ নবেম্বর একটি লিখিত মন্তব্যও দাখিল করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রকাশ:—

I have seen it stated that the police in India are of the people, and that the police is dishonest because the people are so. Those who make such sweeping charges do not know, or do not consider, that by the inadequate scale of pay we have fixed for the police service, we draw to that service, by a natural selection, a class of men not fit for their high responsibilities, and that we train them in dishonesty by giving them ample powers, and an undue degree of protection when they are detected in wrong-doing. (*The Bengalee*, 25 Dec. 1902.)

বরোদার রাজস্ব-সচিব

১৯০৪ সনে রমেশচন্দ্র স্বজাতিবৎসল গায়কোয়াড়ের অনুরোধে, তিন হাজার টাকা বেতনে, বরোদা-রাজ্যের রাজস্ব-সচিবের পদ গ্রহণ করেন। অনেকে আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, রমেশচন্দ্রকে পাইয়া বরোদা-রাজ্য যেমন লাভবান্

হইল, সেইরূপ তাঁহার স্থায় দেশবন্ধুর অভাবে সমগ্র ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হইল। রমেশচন্দ্র ২৩এ আগস্ট নূতন পদে যোগদান করেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় বরোদা-রাজ্যে অচিরাৎ নানাবিধ উন্নতির পথ প্রসারিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত রমেশচন্দ্রের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

I am trying to strike out new lines of progress, to develop new policies and reforms, and am determined to move forward and to carry the State forward. I am trying to gather together the scattered forces which were present here, to encourage enterprise and talent in younger men, to welcome new ideas and new schemes, to initiate progress in all lines, and to make Baroda a richer and a happier State. I go among the people, print and publish my schemes, face the Maharaja with my proposals, and manage to have my way in a manner which old officers of this State pronounce quite "unconventional"! I am trying to relieve the agriculturists of excessive taxation on their land, I am endeavouring to get together capitalists to start new mills and industries, and if I can build up the Legislative Council I will make the work of the State proceed in the interest of the people, and in touch with the people. Everything shall be open and above-board,—nothing done in dark tortuous, secret, autocratic ways. Dreams! Dreams! some will exclaim. Well, let them be so,—it is better to dream of work and progress than to wake to inaction and stagnation. This last shall never be my vocation, it is not in my nature."

ভারতীয় শিল্প-সম্মিলনে নেতৃত্ব

কংগ্রেস কয়েক বৎসর যাবৎ বার্ষিক অধিবেশনের সহিত একটি শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া আসিতেছিলেন সত্য, কিন্তু নবোদ্গত শিল্প-প্রচেষ্টাকে উৎসাহ-বারি-সিঞ্চনে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল না। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সনের ডিসেম্বর মাসে কাশীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ২১শ বার্ষিক অধিবেশনের সহিত একটি শিল্প-সম্মিলনের ব্যবস্থা হয়। রমেশচন্দ্র এই সম্মিলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি বরোদা-রাজ্যের সকল বিভাগে—বিশেষ করিয়া শিল্প-বিভাগে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; তাঁহার স্থায় গুণী ব্যক্তিকে প্রথম শিল্প-সম্মিলনের সভাপতি পদে বরণ করা সমুচিত হইয়াছিল। ৩১এ ডিসেম্বর প্রদত্ত তাঁহার অভিভাষণের একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—

...today there is a desire, which is spreading all over India, that by every legitimate means, by every lawful endeavour, we will foster and stimulate the use of our own manufactures among the vast millions who fill this great Continent. Gentlemen, I am drifting into a subject which has raised much angry discussion, when I speak of the Swadeshi Movement. ...the

Swadeshi Movement is one which all nations on earth are seeking to adopt in the present day. Mr. Chamberlain is seeking to adopt it by a system of Protection. Mr. Balfour seeks to adopt it by a scheme of Retaliation. France, Germany, the United States, and all the British Colonies adopt it by building up a wall of prohibitive duties. We have no control over our fiscal legislation, and we adopt the Swadeshi Scheme therefore by a laudable resolution to use our home manufactures, as far as practicable, in preference to foreign manufactures. I see nothing that is sinful, nothing that is hurtful in this ; I see much that is praiseworthy and much that is beneficial. It will certainly foster and encourage our industries in which the Indian Government has always professed the greatest interest. It will relieve millions of weavers and other artisans from a state of semi-starvation in which they have lived, will bring them back to their hand-loom and other industries, and will minimise the terrible effects of famines....It will give a new impetus to our manufactures which need such impetus ; and it will see us, in the near future, largely dependent on articles of daily use prepared at home, rather than on articles imported from abroad.

রমেশচন্দ্র ১৯০৭ সনের ২৮এ মার্চ তারিখে সুরাটে অনুষ্ঠিত শিল্প-সম্মিলনেরও সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

ডি-সেন্‌ট্রালাইজেশন কমিশন

তিন বৎসর রাজস্ব-সচিবের গুরুভার বহন করিবার পর রমেশচন্দ্রের মনের গতি কোন্ খাতে প্রবাহিত হইতেছিল, ১৭ এপ্রিল ১৯০৭ তারিখে কন্যাপ্রতিম মেহ্‌টা-পত্নীকে ('সুধাহাসিনী' নামে 'সংসারে'র গুজরাটী অনুবাদকর্ত্রী) লিখিত একখানি পত্রে তাহার আভাস আছে। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

Tell me your honest opinion, Sharada, do you not think I would do well to devote the remaining years of my life in writing such books as the 'Lake of Palms'—ay, in compiling a complete history of the Indian people from the earliest times to the twentieth century—than to work and vegetate in Baroda ? I am tne Amatya here, I am acting Dewan here, people look upon me with feelings of awe and respect—but I feel I am proving false to my higher pursuits, false to my destiny ! I have done something in Baroda in these three years ; let me plunge back to those pursuits which are dearest to my heart. As you are longing to come back from Naosari to the larger world of Baroda—I am longing also to return from Baroda to the larger world of literature and political work.

রমেশচন্দ্র ১৯০৭ সনের জুলাই মাস পর্য্যন্ত বরোদায় কার্য করিয়া ছুটি লইয়াছিলেন। ছুটিতে অবস্থানকালে তিনি ১৯০৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ডি-সেন্‌ট্রালাইজেশন কমিশনের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিয়া ভারত-সচিব লর্ড মর্লে সুবিবেচনার কার্য করিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনুসন্ধান-কার্য শেষ হইলে রমেশচন্দ্রকে ১৯০৮ সনের এপ্রিল মাসে কমিশনের সহিত বিলাত গমন করিতে হইয়াছিল।

তাঁহার দৃঢ় আপত্তি সত্ত্বেও কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের মতে কোন কোন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে স্বীয় এলাকাভুক্ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতি করিলে—স্থানীয় বিষয়ের পরিচালনা-কার্যে দেশবাসীকে সরকারী কর্মচারীর প্রভাবাধীন রাখিলে স্বায়ত্তশাসনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়—এই সত্য রমেশচন্দ্র কমিশনের সদস্যগণকে বহু চেষ্টাতেও হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারেন নাই। রমেশচন্দ্র বরোদার কার্যে ছুটি লইয়া কমিশনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই কারণে ১৯০৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কমিশনের কার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত গবর্ণেণ্ট তাঁহাকে বরোদার বেতন মাসিক তিন হাজার টাকা হারে পারিশ্রমিক দিয়াছিলেন।

শাসন-সংস্কার বিষয়ে মর্লের সহিত পত্রাবলী

রয়াল কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইবার পর রমেশচন্দ্র শাসন-সংস্কার বিষয়ে ভারত-সচিব মর্লেকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমরা দুইখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

Bombay 14 Novr. 1907.

I thank you sincerely for the kind advice you have given me in your letter of the 25th October, and I will bear it in mind. I have often been misjudged, as people who advocate reforms always will be ; but the reforms I have urged have always been moderate and practicable, and, to quote your words, I never have asked "for the moon." In all my official career of twenty-six years I worked in harmony with my colleagues and superiors, and I have pursued the some conciliatory policy during the last ten years, *i e.* since my retirement from service. Nevertheless, people who are opposed to all reforms have branded me as an "impatient idealist," while ardent reformer have branded me as lukewarm and half-hearted. *A reformer who is moderate is between two fires. He has no friends, as I have learnt to my cost.*

The situation in India still remains critical, and every coercive measure is adding to the influence of the extremists. Ten years ago the deportation of the Natu brothers, the secret search for a conspiracy against the British rule which did not exist, and the savage sentences passed by Courts in many cases under panic, first gave birth to the extremist party in the Mahratta country from Poona to Nagpur. Later on the unwise partition of Bengal, and the equally unwise measures which were adopted to distinguish between class and class, creed and creed, gave rise to lamentable disturbances, and strengthened the extremist party in Bengal. Recent events, which I need hardly mention, are strengthening the same party in the Punjab. The large majority of the educated people are still moderate, and are striving to stem the new spirit ; but their hands are weakened, as they can as yet show no real advance towards self-government, which is the aim of all moderate reformers......my younger countrymen listen to us with doubt and distrust ; they ask us what has been gained by our "constitutional agitation" during these ten or fifteen years.

You have very kindly suggested that I and my friends should define clearly

মৃত্যু

ছয় মাস দেওয়ানের কার্য করিবার পর ১৯০৯ সনের ৩০এ নবেম্বর রমেশচন্দ্র বরোদায় পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র ভারত শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তৎসম্পাদিত 'বসুমতী'তে লেখেন :—

স্বদেশনিষ্ঠ, স্বদেশবাসীর প্রিয় রমেশচন্দ্র,—বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী রমেশচন্দ্র, কংগ্রেস-যজ্ঞের অন্যতম অধ্বর্য্যু, বাগ্মী রমেশচন্দ্র,—দীন বঙ্গসাহিত্যের ভক্ত উপাসক, ঔপন্যাসিক, ঋগ্বেদের অনুবাদক রমেশচন্দ্র,—ইংরাজী সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, নানা ইংরাজী গ্রন্থের প্রণেতা রমেশচন্দ্র, রাজস্ব ও শাসনব্যবস্থার পারদর্শী, পুরাতাত্ত্বিক, বর্দ্ধন-বিজয়ী রমেশচন্দ্র,—রাজা ও প্রজার বন্ধু, বিজ্ঞ ব্যবস্থাপক রমেশচন্দ্র, গায়কবাড়ের অমাত্য, বরোদার দেওয়ান রমেশচন্দ্র,—ভারতের সকল শুভানুষ্ঠানের হিতকামী কর্ম্মবীর! ভারতের কল্যাণ-কামনায় চিরজীবন যাপন করিয়া, তুমি কর্ম্ম-মন্দিরেই চির-বিশ্রাম করিলে! সাহিত্য ও শিক্ষা, রাজনীতি ও শাসন-ব্যবস্থা, চিন্তার সাম্রাজ্যের কোন্ বিভাগে তোমার কৃতিত্বের পরিচয় মুদ্রিত নাই? তোমার অভাবে বঙ্গদেশ দরিদ্র হইয়াছে। ভারতবর্ষ চিন্তাশীল মনীষী হারাইয়া অশ্রুজলে তোমার স্মৃতির পূজা করিতেছে। ভারতের, বাঙ্গালার, এ শোক কি ভুলিবার? তোমার অভাব কি সুদূর ভবিষ্যতেও দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ পূর্ণ করিতে পারিবে?

সাহিত্য-সেবা

মধুসূদন দত্তের ন্যায় রমেশচন্দ্রের প্রাথমিক রচনাগুলিও ইংরেজীতে লিখিত। তিনি সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া রেঃ লালবিহারী দে-সম্পাদিত *Bengal Magazine* ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত *Mookerjee's Magazine*-এ "Arcydae" [R. C. D.] এই ছদ্ম নামে ইংরেজীতে কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিতে শুরু করেন। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম তাঁহাকে মাতৃভাষার সেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে রমেশচন্দ্রের নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

বঙ্কিমবাবু তখন 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ভবানীপুরে একটি ছাপাখানা হইতে ঐ কাগজখানি প্রথমে বাহির হয়, তথায় বঙ্কিমবাবু সর্ব্বদা যাইতেন। সেই ছাপাখানার নিকটে আমার বাসা ছিল, বলা বাহুল্য বঙ্কিমবাবু আসিলেই আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। এক দিন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল; আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা, তবে তুমি বাঙ্গালা লেখ না কেন?" আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম,—"আমি যে বাঙ্গালা লেখা কিছুই জানি না! ইংরাজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখি নাই, কখনও বাঙ্গালা রচনাপদ্ধতি

জানি না!" গম্ভীর স্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন, "রচনাপদ্ধতি আবার কি,—তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে, তাহাই রচনা-পদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে!" এই মহৎ কথা বরাবরই আমার মনে জাগরিত রহিল,...। ('নব্যভারত', বৈশাখ ১৩০০)

" You will never live by your writings in English," said he on this or on another occasion, "look at others. Your uncles Govind Chandra and Shashi Chandra, Madhu Sudan Datta were the best educated men of the Hindu College in their day. Govind Chandra and Shashi Chandra's English poems will never live, Madhu Sudan's Bengali poetry will live as long as the Bengali language will live." These words created a deep impression in me, and two years after this conversation, my first Bengali work, *Banga Bijeta*, was out in 1874."—*The Literature of Bengal* (1895), p. 226*n*.

ঋষি বঙ্কিমের বাণী সার্থক হইয়াছিল। মাতৃভাষায় রচনা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র একখানি পত্রে অগ্রজকে লিখিয়াছিলেন :—

...I have written a few English books which have, for the time, pleased my countrymen for whom they were written. I have composed two Bengali novels which will probably live after my death.......My own mother tongue must be my line, and before I die I hope to leave what will enrich the language and will continue to please my countrymen after I am dead. (Dist. Backerganj, 13 Aug. 1877.)

রমেশচন্দ্রের রচিত বাংলা গ্রন্থগুলির একটি তালিকা দিতেছি। তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। **বঙ্গবিজেতা** (উপন্যাস)। বনগ্রাম ১২৮১ সাল (১৬ ডিসেম্বর ১৮৭৪)। পৃ. ৩১৮।

১২৮১ সালের বৈশাখ-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রথম প্রকাশিত।

২। **মাধবীকঙ্কণ** (উপন্যাস)। কৃষ্ণনগর ১২৮৪ সাল (৪ জুলাই ১৮৭৭)। পৃ. ২০৭+টীকা।৴০।

৩। **জীবন-প্রভাত** (উপন্যাস)। দক্ষিণ শাহবাজপুর ১২৮৫ সাল (৮ নবেম্বর ১৮৭৮)। পৃ. ৩০০।

১২৮৫ সালের ১ম-১০ম সংখ্যা 'বান্ধবে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

৪। **জীবন-সন্ধ্যা** (উপন্যাস)। ত্রিপুরা ১২৮৬ সাল (৫ জুলাই ১৮৭৯)। পৃ. ২১৩।

৫। **শতবর্ষ** (বঙ্গবিজেতা, জীবন-সন্ধ্যা, মাধবীকঙ্কণ ও জীবন-প্রভাত একত্রে)। (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯)। পৃ. ১০৪৬

৬। **ঋগ্বেদ সংহিতা :** ইং ১৮৮৫-৮৭।
মূল সংস্কৃত (প্রথমোঽষ্টকঃ)। আশ্বিন ১২৯২ (ইং ১৮৮৫)। পৃ. ৭৬৪।
বঙ্গানুবাদ (১ম-৮ম অষ্টক)। ইং ১৮৮৫-৮৭।

৭। **হিন্দুশাস্ত্র,** ১-৯ ভাগ। (শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা সঙ্কলিত ও অনূদিত)।
১৩০০-১৩০৩ সাল (ইং ১৮৯৩-৯৭)।

৮। **সংসার** (উপন্যাস)। (৫ মে ১৮৮৬)। পৃ. ১৫৬।
২য় বর্ষের 'প্রচারে' (১২৯২) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

৯। **সমাজ** (উপন্যাস)। ১৩০১ সাল (২৭ জুলাই ১৮৯৪)। পৃ. ২০২।
১৩০০ (ফাল্গুন-চৈত্র) ও ১৩০১ (বৈশাখ-আষাঢ়) সালের 'সাহিত্যে'
১০ম অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রকাশিত।

১০। **সংসার-কথা** (উপন্যাস)। ? (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০)। পৃ. ৩৬১।
'সংসার'-এর পরিবর্তিত সংস্করণ। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

রমেশচন্দ্রের ছয়খানি উপন্যাসের মধ্যে চারিখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাসের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। প্রিয় গ্রন্থকারগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন :—

Sir Walter Scott was my favourite author forty years ago. I spent days and nights over his novels ; I almost lived in those historic scenes and in those mediaeval times which the great enchanter had conjured up...I do not know if Sir Walter Scott gave me a taste for history, or i fmy taste for history made me an admirer of Scott ; but no subject, not even poetry, had such a hold upon me as history. ("My favourite Authors" : *Wednesday Review*, Trichinopoly, 23 Aug, 1905.)

এই কারণে তাঁহার উপন্যাসগুলিতে অঙ্কিত অনেক চিত্র ও চরিত্র *Ivanhoe*-র অমর লেখকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

রমেশচন্দ্রের বাকী দুইখানি উপন্যাস—'সংসার' ও তাহার উপসংহার 'সমাজ' সামাজিক উপন্যাস। তাঁহার একখানি পত্রে (১৪-২-১৮৯৪) প্রকাশ :—

On principle inter-caste marriage is a duty with us, because it unites the divided and enfeebled nation, and we should establish this principle (as well as widow marriage, *&c.*) safely and securely in our little society, so that the greater Hindu society, of which we are only a portion and the advanced guard, may take heart and follow. I cannot tell you how deeply I have felt this for years past ; of my last two novels, "Sansar" goes in for widow marriage, and "Samaj,"...goes in for inter-caste marriage.

(ইহার পর ১৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কিছুক্ষণ বিড়বিড় ক'রে ভগবানের নাম উচ্চারণ ক'রে আবার বললেন, লেখাপড়া শেখা ও শেখানো—দুই কঠিন কাজ, সকলের ভাগ্যে হয় না। পড়ার জন্যে ছাত্রকে কখনও মারধোর ক'রো না বেটা, এইটুকুই আমার অনুরোধ তোমাদের কাছে।

আমি বললুম, মালিক, এই মারধোরের জন্যেই আমার লেখাপড়া অগ্রসর হতে পারে নি। আপনি অনুরোধ করলেও ছাত্রকে মারা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।

কিছুক্ষণ আলাপচারীর পর হকিম সাহেব বিদায় নিলেন। তিনি চ'লে যাবার একটু পরেই নবাব সাহেব বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই খুবই ক্ষুধার্ত হয়েছ? যদিও আমি রাত্রি নটার আগে খাই না, তবুও আজ তোমাদের খাতিরে এখুনি খাবার দিতে বলি, কি বল?

পরিতোষ বললে, মালিকের যথা অভিরুচি।

নবাব সাহেব অতি মৃদুস্বরে ডাক দিলেন, এই!

চাকর বোধ হয় উৎকর্ণ হয়ে দরজার ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল। আওয়াজ হওয়া মাত্র সে ঘরের মধ্যে এসে বললে, হুজুর!

নবাব সাহেব তার দিকে না চেয়েই বললেন, দস্তরখান বিছাও।

লোকটি 'যো হুকুম' ব'লে বেরিয়ে গেল। তখনই দু-তিনজন লোক এসে সেই কার্পেটের এক ধারে একটা শতরঞ্চি ও তার ওপরে ধপধপে সাদা চাদর পেতে দিলে। ইতিমধ্যে আর এক ব্যক্তি এক রাশ রঙিন চিনেমাটির ছোট বড় প্লেট ও বাটি এনে চাদরের এক কোণে রেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। নবাব সাহেব বললেন, খাবার সময় তোমাদের বাচ্চা অর্থাৎ ছাত্রকে ডেকে পাঠাই, একসঙ্গে খাওয়া যাক, কি বল? তোমাদের আপত্তি নেই তো?

বললুম, না না, আপত্তি কিসের! ডাকুন তাকে, এখুনি আলাপ-পরিচয় হয়ে যাক।

নবাব সাহেব আবার মৃদুস্বরে ডাক দিলেন, এই!

হুজুর!—ব'লে তখুনি এক ব্যক্তি হাজির।

নবাব সাহেব অন্য দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, পেয়ারে সাহেবকে খবর দাও, তার যদি অসুবিধা না হয়, তা হ'লে এখন আমার সঙ্গেই খানা নোশ ফরমাবে।

চাকর 'যো হুকুম' ব'লে বেরিয়ে গেল। নবাব সাহেব আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন, কতদিন হ'ল বাড়ি থেকে বেরিয়েছ? এতদিন কোথায় কাটিয়েছ? কোন্ ইষ্টিশান থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছ? আহা, বড় তক্‌লিফ হয়েছে তোমাদের! ইত্যাদি।

এতক্ষণে আমরা কিছু প্রকৃতিস্থ হয়েছিলুম। নবাব সাহেবকে প্রথমে দেখেই মনের মধ্যে সত্যভাষণের যে আবেগ এসেছিল, তা অনেকটা মন্দা পড়েছিল, তবুও ওরই মধ্যে যতদূর সম্ভব ভদ্রতা ও ইজ্জৎ বাঁচিয়ে তাঁর কথার জবাব দিতে লাগলুম। ওদিকে এক-একজন লোক চিনেমাটির বাসনে ঢাকা সব খাদ্যদ্রব্য এনে সামনে রেখে চ'লে যেতে লাগল। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে খবর দিলে, সাহেবজাদা গোসল ফরমাচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে নবাব সাহেব ব'লে উঠলেন, মালে আল্লা, খোদা তার তন্ দুরস্ত্ রাখুন।

আবার প্রশ্ন শুরু হ'ল। রাত্রে একদিন নেকড়ে আক্রমণ করেছিল শুনে নবাব সাহেব একেবারে চমকে উঠলেন। তারপর সব বৃত্তান্ত শুনে বললেন, ওগুলো নেকড়ে নয়, ওগুলো হচ্ছে হুঁড়ার, মানুষ দেখলে ভাগে, ছোট ছোট অসহায় জানোয়ার ধ'রে খায়।

নেকড়ে-পালের কবল থেকে বেঁচে আসার দম্ভে আঘাত লাগায় কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণই হলুম।

ইতিমধ্যে আর এক ব্যক্তি এসে আদালতের নকিবের মতন গড়গড় ক'রে ব'লে গেল, হুকুম শোনা মাত্র সরকারের আদেশ তামিল করতে না পারার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্ম সাহেবজাদা ক্ষমা প্রার্থনা করছেন, তিনি অনতিবিলম্বেই আপনার সম্মুখে এসে উপস্থিত হবেন।

যা হোক, আরও কিছুক্ষণ এই রকম গৌরচন্দ্রিকার পর ঘরের মধ্যে একজন এসে উপস্থিত হলেন। যিনি এলেন, মানুষের চেহারার মাপকাঠির হিসাবে তাঁকে সুউচ্চ বলা চলতে পারে। অর্থাৎ নীচে ব'সে তাঁর মুখ দেখতে আমাদের মাথার পেছন দিকটা প্রায় পিঠে ঠেকবার উপক্রম হ'ল। উচ্চতার অনুপাতে প্রস্থের দিকও বেশ মানানসই। চাপদাড়ি গোড়া ছুঁচলো ক'রে বেশ পরিপাটিরূপে ছাঁটা, গোঁফও ছোট ক'রে ছাঁটা। গায়ের রঙ লালচে গৌর, চমৎকার টানা টানা চোখ, দেখলেই মনে হয় যেন হাসছে, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি ব'লেই মনে হ'ল।

এই ব্যক্তি হলেন আমাদের ছাত্র এবং এঁকেই প্রহার না দেবার জন্ত নবাব সাহেব এতক্ষণ ধ'রে আমাদের মিনতি জানাচ্ছিলেন।

শিক্ষকের মূর্তি দেখে ছাত্রের পিলে-চমকানো ব্যাপারটাই ন্তায়শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু আমাদের কর্মফলজনিত অদৃষ্টলিপির বিধানে বরাবর উল্টো ব্যবস্থাই দেখে আসছি। ছাত্রের মূর্তি দেখে তো পেটের মধ্যে কি রকম অস্বাভাবিক গুরগুরুনি শুরু হ'ল, অবিশ্যি সেটা ক্ষিদের চোটেও হতে পারে, ঠিক বলতে পারছি না। ক্ষিধের চোটে বাঘের ঘাস খাওয়ার কথাটা কাল্পনিক হ'লেও স্রেফ ক্ষিধের জালায় আমরা সেই পালোয়ান যুবককে সেদিন ছাত্র ব'লে মেনে নিয়েছিলুম।

বৃদ্ধ আমাদের সঙ্গে ছাত্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কি একটা দেড়গজী নাম বললেন, তা তখুনি ভুলে গেলুম, তবে বাড়িসুদ্ধ সকলে তাকে 'পিয়ারা সাহেব' ব'লে সম্বোধন করে।

কথাবার্তা শুরু হ'ল। পিয়ারা সাহেব বললে, আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, আপনাদের মতন সজ্জন ও পণ্ডিতের শিষ্য হবার সৌভাগ্য মিলল।

বাঙালী জাতি ও তাদের নানা গুণের এত প্রশংসা সে করতে আরম্ভ করলে যে, তার পনেরো আনা বুঝতে না পেরেও আমাদের লজ্জা করতে লাগল। মোট কথা, দেখলুম যে, বিনয়, সৌজন্য ও আপ্যায়নে পিয়ারা সাহেব তার ঠাকুরদাদার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ছাত্রের চেহারা দেখে ভড়কে গিয়েছিলুম বটে, কিন্তু তার চালচলন ও কথাবার্তা শুনে তাকে ভালই লাগতে লাগল। এ-ও বুঝতে দেরি হ'ল না যে, তার সেই বৃহৎ চেহারার মধ্যে একটি শিশু লুকিয়ে আছে।

তারপরে আহারের পালা। আহা আহা! কেমন ক'রে কোন্ ভাষায় সেই 'ব্রহ্মানন্দ সহোদরা'র বর্ণনা করব! কি রূপ তার আর কি তার গন্ধ ও আস্বাদন! ভোজনবিলাসী সেই বুভুক্ষু বাঙালী বালকের মুখগহ্বরে সে খাদ্য সেদিন যে রসোল্লাস সৃষ্টি করেছিল, সে কথা স্মরণ হ'লে আজও রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়। সেই রাত্রেই মনে হয়েছিল যে, মুসলমানেরা রন্ধনকার্যে পটীয়ান; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাস বেড়েই চলেছে এবং বাংলা দেশে দেখ্ দেখ্ ক'রে মুসলমানের সংখ্যা এত বেড়ে গেল কি ক'রে তারও একটা হদিস লাগছে।

যা হোক আহারপর্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পিয়ারা সাহেব আমাদের

কাছ থেকে বিদায় নিলেন। চাকরেরা উদ্বৃত্ত খাদ্য, বাসনপত্র ও চাদর শতরঞ্চি সরিয়ে ফেলে সেইখানেই আমাদের বিছানা পেতে দিলে। চমৎকার বিছানা, পাতলা বালাপোশের মতন লেপ। বিছানা পেতে চাকর আমাদের জিজ্ঞাসা করলে, একখানা ক'রে লেপেই হবে, না আর লাগবে?

একখানা ক'রে লেপেই আমাদের হবে শুনে তারা নবাব সাহেবের খাটের কাছে যেতেই তিনি হুকুম করলেন, আমার বিছানা জমিতেই ক'রে দাও।

চাকরেরা পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি ক'রে বিনাবাক্যব্যয়ে খাট থেকে বিছানা তুলে কার্পেটের ওপর পেতে দিয়ে চ'লে গেল।

নবাব সাহেব তাঁর বিছানায় গিয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে বললেন, এবার তোমরা আরাম কর।

তাঁর মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরুনো মাত্র পরিতোষ লম্বা হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

একটু পরে নবাব সাহেব গলা থেকে গোল গোল হলদে পাথরের একটা লম্বা মালা বের ক'রে জপতে আরম্ভ করলেন। বোধ হয় আধ ঘণ্টা পরে একজন চাকর এসে গোটাদুয়েক বাতি ছাড়া ঝাড়ের বাকি মোমবাতিগুলো নিবিয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম টের পাই নি। ঘুমও হয়েছিল বেশ গাঢ়। হঠাৎ শুনতে পেলুম, দূরে যেন কোথায় পেটা-ঘণ্টায় তিনটে বাজল। চোখ চেয়েই মনে হ'ল, এ আমি কোথায় শুয়ে আছি! ওপরে লাল নীল সবুজ সাদা রঙের আয়না দিয়ে বিচিত্র নকশা করা সিলিং, তা থেকে নানা রঙের কাপড়ে মোড়া সুন্দর সুন্দর খাঁচা ঝুলছে। এ পাশে ফিরে দেখি, নবাব সাহেব পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে হাঁটু গেড়ে চোখ বুজে ব'সে সেই ভাবে মালা জপ ক'রে চলেছেন, সবার ওপরে স্তিমিত আলোর স্নিগ্ধ বিভা। আমার মনে হতে লাগল, আমি যেন একটা মুঘল চিত্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছি, ছবিখানার মধ্যে আমিও যেন আঁকা হয়ে বিছানায় প'ড়ে আছি। বাকি রাতটুকু কখনও ঘুম কখনও বা ঘুমঘোরে কাটতে লাগল, শুধু মধ্যে মধ্যে দূরে কে যেন ঘণ্টা পিটে চলতে লাগল, চারটে, পাঁচটা—

রূপের নেশায় একেবারে ভোম হয়ে গিয়েছিলুম, হঠাৎ ওপরের সেই পাখিগুলো একসঙ্গে বিচিত্র সুরে ভোরের গান শুরু ক'রে দিলে। বনে জঙ্গলে স্বাধীন পাখির প্রাণখোলা গান শোনার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে অনেকবার

হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে নবাব সাহেবের ঘরে পিঞ্জরাবদ্ধ পরাধীন পাখিরা আমাকে যে গান শুনিয়েছিল তা আজও ভুলি নি, তা ভোলবার নয়।

পাখির ডাক কিছুক্ষণ চলবার পর নবাব সাহেবের ধ্যানভঙ্গ হ'ল। তিনি মালাগাছা গলায় ঝুলিয়ে রেখে আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে পড়লেন। আমি উঠে বসতেই তিনি আমাকে সম্ভাষণ ক'রে যা বললেন, তার অর্থ—রাত্রিটা তোমার সুস্বপ্নে কেটেছে তো ?

আমি বললুম, কিন্তু আপনাকে দেখলুম, সারারাত্রিই তো ঘুমোন না !

নবাব সাহেব বললেন, সারাজীবন তো ঘুমিয়েই কাটালুম।

নবাব সাহেব তাঁর সেই সুন্দর ভাষায় ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে আরম্ভ করলেন, আর আমি মধ্যে মধ্যে 'হাঁ, হুঁ, না, তা বইকি' ক'রে যেতে লাগলুম।

কিছুক্ষণ আলোচনা চলবার পর গত সন্ধ্যার সেই হকিম সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। পরস্পর অভিবাদনান্তে হকিম সাহেব নবাব সাহেবের নাড়ী দেখতে আরম্ভ করলেন।

ওঃ, সে নাড়ী দেখা বটে, নবাবী নাড়ী কিনা !

হকিম সাহেব নাড়ী দেখতে শুরু করলেন, ইতিমধ্যে একজন লোক এসে বাতিগুলো নিবিয়ে দিয়ে গেল। পাখিগুলোর সেই মধুর কাকলী তীব্রতর ও ক্রমে কর্কশ শোনাতে লাগল। একজন চাকর এসে আমাদের হাত মুখ ধুতে ডেকে নিয়ে গেল। ফিরে এসে দেখি, হকিম সাহেব তখনও নবাব সাহেবের ডান হাতের কব্জিতে টিপ কষছেন।

ইতিমধ্যে আর একদল চাকর এসে ওপরকার সমস্ত খাঁচা নাবিয়ে পাখিদের হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে গেল, তখনও তিনি নবাব সাহেবের কব্জি টিপে চোখ বুজে ব'সে।

আমাদের জন্যে জলখাবার এসে হাজির হ'ল। আমরা খেতে খেতে দেখতে লাগলুম, হকিম সাহেব নবাব সাহেবকে চিত ক'রে ফেলে অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে তাঁর মাথার কাছে গিয়ে বসলেন, তারপর আবার ডান হাতের কব্জি টিপে ধরলেন। তারপর কভু এপাশ কভু ওপাশ, কভু চিত কভু উপুড় করতে করতে শেষকালে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে হকিম সাহেব হাসিমুখে ঘোষণা করলেন, ভবিষ্যৎ খুব অচ্ছ্।

যাক, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচা গেল।

কিছুক্ষণ পরে, বোধ হয় নাড়ী দেখানোর পরিশ্রমের পর একটু দম নিয়ে নবাব সাহেব উঠে টুকটুক্ ক'রে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন, আর হকিম সাহেব আমাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে একজন লোক এসে আমাদের বললে, আপনাদের যদি অসুবিধা না হয়, তা হ'লে পিয়ারা সাহেব সাক্ষাৎ চাইছেন।

তখুনি উঠে চললুম তার সঙ্গে। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলুম, পিয়ারা সাহেব আছেন কোথায়?

কবুতরখানায়।

কথাটা কানে যেতেই পরিতোষ বললে, কি বাবা, পায়রা ওড়াতে হবে নাকি?

বললুম, দেখাই যাক না কি হয়!

পরিতোষ বললে, কি জানি বাবা! এক এক জায়গায় তো দেখছি এক এক রকমের রেওয়াজ। হয়তো এখানকার লোকে সকালবেলা মাস্টারদের ধ'রে পায়রা উড়িয়ে নেয়।

কথাবার্তা হতে হতে আমরা একটা সুদৃশ্য বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হলুম। চারদিকে খুব উঁচু দেওয়াল-ঘেরা একটা বাড়ি, ওপরে থাকে থাকে চারতলা ছাত, অনেকটা ফতেপুর সিক্রির পঞ্চ-মহলের মতন দেখতে।

কিন্তু বাড়ি অমন সুন্দর দেখতে হ'লে হবে কি! বাপ রে বাপ, কি গন্ধ সেখানে! পায়রা ও পায়রাবিষ্ঠার দুর্গন্ধে সে বাড়ির বিশ রশির মধ্যে এগোয় কার সাধ্য!

যা হোক, নাকে কাপড় ঠেসে তো বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়া গেল। দেশী ও বিদেশ থেকে আহৃত হাজার হাজার পায়রা সেখানে বংশানুক্রমে পালিত হয়ে আসছে, সে বোধ হয় দুশো বিভিন্ন জাতের।

পায়রা দেখতে দেখতে আমরা সেই লোকটির সঙ্গে তিন তলার ছাদে গিয়ে উঠলুম, সেখানে পিয়ারা সাহেব ও আরও অনেকগুলি লোক ব'সে ছিলেন। পিয়ারা সাহেব আমাদের দেখে উঠে অভিবাদন ক'রে আসরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলেন। পিয়ারা সাহেব বললেন, আপনাদের অপেক্ষায় এতক্ষণ কবুতর ওড়ানো হয় নি। অনুমতি করেন তো আমরা

বললুম, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়।

আসরে একজন দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ছিলেন, এঁরা বংশপরম্পরা ধ'রে কপোতকুলগুরুর কাজ ক'রে আসছেন। নবাব সাহেবদের বাড়িতেও তাঁদের দু-তিন পুরুষ হয়ে গেছে। এই আসরে পিয়ারা সাহেবের পরেই তাঁর ইজ্জৎ।

আমার কথা শুনে পিয়ারা সাহেব বৃদ্ধকে বললেন, বড়ে মিয়া, শুরু কিজিয়ে।

আমাদের ছেলেবেলায় অধিকাংশ অভিভাবকই ছেলেদের পায়রা পোষাটা পছন্দ করতেন না। এর কারণ হচ্ছে, পায়রার পেছনে দিনরাত এত লেগে থাকতে হয় যে, ছেলেরা লেখাপড়া করবার অবকাশই পায় না। প্রথমত সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পায়রাদের ওড়াবার পালা, তারপরে সারাদিন ধ'রে তাদের খেতে দেওয়া, স্নান ও পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা, সন্ধ্যে হতে না হতে প্রত্যেকটি পায়রা খোপস্থ হয়েছে কি না তার তদারক করা, ঠিক নিজের নিজের জোড়া নিজের ঘরে ঢুকেছে কি না তার তদন্ত করা। শুনেছি, মানুষ যেখানে বস্তিতে বাস করে, পায়রার খোপের মতন ঘেঁষাঘেষি ঘর হওয়ার জন্যে সে স্থানে ব্যাভিচারের মাত্রা খুবই বেশি। আসল পায়রা-সমাজের মধ্যে কিন্তু এ নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। পাশাপাশি ঘরে বাস করলেও সন্ধ্যের ঝোঁকে এর লোক ওর ঘরে ঢুকে পড়লে সে লোকের দুর্ভোগের আর অন্ত থাকে না। বাড়ির গিন্নী সারারাত তাকে চঞ্চু ও পক্ষ-তাড়নায় একেবারে নাজেহাল ক'রে ছাড়ে—এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ ও দৃষ্টি রাখা। তা ছাড়া বেরাল, ভাম ইত্যাদি যাতে পায়রা ধ'রে না খেয়ে ফেলে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা। তা ছাড়া আজ এর পায়রা ও ধ'রে নিয়েছে, এ নিয়ে ঝগড়া মারামারি খুনোখুনি। ওদিকে বহ্বাণ্ডপ্রসূ কপোতবধূর কল্যাণে এক জোড়া পায়রা দেখ্‌ দেখ্‌ ক'রে পাঁচ জোড়ায় পরিণত হতে বেশি দেরি লাগে না। ছেলেরা তখন জোড়া জোড়া পায়রা, কেউ বা কোঁচায় ঢেকে, আর যাদের বাড়িতে পুরুষ অভিভাবকের বালাই নেই অথবা থেকেও ছেলেরা শাসনমুক্ত, তারা অভিভাবকদের সামনে দিয়েই খাঁচায় ভ'রে পায়রা নিয়ে যেত সপ্তাহে দু-বার ক'রে বৈঠকখানার হাটে বিক্রি করতে। এইভাবে দিনরাত পায়রা-চর্চা করতে করতে তারা পাড়ার ও অন্যান্য ছেলেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। আমাদের সময়ে পায়রা-পোষা ছেলেদের হালচালই ছিল এক রকমের।

পায়রা পোষার অভ্যেস না থাকলেও সকালবেলা ছাতে ওঠবার অবকাশ ঘটলেই দেখতুম, আকাশে ছোট-বড় ঝাঁকের পায়রা গোল হয়ে উড়ছে এখানে-সেখানে, মধ্যে মধ্যে এক-একটা পায়রা দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে মনের সাধে শূন্যে উপরি-উপরি গোটাকয়েক ডিগবাজি কিংবা উল্টোবাজি খেয়ে আবার নিজের দলে ঢুকে প'ড়ে উড়তে আরম্ভ করছে। দৃশ্যটা ভালই লাগত। কিন্তু কলকাতায় যাই দেখে থাকি না কেন, এখানে এদের পায়রা-ওড়ানো দেখে জীবনে সত্যিই একটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলুম, যা অন্তত কলকাতার লোকের কাছে দুর্লভ।

পিয়ারা সাহেবের হুকুম পাওয়ামাত্র বড়ে মিয়া দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম ক'রে মুখের মধ্যে একটা আঙুল পুরে দিয়ে লম্বা একটা শিস দিলেন। বলা বাহুল্য ওড়বার পায়রাগুলো যে কোথায় আছে, তা আমরা দেখতে পাই নি।

বড়ে মিয়ার শিস শেষ হবার বোধ হয় মিনিটখানেক পরে মাথার ওপরে পায়রা ওড়ার ফড়ফড় শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। তার একটু পরেই দেখা গেল, বিরাট এক ঝাঁক ঝকঝকে সাদা পায়রা ছাতার মতন গোল হয়ে আকাশে উড়তে আরম্ভ করেছে, বুঝলুম, মাথার ওপরকার ছাতেই পায়রার দল ব'সে আছে ইঙ্গিতের অপেক্ষায়।

কিছুক্ষণ দেখবার পর লক্ষ্য করলুম, ঝাঁকের ঠিক মাঝখানে টিপের মত চকচকে কালো একটা পায়রা উড়ছে। একটু পরেই বড়ে মিয়া উপরি-উপরি ছুটো টানা শিস কাটলেন, আর উড়ল এক ঝাঁক কুচকুচে কালো পায়রা, তার মধ্যিখানে ধবধবে সাদা একটা। তারপরে বড়ে মিয়ার এক নতুন রকমের শিসে এক ঝাঁক সাদা পায়রা উড়ল, যাদের ল্যাজ লাল রঙ করা; আর একরকম শিসে আর এক দল সাদা পায়রা উড়ল, যাদের ল্যাজগুলো কালো রঙ করা। চার দল পায়রা আকাশ জুড়ে গোল হয়ে কখনও ওপরে কখনও নীচে উড়তে লাগল।

এর পর শুরু হ'ল আসল খেলা। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! হঠাৎ বড়ে মিয়া কি রকম উত্তেজিত হয়ে মুখের মধ্যে দুই হাতের আঙুল ঠেসে এক রকমের শিস দিলেন, আর দেখতে দেখতে চার ঝাঁক পায়রা, যারা এতক্ষণ আলাদা আলাদা উড়ছিল, তারা মিলে গিয়ে একসঙ্গে উড়তে লাগল। তারপরে আর এক ধরনের শিস, আবার যার যার দল আলাদা হয়ে গেল।

বড়ে মিয়ার শিসের বিরাম নেই। আর এক শিসে সাদা পায়রারা দল ভেঙে লাইনবন্দী হয়ে একটার পর একটা লম্বা হয়ে উড়ে ক্রমে লাইনের দুই মুখ জুড়ে বিরাট একটা পদ্মের মালা হয়ে গেল, দেখতে দেখতে সেই মালার মাঝখানের শূন্য জায়গায় এসে ঢুকল কালো পায়রার দল, মনে হতে লাগল, যেন সাদা ফ্রেমে বাঁধানো একদল কালো পায়রার ছবি দেখছি। দু দল বিপরীত মুখে উড়তে থাকায় চোখে কি রকম ধাঁধা লেগে যায়, বেশিক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকা যায় না।

এই রকম প্রায় দেড় কি দু ঘণ্টা কসরৎ দেখানোর পর বড়ে মিয়ার এক শিসে পায়রাদের ব্যায়াম বন্ধ হ'ল, তারা ছাতের ওপরে এসে বসল। ধন্য পায়রার দল আর ধন্য বড়ে মিয়ার শিক্ষা ও তার শিস দেবার কায়দা! আমাদের মনে হ'ল, হ্যাঁ, দেখলুম বটে একটা জিনিস।

আমরা যখন অবাক হয়ে পায়রা ওড়ানো দেখছিলুম, তারই মধ্যে মধ্যে পিয়ারা সাহেব আমাদের জিজ্ঞাসা করতে লাগল, আচ্ছা, কবুতরকে ইংরিজীতে কি বলে, বাংলায় কি বলে? এইভাবে চোখ, চঞ্চু, ডানা ইত্যাদি কথার ইংরিজী ও বাংলা শিখে নিতে লাগল। এই অভিনব উপায়ে উভয় পক্ষেরই শিক্ষা শুরু হ'ল আমাদের নতুন কর্মক্ষেত্রে।

দ্বিপ্রহরে আহারের সময় আর পিয়ারা সাহেবের দেখা পেলুম না। খেতে খেতে নবাব সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, এ ঘরে থাকতে তোমাদের যদি অসুবিধা হয় তো বল, অন্য ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দিই।

বললুম, এ ঘরে থাকতে আমাদের কোনও অসুবিধাই নেই, তবে আপনার যদি কিছু অসুবিধা হয়, তা হ'ল যা অভিরুচি তাই করুন।

আমরা নবাব সাহেবের ঘরেই থেকে গেলুম।

সেদিন বিকেলবেলা, তখনও রোদ বেশ চড়চড়ে আছে, পিয়ারা সাহেব আমাদের ডেকে পাঠালেন। চাকরের সঙ্গে আমরা প্রাসাদের হুদ্দোর মধ্যেই একটা বড় উঁচু-নীচু ছাতে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে দেখি, আট-দশটা লোক ছাতের হেথা-হোথা ব'সে দাঁড়িয়ে ইয়া ইয়া বোমা-লাটাইয়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, আকাশে রঙের বাহার লেগে গেছে।

আমাদের দুজনেরই ঘুড়ি ওড়াবার শখ ছিল। ওই প্রকাণ্ড ছাত আর সেখানে ঘুড়ি উড়ছে দেখে মনটা ভারি প্রফুল্ল হয়ে উঠল। পিয়ারা সাহেব